প্রথম প্রকাশ : ১৯৫৯

প্রকাশক :
শ্রীমতী দীপাঞ্জনা চক্রবর্তী
২৭/৬. আটাপাড়া লেন
কলিকাতা ৭০০ ০৫০

মুদ্রক :
গুপ্ত প্রেশ
৩৭/৭. বেনিয়াটোলা লেন
কলিকাতা ৭০০ ০০৯

উৎসর্গ

যিনি আমাকে হাতে ধরে গবেষণার কাজ শিখিয়েছেন
আমার সেই প্রিয় অধ্যাপক তথা পথ-প্রদর্শক
প্রয়াত ডঃ অরুণ কুমার মিত্রের
পুণ্য স্মৃতির উদ্দেশ্যে—

॥ সূচীপত্র ॥

পূর্বাভাষ

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ প্রত্যক্ষভাবে আমাদের দেশকে নাড়া দিয়েছিল। ইউরোপে যখন মহাযুদ্ধ শুরু হয় তখন তা যে আমাদের সমাজজীবনে কোন বড় ধরণের প্রভাব ফেলবে তা মনে হয়নি। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের মতো এই মহাযুদ্ধও ইউরোপেই সীমাবদ্ধ থাকবে এবং আমাদের চিন্তাধারার উপরে কিছু পরোক্ষ প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করবে- এই রকম ভাবা গিয়েছিল। কিন্তু দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ অতি দ্রুত চতুর্দিকে প্রভাব ছড়িয়ে দেয়, এশিয়াখণ্ডে যুদ্ধ শুরু হয়ে যায়। বৃটিশ সরকার ভারতীয় জনগণকে অর্থনৈতিক এবং রাজনৈতিক ভাবে এই যুদ্ধের অংশীদার করে তোলে। জাপান অক্ষশক্তির সঙ্গে যোগদান করায় পূর্ব এশিয়া যুদ্ধক্ষেত্রে পরিণত হয়। সোভিয়েত দেশ ইঙ্গ মার্কিন গোষ্ঠীর সঙ্গে মৈত্রী স্থাপন করে জার্মানি ইটালি এবং জাপানের বিরুদ্ধে সর্বাত্মক যুদ্ধে প্রবৃত্ত হয়। মার্কিন সৈন্যেরা পূর্বভারতে কেন্দ্র স্থাপন করে। বৃটিশ সৈন্য তো ছিলই।

যুদ্ধের সময়ে কংগ্রেস দল বৃটিশ রাজশক্তির কাছ থেকে স্বাধীনতার প্রতিশ্রুতি আদায়ের জন্য চাপ দিতে থাকে। ১৯৪২ সালে ভারত ছাড় প্রস্তাব পাশ হয় এবং দেশব্যাপী বৃটিশ বিরোধী আন্দোলন তীব্র হয়ে ওঠে। মহাত্মা গান্ধী সহ কংগ্রেস নেতৃবৃন্দ গ্রেপ্তার হলেন। কংগ্রেসের মধ্যে বিপ্লবী অংশ এবং সমাজতন্ত্রীরা ভারত ছাড় আন্দোলনকে সশস্ত্র লড়াইয়ের পথে নিয়ে যায়। শাসকদের অত্যাচার এবং দমননীতি প্রচণ্ড আকার ধারণ করে।

ভারতের কমিউনিস্টরা এই সময়ে একটি অদ্ভুত ভূমিকা গ্রহণ করে। প্রথমদিকে তারা এই মহাযুদ্ধকে সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধ বলে ঘোষণা করেছিল কিন্তু সোভিয়েত ইউনিয়ন মিত্র পক্ষে যোগ দেবার সঙ্গে সঙ্গে তারা সোভিয়েতের সমর্থনে মেতে ওঠে এবং এই যুদ্ধকে জনযুদ্ধ বলে ঘোষণা করে।

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ চলাকালীন জননায়ক সুভাষচন্দ্র বসু স্বগৃহে নজরবন্দী ছিলেন। তিনি বৃটিশ সরকারের চোখে ধুলো দিয়ে জার্মানিতে চলে যান এবং হিটলারের সাহায্যে বৃটিশ বিরোধী স্বাধীনতা ফ্রন্ট গঠন করার প্রস্তাব দেন। হিটলারের অনুরোধে তিনি সমুদ্রগর্ভে সাবমেরিনে চড়ে জার্মানি থেকে জাপানে গিয়ে উপস্থিত হন। জাপান সরকারের সঙ্গে চুক্তিক্রমে সুভাষচন্দ্র দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় আজাদ হিন্দ ফৌজ এবং আজাদ হিন্দ সরকার গঠন করেন। যে সব ভারতীয় সৈন্য বৃটিশের অধীনে যুদ্ধ করতে গিয়ে জাপানিদের হাতে ধরা পড়ছিল, তারা এই সেনাবাহিনীতে যোগ দেয়। তা ছাড়া বহু প্রবাসী ভারতীয় আজাদ হিন্দ ফৌজের সঙ্গে সহযোগিতা করে। নেতাজীর ফৌজ ভারতের সীমানার মধ্যে ঢুকে পড়েছিল। কিন্তু ইঙ্গ-মার্কিন ফৌজের কাছে পরাজিত হয়। ঐ সময়ে জার্মান এবং জাপানি ফৌজের পরাজয় শুরু হয়ে যায়। নেতাজীর উদ্দেশ্য সফল হয়নি কিন্তু তাঁর এই প্রচেষ্টা ভারতবাসী তথা বাঙালির মনে সুগভীর প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করে।

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ চলাকালীন কলকাতার বুকের উপরে জাপানি বোমা পড়েছে। কিছুকাল আগে জাপানি সৈন্য যখন মায়নামার দখল করে তখন প্রচুর সংখ্যক প্রবাসী ভারতীয়

দেশে ফিরে আসতে বাধ্য হয়। এ দিকে কলকাতা এবং উপকণ্ঠ থেকে অধিবাসীবৃন্দ কাতারে কাতারে সুদূর গ্রাম অঞ্চলে চলে যেতে থাকে জাপানি বোমার ভয়ে।

যুদ্ধের ফলে যেমন ভারতের প্রধান নগরগুলিতে বিশেষভাবে পূর্বাঞ্চলে সহযোগী শিল্প এবং নানারূপ কর্ম তৎপরতা যার সঙ্গে যুদ্ধের সম্পর্ক তার তেজীভাব দেখা দেয়। আবার পাশাপাশি এতদঞ্চলে ফৌজী চলাচল এবং অবস্থান বেড়ে গিয়ে কিছু নৈতিক সামাজিক সমস্যার সৃষ্টি করে। নিষ্প্রদীপ অবস্থা যে কি ভয়াবহ ব্যাপার কলকাতার মানুষ তার অভিজ্ঞতা লাভ করে। কিন্তু সব চাইতে বড় অভিজ্ঞতা হল পঞ্চাশের মন্বন্তর। ১৯৪৩ সালের সেই দুর্ভিক্ষের সমতুল্য কিছু এক শতাব্দীর মধ্যে মানুষের অভিজ্ঞতায় ধরা পড়ে নি। লক্ষাধিক এই দুর্ভিক্ষে মারা যায়। খাদ্যাভাবের সঙ্গে সঙ্গে দেখা দেয় বস্ত্রাভাব, তারপরে জ্বালানির অভাব। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের ফলাফল এ দেশের মানুষ বিশেষভাবে বঙ্গদেশের লোক হাড়েমজ্জায় অনুভব করেছিল।

আমি খুব সংক্ষেপে দেখাবার চেষ্টা করলাম এদেশে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের প্রভাব কত প্রবল হয়ে উঠেছিল। বাঙালির সাহিত্য ও শিল্পে বাঙালির নাটকে ও চিত্রকলায়, সঙ্গীতে ও চলচ্চিত্রে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের বহুমুখী প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ প্রভাব পড়েছিল। লেখক ড সুপ্রভাত চক্রবর্তী এই পরিপ্রেক্ষিতটি গ্রহণ করে বাংলা নাট্যশালার এবং নাট্য সাহিত্যের তৎকালীন গতি-প্রকৃতি বিশ্লেষণের চেষ্টা করেছেন। তাঁর অবলম্বিত বিষয়টি যে খুবই গুরুত্বপূর্ণ এবং বিস্তৃত আলোচনার যোগ্য তাতে সন্দেহ নেই। এ বিষয়ে অল্পাধিক আলোচনায় সমৃদ্ধ গ্রন্থ ও প্রবন্ধ আমার চোখে পড়েছে। কিন্তু ড চক্রবর্তীর এই কাজটি যেমন বিস্তৃত তেমনি পূর্ণাঙ্গ। সেদিক থেকে এই রচনাটিকে একটি অভিনব ও প্রয়োজনীয় সংযোজন বলে আমি মনে করি।

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময়ে কলকাতায় অনেকগুলি সাধারণ রঙ্গমঞ্চ পুরোদস্তুর সমারোহের সঙ্গে নতুন এবং পুরোনো নাটকের রীতিমতো অভিনয় চালিয়ে যাচ্ছিল। ষ্টার, রঙমহল, মিনার্ভা, শ্রীরঙ্গম, নাট্য নিকেতন, নাট্য ভারতী, আর্ট থিয়েটার প্রভৃতি মঞ্চ ও গোষ্ঠীতো ছিলই, কালিকামঞ্চ নামে দক্ষিণ কলকাতায় উত্তরের থিয়েটারের পাড়ার সঙ্গে পাল্লা দিয়ে একটি পেশাদারি মঞ্চ যাত্রা শুরু করে। সন্দেহ নেই তখনকার কলকাতার তথা বঙ্গীয় নাট্য জগতের মূল আলোকসম্পাত ছিল বাণিজ্যিক থিয়েটারগুলির উপরে। শিশিরকুমার ভাদুড়ির প্রয়োগ শিল্পের অভিনবত্ব বেশ কয়েকবছর আগে শুরু হলেও তখনও তিনি অবসর গ্রহণ করেননি। সময়োপযোগী নতুন নাটক নিয়ে কিছু পরীক্ষা নিরীক্ষা করার চেষ্টা করেছেন। নামকরা অভিনেতাদের মধ্যে অহীন্দ্র চৌধুরী, ছবি বিশ্বাস, নরেশ মিত্র, নির্মলেন্দু লাহিড়ী, নীতিশ মুখোপাধ্যায়, জহর গঙ্গোপাধ্যায়, সরযূবালা, রাণীবালা, রেবা দেবী, মহেন্দ্র গুপ্ত প্রমুখ দাপটের সঙ্গে বাংলার মঞ্চগুলিকে জীবন্ত করে রেখেছিলেন। ব্যক্তিগত অভিনয়ের যে সমুচ্চতায় তাঁরা থিয়েটারকে নিয়ে গিয়েছিলেন তার সমতুল্য পরিস্থিতি আর কখনো তৈরি হয়নি। যুদ্ধকালেও বাঙালির থিয়েটার বাঙালির সংস্কৃতির প্রদীপটি জ্বালিয়ে রেখেছিল।

এই সময়ের নাট্যকারদের মধ্যে মন্মথ রায়, শচীন সেনগুপ্ত, তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়, বিধায়ক ভট্টাচার্য, অয়সকান্ত বক্সী, জলধর চট্টোপাধ্যায়, মহেন্দ্র গুপ্ত প্রমুখের নাম বিশেষভাবে

উচ্চারণ করতে হয়। ব্যবসায়িক মঞ্চের জন্য নাট্য রচনা করলেও এঁদের নাটকে সমকালীন যুগচেতনা প্রতিফলিত হয়েছে। ভারতে স্বাধীনতা সংগ্রাম এবং তার বিভিন্ন সমস্যা কখনো পৌরাণিক কাহিনী কখনো ঐতিহাসিক ঘটনা কখনো সামাজিক প্রসঙ্গ আশ্রয় করে আত্মপ্রকাশ করেছে এবং বাঙালি দর্শকদের মধ্যে জাতীয়তাবাদী ভাবধারা উদ্বেল করে তুলেছে।

এই সময়ে যে সব নাটক খুব জনপ্রিয় হয়ে উঠেছিল তাদের মধ্যে 'ধাত্রীপান্না', 'রাষ্ট্র বিপ্লব', 'শতবর্ষ আগে', 'টিপু সুলতান', 'ভোলা মাষ্টার', 'দুই পুরুষ' প্রভৃতির নাম বিশেষভাবে উল্লেখ করা যায়। সামাজিক সমস্যা নিয়েও নাটক লেখা হয়েছে যেমন 'কঙ্কাবতীর ঘাট'। কিছু কিছু নাটকে পৌরাণিক ভক্তিবাদও প্রকাশ পেয়েছে যেমন 'উত্তরা'। বাঙালির মানস প্রবণতার মূল দিকগুলি ব্যবসায়িক থিয়েটার যুদ্ধকালেও এড়িয়ে যেতে চায়নি।

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধকালে বঙ্গদেশে বামপন্থীদের চেষ্টায় একটি রাজনৈতিক—সাংস্কৃতিক আন্দোলন বিকশিত হয়ে ওঠে, তাকে ফ্যাসী বিরোধী নামে অভিহিত করা হয়। এই আন্দোলনের সঙ্গে একটি নাট্য আন্দোলনও যুক্ত হয়, তাকেই বলে গণনাট্য আন্দোলন। গণনাট্য আন্দোলন নাটক ও সঙ্গীতের ক্ষেত্রে সমাজমুখীতাকে বিশেষ গুরুত্ব দেয়। এরা বৃটিশ বিরোধী স্বাধীনতা আন্দোলনের পাশে একটি নতুন ধরণের সামাজিক আন্দোলনের কথা প্রচার করতে থাকে। জমিদার, জোতদার, মহাজনদের বিরুদ্ধে কৃষকদের- শোষিত মানুষদের সংগ্রাম। তাঁরা মিল মালিকদের বিরুদ্ধে শ্রমিকদের আন্দোলনকে গুরুত্ব দেয়। এই বিষয়বস্তু বাংলা নাটকে অভিনবত্বের সৃষ্টি করে। শুধু তাই নয় নাট্য পরিবেশনার ক্ষেত্রে তাঁরা একটি নব্য ধারা নিয়ে আসেন। থিয়েটারকে তাঁরা ব্যবসায়িক প্রয়োজনের বস্তু করতে রাজি নয়। তাঁদের থিয়েটারের সঙ্গে যুক্ত কেউই পেশাদার নন আবার শৌখিনও নন। থিয়েটার তাঁদের কাছে মিশন। জনগণকে রাজনৈতিক ও সামাজিকভাবে উদ্বুদ্ধ করা তাঁদের অভিপ্রায়। মঞ্চাভিনয়ের বিনোদনকে তাঁরা সস্তা ও লঘু বলে পরিহার করেন। প্রচলিত মঞ্চ ব্যবস্থার ব্যয়বহুলতা কমিয়ে আনতে চান। অভিনয় এবং দর্শক শ্রেণীর মধ্যে সম্পর্ক স্থাপনই তাঁদের লক্ষ্য। গণনাট্যের এই আন্দোলনটির সূচনায় বিজন ভট্টাচার্য, শম্ভু মিত্র, সুধী প্রধান, মনোরঞ্জন ভট্টাচার্য, তৃপ্তি মিত্র, শোভা সেন প্রমুখ কলাকুশলীদের সাধনায় রূপ লাভ করতে থাকে। বাংলা নাটকের জগতে গণনাট্য আন্দোলন একটি নতুন ধারার সূত্রপাত করে। নাট্যকারদের মধ্যে বিজন ভট্টাচার্য (নবান্ন নাটক) এবং তুলসী লাহিড়ী (দুঃখীর ইমান, পথিক প্রভৃতি নাটক) বাংলা নাট্যজগতে অভিনবত্ব নিয়ে আসেন। ডঃ সুপ্রভাত চক্রবর্তী তাঁর 'দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধকালীন বাংলা নাটক ও নাট্যশালা' নামক গ্রন্থে এই পরম সম্ভাবনাপূর্ণ নাট্যযুগকে জীবন্ত করে তোলবার চেষ্টা করছেন। এবং এই গ্রন্থে তিনি স্বাধীনভাবে একটি বড় কাজ নিষ্পন্ন করলেন। বাংলা নাট্যচর্চার ক্ষেত্রে গ্রন্থটির তাৎপর্য স্বীকৃত হবে, এই আশা করি।

নিবেদন

শতবর্ষকাল অতিক্রান্ত বাংলা নাটক ও নাট্যশালার অন্দর মহলের হাল হকিকৎ অনুসন্ধিৎসার আলোকে সম্পূর্ণ আলোকিত হয়নি আজও; তার অবয়ব তাই যতটা ধূসর ততটাই অসম্পূর্ণ। আর দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের ক্রান্তিলগ্নে তার প্রতিচ্ছবি নিঃসংশয়ে ততোধিক তমসাচ্ছন্ন। সেই নিদারুণ সঙ্কট কালের বাংলা নাটক ও তার মঞ্চায়নের রূপ কল্প নির্মাণের অদম্য আকাঙ্ক্ষার পরিণতি বর্তমান গ্রন্থটি। বিস্মৃতপ্রায় অতীত ইতিহাসের ভগ্নস্তূপ থেকে শুধুমাত্র কৌতূহল কিম্বা আনন্দের তাগিদে তথ্য ও সত্যের উদ্ধার-প্রচেষ্টা কেবল দুরূহ নয় রীতিমত আয়াস-সাধ্য ব্যাপার। এ কাজে আমাদের সাফল্য ব্যর্থতার আদর্শ বিচারক, রসবোধ সম্পন্ন পাঠক গোষ্ঠী। সুতরাং অধিক মন্তব্য নিষ্প্রয়োজন।

যেটুকু স্মরণে রাখা আবশ্যক তা হচ্ছে এই যে, "দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধকালীন বাংলা নাটক ও নাট্যশালা" নিছক একটি সময় সীমার অন্তর্ভুক্ত বাংলা নাটকের ইতিহাস মূলক গ্রন্থ নয়— বাংলা ভাষায় সে জাতীয় গ্রন্থের অভাব নেই। বরং একে বলতে পারি, একটি বিশেষ দেশ কাল সমাজের প্রেক্ষাপটে অভিনয়ের মানদণ্ড নির্ভর বাংলা নাটকের বিচার বিশ্লেষণ মূলক গ্রন্থ। অর্থাৎ দ্বিতীয় মহাযুদ্ধকালীন বাংলা নাটকের আলোচনায় তার প্রয়োগ নৈপুণ্যের বিষয়টিকেও যথেষ্ট গুরুত্ব দিতে চেষ্টা করেছি—কেননা নাট্য বিচার কখনই তার অভিনয় প্রসঙ্গকে বাদ দিয়ে সম্পূর্ণ হতে পারে না। সম্ভবত বাংলা নাট্য সাহিত্যের আলোচনায় এই জাতীয় প্রচেষ্টা এই প্রথম।

বর্তমান গবেষণা-গ্রন্থটি এমন এক পর্বের বাঙালীর নাট্যচর্চাকে উপজীব্য করেছে, সমগ্র পৃথিবীর ইতিহাসে তদপেক্ষা সঙ্কট-কাল আর আসেনি; যুগ-সঙ্কটের সেই অধ্যায়টি সম্পর্কে অবহিত না থাকলে সমকালীন বাংলা নাটকের সম্যক রসাস্বাদন বিঘ্নিত হবে। তাই যুগ-পরিবেশের চিত্রটি যথা সম্ভব উদ্‌ঘাটনের চেষ্টা করেছি। প্রসঙ্গত নাটক ও তার মঞ্চায়নের পারস্পরিক সম্পর্কটি উপলব্ধির প্রয়োজনে আচার্য ভরত থেকে শুরু করে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্ত্য দার্শনিকবৃন্দের মতামত পর্যালোচনা করে সিদ্ধান্তে উপনীত হতে চেয়েছি।

কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় এই গবেষণা গ্রন্থটিকে পি.এইচ ডি. উপাধির জন্য অনুমোদন দিয়ে আমাকে সম্মানিত করেছেন। পরম শ্রদ্ধেয় অধ্যাপক ডঃ অরুণ কুমার মিত্রের অধীনে আমি আমার গবেষণার কাজ শুরু করি। গভীর মনীষা, সমৃদ্ধ রসদৃষ্টি এবং সুদক্ষ নির্দেশনায় তিনি আমাকে পথ দেখিয়েছেন। এই গ্রন্থের যা কিছু গৌরব, সে কেবল

তাঁরই প্রাপ্য . আমি নিমিত্ত মাত্র। কিন্তু আমার অত্যন্ত দুর্ভাগ্য. এ কাজ সম্পূর্ণ হবার পূর্বেই তাঁর অকাল প্রয়াণ আমার লক্ষ্যকে অনিশ্চিত করে তোলে। এই দিশাহারা অবস্থায় অধ্যাপক ডঃ সুখেন্দু সুন্দর গঙ্গোপাধ্যায় অকৃত্রিম বাৎসল্যে তাঁর তত্ত্বাবধানে আমার অসমাপ্ত কাজ সম্পূর্ণ করবার বিরল সুযোগ করে দিয়ে আমাকে ধন্য করেছেন। স্নেহ যে কত দুর্বার হতে পারে. তাকে প্রত্যক্ষ করবার এমন গৌরবময় অভিজ্ঞতা আজকের মূল্যবোধহীন সমাজে একান্তই দুর্লভ। তাঁকে সশ্রদ্ধ প্রণাম জানাই। অপরিশোধনীয় ঋণের অকুণ্ঠ স্বীকৃতি জানাই পিতৃ প্রতিম অধ্যাপক প্রয়াত ডঃ অরুণ কুমার মিত্রের অমর আত্মার উদ্দেশ্যে গ্রন্থখানি উৎসর্গ করে।

এই গ্রন্থ রচনায় আমাকে পদে পদে বহু বাধা বিঘ্নের সম্মুখীন হতে হয়েছে। সব থেকে বড় বাধা মূল নাট্য গ্রন্থগুলির দুষ্প্রাপ্যতা: সে কালের বহু নাটকই আজ লুপ্তপ্রায়: অনেক নাটক ছাপানোই হয়নি চরম ঔদাসীন্যে পাণ্ডুলিপি ধ্বংস হয়ে গেছে। বিক্রির অভাবে অধিকাংশ মুদ্রিত নাটকের পুনর্মুদ্রণ হয়নি। গ্রন্থ তালিকায় থাকলেও গ্রন্থাগারে নাট্যগ্রন্থটির সন্ধান মেলেনি ..এমন ঘটনাও বিরল নয়। আমাদের দেশে নাট্যগ্রন্থ সংরক্ষণের কোন সুচারু ব্যবস্থা নেই। ফলে দুষ্প্রাপ্যতা হেতু অনেক নাটককে আলোচনার বাইরে রাখতে হয়েছে।

উল্টোদিকে গবেষণার কাজে বহু ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানের কাছ থেকে নানা ভাবে উপকৃত হয়েছি। প্রয়াত শ্রীযুক্ত মন্মথ রায়. শ্রীযুক্ত দেবনারায়ণ গুপ্ত. বনফুলের জ্যেষ্ঠপুত্র ডাঃ অসীম কুমার মুখোপাধ্যায়. শ্রী অনুপ গুপ্ত. 'বহুরূপী' র শ্রীতারাপদ মুখোপাধ্যায়. ডঃ মানস মজুমদার. ডঃ নির্মলেন্দু ভৌমিক নানাভাবে সাহায্য করেছেন। অগ্রজ প্রতিম বিদগ্ধ সাহিত্য সমালোচক ডঃ শম্ভুনাথ গঙ্গোপাধ্যায় অসম্ভবকে সম্ভব করেছেন আমার মত একজন অখ্যাত লেখকের গ্রন্থ প্রকাশের ব্যবস্থা করে দিয়ে। তাঁর আগ্রহ ভরে লিখে দেওয়া 'পূর্বাভাষ' টি গ্রন্থের শিরোভূষণ রূপে নিঃসন্দেহে এর গৌরব বৃদ্ধি করেছে। 'গুপ্ত প্রেশের' কর্ণধার শ্রীঅরিজিৎ রায়চৌধুরী মুদ্রণের দায়িত্ব গ্রহণ করে আমাকে দুশ্চিন্তা মুক্ত করেছেন। নিয়ত উৎসাহিত করেছেন আমার পিসেমশাই ডাঃ কৈলাশপতি চট্টোপাধ্যায়. আমার জেঠা জেঠিমা. কাকা কাকিমা. ভাই বোনেরা. পরিবারের সকলেই। চরম আর্থিক সঙ্কটের মধ্যে দাঁড়িয়েও আমার বাবা মা সংসারের সব দায়িত্ব থেকে আমাকে অব্যাহতি দিয়ে গবেষণার পথকে সুগম করেছেন। আমার স্ত্রী শ্রীমতী দীপাঞ্জনার নিরন্তর অনুপ্রেরণা আমার কাজে আনন্দ এনেছে. গতি এনেছে---আত্মবিস্মৃতির অবকাশ দেয়নি। ছাত্র-ছাত্রীদের মধ্যে শ্রীমান নবারুণ. অপু. কল্যাণীয়া টিঙ্কা. টুম্পা এবং পিঙ্কির ক্রমাগত তাগিদ এবং ভালোবাসার দাবী বুক ভরে দিয়েছে। তাদের সর্বাঙ্গীণ সাফল্য কামনা করি। দুষ্প্রাপ্য গ্রন্থ. পত্র পত্রিকা এবং অপরাপর মূল্যবান তথ্য সরবরাহ করে আমাকে সবিশেষ ঋণী করেছেন 'জাতীয় গ্রন্থাগার' (সংবাদপত্র বিভাগ). 'বয়েজ ওন লাইব্রেরী'. 'বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ'. 'বাগবাজার রিডিং লাইব্রেরী'. 'চৈতন্য লাইব্রেরী'. উত্তরপাড়া জয়কৃষ্ণ

লাইব্রেরী`-র কর্মীবৃন্দ। এঁদের সকলের অকুণ্ঠ সহযোগিতা ছাড়া এই গ্রন্থ রচনা কখনই সম্ভব হত না। নিরর্থক কৃতজ্ঞতা জানিয়ে এঁদের কাউকেই ছোট করবার স্পর্ধা আমার নেই। আরও একটি কথা বলে রাখি. যে কোন সদুপদেশ পরবর্তী সংস্করণে শ্রদ্ধার সঙ্গে বিবেচিত হবে। পরিশেষে আচার্য ভরতের ভাষার বলি -

"ন তজ্জ্ঞানং ন তচ্ছিল্পং ন সা বিদ্যা ন সা কলা।
ন স যোগো ন তৎকর্ম নাট্যেহস্মিন যন্ন দৃশ্যতে॥

বিনীত
সুপ্রভাত চক্রবর্তী

ভূমিকা

যুগ-পরিবেশ এবং নাটকের ভাববস্তু ও আঙ্গিকে তার প্রভাব

॥ এক ॥

দৈববাণীর মতই ফলে গিয়েছিল কথাটি। পৃথিবীর তাবৎ রাষ্ট্রের শান্তিকামী মানুষ যখন সবে মাত্র স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলতে শুরু করেছেন, ঠিক তখনই প্রথম মহাযুদ্ধ জয়ী ফ্রান্সের সর্বাধিনায়ক মার্শাল ফস বহু প্রত্যাশিত "ভার্সাই-চুক্তি" সম্পর্কে একটি কঠিন মন্তব্য ছুঁড়ে দিয়েছিলেন — "This is not Peace It is an Armistice for twenty years"— অর্থাৎ এটা কোন শান্তিচুক্তি নয়, বিশ বছরেরে জন্যে যুদ্ধ বিরতি মাত্র।[১] সেদিন অনেকেই হয়ত মার্শাল ফসের হঠকারী মন্তব্যের বিরূপ সমালোচনা করেছিলেন; কিন্তু সত্যিই তাঁদের কুড়ি বছরের বেশি অপেক্ষা করতে হয়নি। ঠিক কুড়ি বছরের মাথাতেই ফসের ভবিষ্যদ্বাণীকে আশ্চর্য ভাবে সফল করে দিয়ে আরও একটি নরমেধ যজ্ঞের ধ্বংসলীলা সমগ্র পৃথিবী জুড়ে ত্রাসের সঞ্চার করেছিল — এবারে আরও ব্যাপক, আরও সর্বগ্রাসী রূপে!

যুদ্ধ মানব ইতিহাসে নতুন নয়, আকস্মিক তো নয়ই — মানুষের আদিমতম প্রবণতাগুলির অন্যতম এই যুদ্ধ। প্রভুত্বের বাসনা, অন্যের ওপর খবরদারী করার অদম্য আকাঙ্ক্ষা, আদিম কাল থেকে মানুষকে বারংবার রণাঙ্গণের দিকে ঠেলে দিয়েছে। কিন্তু দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের ব্যাপকতা, তার ফলশ্রুতি এত সুদূর প্রসারী যে সমগ্র মানব জাতীর ইতিহাসে তা এক নজির-বিহীন দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছে। মানুষের সামগ্রিক জীবন প্রবাহ এই একটি মাত্র সংঘাতে কল্পনাতীত ভাবে কেঁপে উঠেছিল। রণভূমির সীমানা ছড়িয়ে দেশ-কাল ব্যতিরেকে ব্যক্তি ও সমষ্টি মানুষের আশা - আকাঙ্ক্ষা, ভাল-মন্দ, ন্যায়-নীতি; তার জীবন-দর্শন, সমাজ-সভ্যতা; তার জ্ঞান-বিজ্ঞান, ধর্ম-বিশ্বাস; তার সাহিত্য-সংস্কৃতি— এক কথায় তার সামগ্রিক পরিমণ্ডল অভিনব চেতনায় উদ্দীপিত হয়ে উঠেছিল। যুদ্ধের

---

[১] দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের ইতিহাস, বিবেকানন্দ মুখোপাধ্যায়-দ্বিতীয় সংস্করণ, প্রথম খণ্ড, পৃষ্ঠা ৫ দ্রষ্টব্য।

এই যুগান্তকারী রূপটি ইত:পূর্বে এত স্পষ্ট ভাবে উপলব্ধি করা যায়নি। এমন কি ব্যাপ্তি ও গভীরতায় দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ প্রথম বিশ্বযুদ্ধকেও বহুদূর অতিক্রম করে গিয়েছিল।

তবে এ কথা ঠিক, মানুষের স্মরণ মনন চিন্তনের রাজ্যে যে অস্থিরতা এই পর্বে অনুভূত হচ্ছিল এবং যে অস্থিরতা পরবর্তী মানব ইতিহাসকেও আচ্ছন্ন করেছে, প্রথম মহাযুদ্ধ সমসাময়িক কাল থেকে তার ক্ষেত্র প্রস্তুত হতে শুরু করেছিল। কিন্তু যুগক্রান্তির সমস্ত লক্ষণ তখনও সুস্পষ্ট আকার নিয়ে ততটা স্পষ্ট ও প্রত্যক্ষ হয়ে ওঠেনি। বরং চিরাচরিত ধারনায় অমঙ্গলের বিনাশ এবং শুভ বা মঙ্গলের পুন:প্রতিষ্ঠার প্রতি স্বাভাবিক একটা ঔৎসুক্য বোধ, স্বল্প মাত্রায় হলেও টিকে ছিল। অন্তত সংশয়াতীত ভাবে নেতিবাদী জীবন দর্শন তখনও প্রতিষ্ঠিত হতে পারেনি। এই অভিমতের বিরুদ্ধে বিপরীত যুক্তি উঠবে হয়ত, আমরা যথা সময়ে তার প্রমাণ দেব। কিন্তু জীবন নিয়ে জুয়া খেলার এই নগ্ন টানা-পোড়েন দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের চরমতম আঘাতে একটা নিশ্চিত পথ-নির্দেশে এসে পরিসমাপ্তি লাভ করে।

এই কারণে সমকালীন ও পরবর্তী সাহিত্যের গতি-প্রকৃতি নির্ণয়ে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের গুরুত্ব এত বেশি। সাহিত্য যেহেতু সমাজ বিবর্জিত নয় এবং সাহিত্যের আশ্রয় যেহেতু সমাজ, সেইহেতু সমকালীন সমাজ মানসের পরিপ্রেক্ষিতে সাহিত্য-বিচার অপরিহার্য। আবার গণ জীবনের সঙ্গে অন্তরঙ্গতায় সমস্ত শিল্পকলাগুলির মধ্যে নাটকের অগ্রণী ভূমিকা অবিসংবাদিত ভাবে স্বীকৃত; ফলে সমকালীন নাট্য আন্দোলনের ধারাটি সঠিক ভাবে অনুধাবন করতে হলে এই অবক্ষয়িত সমাজ-মানসের রেখা-চিত্রটি বিশ্লেষণের প্রয়োজন আছে। আরও একটি বিষয় বর্তমান ক্ষেত্রে স্মরণযোগ্য—দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ কোন বিচ্ছিন্ন বা বিক্ষিপ্ত ঘটনা নয়, জাগতিক তত্ত্বের অনিবার্য নিয়মেই এত বড় বিপর্যয়ের সম্মুখীন হতে হয়েছিল মানুষকে। এও মনে রাখা প্রয়োজন—কাছে দূরের সমস্ত মানুষের, এমনকি ভাবীকালের মানব-গোষ্ঠীর ভাগ্যসূত্র একই গ্রন্থিতে গাঁথা পড়েছিল সেদিন। একটি নির্দিষ্ট ভৌগোলিক সীমারেখার সঙ্কীর্ণ গণ্ডীকে অতিক্রম করে 'অনাগত বিধাতা'-র উদ্বোধনকল্পে সম্মিলিত মানবযাত্রীর অনিশ্চিত যাত্রা শুরু এই যুগ সন্ধিক্ষণ থেকে।

॥ দুই ॥

প্রথম মহাযুদ্ধের সপক্ষে যুক্তি দেখানো হয়েছিল, এই যুদ্ধ ভবিষ্যৎ পৃথিবীতে সমস্ত রকম যুদ্ধের সম্ভাবনা চিরতরে বিলুপ্ত করে গণতন্ত্রের স্থায়ী প্রতিষ্ঠা সুদৃঢ় করবে। বলা বাহুল্য গণতন্ত্রের এ হেন মুখরোচক প্রলোভনে সেকালের অনেক শান্তিবাদী নেতাও বিভ্রান্ত হয়েছিলেন। প্রথম মহাযুদ্ধকে ভাবীকালের মানব সমাজের পক্ষে নিরাপদ ও মঙ্গলজনক বলেই তাঁরা বিশ্বাস করেছিলেন।[২] কিন্তু অচিরেই তাঁদের মোহভঙ্গ হয়েছিল।

---

[২] "গান্ধীজীর মতো অহিংসাবাদীও তাই সৈন্য সংগ্রহে প্রবৃত্ত হয়েছিলেন" – "আধুনিক বাংলা কাব্য পরিচয়", ডঃ দীপ্তি ত্রিপাঠী, দ্বিতীয় সংস্করণ, পৃষ্ঠা ১২ দ্রষ্টব্য।

প্রায় সাড়ে চার কোটি [৩] মানুষের আত্মবলিদানের পর সমাপ্তি ঘটে সেই নিধন যজ্ঞের (১৯১৮, ১১ই নভেম্বর)। তারপর আরও প্রায় আট মাস সময় লেগে যায় পৃথিবীর প্রথম বৃহত্তর শান্তি চুক্তিটির খসরা তৈরী হতে। অনেক টালবাহানা, অনেক ওজর আপত্তি, অনেক দর কষাকষির পর অবশেষে ২৮শে জুন, ১৯১৯, ফ্রান্সের ভার্সাই শহরে স্বাক্ষরিত হয় সেই ঐতিহাসিক চুক্তি-- "ভার্সাই চুক্তি" নামে যা চিরস্মরণীয় হয়ে আছে। এত সত্ত্বেও 'শান্তির ললিত বাণী' ব্যর্থ পরিহাস হয়েই দেখা দিল -গণতন্ত্রের গালভরা বুলিটিও ম্যাজিকের মত অন্তর্ধান করল। কিন্তু কেন ?

এই 'কেন'-র উত্তর পাওয়া খুব দুরূহ নয়। যে "ভার্সাই চুক্তি" মানব কল্যাণকে সুনিশ্চিত করার পথে প্রথম পদক্ষেপ হিসাবে গণ্য হতে পারত, বিশ্বনেতৃবর্গের চরম অদূরদর্শিতা ও কূটকৌশলে সেই মহৎ পরিকল্পনাটি পরিণত হল প্রতিহিংসা বৃত্তি চরিতার্থ করণের কাজে। চিরস্থায়ী শান্তির পরিবর্তে জার্মানীকে পঙ্গু ও বিকলাঙ্গ করে তার সমাধি রচনার ব্যবস্থা করা হল এই চুক্তিতে।[৪] বানচাল হয়ে গেল "বিশ্ব রাষ্ট্র সংঘ" গঠনের প্রকৃত উদ্দেশ্যটি। এমন কি একটি রাষ্ট্রের অক্ষমতার সুযোগে গৃহীত এই প্রতিহিংসা-নীতি কোনদিন যে পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে বুমেরাং হয়ে ফিরে আসতে পারে, সে কথা একবারও তলিয়ে দেখতে চাইলেন না সেকালের সামরিক নেতৃবৃন্দ।

কিন্তু কাল তার আয়োজন পূর্ণ করে চলেছিল নি:শব্দে। তারই একটি ইঙ্গিত-- অদূর ভবিষ্যতে পরাজিত ও বিধ্বস্ত জার্মানীর হৃত গৌরব পুনরুদ্ধারের দুর্জয় সংকল্প নিয়ে এ্যাডলফ হিটলারের[৫] অভ্যুত্থান। তারও স্বল্পকাল পূর্বে পৃথিবীর ভাগ্যাকাশে আর একটি অশুভ গ্রহের আবির্ভাব যেন এই বৃত্তেরই প্রাথমিক পর্বটুকু রচনা করে রেখেছিল। ইতালীর স্বঘোষিত 'ডুসে' (নেতাজী) বেনিটো মুসোলিনী [৬] রোমক সাম্রাজ্য পুন:প্রতিষ্ঠার

বিভিন্ন ব্যক্তি ও সংস্থা কর্তৃক প্রকাশিত পরিসংখ্যান অনুসারে প্রথম মহাযুদ্ধে, যুদ্ধ, দুর্ভিক্ষ ও মহামারীতে সামরিক ও অসামরিক ব্যক্তি নিহত হয়েছেন মোট ৪ কোটি ১৪ লক্ষ ৩৫ হাজার। বিকলাঙ্গ ও পঙ্গু হয়েছেন ২ কোটি লোক এবং সর্বস্ব হারিয়েছেন কয়েক লক্ষ মানুষ।

"ভার্সাই চুক্তির" ফলে জার্মানীর ক্ষয় ক্ষতির চিত্রটি এই রকমঃ ইউরোপে ভূমিক্ষয় ২৭ হাজার বর্গমাইল এবং লোক সংখ্যা ৬৫ লক্ষ। সমুদ্র পারবর্তী উপনিবেশে ভূমিক্ষয় ১০ লক্ষ বর্গমাইল এবং লোকসংখ্যা ১ কোটি ২০ লক্ষ। এ ছাড়া প্রচুর কাঁচামাল, খনিজ সম্পদ ও সমস্ত রকম সমর সম্ভার।

প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য যে হিটলার জাতিতে জার্মান ছিলেন না, অষ্ট্রিয়াতে তাঁর জন্ম। ভিয়েনা শহরের দূরবর্তী একটি গ্রামের একজন জারজ সন্তানের তৃতীয় স্ত্রীর গর্ভে তাঁর জন্ম হয়। পারিবারিক শিক্ষা দীক্ষাহীন হিটলারকে দারিদ্রের জ্বালায় প্রথম মহাযুদ্ধে সামান্য সৈনিকের চাকুরী গ্রহণ করতে হয়। সেখান থেকে তিনি কূটকৌশলে জার্মান রাষ্ট্রের সর্বোচ্চ পদে অধিষ্ঠিত হয়ে সারা পৃথিবীতে আতঙ্কের সঞ্চার করেন।

মুসোলিনীর জীবনও হিটলারের মতই নাটকীয়। তিনি একজন কর্মকারের পুত্র এবং প্রথম জীবনে একটি বামপন্থী পত্রিকার সম্পাদক ছিলেন। ইতালীতে আভ্যন্তরীণ গোলোযোগের সুযোগে রাষ্ট্র ক্ষমতা দখল করে মুসোলিনী গণতন্ত্রের বিরুদ্ধে জেহাদ ঘোষণা করেন।

উত্তেজক বক্তৃতায় ইতালীয় জনসাধারণকে বিভ্রান্ত করে তুলেছিলেন। তবে বিচক্ষণতা ও কূটনীতিতে হিটলার অনায়াসে মুসোলিনীকে অতিক্রম করে সামগ্রিক পৃথিবীর পক্ষে অনেক বেশি বিপজ্জনক হয়ে উঠেছিলেন। আরও একটি নির্মম সত্য এই যে, লেনিনের নেতৃত্বে সোভিয়েত রাষ্ট্রে কমিউনিজমের প্রতিষ্ঠা এবং তারই অনুসরণে পৃথিবীর বিভিন্ন রাষ্ট্রে কমিউনিস্ট আন্দোলনের সূত্রপাত, ধনতান্ত্রিক শক্তিবর্গকে যথেষ্ট দুশ্চিন্তায় ফেলেছিল। কমিউনিস্ট জুজুর ভয়ে ভীত সন্ত্রস্ত ধনতান্ত্রিক শক্তিবর্গ তাই গোপনে বা প্রকাশ্যে হিটলারকে সমস্ত রকম সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিতে দ্বিধা করেননি; ধনতন্ত্রের স্বার্থে কমিউনিস্ট রাশিয়া অপেক্ষা ফ্যাসিস্ট জার্মানী তাঁদের কাছে অনেক বেশি নিরাপদ বলেই মনে হয়েছিল। কিন্তু স্বার্থ সন্ধানী ধনতান্ত্রিক শক্তিবর্গের বিস্ময়ের তখনও কিছু বাকি ছিল। ২৩শে আগস্ট, ১৯৩৯ কমিউনিস্ট রাশিয়া এবং ফ্যাসিস্ট জার্মানী মস্কোতে দশ বছরের অনাক্রমণ চুক্তিতে স্বাক্ষর করে সমগ্র দুনিয়াকে যেন চমকে দিল। স্ট্যালিনের রাশিয়ার সঙ্গে হিটলারের জার্মানীর বন্ধুত্ব—এ যে অবিশ্বাস্য! তবু এই অবিশ্বাস্য ঘটনাটি সম্ভব হয়েছিল; তার কারণ, তীব্র সোভিয়েত বিদ্বেষ থেকে স্ট্যালিন বুঝেছিলেন অদূর ভবিষ্যতে সম্ভাব্য নাৎসী আক্রমণ প্রতিরোধের প্রস্তুতির জন্যে কিছুটা সময় অপরিহার্য। আর হিটলার চেয়েছিলেন উভয় রণাঙ্গণের দায়িত্ব থেকে অব্যাহতি এবং ২২শে জুন, ১৯৪১ অতর্কিতে রাশিয়া আক্রমণ করে তিনি আবার প্রমাণ করেছিলেন, সামরিক চুক্তি মাত্রই কোন না কোন সময় লঙ্ঘিত হয়ে থাকে।

বিশ্ব রাজনীতির প্রেক্ষাপট যখন এই ভাবে ক্রমশ জটিল থেকে জটিলতর হয়ে উঠছে, তখন প্রশান্ত মহাসাগরে শোনা গেল আর এক রণশক্তির উদ্ধত আস্ফালন। ১৯৩৭ এ জাপান কর্তৃক আক্রান্ত হল চীন এবং জাপ-মার্কিন বিরোধের সূত্র ধরে ১৯৪১ র ৭ই ডিসেম্বর পার্ল হারবার থেকে শুরু করে উদীয়মান সূর্যের দেশ জাপান, তার বিপুল রণসম্ভার নিয়ে পৌঁছে গেল ভারতবর্ষের প্রান্তদেশ পর্যন্ত। সমগ্র ইউরোপ জুড়ে নাৎসী বাহিনীর প্রচণ্ড তাণ্ডব-লীলার পরিপূরক রূপেই যেন উত্তপ্ত হয়ে উঠল এশিয়া ভূখণ্ড। অর্থাৎ ১৯১৪ থেকে যে অবক্ষয়ের সূচনা, ১৯৪০-৪১-এ এসে তার ব্যাপক বিস্তৃতি অদৃশ্য নাগপাশে বন্দী করে ফেলল সমগ্র মানব সমাজকে।

সভ্যতার এই সঙ্কট বিচলিত করেছিল সত্য সুন্দর-মঙ্গলের আজন্ম পুরোহিত রবীন্দ্রনাথকে! মানবতার প্রতিভূ কবি, মানবতার এ হেন অপমানে ভারাক্রান্ত হৃদয়ে তৎকালীন মার্কিন প্রেসিডেন্ট রুজভেল্টের উদ্দেশ্যে পাঠালেন সেই ঐতিহাসিক তারবার্তা (১৫ই জুন, ১৯৪০):

"To day we stand in awe before the fearfully destructive force that has so suddenly swept the world Every moment I deplore the smallness of our mens and the feebleness of our voice in India, so utterly inadequate to stem in the least the tide of evil that has menaced the permanence of civilisation. All our individual problems of politics to-day have merged into one supreme world politics which, I believe, is seeking the help of

the United states of America as the last refuge of the spiritual man, and these few lines of mine merely convey my hope, even if unnecessary, that she will not fail in her mission to stand against this universal disaster that appears so imminent" [৭]
দানব শক্তির উন্মত্ত তাণ্ডবে রবীন্দ্রনাথের মত সংবেদনশীল ব্যক্তি মাত্রই সেদিন উৎকণ্ঠিত হয়ে উঠেছিলেন—এবং এই উৎকণ্ঠার যথেষ্ট কারণ ছিল।

॥ তিন ॥

আন্তর্জাতিক রাজনীতির বিক্ষুব্ধ তরঙ্গ ভারতবর্ষের বেলাভূমিকেও উত্তাল করে তুলেছিল। উপস্থিত সঙ্কটে ভারতের ভূমিকা নিয়ে ঔপনিবেশিক বৃটেনের দৃষ্টিভঙ্গি স্বভাবত:ই দেশীয় মানুষের স্বার্থের অনুকূল ছিল না। সাম্রাজ্যবাদের স্বার্থে ভারতকে 'যুদ্ধরত' বলে বৃটেনের একতরফা ঘোষণার প্রতিবাদে জাতীয় কংগ্রেসের নেতৃত্বে সমস্ত দেশ জুড়ে বিক্ষোভ ফেটে পড়তে থাকে। আর এই বিক্ষোভকে কঠোর ভাবে মোকাবিলা করার উদ্দেশ্যে বৃটিশ পার্লামেন্ট বড়লাটের হাতে দমন-পীড়নের চূড়ান্ত ক্ষমতা অর্পণ করে 'ভারত রক্ষা আইন' জারি করে। স্বাধীনতাকামী জনগণের বহু প্রত্যাশিত 'ডোমিনিয়ন স্টেটাসের' পরিবর্তে যুদ্ধকালীন সরকারের পক্ষ থেকে জাতীয় কংগ্রেসকে আমন্ত্রণ জানানো হয় একটি পরামর্শ কমিটি গঠনের। বলা বাহুল্য এ হেন অসম্মানজনক প্রস্তাব গ্রহণের অর্থই ছিল যুদ্ধে সর্ববিধ সমর্থনের পরোক্ষ স্বীকৃতি; জাতীয় ভাবধারার সম্পূর্ণ বিরোধী এই প্রস্তাব স্বাভাবিক কারণেই সর্ব-সম্মতিক্রমে প্রত্যাখ্যাত হল। শেষ চেষ্টা হিসাবে রাজা গোপালাচারীর নেতৃত্বাধীন, কংগ্রেসের একটি জাতীয় সরকার গঠনের শর্ত সাপেক্ষে যুদ্ধে সমর্থন ও সহযোগিতার প্রশ্নটিও সরকার বিবেচনা করার প্রয়োজন মনে করলেন না। উপরন্তু হিন্দু-মুসলমানের পারস্পরিক সহযোগিতার ও সম্প্রীতির সম্পর্কটিকে নানা কৌশলে রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষে রূপান্তরের চেষ্টা শুরু হল—যার চরমতম পরিণতি '৪৬ র সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা।

সমকালীন ভারতবর্ষের জনমানসে যে দুই নেতার ভাবধারা এই পরিস্থিতিতে সর্বাপেক্ষা প্রভাব বিস্তার করেছিল, তাঁদের একজন মহাত্মা গান্ধী এবং অন্যজন নেতাজী সুভাষ চন্দ্র বসু। যুদ্ধে সহযোগিতার প্রশ্নে অহিংসবাদী গান্ধীজী এবং কংগ্রেসের বিরোধ যখন বিচ্ছেদের পর্যায়ে এসে উপনীত, তখন দেশ জুড়ে সত্যাগ্রহের ডাক দিলেন গান্ধীজী, ১৯৪০-র অক্টোবরে। তদুপরি প্রধানত বহির্বিশ্বের চাপে সমঝোতার ভাঁওতায় প্রস্তাবিত "ক্রিপস্ মিশনের" বঞ্চনার প্রতিবাদে সংগঠিত জনমতের সামনে গান্ধীজী ধ্বনি তুললেন—'কুইট ইণ্ডিয়া'—'ইংরেজ ভারত ছাড়' (৭/৮ আগষ্ট ১৯৪২)! এই অগ্নিমন্ত্র দেশের প্রান্ত থেকে প্রান্তরে ছড়িয়ে পড়ে ভারতের জাতীয়তাবাদী আন্দোলনে এক অনমনীয় প্রত্যয় ও

দৃঢ়তা দান করল। আগষ্ট বিপ্লবেই সর্বপ্রথম একটা বৃহত্তর গণ আন্দোলনের সূচনা দেখা গেল সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে। অন্যদিকে আভ্যন্তরীণ রাষ্ট্র বিপ্লবের পাশাপাশি সুদূর বার্লিন থেকে নেতাজীর উদাত্ত আহ্বানে বৃটিশ সরকারের লৌহ শৃঙ্খল কেঁপে উঠল আর একবার! সন্দেহ নেই, রূপকথার গল্পের আশ্চর্য নায়কের মত নেতাজীর অন্তর্ধান (১৮ই জানুয়ারী, ১৯৪১), বার্লিনে 'আজাদ হিন্দ সংঘের' প্রতিষ্ঠা (২রা নভেম্বর, ১৯৪১), বিপ্লবী রাসবিহারী বসুর কাছে থেকে সিঙ্গাপুরে 'আই.এন.এ.র' কর্তৃত্বভার গ্রহণ (৪ঠা জুলাই ১৯৪৩), ঐ বছরই 'আজাদ হিন্দ সরকারের' প্রতিষ্ঠা (২১শে অক্টোবর) ও জাপান-জার্মানী-ইতালীর স্বীকৃতি লাভ, পরিশেষে বৃটেন ও আমেরিকার বিরুদ্ধে নেতাজীর একযোগে যুদ্ধ ঘোষণার (২৩শে অক্টোবর, ১৯৪৩) মত যুগান্তকারী ঘটনায় স্বদেশী আন্দোলনের ধারাটাই রাতারাতি পাল্টে গিয়েছিল। নেতাজীর বিরুদ্ধে কুৎসা ও অপপ্রচারের বহু হীন প্রচেষ্টা সত্ত্বেও ভারত ব্রহ্মদেশ সীমান্তে আজাদ হিন্দ বাহিনীর দুরন্ত সংগ্রামে প্রাথমিক বিজয়, নি:সন্দেহে জাতির চিত্তে আবেশ দীপ্ত নব অনুভূতির সঞ্চার করেছিল।

ভারতবর্ষের জাতীয়তাবাদী আন্দোলন খুব স্বাভাবিক ভাবেই সোভিয়েত রাশিয়াকে আদর্শ স্থানীয় হিসাবে গ্রহণ করেছিল। কারণ ফ্যাসিবাদের বিরুদ্ধে আত্ম প্রস্তুতির পথে সোভিয়েত রাষ্ট্রই ছিল সেদিন একমাত্র আলোক বর্তিকা। শুধু ভারতীয় কমিউনিস্ট পার্টি নয়, সমকালীন রাজনীতির নীতি নির্ধারণের প্রশ্নে জাতীয়তাবাদী কংগ্রেসের মধ্যেও সোভিয়েত সমর্থন প্রচ্ছন্ন ছিল না। এই অবস্থায় ১৯৪১ এ হিটলারের নাৎসী বাহিনীর রাশিয়া আক্রমণের সঙ্গে সঙ্গে, আন্তর্জাতিক পরিস্থিতির পরিবর্তনে কমিউনিস্ট পার্টির ভূমিকা বিতর্কিত অধ্যায়ের সূচনা করে। যে যুদ্ধকে তারা এতদিন বিবাদমান দুই সাম্রাজ্যবাদী শক্তির ক্ষমতার দম্ভের নগ্ন প্রতিযোগিতা বলে প্রচার করে এসেছিল, আকস্মিক ভাবে সেই যুদ্ধে সাহায্য দানের স্বীকৃতি একটা সংশয়ের আবর্ত রচনা করে। তদুপরি শাসকগোষ্ঠী কর্তৃক পুরস্কার স্বরূপ কমিউনিস্ট পার্টির ওপর থেকে নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহার এবং কংগ্রেসকে বে-আইনী ঘোষণা, সেদিন কমিউনিস্ট পার্টি সম্পর্কে বিরূপ প্রতিক্রিয়াই সৃষ্টি করেছিল। তবে অনতিদূর উত্তরকালে ভারতীয় কমিউনিস্ট পার্টি সমস্ত সন্দেহের অবসান ঘটিয়ে মেহনতী মানুষের সংগ্রামের হাতিয়ারে পরিণত হতে পেরেছিল- এটাই আশার কথা।

কিন্তু জাতীয় জীবনে আশা ভঙ্গের শোচনীয় লগ্ন তখনও আসেনি। বিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধ থেকে উদ্ভূত চরম অর্থনৈতিক সংকট পঞ্চাশের মন্বন্তরে (১৩৫০) উপনীত হয়ে যুদ্ধকালীন জীবন বিপর্যয়কে আরও তীব্র করে তুলল। বিগত কয়েক শতাব্দী ধরে অর্থনীতির দুনিয়ায় বৃটেনের প্রাধান্য অটুট ছিল। অথচ বিংশ শতাব্দীর গোড়ায় পদার্পণ করে দেখা গেল, চঞ্চলা লক্ষ্মী বৃটেনের রাজ দরবার পরিত্যাগ করে মার্কিন মুলুকে তাঁর কৃপাদৃষ্টিপূর্ণ স্বর্ণাঞ্চল প্রসারিত করেছেন।

বাস্তবিক তখন পেট্রোলিয়ামজাত পণ্য, কয়লা, লোহা প্রভৃতি খনিজ দ্রব্য; কার্পাস বস্ত্র ও খাদ্য শস্য উৎপাদনে এবং যন্ত্রশিল্প ও সমর সম্ভারের নব নব উদ্ভাবনে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র পৃথিবীর মধ্যে অপ্রতিদ্বন্দ্বী শ্রেষ্ঠত্ব অর্জন করেছিল। নতুন দিনের রাষ্ট্র ব্যবস্থায়

এই সমস্ত অভিনব পণ্যসম্ভার যে বিপুল উন্মাদনা সৃষ্টি করবে তাতে আর আশ্চর্য কি? 'গণ উৎপাদনের নীতি'-তে (Mass Production) মার্কিন কোম্পানীগুলি আন্তর্জাতিক বাজারে একচেটিয়া অধিকার যেমন কায়েম করে বসল, তেমনি মার্কিন বাণিজ্য নীতির ফাঁদে পা দিয়ে অন্যান্য রাষ্ট্রগুলি অসম্ভব রকমের ঋণজালে জড়িয়ে পড়তে বাধ্য হল।* এদিকে মিত্র শক্তিবর্গের পরস্পরের মধ্যে যুদ্ধের খরচ বাবদ বিরাট অঙ্কের দেনা-পাওনা নিয়ে টানাটানি চলছিল। মার্কিন ঋণ পরিশোধের উত্তরে তারা জার্মানীকে শ্রীখণ্ডী দাঁড় করিয়ে অব্যাহতি পেতে চাইলেন। বলা বাহুল্য সমস্ত দিক দিয়ে বিকলাঙ্গ ও পঙ্গু জার্মানীর পক্ষে এই গগনচুম্বী ক্ষতিপূরণের অর্থ পরিশোধ করা কখনই সম্ভব ছিল না। এইভাবে সমগ্র দুনিয়ার অর্থনৈতিক অবস্থা একটা বিপজ্জনক সীমায় এসে উপনীত হল। অবস্থার মোকাবিলার উদ্দেশ্যে গৃহীত হল দুটি হাস্যকার পরিকল্পনা: ১৯২৪ এ 'ডয়েস প্ল্যান' এবং ১৯২৯ এ 'ইয়ং প্ল্যান'। এই দুটি অদ্ভুত পরিকল্পনায় প্রস্তাব করা হল—আমেরিকা ও মিত্র শক্তিবর্গ সামান্য সুদে জার্মানীকে 'শ্রমশিল্প' ও 'বহির্বাণিজ্যের' জন্যে অর্থ ঋণ দেবে এবং জার্মানী অতিরিক্ত রপ্তানী ও বাণিজ্যে লাভ থেকে সহজ কিস্তিতে ঋণ পরিশোধ করবে। কিন্তু এই দুটি পরিকল্পনা বিশেষ ফলপ্রসূ হল না। আর তারই প্রতিক্রিয়া দেখা গেল নিউইয়র্কে শেয়ার বাজারের পতনে! মার্কিন অর্থনীতির ভাঙ্গন স্পর্শ করল অন্যান্য রাষ্ট্রকেও—বৃটেন পরিত্যাগ করতে বাধ্য হল ঐতিহ্যপূর্ণ স্বর্ণমান, বৃটিশ ভারতের অর্থনীতিও অনিবার্যভাবে তার প্রভাব থেকে মুক্ত থাকতে পারল না। পরিশেষে বিশ্ব অর্থনীতির মন্দা দূরীকরণের উদ্দেশ্য ১৯৩৩ এ লণ্ডনে আয়োজিত হল বিশ্ব সম্মেলন। কিন্তু শুভবুদ্ধি ও পরিণত চিন্তার অভাবে সেই সম্মেলনও সফল হতে পারল না। আন্তর্জাতিক অর্থনীতির এ হেন নিদারুণ বিপর্যয় ব্রিটিশ ভারতের পল্লীনির্ভর সমাজ বাতাবরণের একেবারে গভীরে গিয়ে আঘাত করে বসল।

তদুপরি জাপানী আক্রমণের পরিপ্রেক্ষিতে ভারত একটি যুদ্ধের ঘাঁটিতে পরিণত হয়েছিল। ভারত-ব্রহ্মদেশ সীমান্তে বিপুল সংখ্যক আমেরিকান, চীনা ও বৃটিশ ভারতীয় সেনা সমাবেশ অবস্থাকে আরও ঘোরালো করে তুলেছিল। তাদের যাবতীয় ব্যয়ভার, আশ্চর্যজনক ভাবে উদাসীন সরকার দেশীয় জনসাধারণের কাঁধে চাপিয়ে দিয়ে নিশ্চিন্ত ছিলেন। কৃষিজাত পণ্যের একটা বড় অংশ এই বিদেশী সেনাবাহিনীর চাহিদা মেটাতে ব্যবহৃত হচ্ছিল। অন্যদিকে যুদ্ধের পূর্বে প্রশান্ত মহাসাগরীয় জলপথে যে শস্য বিদেশ থেকে আমদানী হত, প্রশান্ত মহাসাগরে জাপানের অভ্যুদয়ের ফলে সে ব্যবস্থাও অচল

---

* বিবেকানন্দ মুখোপাধ্যায় "দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের ইতিহাস" (প্রথম খণ্ড, পৃষ্ঠা ১০) গ্রন্থে একটি কৌতূহলজনক তথ্যের উল্লেখ করেছেন। তথ্যটি তৎকালীন অর্থনীতির চিত্রটি বুঝতে সাহায্য করবে বলে তুলে দিচ্ছি—১৯১৪ তে যুদ্ধের পূর্বে পৃথিবীর কাছে আমেরিকার ঋণ ছিল তিনশো কোটি ডলার। আর ১৯১৮-তে যুদ্ধ শেষে সমস্ত ঋণ পরিশোধ হয়ে তার পাওনা দাঁড়ায় একহাজার কোটি ডলার। কাজেই অবস্থাটা ভাববার মত।

হয়ে পড়ল। এই বিপর্যয় আরও তীব্র রূপ ধারণ করল ১৯৪২-র ভয়াবহ সাইক্লোন এবং পঞ্চাশের মন্বন্তরে (১৩৫০ বা ১৯৪৩)। ১৯৪২ র সাইক্লোন ও বন্যায় মেদিনীপুরে লক্ষ লক্ষ টন খাদ্যশস্যের বিনষ্টি সত্ত্বেও সরকারী তরফে বিন্দুমাত্র উৎকণ্ঠার লক্ষণ দেখা গেল না। ফলে চরম খাদ্য সঙ্কটে পড়তে হল দেশের মানুষকে। আর তারই পরিণতিতে পঞ্চাশের মন্বন্তরের অভিশপ্ত অধ্যায়টি নেমে এল এ দেশের বুকে। ভারতীয় জনসংখ্যার প্রায় এক তৃতীয়াংশ মানুষ দুর্ভিক্ষের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে সেদিন প্রত্যক্ষ করেছিলেন এই ভয়াবহ অবস্থাকে। বাঙলাদেশে তার শোচনীয়তা ছিল তীব্রতর। বাঙলার গ্রামে, শহরে, কলকাতা মহানগরীর ফুটপাতে লক্ষ লক্ষ মৃত মানুষে সে যেন এক মহাশ্মশান। সরকারী হিসাবে দুর্ভিক্ষে মৃত্যুর সংখ্যা ১৫ লক্ষ; কিন্তু বেসরকারী মতে তা ৩৫ থেকে ৪৫ লক্ষের মধ্যে বলে প্রমাণিত। অতিরিক্ত সংযোজন হিসাবে এর সঙ্গে যুক্ত হল ১৯৪৬-র সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা, ১৯৪৭ র দেশ বিভাগ ও উদ্বাস্তু সমস্যা।

অবস্থার সুযোগে সরকারী মদতপুষ্ট আমলাতন্ত্র কালোবাজারী, মুনাফাবাজী, মজুতদারীর মত জঘন্য সামাজিক অপরাধে লিপ্ত হয়ে রাতারাতি বিত্তলাভে সচেষ্ট হলেন। চরম খাদ্যাভাব, অর্থনৈতিক সঙ্কট, কৃষিক্ষেত্রে বিপর্যয়, সেদিন যৌথ একান্নবর্তী পরিবারের বন্ধন ছিন্ন করে দিশাহারা গ্রাম-বাঙলার মানুষকে তাড়িত করেছিল কলকাতার ফুটপাথের দিকে। কলকাতার ফুটপাথই তখন যেন মোক্ষ লাভের একমাত্র উপায় হয়ে উঠেছিল গ্রাম-বাঙলার ওই সব বাস্তুহারা, ভূমিহারা, বিত্তহারা অন্নহারা বুভুক্ষু মানুষের কাছে। কিন্তু মহানগরীর হতাশাক্লিষ্ট দিনগুলিতে তাদের জন্যে সামান্যতম সহানুভূতিও অবশিষ্ট ছিল না। সরকারী লঙ্গরখানা থেকে শুরু করে সর্বত্র দুর্নীতির অবাধ বিচরণ ওই সব জীবন্ত কঙ্কালদের শেষ আশাটুকুও নির্মম ভাবে মুছে দিয়েছিল।

॥ চার ॥

বিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধ থেকে বিজ্ঞান, প্রযুক্তিবিদ্যা ও মনোবিজ্ঞানের জগতে উদ্ভাবিত নতুন নতুন তত্ত্ব ও তথ্য সমূহ, সমকালীন যন্ত্রণাজর্জর জীবন প্রবাহে যুক্ত হয়ে বিচিত্র তরঙ্গের অভিঘাত সৃষ্টি করেছিল। অর্থাৎ যুগক্রান্তির সমাগত লক্ষণ কেবলমাত্র বাইরের দিক থেকেই সংঘটিত হয়নি; মানুষের স্মরণ-মনন-চিন্তনের ক্ষেত্রগুলিতেও বহুধা বিভক্ত জটিল ভাবাধারা ক্রমশ: দানা বেঁধে উঠতে শুরু করেছিল। এ কালের সমাজ-মানসের চরিত্র ধর্মের মূল্যায়ণে অন্তর্জগতের এই জটিলতার গ্রন্থি মোচনও তাই অনিবার্য। নাটক যদি "লোকবৃত্তির" অনুকরণ বলে গণ্য হয়, তবে কালের নিরিখে তার স্বরূপ বিশ্লেষিত না হলে সমকালীন নাট্য সাহিত্যের তথা নাট্য প্রয়োগের সম্যক চিত্রটি উপলব্ধি করা সম্ভব নয়। কালগত চৈতন্য প্রবাহের বহুমুখী অভাবিতপূর্ব স্রোতোধারাই সমকালীন বাংলা নাটকের অঙ্গনকে আপ্লুত করে তাকে উর্বরতা দান করেছে।

জগৎ ও জীবন সম্পর্কে পূর্বতন যুগের দৃঢ়-প্রোথিত সংস্কার ও বিশ্বাস, বিজ্ঞানের কতকগুলি অভিনব আবিষ্কারে বিগত শতাব্দীর শেষার্ধ থেকে ভেঙে পড়তে শুরু করেছিল।

এই ভাঙ্গন আরও তীব্র ভাবে অনুভূত হচ্ছিল বিংশ শতকের প্রারম্ভ থেকে। আইনস্টাইনের "আপেক্ষিকতাবাদ" (theory of Relativity) প্রথম আঘাত হানল 'নিত্য' বা 'সনাতন' কালের ধারনায়। দেখা গেল, স্থান কাল আর পাত্র পরস্পরের ওপরে নির্ভরশীল এবং একটির কিছু মাত্র পরিবর্তন, অন্য দুটি ক্ষেত্রের স্থিতাবস্থাতেও বিঘ্ন ঘটায়। অর্থাৎ নিত্য বলে কোন কিছুর অস্তিত্ব কল্পনা করা যায় না; নিত্যকালের ধারনা করাই যদি সম্ভব না হয়, তাহলে তার পশ্চাতে নিয়ন্ত্রা শক্তি হিসাবে সর্বশক্তিমান ঈশ্বরের অস্তিত্ব কল্পনাই বা কি ভাবে সম্ভব? এদিকে "রেডিও একটিভিটির" আবিষ্কারে (Radioactivity) শতাধিক রেডিও এক্টিভ এলিমেন্টের সন্ধান পাওয়া গেল। এগুলি থেকে নির্গত তেজস্ক্রিয় রশ্মি পুরু ধাতব বা কংক্রিটের আবরণও অনায়াসে ভেদ করতে পারে—কোন বাধা দ্বারাই তাকে প্রতিহত করা যায় না। কয়েক বছর পর মাদাম কুড়ি কৃত্রিম উপায়ে রেডিও-এক্টিভ এলিমেন্ট প্রস্তুত করতে সক্ষম হলেন—খোদার ওপরেও খোদকারী করা সম্ভব হল। "কোয়ান্টাম থিয়োরী"-তে (Quantum Theory) আলোক বিকিরণের ব্যাখ্যা করতে গিয়ে প্ল্যাঙ্ক দেখালেন প্রবহমান ধারা বলে কিছু নেই। যাকে আমরা প্রবহমানতা বলে মনে করি, তা আসলে পরস্পর থেকে বিচ্ছিন্ন গুচ্ছ গুচ্ছ অতি ক্ষুদ্র কণার সমষ্টি মাত্র; কোন মাধ্যম ছাড়াই এরা লক্ষ লক্ষ মাইল পথ পরিক্রমণ করতে পারে। এই তত্ত্বকে স্বীকার করে নিলে ঐতিহ্য (Heredity)-কে অস্বীকার করতে হয়।

পরমাণুর গঠন তত্ত্বেও (Atomic Structure) যুগান্তকারী মতবাদ প্রচার করলেন এ কালের বিজ্ঞানীরা। ডালটনের পরমাণুবাদ পূর্বেই পরিত্যক্ত হয়েছিল। এখন পরমাণুর গঠন-কৌশল ব্যাখ্যা করে রদার-ফোর্ড বললেন প্রোটন ও নিউট্রন কণাকে কেন্দ্র করে ইলেকট্রন কণা নির্দিষ্ট কক্ষে পরিভ্রমণ করেন। তিনি এ-ও বললেন, ইলেকট্রন কণা মাঝে মাঝে কক্ষ পরিবর্তন করে বটে, তবে তার সঙ্গত কারণ নির্ণয় অসম্ভব। তবে কি কার্যকারণ তত্ত্ব ভিত্তিহীন? বোর বললেন, কেন্দ্রীভূত প্রোটন ও নিউট্রন এবং কক্ষ পরিভ্রমণরত ইলেকট্রন যদি সমচার্জ ভুক্ত (নেগেটিভ বা পজিটিভ) হয়, তবে বিকর্ষণের ফলে বাইরের দিকে বেরিয়ে যেতে চেষ্টা করে। আবার বিষমচার্জভুক্ত (একটি নেগেটিভ অন্যটি পজিটিভ) হলে, আকর্ষণের ফলে ঠিক উল্টো আচরণ করে। এই কক্ষ পরিবর্তনে যে পরিমাণ (Unit) শক্তি তার প্রয়োজন, তার অভাব থাকলে এরা পিংপং বলের মত কক্ষপথে উলম্ফন করে। অর্থাৎ জগতের প্রতিটি ঘটনাই কার্যকারণ তত্ত্বের অমোঘ নিয়মের অধীন কিনা এ নিয়ে নতুন করে ভাবনা চিন্তার প্রয়োজন দেখা দিল। আরও জানা গেল, পদার্থের নিজস্ব কোন রূপ-রস-গন্ধ নেই; পরমাণুর গঠনের ওপরে তার বাহ্যিক রূপভেদ নির্ভর করে। পরশপাথরের স্পর্শে লোহা যেমন সোনায় পরিণত হয়, তেমনি পরমাণুর গঠনের মৌলিক পরিবর্তন ঘটিয়ে এক বস্তুর অন্য বস্তুতে রূপান্তরও সম্ভব। এ যেন শঙ্করাচার্যের মায়াবাদের অভিনব বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা—যা দেখছি, শুনছি, প্রত্যক্ষ করছি তার কোনটাই চূড়ান্ত সত্য নয়! নৈতিকতার মানদণ্ডে নতুন যুগের এই অভিনব যুক্তিই কার্যকর হয়ে পড়ল। পাপ-পুণ্য, ন্যায়-অন্যায়, ভাল-মন্দ আসলে যে

মানুষের মনোগত বিকার মাত্র—এমন ধারনাই বদ্ধমূল হয়ে উঠতে চাইছিল সেদিন। প্রযুক্তি বিদ্যার ক্ষেত্রে অভাবনীয় সাফল্য, একই ভাবে মানুষের আত্মশক্তি নির্ভরতা বহুলাংশে বৃদ্ধি করল। মানুষের হাতে এসে গেল এরোপ্লেন (১৯০৩), হেলিকপ্টার (১৯০৯)। বিধির বিধান লঙ্ঘন করে মানুষ চূর্ণ করল তার নিজ মর্ত্যসীমা। দূরের সঙ্গে নৈকট্য স্থাপিত হল রেডিও টেলিফোন (১৯০৬) এবং ট্রান্সমিটারের (১৯১৪) ব্যবহারে। অন্যদিকে ট্যাঙ্ক (১৯১৫) ও আধুনিক সমরাস্ত্র, ক্ষমতার লিপ্সা ও প্রতিহিংসা বৃত্তিকে আশাতীত নিরাপত্তা দান করল। চিকিৎসা বিজ্ঞানেও যুগান্তর আনলেন আলেকজান্ডার ফ্লেমিং এবং ফ্লোরিঃ পেনিসিলিনের আবিষ্কার মুমূর্ষু মানুষকে মুক্তির পথ দেখালো। মৃত্যুর ওপরেও মানুষ যেন তার অধিকার কায়েম করে বসতে চাইল।

সর্বোপরি মনস্তত্ত্বের ব্যাখ্যায় বিগত শতাব্দীর ঐতিহ্যগত বিশ্বাস নির্মূল করে ফ্রয়েড এমন একটি মতবাদ প্রচার করলেন, যার প্রত্যক্ষ প্রভাব ইথার তরঙ্গের মতই এ কালের চিন্তাশীল মানুষকে স্পর্শ করে একেবারে অভিভূত করে ফেলল। ফ্রয়েড মনোজগতের বিভিন্ন ক্রিয়ার ব্যাখ্যা করতে গিয়ে চেতন মনের (conscious mind) অন্তরালে অবচেতন মনের (unconscious mind) ক্রিয়াশীল ভূমিকা খুঁজে পেলেন। তিনি বললেন, জীবনের সমস্ত অভিজ্ঞতা অবচেতন মনে সঞ্চিত থেকে অলক্ষ্যে চেতন মনের উদ্দীপনাকে নিয়ন্ত্রণ করে। কেবল মাত্র দুঃখজনক ও যৌন কামনার সঙ্গে যুক্ত অভিজ্ঞতাগুলি অবদমিত হয়ে থাকে। অবচেতন মনের এই সব অবদমিত কামনা বাসনা স্বপ্নের মধ্যে টুকরো টুকরো myth এর আকারে দেখা দেয়। আপাত দৃষ্টিতে এই সব myth এর টুকরোগুলিকে অসংলগ্ন মনে হলেও, আসলে তা অবচেতন মনের ভাবনা-চিন্তার প্রকাশ। চেতন ও অবচেতনের ভাষার ভিন্নতার কারণে স্বাভাবিক বুদ্ধিতে এগুলিকে অসংলগ্ন মনে হয়। স্বপ্নের মধ্যে যেমন এদের প্রকাশ ঘটে, তেমনি আবার দীর্ঘকাল ধরে অবদমিত থাকার ফলে অনেক সময় মস্তিষ্কের স্বাভাবিক ভারসাম্য নষ্ট হয়ে নানাবিধ মানসিক জটিলতার সৃষ্টি করে। বৈজ্ঞানিক পরিভাষায় এগুলিকে আমরা বলি "হিস্টিরিয়া", "নিউরোসিস" প্রভৃতি। ফ্রয়েডের ব্যাখ্যায় সন্তুষ্ট না হয়ে এডলার, এবং ইয়ুং ভিন্নমত পোষণ করলেন। যৌন-কামনার পরিবর্তে মনের গতিবিধি নিয়ন্ত্রণে এডলার নির্দিষ্ট করলেন ক্ষমতা-লিপ্সাকে; ইয়ুং একটা "collective unconscious"-এর কথা বললেন। এইভাবে মনস্তত্ত্বের জগতেও যুগান্তকারী পরিবর্তন দেখা গেল।

অন্যতম সংরক্ষিত ক্ষেত্র ছিল ধর্ম; কিন্তু উনবিংশ শতাব্দীর অধ্যাত্ম ভাবনার প্রেক্ষাপট বহু পূর্বেই অপসারিত হতে শুরু করেছিল ব্রাহ্ম-ধর্মের উত্থানে। ব্রাহ্ম ধর্ম আন্দোলন বৃহত্তর হিন্দু ধর্মের বিকল্প হিসাবে প্রতিষ্ঠিত হতে না পারলেও, হিন্দু ধর্মের পৌত্তলিকতার বিরুদ্ধে একটা বড় আঘাত হানতে পেরেছিল। সেই সঙ্গে রামকৃষ্ণ বিবেকানন্দ প্রবর্তিত নব্য হিন্দু ধর্মের মানবতাবাদের আদর্শ, ধর্ম সম্পর্কে একটা নতুনতর জিজ্ঞাসার উদ্ভব ঘটিয়েছিল। রবীন্দ্রনাথে সেই মানুষের ধর্মের বাণীই বাঙ্ময় রূপ-নির্মিতি পেয়েছিল। আর এ কালের রূঢ় বাস্তব অভিজ্ঞতা সম্পন্ন মানুষ মানবতার অপমানকেই প্রত্যক্ষ করল

বিশেষ সামাজিক পটভূমিতে দাঁড়িয়ে। অতএব ধর্ম সম্পর্কে আগ্রহের কোন অবকাশ আর রইল না।

সামগ্রিক ফলশ্রুতি দাঁড়ালো, জীবনের সর্বস্তরে সাম্যের অভাবজনিত তীব্র সংশয়। পূর্বেই বলেছি, এই সংশয়ের সূত্রপাত প্রথম মহাযুদ্ধের সমসাময়িক কাল থেকে হলেও, তার তীব্রতা তখনও ততটা অনুভূত হয়নি। তার কারণ, প্রথমত: ফ্যাসীবাদী শক্তির উন্মত্ত রূপ তখনো প্রত্যক্ষ গোচর হয়নি। দ্বিতীয়ত: চিন্তা জগতের বৈপ্লবিক তরঙ্গ সমূহ ভাবকেন্দ্রগুলিকে আপ্লুত করতে কিছুটা সময় লেগেছে। তৃতীয়ত: জাতীয় জীবনে অচলায়তনের ভিত্তিমূল কেঁপে উঠলেও গৃহত্যাগের প্রশ্ন তখনো দেখা দেয়নি।

॥ পাঁচ ॥

সমকালীন বাংলা নাটক এই জটিল জীবন চর্যার মধ্যে থেকে উপাদান সংগ্রহ করে তাকেই শিল্পরূপ দান করেছে। ফলে গিরিশচন্দ্র থেকে শুরু করে দ্বিজেন্দ্র উত্তরকাল পর্যন্ত প্রবাহিত বাংলা নাটকের বিশিষ্ট ধারাটি নবযুগের কালতটের অভিঘাতে ভিন্ন পথ সন্ধানী হয়ে পড়েছে। ইহবাদ সর্বস্বতা হয়ে উঠল একালের বাংলা নাটকের প্রাণধর্ম। এমনকি আশ্রয় যেখানে ভক্তিরস এবং ক্ষেত্র যেখানে পৌরাণিক, সেখানেও আধুনিক বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিতে পুনর্বিবেচনার প্রয়োজন দেখা দিল। চরিত্র ধর্মের মূল্যায়নে মনস্তত্ত্বের নবোদ্ভাবিত ব্যাখ্যাকে সজ্ঞানে বা অজ্ঞানে স্বীকার করে নিলেন এ কালের নাট্যকার। প্রেম-প্রীতি প্রভৃতি সুকোমল হৃদয়বৃত্তি সমূহকে উপেক্ষা করা না গেলেও ভাবের স্বর্ণশিখর থেকে তাকে উৎপাটিত করে ধূলি মলিন গৃহ প্রাঙ্গণে উপলব্ধি করার প্রবণতা দেখা গেল। ধর্মবোধের সনাতন ধারনা ভেঙ্গে পড়ায় নৈতিকতার মানদণ্ডের পরিবর্তন ঘটলো। স্বাধীনতা আন্দোলনের প্রবল উন্মাদনা বাংলা নাটকে স্বদেশ চর্চাকেও কিছু পরিমাণে স্থান করে দিল; এবং এই কারণে বিস্মৃতপ্রায় ইতিহাস পুনরুদ্ধারের একটা আন্তরিক তাগিদ অনুভূত হল। সর্বোপরি নাটক শুধু মাত্র বিনোদনের মধ্যে সীমাবদ্ধ রইল না, শ্রেণী সচেতনতার বিশিষ্ট লক্ষণগুলি নাটকে ক্রমশ: রূপ পরিগ্রহ করে শিল্পজগতে প্রবেশাধিকার লাভ করল---নাটক হয়ে উঠল প্রতিবাদের, প্রতিরোধের অন্যতম হাতিয়ার। বাংলা নাটকের এই উত্তরণ নিঃসন্দেহে উত্তরকালের সাহিত্যে সোনার ফসল ফলিয়েছে।[১]

পাশ্চাত্ত্য প্রভাবের ক্ষেত্র পরিবর্তনও আলোচ্য পর্বে বাংলা নাটকের পালা বদলে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করেছে। এতকাল ইংরেজি নাটক---প্রধানত শেক্সপীয়রের আদর্শই বাংলায় অনুসৃত হচ্ছিল। গিরিশচন্দ্রের ওপরে শেক্সপীয়রের প্রভাব অপরিসীম।রবীন্দ্রনাথও

---

১ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর নাটকে যুগ ভাবনার প্রকাশকে সর্বপ্রথম স্বীকৃতি জানিয়ে আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন। তিনি লিখেছেন-"ভালো নাট্যকাব্যে লেখকের আত্মপ্রকৃতি এবং বাহিরের মানব প্রকৃতি এমনি অবিচ্ছিন্ন ঐক্য রক্ষা করে মিলিত হয় যে উভয়কে স্বতন্ত্র করা দুঃসাধ্য"। -"সাহিত্য" গ্রন্থের "সাহিত্য" প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য।

কম-বেশী শেক্সপীয়রকে অনুসরণ করেছেন। কিন্তু এ কালের বাংলা নাটকে যে দুজন পাশ্চাত্ত্য নাট্যকার বিশেষ আলোড়ন তুলেছেন, তাঁরা কেউই ইংরেজ নাট্যকার নন; একজন নরওয়ে দেশের ইবসেন, অন্যজন জার্মান নাট্যকার ব্রেশট্ বা ব্রেখট্। এই দুই নাট্যকারের অভ্যুদয় বিশ্ব নাট্য পরিমণ্ডলে অভাবনীয় সাড়া জাগিয়েছিল। বিশ্বের তরুণ নাট্যকারবৃন্দকে এঁরা অতি সহজেই সম্মোহিত করে ফেললেন। বক্তব্যের উপস্থাপনায়, টেকনিক ও প্রয়োগ কৌশলে তাঁরা এমন এক মায়াজাল সৃষ্টি করলেন, যার প্রভাব থেকে বাংলা নাটকও মুক্ত থাকতে পারলো না। মোটের উপর যুগক্রান্তি পর্বের বাংলা নাটকে নতুন দিনের পথ নির্মিতির সচেতন প্রয়াস উজ্জ্বল হয়ে উঠছিল। এই প্রচেষ্টাকে আমরা দুটি শ্রেণীতে বিভক্ত করে নিতে পারি - একটি শিল্পবৈশিষ্ট্যগত দিক এবং অন্যটি তার প্রয়োগ কৌশলগত নৈপুণ্য।

ভাববস্তুর দিক থেকে যুগচেতনার যে বিশিষ্ট লক্ষণগুলি বাংলা নাটকে তখন স্পষ্ট হয়ে উঠছিল সেগুলিকে এইভাবে বিন্যস্ত করে নেওয়া যেতে পারে ঃ

১। নাগরিক যন্ত্র সভ্যতার হতাশাক্লিষ্ট রূপের অভিব্যক্তি।

২। বস্তুবাদী জীবন দর্শনের স্বীকৃতি ও ইহবাদ সর্বস্বতা।

৩। বৈজ্ঞানিক দৃষ্টি দ্বারা জগৎ ও জীবনের সমুদয় তত্ত্বের মীমাংসা প্রবণতা।

৪। চরিত্র ধর্মের মূল্যায়ণে ফ্রয়েড, এডলার, ইয়ুং প্রমুখ মনোবিজ্ঞানী প্রবর্তিত মতবাদের অনুশীলন।

৫। প্রেম-প্রীতি প্রভৃতি সুকোমল অনুভূতির জৈবিক দৃষ্টিতে পুনর্বিচার।

৬। ধর্ম, ঈশ্বর, ন্যায়, নীতি প্রভৃতি সম্পর্কে সনাতন ধারনায় অনাস্থা।

৭। পৌরাণিক চরিত্রগুলির মধ্যে সংগ্রামশীল মানবাত্মার আবিষ্কার।

৮। দেশাত্মবোধের প্রেরণা--সেই কারণে ইতিহাসের অনুসরণ প্রচেষ্টা ও ইতিহাস থেকে সচেতন দৃষ্টান্ত গ্রহণ।

৯। মার্কসবাদের প্রভাবে সাম্যবাদী চেতনার প্রসার; শ্রেণী সংগ্রাম বা গণ আন্দোলনকে হতাশা-মুক্তির অনন্য পন্থা হিসাবে স্বীকৃতি।

১০। কখনো কখনো উদভ্রান্ত জীবন থেকে পলায়নী প্রয়াস।

তবে মনে রাখা দরকার যুগক্রান্তির সমস্ত লক্ষণ সকল নাট্যকারের সমস্ত নাটকে একই সঙ্গে পুঞ্জীভূত হয়ে ওঠেনি - তা সম্ভবও নয়। একটা আবর্তসঙ্কুল চৈতন্য-প্রবাহের বৈচিত্র্যময় আন্দোলনের ঘাত প্রতিঘাতে রূপে-রসে এ কালের নাটক পূর্ণতার লক্ষ্যে পৌঁছাতে চেয়েছে; নানা পুষ্প শোভিত মনোরম উদ্যানের মত, প্রাঙ্গণে তার নানা বর্ণের নানা রঙের বিচিত্র সমারোহ।

আঙ্গিক ও প্রয়োগ কলাতেও মৌল উপাদানের পরিবর্তন সূচীতে হচ্ছিল এই ভাবে:

১। নাটকে গতি সঞ্চারের উদ্দেশ্যে মঞ্চ ব্যবস্থার পরিবর্তন; সম্ভাব্য ক্ষেত্রে ঘূর্ণায়মান মঞ্চের (Revolving Stage) ব্যবহার।

২। অঙ্ক, দৃশ্য প্রভৃতির অলঙ্কারশাস্ত্র সম্মত বিভাগ যথা সম্ভব বর্জন।

৩। ফ্ল্যাশ ব্যাক (Flash Back) রীতির প্রবর্তন।

৪। অভিনয়-যোগ্যতার কারণে অসম্ভব, অলৌকিক দৃশ্যের ব্যবহার রোধ।

৫। চরিত্রোপযোগী সংক্ষিপ্ত, সংহত সংলাপ; আঞ্চলিক ভাষায় প্রয়োগ।

৬। প্রতীকের গুরুত্ব—শব্দ, আলো, আবহ সংগীতের ব্যঞ্জনাময় ব্যবহার।

অভিনয়ের প্রতি লক্ষ্য রেখেই এই পর্বের প্রায় অধিকাংশ নাটক রচিত হয়েছে বলে আঙ্গিক ও প্রয়োগ ব্যাপারটি সমধিক গুরুত্ব পেয়েছে। প্রায় সকল নাট্যকার মঞ্চ জগতের সঙ্গে কোন না কোন ভাবে যুক্ত থাকার ফলে, অভিনয়ের বিষয়টি এঁরা বিস্মৃত হতে পারেননি। পূর্ববর্তী যুগে এই দৈন্য অনেক সময়েই দেখা গেছে। দ্বিজেন্দ্রলালের "চন্দ্রগুপ্ত" নাটকে নন্দের শিরোশ্ছেদের দৃশ্য, বা রবীন্দ্রনাথের "রাজা ও রাণী" নাটকে রাণী সুমিত্রার কুমার সেনের ছিন্ন মস্তক বহন করে আনার ঘটনা, আর যাই হোক অভিনয় যোগ্য নয়। এই ধরনের আঙ্গিকগত ত্রুটি এ যুগের নাটকে অনুপস্থিত। দীর্ঘ সংলাপের ক্লান্তিকর পুনরাবৃত্তিও যথা সম্ভব বর্জনের প্রয়াস আছে। অবশ্য এ ব্যাপারে পথ প্রদর্শক স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ। সর্বোপরি মঞ্চ ব্যবস্থার আধুনিকীকরণে বিজ্ঞানকে কাজে লাগিয়ে এবং দৃঢ়-পিনদ্ধ নাট্যকাহিনীতে গতি সঞ্চার করে এ যুগের নাট্যকার বাংলা নাটকে নতুন যুগের সূচনা করেছেন।

প্রথম অধ্যায়

কালের দৃষ্টিতে নাটক ঃ শিল্প সৃষ্টি বনাম প্রয়োগ

নাট্য- বিচারে অভিনয়ের মানদণ্ড কতদূর গ্রহণযোগ্য, অনুসন্ধান করা যেতে পারে। 'নাটক' শব্দের উৎপত্তির মধ্যেই অভিনয়ের সুস্পষ্ট ইঙ্গিত আছে। 'নট' ধাতু থেকে সংস্কৃত 'নাট্য' শব্দটি উৎপন্ন এবং 'নাট্যের' অন্যতম বিভাগ নাটক। 'নট' ধাতুর প্রকৃত অর্থ অঙ্গ-চালনা করা। সংস্কৃতে প্রায় অনুরূপ অর্থে আরও একটি ধাতু পাওয়া যাচ্ছে—'নৃৎ'; সুন্দর অঙ্গভঙ্গি করা অর্থে এই ধাতুর প্রচলন। সাধারণ বিশ্বাস এই যে,—'নৃত্য', 'নট', 'নাট্য', কোন একটি মূল ধাতু থেকে নিষ্পন্ন। কিন্তু এই অভিমত গ্রহণ করা যাচ্ছে না; যাচ্ছে না তার কারণ, নাচ অর্থে 'নৃত্য' শব্দ এসেছে 'নৃৎ' ধাতু থেকে ঠিকই তবে ভাষাতাত্ত্বিক বিচারে 'নৃৎ' থেকে 'নাট্য' শব্দের উৎপত্তি অসম্ভব হয়ে পড়ে। অধ্যাপক কিপেরের মতে (Kuiper) আর্যেতর কোন ভাষার মধ্যে 'নট্' ধাতুর মূল নিহিত আছে। এ ব্যাপারে ভিন্ন মত পোষণ করেছেন ডঃ সুকুমার সেন মহাশয়। তাঁর মতে 'নট্' ধাতুটি 'নৃৎ' ধাতুর পূর্বতন বিকার জাত।[১]

কিন্তু সংস্কৃতে নাট্যকর্ম এবং নৃত্যকর্ম সমার্থক নয়। নাট্যকর্ম বলতে বোঝাত বিচিত্র ক্রীড়া, অভিনয়, পুতুলবাজি বা ভোজবাজি। তারই অনুসঙ্গ হিসাবে প্রচলন ছিল নৃত্যকর্মের। মহাকবি কালিদাসের রচনায় বিচিত্র সজ্জা ও অঙ্গভঙ্গি দেখানো অর্থে 'নাটয়' শব্দটির প্রয়োগ আছে। 'নাটক' শব্দটিও আমরা কালিদাসের রচনাতেই প্রথম পাই। 'নাট্য' থেকে নাম ধাতু করে বা 'নট্' থেকে ণিজন্ত ধাতু করে 'নাট করা' অর্থে 'নাটয়' শব্দটি এসেছে। কাজেই দেখতে পাচ্ছি 'নৃৎ' থেকে নয়, পৃথক 'নট্' ধাতু থেকেই 'নাট্য' শব্দের উৎপত্তি। বোধহয় 'নাট্য' এবং 'নৃত্যের' কাছাকাছি অবস্থানের জন্যে কালে উভয়ে সমার্থক হয়ে পড়েছে। প্রাচীন ভারতে নৃত্য-গীতাদির জন্যে মন্দির-সংলগ্ন নির্দিষ্ট মণ্ডপ নাটমন্দির নামেই প্রচলিত ছিল এবং এখনো এই রকম প্রচলন আছে। অতএব মূলের অর্থ বিচারে 'নাট্য' শব্দে অঙ্গ-চালনাকে নির্দেশ করে অভিনয়কেই ইঙ্গিত করছে—এমন সিদ্ধান্তে আসা চলে।

---

১ ''নট নাট্য নাটক''—ডঃ সুকুমার সেন, প্রথম সং, দ্বিতীয় মুদ্রণ, পৃঃ ২ দ্রষ্টব্য।

নাটকের উৎস সন্ধানে প্রাচীন ঐতিহ্য

নাটকের উৎস নির্ণয়ে নানা মুনির নানা মত। বৈদিক যুগে নাটক ছিল না বা নাটকাভিনয়ের কোন প্রামাণ্য তথ্যও বৈদিক সাহিত্যে নেই। নাটকের উদ্ভব ঘটেছে আরও পরবর্তীকালে। কিন্তু বৈদিক সাহিত্যে এবং বৈদিক যাগযজ্ঞানুষ্ঠানের মধ্যে নাটকের বীজ ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত অবস্থায় নিহিত আছে।[১] 'ঋক্‌বেদের' দশম মণ্ডলের দশম সূক্তে নির্জন দ্বীপে কামাতুরা ভগ্নী যমীর আসঙ্গ লিপ্সার উত্তরে ভ্রাতা যমের প্রত্যাখ্যানের বর্ণনাটি শুধু সংলাপ ধর্মী নয়, পরিবেশ ও পরিস্থিতিও যথেষ্ট নাটকীয়। ঐ দশম মণ্ডলের পঁচানব্বই সূক্তে উর্বশীর স্বর্গে প্রত্যাবর্তনের পূর্বে পুরুরবার সঙ্গে তার কথোপকথন আধুনিক কালের ট্র্যাজিক নাটকের কথাই স্মরণ করিয়ে দেয়। কিংবা একই মণ্ডলের একশ আট সূক্তে সরমা ও পণিদের উক্তি-প্রত্যুক্তির নাটকীয় উপাদানের চমৎকারিত্বও লক্ষ্য করবার মত। প্রসঙ্গত উল্লেখ করতে পারি দশম মণ্ডলের আঠাশ এবং একান্ন সূক্ত দুটির কথা।[৩] এই সমস্ত দৃষ্টান্ত থেকে অতি সহজেই নাটকের প্রাথমিক অঙ্কুড়িত রূপ সম্পর্কে একটা ধারনা করে নেওয়া যায়।

বৈদিক যজ্ঞানুষ্ঠান প্রথম দিকে চারটি পর্বে বিভক্ত ছিল। হোতা দেবতার আবাহন করতেন, অধ্বর্যু আহূত দেবতার উদ্দেশ্যে যজ্ঞে আহুতি দিতেন, উদ্গাতা দেবতার প্রীতির জন্যে মন্ত্রে সুর সংযোগ করে সংগীত পরিবেশন করতেন এবং এই তিনজনের কোথাও কোন ভ্রম-প্রমাদ ঘটছে কিনা ব্রহ্মা তা লক্ষ্য রাখতেন।[৪] এইভাবে সমগ্র অনুষ্ঠানটি পরিচালিত হত। ঋকবেদের কোথাও কোথাও মুখে রঙ মেখে উজ্জ্বল বর্ণময় সাজসজ্জা করে নৃত্য-অভিনয়ের উল্লেখ আছে।[৫] এগুলিকে আমরা নাটক অভিনয়ের পূর্বসূরী হিসাবে গণ্য করতে পারি।

পতঞ্জলির অষ্টাধ্যায়ী মহাভাষ্য থেকেও তৎকালীন সমাজে কথকতা নৃত্য অভিনয় বা পুতুল নাচ প্রচলনের সংবাদ পাচ্ছি। কোন কোন পাশ্চাত্ত্য সমালোচক অভিমত প্রকাশ করেছেন যে, পুতুল নাচ থেকেই এক সময় নাটকের জন্ম সম্ভব হয়েছিল। পুতুল নাচ যে নাটকের অঙ্কুড়িত রূপ, এই অভিমতের সপক্ষে যথেষ্ট যুক্তি আছে। ঋকবেদের যুগে ধর্ম-অনুষ্ঠানে মূর্তি পূজোর উদ্ভব ঘটেনি। পতঞ্জলির আলোচনায় দেখা যাচ্ছে যে, পাণিনির সময় থেকে সমাজে পুতুল খুবই পরিচিত বস্তু হয়ে উঠেছিল; নানা রকমের মূর্তি বা পুতুল কিনতে যেমন পাওয়া যেত, তেমনি বিক্রির জন্যে নয় অথচ জীবিকা নির্বাহ হয়—এমন মূর্তিরও ব্যবহার ছিল।[৬] বিক্রি হত না অথচ জীবিকা নির্বাহের কাজে

---

[১] এ ব্যাপারে সহমত পোষণ করেন—ম্যাক্সমূলার, লেভি, স্ত্রোয়িডের, হার্টেল প্রমুখ।

[২] আব্দুল আজীজ আল আমান সম্পাদিত "ঋকবেদ সংহিতা", দ্বিতীয় খণ্ড, পৃঃ ৪৬৪, ৫৯৫, ৬১৬, ৪৯২, ৫২৫ যথাক্রমে দ্রষ্টব্য।

[৪] ব্রহ্মার চতুর্মুখ কল্পনা কি চতুর্বেদ সম্পর্কে তার জ্ঞানের দ্যোতনা?

[৫] উক্ত গ্রন্থের প্রথম খণ্ড, পৃঃ ১৯৪—১৯২.৪ এবং পৃঃ ৩৯১ —৩১.২, দ্রষ্টব্য।

[৬] "বিক্রয়ের জন্যে নয় অথচ রোজগার হয় এমন গড়া মূর্তি পুতুল বাজিরই হতে পারে।"—"নট নাট্য নাটক", প্রথম সংস্করণ, দ্বিতীয় মুদ্রণ, পৃঃ ২১ —ডঃ সুকুমার সেন।

লাগত এমন পুতুল, পুতুল নাচ ছাড়া আর কিছু হতে পারে বলে তো মনে হয় না। সম্ভবত সম্রাট অশোকের সময় থেকে পুতুল নাচের অভিনয় ক্রীড়া বিনোদনের অঙ্গ হয়ে উঠেছিল। পতঞ্জলির গ্রন্থে নট-নটী ও নটকর্মেরও পরোক্ষ উল্লেখ আছে। পতঞ্জলির আবির্ভাবকাল খ্রীষ্টপূর্ব দ্বিতীয় শতাব্দী এবং তারও বহু পূর্ব থেকে পুতুল-নাচ ভিত্তিক নাট্যকর্ম সমাজে প্রচলিত ছিল—এ অনুমান খুবই সঙ্গত। পরবর্তীকালে যাত্রা, কথকতা, রামাই পণ্ডিতের 'শূণ্যপুরাণ', জয়দেবের 'গীতগোবিন্দ', বড়ু চণ্ডীদাসের 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তন', পালাগান বিভিন্ন 'মঙ্গলকাব্য', 'ঝুমুর' ও 'ধামালী' গানের নৃত্য গীতাদির অনুষ্ঠানের ধারায় নাট্যাভিনয়ের প্রাথমিক রূপটি গড়ে উঠেছে।

কিন্তু বিরুদ্ধবাদী উন্নত নাসা পাশ্চাত্ত্য সমালোচকদের কেউ কেউ প্রমাণ করতে ব্যস্ত হয়ে পরেছেন যে, আলেকজাণ্ডারের ভারত অভিযানের (খ্রীঃ পূঃ ৩২৭ ৩২৬) পূর্বে এদেশে নাটক বলে কিছু ছিল না। গ্রীক বীর আলেকজান্ডারের ভারত অভিযানের সূত্র ধরে গ্রীক অনুকরণে এদেশে নাটকের উৎপত্তি -এই তাঁদের অভিমত। তাঁদের প্রধান যুক্তি নাটকে 'যবনিকা'[৭] শব্দটি এসেছে 'যবন'—গ্রীস দেশের লোক—এই সূত্রে। দ্বিতীয় যুক্তি, এ দেশীয় নাটকে কাহিনী, চরিত্র, পরিবেশ নাকি গ্রীক নাটকের অভ্রান্ত অনুকরণ ছাড়া কিছু নয়। পরশ্রীকাতরতার এমন উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত বড় একটা মেলে না। সংস্কৃত নাটকে 'যবনিকা' ছিল না, ছিল 'যমনিকা'—'যবন' শব্দের সঙ্গে তার আদৌ কোন সম্পর্ক নেই। শব্দটি যম শব্দ থেকে উৎপন্ন; বিরতি, সমাপ্তি ইত্যাদি অর্থে তার ব্যবহার ছিল। 'যমনিকা' থেকে পরে হয়েছে 'যবনিকা'। 'যমনিকা' বলতে সাধারণ অর্থে এক ধরনের কাপড়ের আবরণ। 'যমনিকার' আড়াল থেকে সূত্রধার পুতুল নাচাতেন বা রঙ্গমঞ্চে প্রবেশ-প্রস্থানের জন্য অভিনেতা অভিনেত্রীরা যমনিকা ব্যবহার করতেন। সেকালের রঙ্গমঞ্চে এখনকার মত স্থায়ী যবনিকার প্রচলন হয়নি। চারিদিক খোলা মঞ্চে অনেকটা যাত্রার ঢঙে অভিনয় হত। নেপথ্য সংলাপের ক্ষেত্রেও যমনিকার আড়াল প্রয়োজন হত। পরে অবশ্য খাটানো যবনিকার প্রচলন হয়েছিল। আবার 'যবন' বলতে শুধু গ্রীস দেশের লোক নয়,—ইরাক, ইরান প্রভৃতি মধ্যপ্রাচ্যের লোকেদের সাধারণ পরিচিতি ছিল 'যবন' নামে। দ্বিতীয় যুক্তিটি প্রসঙ্গে এইটুকু উল্লেখ করলেই যথেষ্ট হবে যে, সংস্কৃত নাটকের পরিকল্পনায় গ্রীক ভাবাদর্শ খুঁজে বেড়ান নেহাৎই কষ্ট-কল্পনা ছাড়া কিছু নয়। সচেতন পাঠক মাত্রই সে কথা স্বীকার করবেন। ঋক্‌বেদের যুগেই এদেশে নাটকাভিনয়ের প্রাথমিক অঙ্কুরোদ্গম হয়েছিল এবং বৈদিক সাহিত্য, যাগযজ্ঞানুষ্ঠান, পুতুলনাচ প্রভৃতি বিবর্তনের মধ্যে দিয়ে নাট্যকর্ম ও তার অভিনয়ের বিশিষ্ট ধারাটি জন্মলাভ করেছে। আলেকজাণ্ডারের ভারত অভিযানের সঙ্গে তার আদৌ কোন সম্পর্ক নেই।

---

[৭] গ্রীক 'Ionian' শব্দ থেকে যবন শব্দের উৎপত্তি বলে অনেকে মনে করেন। কিন্তু গ্রীক নাটকে যবনিকা ব্যবহারের কোন প্রমাণ নেই। উল্টোদিকে নাট্যশাস্ত্রের পঞ্চম অধ্যায়ে যবনিকার উল্লেখ আছে।

নাট্যের সংজ্ঞা, পরিধি ও অভিনয় প্রসঙ্গ

উত্তরাধিকার সূত্রে বাংলা নাটক সংস্কৃত নাটকের অনুগামী এবং ব্যাপ্তি ও সমৃদ্ধির ক্ষেত্রে পাশ্চাত্ত্য প্রভাব যুক্ত। বাংলা নাটকের এক প্রান্ত স্পর্শ করে আছে সংস্কৃতের প্রাঙ্গণকে, অন্য প্রান্ত গিয়ে পৌঁছেছে পাশ্চাত্ত্য জগতের হর্ম্ময় প্রাসাদে। এই দুই বিপরীতমুখী ভাব-সম্মিলনেই আধুনিক বাংলা নাটকের আত্মমুক্তি এবং যুদ্ধকালীন ক্রান্তি লগ্নেই তার আনুষ্ঠানিক যাত্রা শুরু। কাজেই প্রাচ্য ও পাশ্চাত্ত্য আলঙ্কারিকদের মতামত পর্যালোচনা করে সঠিক সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া ছাড়া, বাংলা নাটকের স্বরূপ নির্ণয়ে আমাদের গত্যন্তর নেই।

সংস্কৃত নাট্যের উৎপত্তির যেটুকু তথ্য পাওয়া যাচ্ছে তাতে দেখা যাচ্ছে যে, বেদ চর্চায় সমাজের সর্বস্তরের মানুষের অধিকার স্বীকৃতি লাভ করেনি বলে, পরবর্তীকালে সর্বসাধারণের অধিগম্য শাস্ত্র রচনার পরিকল্পনা থেকে 'পঞ্চমবেদ' 'নাট্যবেদের' সৃষ্টি। আচার্য ভরত 'নাট্যশাস্ত্র' গ্রন্থে বলেছেন :

> জগ্রাহ পাঠ্যমৃগ্বেদাৎ সামভ্যো গীতমেব চ।
> যজুর্বেদাদভিনয়ান্ রসানার্থবণাদপি ॥
> বেদোপবেদৈঃ সংবদ্ধো নাট্যবেদো মহাত্মনা।
> এবং ভগবতো সৃষ্টো বহ্মণা সর্ববেদিনা ॥ (১.১৭.১৮)

অর্থাৎ ভগবান ব্রহ্মা ঋক্‌বেদ থেকে পাঠ্যবস্তু, সামবেদ থেকে গান, যজুর্বেদ থেকে অভিনয় এবং অথর্ববেদ থেকে রসসমূহ নিয়ে নাট্যবেদ সৃষ্টি করেন।* নাট্যের উপাদান এখানে পাচ্ছি—পাঠ, সংগীত, অভিনয় এবং রস; পাঠ বলতে বিষয় বা কাহিনী বুঝতে হবে। তাহলে এই ভাবে বলতে পারি যে, কাহিনী ও সংগীত অভিনয় দ্বারা রস সৃষ্টিতে সহায়ক হলে নাট্য পদবাচ্য হতে পারে। সে ক্ষেত্রে দাঁড়ায় এইরকম:
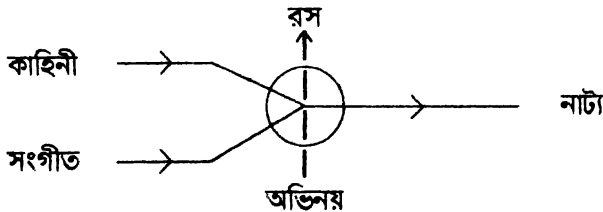
এখানে এ উল্লেখও পাচ্ছি যে, চতুর্বেদ নাট্যের উৎস। কিন্তু এই ব্রহ্মা কে? পূর্বেই বলেছি, প্রথম দিকে বৈদিক যজ্ঞে চারজন ঋত্বিকের প্রয়োজন হত—হোতা, অধ্বর্যু উদ্গাতা এবং ব্রহ্মা, এও বলেছি সমগ্র অনুষ্ঠান পরিচালনার দায়িত্বে থাকতেন ব্রহ্মা। অতএব সিদ্ধান্তে আসতে পারি, বৈদিক যজ্ঞের ব্রহ্মা নাট্যকর্মের আদি উদ্ভাবক। ব্রহ্মা ব্যক্তি বিশেষ নন—

* The Indian Stage, H N Dasgupta, pp. 3

বিশেষ একটি সম্মানজনক পদাধিকার। আর ঋষি বা ঋষিতুল্য ব্যক্তির বিশেষণ হিসাবে ভগবান* শব্দের প্রয়োগ সে কালেও ছিল, এ কালেও আছে। আমরা তো এখনো বলি 'ভগবান বুদ্ধ' 'ভগবান রামকৃষ্ণ'— ইত্যাদি।

ব্রহ্মাকৃত নাট্যকর্মের আদি প্রয়োগকর্তা আচার্য ভরত। আচার্য ভরত শুধু নাট্যশাস্ত্র প্রণেতা নন, তিনি একাধারে নট, পরিচালক, রূপকার এবং অলঙ্কারশাস্ত্র প্রণেতা। এই কারণে ভরতের নাট্যশাস্ত্রে নাট্যের লক্ষণ, রূপ, রীতি ও প্রয়োগ সম্পর্কে বিস্তৃত আলোচনা দেখতে পাই। যদিও প্রসঙ্গ খুব সুবিন্যস্ত নয়, তবুও সেখান থেকে নাট্যের লক্ষণগুলি খুঁজে নিতে অসুবিধা হয়না। নাট্য আসলে রূপের আরোপ। আচার্য ভরত বলেছেন :

নানাভাবোপসংপন্নং নানাবস্থান্তরাত্মকম্।
লোকবৃত্তানুকরণং নাট্যমেতন্ময়া কৃতম॥ (১.১১১)

সহজ বাংলায় এর অর্থ—বিবিধ ভাবযুক্ত নানা অবস্থার ও নানা কর্মের লোকবৃত্তের অনুকরণ নাট্য। 'লোকবৃত্তের অনুকরণ' কথাটি অভিনয়কেই ইঙ্গিত করে। এ কথার আরও বিস্তৃত এবং সহজতর অর্থ পাই কিছু পরে; যেখানে আচার্য ভরত বলেন :

দেবতানামসুরানাং রাজ্ঞামথ কুটুম্বিনাম্।
কৃতানুকরণং লোকে নাট্যমিত্যভিধীয়তে।
যোহয়ং স্বভাবো লোকস্য সুখদুঃখসমন্বিতঃ॥
সোহঙ্গাদ্যভিনয়পেতঃ নাট্যমিত্যভিধীয়তে।

[১.১২০(খ)-১২২ (ক)]

অর্থাৎ জগতে দেবতা, অসুর, রাজা ও গৃহস্থের কৃত কর্মের অনুকরণ নাট্য নামে অভিহিত হয়। এই সব ব্যক্তির সুখ-দুঃখ যুক্ত যে স্বভাব তা অঙ্গাদি (আঙ্গিক, বাচিক, আহার্য ও সাত্ত্বিক) অভিনয়ের সঙ্গে যুক্ত হলে নাট্য রূপে গণ্য হতে পারে।

অধিক উদ্ধৃতির প্রয়োজন নেই; এখানে এইটুকু অন্তত স্পষ্ট যে, বিভিন্ন স্বভাবের ব্যক্তির, বিভিন্ন বৃত্তির অনুকরণ বা আভিনয়িক রূপায়ণ এক কথায় নাট্য নামে অভিহিত। কিন্তু এই প্রসঙ্গে আরও কিছু কথা এসে পড়ে। মানুষের বৃত্তির সীমা-পরিসীমা নেই, ব্যক্তি বা অবস্থা বিশেষে তার চেহারাও বিভিন্ন। তার মধ্যে কোন কোনটি নাট্যের বিষয় হতে পারে—তার উদ্দেশ্যই বা কি? নাট্যে অনুসৃত বৃত্তিসমূহের উল্লেখ নাট্যশাস্ত্রেই পাচ্ছি:

ক্বচিদ্ধর্মঃ ক্বচিৎক্রীড়া ক্বচিদর্থ ক্বচ্ছমঃ।
ক্বচিদ্ধাস্যং ক্বচিদ্ যুদ্ধং ক্বচিৎকামক্বচিদ্বধঃ॥ (১.১০৭)

কখন ধর্ম, কখন ক্রীড়া, কখন অর্থ, কখন শান্তি, হাস্য, যুদ্ধ, কাম বা হত্যা নাট্যের বিষয়রূপে গণ্য হয়ে থাকে। অর্থাৎ ধর্ম, ক্রীড়া, অর্থ, শান্তি, হাস্য, যুদ্ধ, কাম বা হত্যার

---

* ভগবান ও দেবতা সমার্থক নয়। ঐশ্বর্য, বীর্য, যশ, শ্রী, জ্ঞান ও বৈরাগ্য—এই ছয়টিকে একত্রে বলে ভগ। যাঁর মধ্যে এই ছয়টি পূর্ণভাবে বিদ্যমান, তিনিই ভগবান পদবাচ্য।

বৃত্তিসমূহ অনুকরণ দ্বারা শিল্পরূপ লাভ করলে তাকে নাট্য বলা চলে। ব্যাপারটিকে আমরা এই ভাবে বুঝে নিতে পারি :

যেহেতু কার্য মাত্রই তার একটা উদ্দেশ্য থাকে, সেইহেতু নাট্য কর্মেরও একটা সুস্পষ্ট লক্ষ্য বা উদ্দেশ্য আছে। কি সেই লক্ষ্য বা উদ্দেশ্য? লক্ষ্যের সীমা নির্দেশ করেছেন ভরত এইভাবে :

ধর্মোঽধর্মপ্রবৃত্তানাং কামঃ কামোপসেবিনাম্।
নিগ্রহো দুর্বিনীতানাং বিনীতানাং দমক্রিয়া॥
ক্লীবানাং ধার্ষ্ট্যকরণমুৎসাহঃ শূরমানিনাম্।
অবুধানাং বিবোধশ্চ বৈদুষ্যং বিদুষামপি॥ (১.১০৮-১০৯)

নাট্যে অধর্মে প্রবৃত্তদের ধর্ম, কামাসক্তদের কাম, উদ্ধতদের শাসন, বিনীতকে আত্মসংযম, নিস্তেজকে সাহস, বীর ও মানী লোককে উৎসাহ, মূর্খদের জ্ঞান এবং পণ্ডিতগণকে প্রজ্ঞা সম্পর্কে উপদেশ দেওয়া হয়। বৃত্তিসমূহের অনুকরণ দ্বারা চিত্তশুদ্ধির প্রতি আচার্য ভরত এখানে ইঙ্গিত করেছেন বলেই মনে হয়। বিষয়টিকে নিম্নোক্ত রূপে রেখাচিত্রে বিন্যস্ত করে নেওয়া যায় :
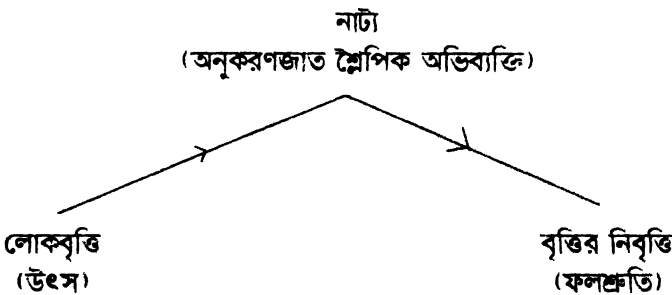
অতএব দেখতে পাচ্ছি, নাট্য বলতে আচার্য ভরত রূপের আরোপকে বুঝেছেন; আর তাই নাট্যের প্রতিশব্দ হিসাবে তিনি 'রূপ' বা 'রূপক' শব্দের প্রয়োগ করেছেন স্বচ্ছন্দে। রূপের আরোপ কথাটি অভিনয়কেই নির্দেশ করছে। পরবর্তী কালের আলঙ্কারিকেরাও এ ব্যাপারে কোন আপত্তি তোলেননি। ধনঞ্জয় "দশরূপকে" তাকে সুস্পষ্ট ভাবে বিন্যস্ত করেছেন মাত্র। আবার যে 'নট' ধাতু থেকে নাট্য শব্দটির উৎপত্তি, তারও বুৎপত্তিগত অর্থ, অঙ্গ চালনা করা। কাজেই নাট্য যে একান্তভাবে অভিনয়-নির্ভর ব্যাপার, প্রাচীন

কাল থেকে এই মতবাদই স্বীকৃতি পেয়ে এসেছে এবং তা নিয়ে দ্বিরুক্তির কোন কারণ দেখিনা।

এখানে প্রসঙ্গত উল্লেখ করা প্রয়োজন যে সংস্কৃত নাট্য এবং বাংলা নাটক কখনই এক বস্তু নয়। নাট্য বা রূপকের দশটি প্রকার ভেদের অন্যতম নাটক। নাটক, প্রকরণ, প্রহসন, ডিম, ব্যায়োগ, সমবকার, বীথি, অঙ্ক, ইহামৃগ এব ভান যথাক্রমে নাট্যের সুস্পষ্ট দশটি প্রকারভেদ। অবশ্য বাংলায় দশটি রূপকের সব কয়টির সন্ধান যেমন পাওয়া যায় না, তেমনি নাটক নামের অন্তরালে অন্যগুলিও একটা সাধারণ পরিচিতি লাভ করেছে। হয়ত সেই কারণেই নাট্য এবং নাটক সমার্থক হয়ে পড়েছে। কিন্তু সে যাই হোকনা কেন, নাট্য বা নাটক শ্রব্য বা পাঠ্য নয় একান্ত ভাবেই দৃশ্যকাব্যরূপে গণ্য।[১০]

শুধু সংস্কৃত অলঙ্কারশাস্ত্রে নয়, পাশ্চাত্ত্য আলঙ্কারিকেরাও নিঃসংশয়ে নাটককে অভিনয় নির্ভর শিল্পকলা হিসাবেই রায় দিয়েছেন। ট্র্যাজেডির সংজ্ঞা নির্ধারণ করতে গিয়ে সর্বজন শ্রদ্ধেয় গ্রীক দার্শনিক Aristotle বলেছেন ঃ

"Tragedy, then, is an imitation of an action that is serious, complete and of a certain magnitude, in Language embellished with each kind of artistic ornament, the several kinds being found in separate parts of the play, in the form of action, not of narrative, through pity and fear effecting the proper purgation of these emotions."[১১]

কমেডির সংজ্ঞা সম্পর্কেও তাঁর বক্তব্য:

"Comedy is, as we have said, an imitation of characters of a Lower type, —not, however, in the full sense of the word bad, the Ludicrous being merely a subdivision of the ugly."[১২]

নাটক তা সে ট্র্যাজেডি বা কমেডি যাই হোক না কেন, আসলে ঘটনা বা চরিত্রের 'imitaiton' - বা অনুকরণ,--- অন্তত Aristotle-র তাই অভিমত। এখন প্রশ্ন, 'imitation' বলতে Aristotle সঠিক কি বুঝেছেন? কেননা Aristotle-র শিক্ষাগুরু Plato পূর্বেই মত প্রকাশ করেছেন 'কলা বিদ্যা মাত্রই অনুকরণাত্মক'; অতএব Aristotle-র 'imitation' কথাটি বিশেষ ভাবে নাটকের অভিনয়কে নির্দেশ করছে কিনা সংশয় থেকে যায়। এক্ষেত্রে মনে রাখা দরকার, Plato-র কাছে 'imitation' বলতে- "শুধু রূপ কল্পনা নয় ব্যক্তির ভাব-ভাবনা, আলাপ আচরণ সব কিছুরই উপস্থাপনা।"[১৩] অন্যদিকে Aristotle শিল্পসৃষ্টির মূলে 'imitation' কে স্বীকার করে নিয়েও দৃশ্যকাব্য ও শ্রব্যকাব্যের সুস্পষ্ট বিভাজন

---

১০ অবশ্য স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ নাটকের অভিনয়কে ততটা গুরুত্ব দেননি বলেই মনে হয়। তাঁর মতে— "নাটকের যদি অভিনয় না হয় তো অভিনয়েরই পোড়াকপাল। নাটকের কোন ক্ষতিবৃদ্ধি নেই।"

১১ Aristotle's Theory of Poetry and Fine Art---S. H. butcher. 4th Ed. PP 23

১২ Ibid , pp 21

১৩ এরিস্টটলের পোয়েটিক্স ও সাহিত্যতত্ত্ব—ডঃ সাধন কুমার ভট্টাচার্য, পৃঃ ১০৭।

রেখাটি বিস্মৃত হননি; এবং নাটককে দৃশ্যকাব্যের অন্তর্ভুক্ত করে 'imitation'—কথাটি দ্বারা তার অভিনয়-নির্ভরতা বিষয়ে নিশ্চিত সিদ্ধান্তে পৌঁছেছেন।

অনুকরণবাদের যৌক্তিকতা নিয়ে পরবর্তীকালের নাট্য সমালোচকদের মধ্যে তুমুল বাদানুবাদের সৃষ্টি হয়েছে। কিন্তু যে, যে ভাবেই বলুন না কেন, নাটক যে বিশেষ ভাবে অভিনয় নির্ভর শিল্পকলা—পরিশেষে এই সাধারণ সিদ্ধান্তে এসে পৌঁছেছেন প্রায় সকলেই। Cicero-কে উদ্ধৃত করে AEelius Donatus মত প্রকাশ করেছেন ঃ

"The Drama is a copy of life, a mirror of custom, a reflection of truth."[১৪]

প্রায় একই কথা একটু ঘুরিয়ে অন্যভাবে বলতে চেষ্টা করেছেন Beaumarchais,—তাঁর মতে ঃ

"if the theatre is a faithful picture of what happens in the world, the interest aroused in us must of necessity have a close relationship to the way in which we look at reality."[১৫]

বাস্তবের প্রতিফলন ব্যাপারটিকেই সর্বাধিক গুরুত্ব দিয়েছেন অন্যতম সমালোচক Hugo; Hugo নাটকের সংজ্ঞা নির্দেশ করেছেন এইভাবে ঃ

"The drama is a mirror in which nature is refllected."[১৬]

বলা বাহুল্য Aristotle কে ছাড়িয়ে এই সব সমালোচকেরা খুব বেশি দূরে অগ্রসর হতে পারেননি। Aristotle-র বক্তব্যেরই প্রতিধ্বনি শুনতে পাই এঁদের মন্তব্যে। সে দিক থেকে বরং একটু নতুন কথা শোনাতে চেষ্টা করেছেন Hedelin। সম্ভবত তিনিই প্রথম অনুকরণ তত্ত্বের বিরোধিতা করে বলেছেন ঃ

"The stage does not present things as they have been, but as they ought to be."[১৭]

তবে Hedelin-র বক্তব্যে নতুনত্ব থাকলেও নাটকের সমস্ত লক্ষণগুলি তাঁর মতবাদেও অনুপস্থিত। এ যেন সাহিত্য সম্পর্কে চিরাচরিত ধারনা—"The truth of poetry is not copy of reality but a higher reality"—তত্ত্বের ভিন্নতর ব্যাখ্যা। সর্বপ্রথম যিনি নাটকের লক্ষণ বিচারে গ্রহণযোগ্য সংজ্ঞা দেবার চেষ্টা করেছেন, তিনি Henry Arthur Jones, তিনিই প্রথম বললেন ঃ

"Drama arises when any person or persons in a play are consciously or unconsciously 'up against' some antagonistic person, or circumstances, or fortune."[১৮]

তবে Arthur Jones-র থেকেও স্পষ্ট ভাষায় দর্শকের উপযোগিতা বিষয়ে মত দিয়েছেন Sarcey। তিনি খুব জোড়ের সঙ্গেই বলেছেন ঃ

"A play without an audience is inconceivable."[১৯]

---

১৪ The Theory of Drama-A Nicoll. pp 24

১৫ Ibid., pp. 25

১৬ Ibid., pp 27

১৭ Ibid., pp 27

১৮ Ibid., pp 29.

১৯ Ibid., pp. 30

দর্শকের উপস্থিতি ছাড়া নাটকের অভিনয়ের অসম্ভাব্যতা নিয়ে প্রশ্ন ওঠে না। তবু Sarcey-র মতবাদ আংশিকতা দোষ দুষ্ট: কারণ দর্শকের উপস্থিতির বিষয়টিকে গুরুত্ব দিতে গিয়ে Sarcey নাটকের শিল্প-লক্ষণ সম্পর্কে কোন কথাই বলবার প্রয়োজন মনে করেননি। Sarcey-র বক্তব্যকে সংশোধন করে নিয়েছেন অধ্যাপক Nicoll এই ভাবে ঃ

"A play without an audience and actors to interpret it is inconceivable."[২০]

আসলে 'Drama', 'play' এবং 'Theatre'- এই তিনটি ইংরেজি শব্দের ব্যুৎপত্তিগত অর্থ নিয়ে সংশয়ে পড়েছেন এই সব সমালোচকেরা। মনে হচ্ছে 'Drama' শব্দটিকে 'play' বা 'Theatre' থেকে এঁরা একটু পৃথক রেখেই বিচার করেছেন। অর্থাৎ 'Drama' যখন, তখন তা সাহিত্যকৃতি হিসাবে বিবেচ্য এবং তাকে 'Play' বা 'Theatre' পর্যায়ে পৌছাতে হলে দর্শক উপস্থিতিকে অস্বীকার করবার উপায় নেই এই তাঁদের অভিমত। কিন্তু এ হেন পৃথকীকরণ কতদূর যুক্তিসম্মত, এখানে এ প্রশ্ন ওঠা স্বাভাবিক। পূর্বজ সমালোচকদের মতামতের এবংবিধ অসম্পূর্ণতা দূর করে একটা বস্তুনিষ্ঠ সংজ্ঞা নির্ণয়ের চেষ্টা করেছেন অধ্যাপক Nicoll এবং তাঁর মন্তব্যকেই আমরা সর্বাধিক গ্রহণযোগ্য বলে মনে করি। Nicoll বলেছেন ঃ

"Drama is the art of expressing ideas about life in such manner as to render that expression capable of interpretation by actors and likely to interest an audience assembled to hear the words and witness the actions."[২১]

মন্তব্যের পর মন্তব্যের উতোর চাপানের মধ্যে থেকে মোটের ওপর যে কথাগুলো বেরিয়ে আসে, সেগুলোকে যদি আমরা সূত্রাকারে সাজিয়ে নিই, তাহলে নাটকের সামগ্রিক পরিচয় সম্পর্কে অতি সহজেই সর্বজন গ্রাহ্য একটা সিদ্ধান্তে পৌছান সম্ভব হবে। সেক্ষেত্রে নাটকের আলোচনায় তার অভিনয় রীতি ও রঙ্গমঞ্চের অন্তর্ভুক্তির প্রাসঙ্গিকতা নিয়েও সন্দেহের অবকাশ থাকে না। যেটুকু তথ্য পাচ্ছি, তাতে দেখা যাচ্ছে নাটক ঃ

১। নির্বাচিত লোকবৃত্তির অনুকরণ।
২। শ্রব্য বা পাঠ্য নয়, নিশ্চিতরূপে দৃশ্যকাব্য।
৩। অভিনয় নির্ভর স্বতন্ত্র শিল্পকলা।
৪। দর্শকের উপস্থিতি একান্তভাবে কাম্য।
৫। বৃত্তিসমূহের নিবৃত্তি ফলশ্রুতি।

এই সব সাধারণ সূত্রের ওপরে ভিত্তি করে আমরা নাটকের সংজ্ঞা নির্ণয় করতে পারি এইভাবে জীবনের সুনির্বাচিত মুহূর্তের সমন্বয়ে সৃষ্ট দর্শক গ্রাহ্য অভিনয়-নির্ভর শৈল্পিক অভিব্যক্তি নাটক।

অর্থাৎ 'নাটক' বলতে আমরা এমন একটি বিশিষ্ট শিল্পরীতিকে বুঝি, যেখানে জীবনের নানা অবস্থার অনুকরণ ঘটে অভিনয়ের বিশেষ পদ্ধতিতে তা দর্শক মনে রস-সঞ্চারে

---

২০ Ibid., pp ৩১

২১ Ibid., pp ২৫

সক্ষম এবং তা শিল্প সম্মত। এখন অভিনয় ব্যাপারটিকে যদি এতখানি গুরুত্ব দিতে হয়, তাহলে নাটককে বলতে পারি একটি বলিষ্ঠ 'টিম ওয়ার্ক'; আর এই 'টিম ওয়ার্ক' স্রষ্টা, সৃষ্টি ও রসভোক্তা এই তিনটি প্রান্তে সম্প্রসারিত। নাটকের সঙ্গে সাহিত্যের অন্যান্য শাখার প্রধান এবং মৌলিক পার্থক্য, নাটক শুধুমাত্র সাহিত্য হিসাবে বিবেচ্য নয় – যতক্ষণ না তা অভিনয়ের উদ্দেশ্যে রঙ্গমঞ্চে প্রযুক্ত হচ্ছে ততক্ষণ পর্যন্ত তার সঠিক মূল্যায়ণ সম্ভব নয়। বাংলা ভাষায় নাট্য সমালোচনা গ্রন্থের অভাব নেই কিন্তু যতদূর জানি, অভিনয়ের মানদণ্ডে তার গুণাগুণ বিচার এ যাবৎ হয়নি। একটি বিশেষ দেশ-কাল সমাজের প্রেক্ষাপটে রঙ্গমঞ্চে প্রযুক্ত নাটক সমূহের রস সমৃদ্ধ আলোচনা এবং অভিনয় জগতের তথ্যানুসন্ধান বর্তমান গ্রন্থের আলোচ্য বিষয়।

প্রাচীন ভারতীয় নাট্যশালা

চৌষট্টি কলার অন্যতম নাটক, যদি অভিনয় নির্ভর শিল্প কলা হিসাবে গণ্য হয়, তবে নাটক বিচারে নাট্যশালা সম্পর্কিত আলোচনা প্রাসঙ্গিক হয়ে পড়ে। নাট্যশালার উদ্ভব ও তার বিবর্তনের সঙ্গে নাট্যাভিনয়ের ধারাটি ওতপ্রোত ভাবে যুক্ত। নাট্যশালার আলোচনা ব্যতীত নাট্যাভিনয়ের ইতিহাস উদ্ধার নিতান্তই অসম্ভব।

যুগক্রান্তি পর্বে কলকাতার নাট্যশালাগুলির সম্যক চিত্র উদ্ঘাটনের পূর্বে তার উৎস মুখটি অনুসন্ধান করা যেতে পারে। পাশ্চাত্য সমালোচকদের প্রায় সকলেই প্রাচীন ভারতে স্থায়ী নাট্যশালার সম্ভাবনা বাতিল করে দিয়েছেন এবং কলকাতায় স্থায়ী নাট্যশালা প্রতিষ্ঠার পশ্চাতে তাঁরা বিদেশী প্রভাবকে সক্রিয় দেখেছেন। এই অভিমতের সপক্ষে গ্রহণযোগ্য কোন যুক্তি তাঁদের আলোচনায় পাচ্ছি না। তাঁদের মত অনুসারে, রাজগৃহ বা মন্দির সংলগ্ন নৃত্য-গীতাদির জন্য নির্দিষ্ট স্থানে সাময়িক ভাবে নাট্যাভিনয়ের ব্যবস্থা হত মাত্র - স্থায়ী নাট্যগৃহ বলতে প্রাচীন ভারতে আদৌ কোন কিছু ছিল না। কিন্তু নাট্যশাস্ত্র এবং অন্যান্য সাক্ষ্যপ্রমাণ থেকে বিরুদ্ধ মতবাদই প্রতিষ্ঠিত হয়ে পড়ে।

নাট্যশাস্ত্রের কথায় পরে আসছি। প্রথমে অন্যান্য তথ্য প্রমাণ থেকে অনুসন্ধান করা যাক। কালিদাসের 'মালবিকাগ্নিমিত্র' নাটকে 'প্রেক্ষাগার' কথাটির উল্লেখ আছে। রাজা অগ্নিমিত্র দুজন নাট্যাচার্যকে প্রতিপালন করতেন, তাঁরা সদলবলে অভিনয় করতেন, অভিনয় শিক্ষাও দিতেন এমন প্রসঙ্গ উক্ত নাটকেই পাচ্ছি। আবার 'বিক্রমোর্বশীয়' নাটকে 'পরিষদ' বা পূর্বে বহু নাটক অভিনীত হয়েছে এমন রঙ্গালয়ে নাটকটি অভিনয়ের স্পষ্ট উল্লেখ আছে।[১১] পতঞ্জলির রচনা থেকেও সমাজে নৃত্য অভিনয়, পুতুল নাচ বা কথকতা প্রচলনের সংবাদ পাওয়া যাচ্ছে। নিয়মিত অভিনয় হত, অভিনয় শিক্ষার ব্যবস্থাও ছিল অথচ স্থায়ী নাট্যশালা বলতে কিছু ছিল না- এ যুক্তি মানি কি করে?

---

[১১] "বিক্রমোর্বশীয়" নাটকে আছে "পরিষদেষাং পূর্বেষাং দৃষ্টরসপ্রবন্ধা অহমস্যাং কালিদাসগ্রথিত-বস্তুনা নবেন ত্রোটকেন উপস্থাস্যে।" - পূর্বে বহু নাটকের অভিনয় হয়েছে, শিক্ষিত দর্শকদের জন্যে নির্দিষ্ট এমন একটি পরিষদ (অর্থাৎ রঙ্গালয়) এই নাটকের অভিনয় স্থান।
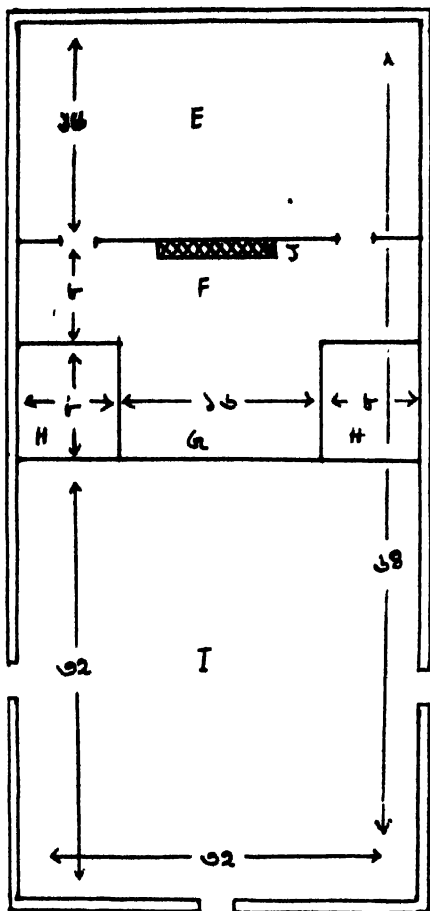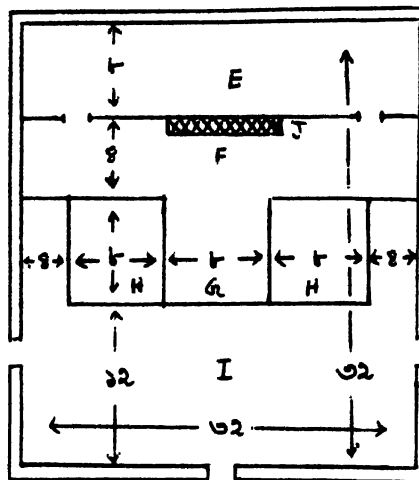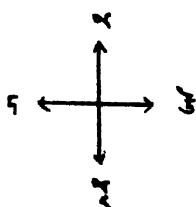
প্রাচীন ভারতীয় ত্রিবিধ রঙ্গালয়ের হাতের মাপ অনুসারে ভূমি-নকশা ।
E - নেপথ্যগৃহ ; F - রঙ্গশীর্ষ ; G - রঙ্গপীঠ ; H - মত্তবারণী ; I - রঙ্গমণ্ডপ ;
J - যবনিকা ।
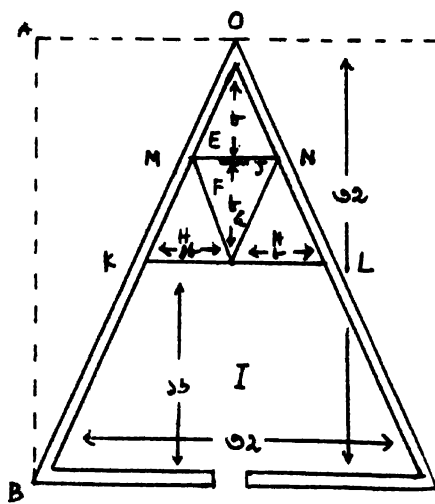
আচার্য ভরতের নাট্যশাস্ত্রের 'প্রেক্ষাগৃহলক্ষণ' শীর্ষক দ্বিতীয় অধ্যায়ে নাট্যশালা নির্মাণের বিস্তৃত বর্ণনা আছে। নারদের 'সংগীত মকরন্দ', শারদাতনয়ের 'ভাবপ্রকাশ', রাজশেখরের 'কাব্যমীমাংসা', 'শিল্পরত্ন', 'সংগীত রত্নাকর' প্রভৃতি গ্রন্থে নাট্যগৃহের যে সমস্ত বিবরণ আছে, তার থেকে স্থায়ী রঙ্গমঞ্চের স্বপক্ষেই যুক্তি এসে পড়ে। আচার্য ভরত মাটি পরীক্ষা থেকে শুরু করে নির্বাচন, জমির মাপ, জমির নক্সা, ভিত্তি স্থাপন, স্তম্ভ নির্মাণ, বেদিকা তৈরি, গবাক্ষ প্রস্তুত, দেয়ালে চিত্রাঙ্কন এমনকি দর্শকদের আসন সজ্জারও খুঁটি-নাটি ব্যবস্থা নিয়ে আলোচনা করেছেন: এবং সে আলোচনা যথেষ্ট বিজ্ঞান নির্ভরও বটে। কাজেই প্রাচীন ভারতে স্থায়ী রঙ্গমঞ্চের স্বপক্ষে প্রামাণ্য যুক্তিকে অস্বীকার করবার উপায় নেই।

রঙ্গালয় বা প্রেক্ষাগৃহের আলোচনায় অন্যান্য গ্রন্থগুলি ভরতের নাট্য-শাস্ত্রের অনুসরণ বলে ভরতমুনিকেই আমরা আদর্শস্থানীয় রূপে গণ্য করতে পারি। আচার্য ভরত দেবস্থপতি বিশ্বকর্মা পরিকল্পিত তিন ধরনের নাট্যগৃহের কথা বলেছেন— বিকৃষ্ট, চতুরস্র, ও ত্র্যস্র। যথা ঃ

ইহ প্রেক্ষাগৃহাণাং তু ধীমতা বিশ্বকর্মণা।
ত্রিবিধঃ সন্নিবেশশ্চ্য শাস্ত্রতঃ পরিকল্পিতঃ॥
বিকৃষ্টশ্চতুরস্রশ্চ ত্র্যস্রশ্চৈব হি মণ্ডপ ঃ [২.৭ ৮ (ক)]

'বিকৃষ্ট' কথাটিতে আয়তাকার, চতুরস্র দ্বারা চতুষ্কোণ এবং ত্র্যস্র অর্থে ত্রিকোণাকৃতি বোঝান হয়েছে। আয়তন অনুসারে এদের প্রত্যেকটির তিনটি করে বিভাগ নির্দিষ্ট— জ্যেষ্ঠ, মধ্য ও অবর। হাত বা দণ্ড[১১] অনুসারে এদের দৈর্ঘ যথাক্রমে ১০৮ (জ্যেষ্ঠ), ৬৪ (মধ্য), এবং ৩২ (অবর)। কেউ কেউ জ্যেষ্ঠ, মধ্য ও অবর অর্থে যথাক্রমে বিকৃষ্ট, চতুরস্র এবং ত্র্যস্র বুঝেছেন। কিন্তু অভিনবগুপ্ত স্পষ্টই বলেছেন প্রত্যেকটিরই তিনটি করে মোট নয় প্রকার রঙ্গালয় ছিল। আবার হাত এবং দণ্ডের মাপ অনুসারে বিচার করলে সংখ্যা দাঁড়ায়— হাত অনুসারে নয় রকম এবং দণ্ড অনুসারে আরও নয় রকম, মোট আঠারো রকমের রঙ্গালয়। অভিনবগুপ্তের মতে দেবতা, রাজা ও সাধারণ মানুষের জন্যে জ্যেষ্ঠ, মধ্য ও অবর—এই তিন রকমের ব্যবস্থা, সেটা হাত বা দণ্ড যে কোন মাপেই হোক না কেন। অর্থাৎ দেবতাদের জন্যে জ্যেষ্ঠ বিকৃষ্ট, জ্যেষ্ঠ চতুরস্র বা জ্যেষ্ঠ ত্র্যস্র; রাজন্যবর্গের জন্যে অনুরূপ ভাবে ত্রিবিধ মধ্যম এবং সাধারণের জন্যে ত্রিবিধ অবর নাট্যগৃহ নির্দিষ্ট ছিল। এখন এই দেবতা, রাজা ও সাধারণ মানুষ অভিনেতা, না কি দর্শক? অভিনবগুপ্ত অভিনেতা ধরেই বিচার করেছেন; তাঁর বিচারে দেব-কাহিনীর জন্যে জ্যেষ্ঠ, রাজপুরুষদের নিয়ে রচিত কাহিনীর জন্যে মধ্য, আর সাধারণ মানুষদের নিয়ে রচিত নাট্যের জন্যে অবর মাপের নাট্যশালা ব্যবহৃত হত। অনেকটা আধুনিক কালের পৌরাণিক, ঐতিহাসিক এবং সামাজিক নাটকের মতই বিষয় বস্তুতে প্রকার ভেদ, আর সেই মত যা কিছু বিধি-বিধান।

---

[১১] নাট্যশাস্ত্রের মতে ২৪ আঙ্গুলে এক হাত এবং ৪ হাতে এক দণ্ড।

কিন্তু অভিনবগুপ্তের ব্যাখ্যায় কিছু বিভ্রান্তির সৃষ্টি হয়েছে। আচার্য ভরত মধ্যম মাপের নাট্যগৃহ মর্ত্যবাসীর পক্ষে উপযুক্ত বলে রায় দিয়েছেন; অতি বড় বা অতি ছোট রঙ্গালয়ের অসুবিধার কথাও তিনি বলেছেন। তাহলে দেব কাহিনী বা মানব কাহিনী নিয়ে রচিত নাটক অভিনীত হত কি ভাবে? অভিনবগুপ্তের ব্যাখ্যা মেনে নিলে এ দুই শ্রেণীর কোনটিই মধ্যম মাপের রঙ্গমঞ্চের উপযুক্ত নয়। এমন কথাও নিশ্চয় বলা যায় না যে মর্ত্যবাসী মানুষ কেবল মাত্র রাজকাহিনীরই অভিনয় করতেন অন্য দুটি বাদ দিয়ে। এই বিতর্কের একটি মাত্র সন্তোষজনক ব্যাখ্যা হতে পারে এই যে দেবতা, রাজা ও সাধারণ মানুষের এই বিভাজন অভিনেতা হিসাবে নয় দর্শক হিসাবে। দেবতা, রাজা বা সাধারণ মানুষ যারা যেমন পর্যায়ের দর্শক তারা সেইরকম মঞ্চে (ত্রিবিধ জ্যেষ্ঠ, ত্রিবিধ মধ্য বা ত্রিবিধ অবর) সব নাটকেরই অভিনয় করতেন।

আচার্য ভরতের অনুসরণে এখন মধ্যম মাপের বিকৃষ্ট, চতুরস্র এবং অবর এই ত্রিবিধ রঙ্গালয়ের অনুসন্ধান করা যেতে পারে। ভরতমুনি হাতের মাপ ব্যবহার করেছেন - আমরাও দণ্ডের পরিবর্তে হাতের মাপই ব্যবহার করব। যেহেতু, সংস্কৃত নাটকের অভিনয় একদা লুপ্ত হয়ে গিয়েছিল, অতএব আধুনিক কালের অভিনয় রীতি ও মঞ্চ ব্যবস্থার সঙ্গে তার যোগসূত্র সাধারণ ভাবে এতকাল অস্বীকৃত হয়ে এসেছে। এই অভিমত কতদূর যুক্তি সম্মত, বর্তমান ক্ষেত্রে সেটিও আমাদের বিচার্য বিষয়।

॥ বিকৃষ্ট প্রেক্ষাগৃহ ॥

বিকৃষ্ট প্রেক্ষাগৃহ পূর্ব পশ্চিমে বিস্তৃত, দৈর্ঘ্যে ৬৪ হাত এবং প্রস্থে ৩২ হাত; মূল মঞ্চের অবস্থান ছিল পশ্চিমদিকে অর্থাৎ অভিনেতারা পূর্বদিকে মুখ করে অভিনয় করতেন। সমস্ত শ্রেণীর রঙ্গমঞ্চের এটি ছিল সাধারণ রীতি। ৬৪ হাত লম্বা জমিকে উত্তর দক্ষিণ বরাবার সমান দুই ভাগে, ৩২ ৩২ হাত মাপে ভাগ করা হত। পূর্বদিকের অর্ধাংশ 'রঙ্গশালা' 'রঙ্গমণ্ডপ' বা auditorium সেখানে গ্যালারির আকারে দর্শকের আসন সজ্জিত থাকত। দুটি সারির মধ্যে সব সময় এক হাত পরিমাণ উচ্চতার ব্যবধান রাখা হত যাতে অভিনয় দেখতে কোন অসুবিধার সৃষ্টি না হয়। কখনও কখনও আবার দ্বিতল বিশিষ্ট রঙ্গমণ্ডপ নির্মাণ করা হত। রঙ্গগৃহের ছাদ শৈলগুহাকৃতি করা হত প্রতিধ্বনির কথা মনে রেখে। পশ্চিম দিকের বাকি অর্ধাংশকে আবার একই ভাবে উত্তর দক্ষিণে ১৬ ৩২ হাত মাপে সমান ভাগে ভাগ করা হত। সামনের ১৬ ৩২ হাত পরিমাণ স্থান মূল রঙ্গভূমি বা Stage। একেও আবার উত্তর দক্ষিণে ৮ ৩২ হাত মাপে সমান দুটি ভাগে ভাগ করা হত। পেছনের ৮ ৩২ হাত অংশটি Back Stage বা রঙ্গশীর্ষ। রঙ্গশীর্ষের ঠিক মাঝখানে ৬টি কাঠ দ্বারা নির্মিত ষড়দারুক[১৪] অংশে খুব সম্ভব গায়ক বাদকেরা অবস্থান করতেন। সামনের অংশের উত্তর ও দক্ষিণে ৮ ৮ হাত পরিমাণ স্থানে নির্মাণ করা হত

---

[১৪] "ষড়দারুক" যে ঠিক কি বস্তু তা নিয়ে পণ্ডিতদের মধ্যে বিতর্কের সৃষ্টি হয়েছে।

দুটি মত্তবারণী।[২৫] মত্তবারণী দুটির মধ্যবর্তী ৮·১৬ হাত অংশটিকে বলা হত রঙ্গপীঠ। মূল অভিনয় হত এই রঙ্গপীঠে বা Front Stage-এ। মত্তবারণীর চারকোণে সুসজ্জিত চারটি স্তম্ভ এবং তার পশ্চাতে আড়াল থাকত। অভিনেতারা প্রয়োজনে সেখানে বিশ্রাম করতে পারতেন। মনে হয় মত্তবারণী অনেকটা বারান্দার মত. এর মেঝে সাধারণত রঙ্গপীঠের থেকে দেড় হাত উঁচু রাখা হত। রঙ্গশীর্ষ. রঙ্গপীঠ. মত্তবারণী প্রভৃতি বাদ দিয়ে একেবারে পশ্চাতে ১৬·৩২ হাত স্থান জুড়ে নির্মিত হত নেপথ্যগৃহ। নেপথ্য গৃহের দুই প্রান্তে দুটি দরজা দিয়ে অভিনেতারা রঙ্গশীর্ষ হয়ে রঙ্গপীঠে প্রবেশ-প্রস্থান করতেন। এ ছাড়াও ঠিক কোথায় কোথায় কটি স্তম্ভ নির্মাণ করা হত. মঞ্চ অলঙ্করণের কি কি ব্যবস্থা ছিল তারও বিস্তৃত বিবরণ আচার্য ভরত দিয়েছেন। অপ্রয়োজন বোধে সে আলোচনায় আমরা যাচ্ছি না। এবার দেখা যাক অন্য দুই রকমের নাট্যগৃহ কি রকম ছিল।

॥ চতুরস্র প্রেক্ষাগৃহ ॥

চতুরস্র প্রেক্ষাগৃহের আয়তন আচার্য ভরত বলেছেন দৈর্ঘে প্রস্থে সমান---৩২·৩২ হাত পরিমাণ। অর্থাৎ এটি বিকৃষ্টের ঠিক অর্ধ পরিসর। তবে এর গঠন কৌশল বেশ জটিল। নাট্যশাস্ত্রে প্রামাণ্য তথ্যের যথেষ্ট অভাব বলে এই শ্রেণীর রঙ্গমঞ্চ সম্পর্কে সুস্পষ্ট ধারনা করাও বেশ মুশকিল। অভিনবগুপ্ত শঙ্কুকের মতবাদ বিচার করে মোটামুটি একটা আলোচনা করেছেন। আমাদেরও অভিনবগুপ্তকে অনুসরণ করা ছাড়া গত্যন্তর নেই। অভিনবগুপ্তের মতে ৩২·৩২ হাত পরিমাণ জমিকে প্রথমে সমান ৬৪টি বর্গক্ষেত্রে ৪·৪ হাত মাপে ভাগ করে নেওয়া হত। ঠিক মাঝখানে এই রকম চারটি বর্গক্ষেত্র নিয়ে তৈরি হত রঙ্গপীঠ বা Front Stage. তার আয়তন ৮·৮ হাত। রঙ্গপীঠের দুপাশে পূর্বের মতই ৮·৮ হাত মাপে দুটি মত্তবারণী গঠন করা হত। বিকৃষ্টের সঙ্গে শুধু তফাৎ এই-- এখানে মত্তবারণীর পরেও দুপাশে ৪·৮ হাত জায়গা থেকে যাচ্ছে। এই দুটি জায়গা যে কি কাজে লাগত তার কোন হদিশ পাওয়া যায় না। খুব সম্ভব বিশিষ্ট দর্শকদের এই দু'পাশে বসবার জায়গা করা হত। রঙ্গপীঠের ঠিক পিছনেই ৪·৩২ হাত স্থানে পূর্বের মতই রঙ্গশীর্ষ. ষড়দারুক এবং নেপথ্যে প্রবেশ প্রস্থানের জন্যে দুপাশে দুটি পথ--- ইত্যাদির ব্যবস্থা। তৎপশ্চাতে ৮·৩২ হাত নেপথ্য গৃহ। কেউ কেউ বলছেন নেপথ্যের মাপ ৪·৩২ হাত এবং রঙ্গশীর্ষের মাপ ৮·৩২ হাত। তবে এ বিতর্কের সঠিক সমাধান খুঁজে পাওয়া প্রায় অসম্ভব। রঙ্গপীঠের সামনে পূর্বদিকে অবশিষ্ট ১২·৩২ হাত জায়গা জুড়ে গ্যালারির মত কাঠ বা ইটের তৈরি দর্শকদের আসনের বন্দোবস্ত থাকত। চতুরস্র নাট্যগৃহের দরজার সংখ্যা নিয়েও বেশ গোলমালে পড়তে হয়। আচার্য ভরত দুটি দরজার উল্লেখ করেছেন. অভিনবগুপ্ত বলেছেন চারটি. অধ্যাপক মাঁকড়ের মতে আবার পাঁচটি। দুটি নেপথ্য থেকে রঙ্গমঞ্চে প্রবেশ প্রস্থানের জন্যে, বাকি তিনটি দর্শকদের রঙ্গমঞ্চে প্রবেশ-প্রস্থানের জন্যে ব্যবহৃত হত। এ ছাড়া অন্যান্য আয়োজন বিকৃষ্টের মতই।

---

[২৫] "মত্তবারণী" নিয়েও একই বিতর্কের সৃষ্টি হয়েছে।

॥ ত্র্যস্র প্রেক্ষাগৃহ ॥

ত্র্যস্র প্রেক্ষাগৃহের আকার আয়তন নিয়ে সব থেকে বেশি বিভ্রান্তির সৃষ্টি হয়েছে। আচার্য ভরত শুধুমাত্র ত্রিকোণাকৃতি বলেই ক্ষান্ত হয়েছেন—কোন রকম মাপ-জোপ দেননি। অভিনবগুপ্তও একই ভাবে নীরব থেকেছেন। অন্য যে সব আলোচনা পাচ্ছি, তাতেও যুক্তি অপেক্ষা কল্পনারই প্রাবল্য। কাজেই প্রকৃত তথ্য উদ্ধারে যথেষ্ট সতর্কতার প্রয়োজন। পূর্ববর্তী আলোচনার মধ্যে থেকে কয়েকটি সাধারণ সূত্র বের করে নিলে এ বিষয়ে আমরা নতুন ভাবে আলোকপাত করতে সক্ষম হব। ইতঃপূর্বে আমরা দেখেছি, বিকৃষ্টের তুলনায় চতুরস্র আয়তনে অর্ধ পরিসর এবং উভয় ক্ষেত্রেই প্রস্থ ৩২ হাত। এও দেখেছি, বিকৃষ্টকে জ্যেষ্ঠ, চতুরস্রকে মধ্য এবং ত্র্যস্রকে অবর বলে কেউ কেউ ভুল করেছেন। এই সূত্র ধরেই ত্র্যস্র বা ত্রিকোণাকৃতি প্রেক্ষাগৃহের সঠিক আয়তন বের করে নেওয়া সম্ভব। ধরা যাক ৩২×৩২ হাত চতুরস্র 'ABCD'। এই চতুর্ভূজের ওপরের বাহু AD-র মধ্যবিন্দু ১৬ হাতের মাথায় ধরা যাক O আর তার বিপরীত বাহু BC। এখন O থেকে B এবং C তে দুটি রেখা টানলে পাওয়া যায় OBC সমদ্বিবাহু ত্রিভুজ। এই ত্রিভূজের BC বাহুর দৈর্ঘ ৩২ হাত এবং O থেকে BC বাহুর দূরত্বও ৩২ হাত। তাহলে ত্রিভূজটির সর্বোচ্চ মাপ দাঁড়াচ্ছে দৈর্ঘে ৩২ হাত এবং প্রস্থেও ৩২ হাত। শুধু তাই নয়, এই ত্রিভূজটির পরিমাপ ৩২×৩২ হাত চতুরস্রের ঠিক অর্ধেক। এক্ষেত্রে তিন শ্রেণীর রঙ্গমঞ্চের প্রতিটি যেমন প্রস্থে ৩২ হাত পাওয়া যাচ্ছে, তেমনি আনুপাতিক আয়তনও সুন্দর মিলে যাচ্ছে। বিকৃষ্টের অর্ধ পরিসর চতুরস্র এবং চতুরস্রের অর্ধ পরিসর ত্র্যস্র। আর এই জন্যেই বিকৃষ্টকে জ্যেষ্ঠ, চতুরস্রকে মধ্য এবং ত্র্যস্রকে অবর বলে ভ্রান্তি জন্মানোর সুযোগ ঘটেছিল। অতএব এই পরিমাপ যথার্থ বলে আমরা দাবী করতে পারি। এখন দেখা যাক এখানে অন্যান্য ব্যবস্থা কেমন ছিল। বিকৃষ্ট বা চতুরস্রে অর্ধেক বা তার কিছু বেশি অংশ জুড়ে রঙ্গপীঠ, রঙ্গশীর্ষ, নেপথ্য প্রভৃতির অবস্থান দেখতে পাচ্ছি। এখানেও একই ভাবে প্রেক্ষাগৃহের ঠিক মাঝ বরাবর 'BC' বাহুর সমান্তরাল একটি রেখা 'KL' টানতে হবে। তার পশ্চাতে ঐ রেখার সমান্তরাল মাঝ বরাবর আর একটি রেখা 'MN' টানলে এবং M ও N থেকে 'KL' বাহুর ঠিক মাঝখানে আরও দুটি রেখা টানলে চারটি সমান মাপের ত্রিভূজ পাওয়া যাবে। প্রতিটি ত্রিভূজের সর্বোচ্চ পরিমাপ দাঁড়াবে ৮×৮ হাত। একেবারে পশ্চাতে নেপথ্যগৃহ, তার সম্মুখে রঙ্গশীর্ষ, রঙ্গপীঠ ও যড়দারুক এবং রঙ্গপীঠের দুপাশে মত্তবারণী। মূলমঞ্চের সামনে ১৬×৩২ হাত পরিমাণ স্থানে গ্যালারি; অন্যান্য ব্যবস্থা পূর্ববৎ। বিকৃষ্টে দর্শক সংখ্যা ৫০০, চতুরস্রে ২৫০-র বেশি নয় এবং ত্র্যস্রে তা ১০০ থেকে ১২৫ র মধ্যে সীমাবদ্ধ।[২১] অন্যদিকে গ্রীসে দর্শকের জন্যে আসন নির্দিষ্ট ছিল প্রায় হাজার পনেরো মত।

[২১] প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য যে, W B Keith তাঁর বিখ্যাত 'Sanskrit Drama' গ্রন্থে শূদ্রদের রঙ্গমঞ্চে প্রবেশাধিকার নিয়ে সংশয় প্রকাশ করেছেন (পৃঃ ৩৭৯)। কিন্তু সর্বসাধারণের অধিগম্য শাস্ত্র রচনার পরিকল্পনা থেকেই পঞ্চম বেদ নাট্যবেদের সৃষ্টি। তাছাড়া দর্শকের সামাজিক প্রতিষ্ঠা ভেদে তিন শ্রেণীর রঙ্গমঞ্চের বিধান নাট্যশাস্ত্রেই আছে। কাজেই শূদ্রদের রঙ্গমঞ্চে প্রবেশাধিকার নিয়ে জোড় করে আপত্তি ধোপে টেকে না।

বিস্মৃতপ্রায় অতীত ইতিহাসের ভগ্নস্তূপ থেকে প্রাচীন ভারতীয় নাট্যশালা সম্পর্কে যতটুকু তথ্য উদ্ধার করা সম্ভব হয়েছে, সাধারণ মত এই যে, এ কালের নাট্যশালার স্থাপত্য কৌশল, নেপথ্য-বিধান বা অভিনয়-রীতিতে তার প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ প্রভাব নেই। কেননা, সংস্কৃত নাটকের অভিনয় একদা লুপ্ত হয়ে গিয়েছিল: মধ্যবর্তী কালের দীর্ঘ ব্যবধানে তার পুনরুজ্জীবন যেমন ঘটেনি, তেমনি পাশ্চাত্ত্য ভাবধারার প্রত্যক্ষ সংস্পর্শে অভিনয় জগতে বহু বৈপ্লবিক পরিবর্তন সাধিত হয়েছে এবং এখনও হচ্ছে। পরিবর্তন প্রাণের ধর্ম—জীবনেরই ধর্ম: যা গতিশীল তার প্রতিটি পদক্ষেপই একটা পরিবর্তনের মধ্যে দিয়ে নতুনকে অঙ্গীকার করে নেওয়ার ব্রত। এই নিয়মের ব্যত্যয় বাংলা মঞ্চ জগতের গতি পথে কাম্যও নয় প্রত্যাশিতও নয়। কিন্তু তার উৎস মুখের সব চিহ্নই লুপ্ত প্রায়, এমন মনে করারও কোন কারণ দেখিনা। অলঙ্কারশাস্ত্রের ত্রিবিধ রঙ্গালয় এ কালে অবান্তর ঠিকই, তবু মঞ্চ নির্মাণের খুঁটিনাটি বিধি ব্যবস্থার অনেকটাই আজও বিদ্যমান। নেপথ্যগৃহ, মূল মঞ্চের সম্মুখ, মধ্য ও পশ্চাৎ বিভাগ, দর্শকের আসন সজ্জা, রঙ্গগৃহের ছাদের আকৃতি প্রভৃতিতে কাঠামোগত বৈজ্ঞানিক পদ্ধতির বিশেষ কোন হেরফের ঘটেনি। অভিনয় রীতিতেও অলঙ্কার-শাস্ত্রের বিধি-বিধান একই ভাবে কার্যকর আছে। আসলে পাশ্চাত্ত্য শিক্ষাভিমানের উৎকট আতিশয্যে দেশীয় ঐতিহ্যকে অস্বীকার করবার যে উন্নাসিকতা সর্বত্র বিদ্যমান এ ক্ষেত্রেও তার কোন ব্যতিক্রম ঘটেনি।[২৭]

যুগক্রান্তি পর্বে কলকাতার নাট্যশালা

প্রদীপ জ্বালবার আগে সলতে পাকানোর একটা অধ্যায় থাকে, আরম্ভেরও থাকে একটা পূর্ব সূচনা; সে অধ্যায় কালের ব্যবধানে কখন অস্পষ্ট, ধূসর—কখন বা বিস্মৃতির অন্ধকারে হারিয়ে যাওয়া বিস্মরণের ইতিহাস। ভাগ্যের কথা, নাট্যশালার দোর গোড়ায় বাংলা নাটকের ছাড়পত্রের সেই পরম লগ্নটি স্মরণের আবরণে সযত্নে রক্ষিত হয়েছে অমূল্য সম্পদের মতই। সংগীত প্রেমিক সুর-সাধক ভবঘুরে এক রুশ যুবকের সামান্য একটি ইচ্ছা, প্রস্তুত করেছে বাংলা নাটকাভিনয়ের ক্ষেত্রভূমি—সেও মৌলিক বাংলা নাটক দিয়ে নয়, দুটি বিদেশী নাটকের অনুবাদ দিয়ে।[২৮] হেরাসিম স্টেপানোভিচ্ লেবেডেফের 'বেঙ্গলী থিয়েটার' (১৭৯৫) প্রতিষ্ঠার পথ ধরে যে আলোক বর্তিকা সেদিন প্রজ্জ্বলিত হয়েছিল, বাংলা নাটক ও নাট্যশালার ইতিহাসে তা চিরস্থায়ী রূপ পরিগ্রহ করে আলোক

---

[২৭] ব্যক্তিগত জীবনে দীর্ঘকাল মঞ্চাভিনয়ে যুক্ত থাকার সুবাদে যে অভিজ্ঞতা লাভ করেছি, সেই অভিজ্ঞতা থেকেই বলতে পারি, আধুনিক মঞ্চ ব্যবস্থায় বৈজ্ঞানিক ও কারিগরী কলাকৌশলের প্রয়োগ ইদানিং যথেষ্ট বৃদ্ধি পেলেও মূল কাঠামোর কোন পরিবর্তন ঘটেনি। নাটকের বক্তব্যকে তুলে ধরার জন্যে বিজ্ঞানকে নানাভাবে কাজে লাগানো হয় মাত্র। আবার নাটকে যিনি অভিনয় করেন, জেনে হোক, না জেনে হোক, অলঙ্কারশাস্ত্র নির্দেশিত চতুর্বিধ (আঙ্গিক, বাচিক, আহার্য এবং সাত্বিক) অভিনয় রীতি তাঁকে মেনে চলতেই হয়। যে কোন সচেতন অভিনেতা অভিনেত্রী সেটি করে থাকেন।

[২৮] 'Disguise' এবং 'Love is the Best Doctor'।

বিকিরণ করে চলেছে। ১৮৭২ এ 'বাগবাজার এমেচার থিয়েটারের' নির্মোক থেকে 'ন্যাশানাল থিয়েটার'র আত্মপ্রকাশ সেই ধারারই গৌরবোজ্জ্বল সংযোজন এবং পরবর্তীকালের নাট্যশালায় গণ সংযুক্তির অগ্রদূত এবং তা অদ্যাবধি প্রবাহিত।

কিন্তু নাট্যশালার এই সুদীর্ঘ কাল ব্যাপি ভাগ্যাকাশে ভাগ্যদেবীর প্রসন্ন রৌদ্রকিরণ সকল সময় বর্ষিত হয়নি: মাঝে মাঝেই দুর্যোগের ঘনঘটা কৃষ্ণপক্ষ ছায়া বিস্তার করে তার স্থায়িত্ব তথা অস্তিত্বকে বিপন্ন করে তুলেছে। রাজনৈতিক অস্থিরতা, অর্থনৈতিক অনিশ্চয়তা, কখন কখন মতানৈক্য জনিত কারণে তার গতিপথ হয় রুদ্ধ হয়ে পড়েছে নতুবা জটিল থেকে জটিলতর হয়ে উঠেছে। বিশেষতঃ দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের ক্রান্তিলগ্নে কলকাতার পেশাদারী নাট্যশালাগুলিকে প্রতি মুহূর্তে প্রতিকূল অবস্থার সম্মুখীন হতে হয়েছে। জাপানী বোমার সম্ভাব্য আক্রমণ আশঙ্কা, দুর্ভিক্ষ, মন্বন্তর, স্বাধীনতা আন্দোলন, দেশ বিভাগ, উদ্বাস্তু সমস্যা এবং প্রাকৃতিক বিপর্যয়ে অনাহার ক্লিষ্ট কলকাতা পরিণত হয়েছিল এক মহাশ্মশানে। এর সঙ্গে যুক্ত হয়েছিল সামাজিক অবজ্ঞা ও উন্নাসিকতা। সেকালে ভদ্র সমাজে থিয়েটার সম্পর্কে বিরূপ মানসিকতাই অতিমাত্রায় জাগরিত ছিল। সৌখীন 'বাবু' সম্প্রদায়ের অলস অবসর বিনোদনের অন্যতম অবলম্বন রূপে চিহ্নিত হয়েছিল নাটক।[১১] সেই কারণে নাট্যজগতের সঙ্গে যে কোন রকম সংশ্রব সমাজে নিন্দনীয় ছিল। প্রসঙ্গত বলতে পারি গিরিশচন্দ্রের মত প্রতিভাবান নাট্যকারও 'নেটো গিরিশ' অভিধায় ভূষিত হয়েছিলেন তাঁর সমকালে। কাজেই অবস্থাটা অনুমান করে নেওয়া খুব একটা কঠিন নয়। তথাকথিত ভদ্র সমাজে অপাংক্তেয় এক শ্রেণীর সৌখীন নাট্যামোদী সম্প্রদায়, প্রয়োজনে সর্বস্ব পণ করে এগিয়ে না এলে নাট্যাভিনয়ের ধারাটি হয়ত এতদিনে লুপ্ত হয়ে যেত। দেনার দায়ে অনেক সময় বন্ধ হয়ে গেছে থিয়েটারের দরজা কিংবা বারংবার হাত বদল ঘটেছে মালিকানার: উপরন্তু 'অভিনয় নিয়ন্ত্রণ আইনের' (১৮৭৬) কঠোর রজ্জুপাশ এই গতিপথকে করে তুলেছে আরও সংশয় সঙ্কুল। চলচ্চিত্র শিল্পের ব্যাপক প্রসারও মঞ্চাভিনয়ের পথে নানাভাবে অন্তরায় সৃষ্টি করেছিল।[১২] তবু এই বিরুদ্ধ পরিবেশে আর্থিক ক্ষয়ক্ষতি এবং সমাজ-নিন্দাকে পাথেয় করে এ কালের নাট্যশালাগুলি, নাট্যামোদী দর্শকের কথা স্মরণে রেখে নিত্য নতুন নাটকের অভিনয় ধারাকে অব্যাহত রাখতে সচেষ্ট হয়েছিল---এইখানেই তাদের কৃতিত্ব। নিম্নে এই পর্বের নাট্যশালাগুলির সার্বিক চিত্র গ্রহণের চেষ্টা করা যেতে পারে।

---

[১১] বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় "লোকরহস্য" গ্রন্থের 'বাবু' নিবন্ধে বলেছেন--"যাঁহার ইষ্টদেবতা ইংরাজ, গুরু ব্রাহ্মধর্মবেত্তা, বেদ দেশী সম্বাদপত্র এবং তীর্থ ন্যাশানেল থিয়েটার', তিনিই বাবু।" থিয়েটার সম্পর্কে প্রচ্ছন্ন বিদ্রূপটি লক্ষণীয়। আমাদের সমাজে এই মনোভাবের পরিবর্তন ঘটতে যথেষ্ট সময় লেগেছে।

[১২] মন্মথ রায়ের মত নাট্যকারও চলচ্চিত্রে উৎসাহিত হয়ে ১৯৩৮ (মীরকাশিম) থেকে ১৯৫২ (মহাভারতী) পর্যন্ত কোন নাটক লেখেননি বা নাট্যজগতের সঙ্গে কোন সম্পর্ক রাখেননি। মৃত্যুর অল্প কিছুদিন আগে একটি একান্ত সাক্ষাৎকারে তিনি আমাকে জানান যে, ঐ সময় তিনি সিনেমায় উৎসাহিত হয়ে বোম্বাই প্রবাসী হয়েছিলেন।

॥ স্টার ॥

কালের দিক থেকে দীর্ঘ ঐতিহ্যবাহী স্টার থিয়েটারের উদ্ভবের সঙ্গে যাঁর নাম অঙ্গাঙ্গী ভাবে যুক্ত, তিনি অভিনয় জগতের প্রবাদময়ী অভিনেত্রী, গিরিশচন্দ্রের অবিস্মরণীয় সৃষ্টি নটী বিনোদিনী। তীব্র মতানৈক্যের ফলে গিরিশচন্দ্র তাঁর কয়েকজন অনুগামীদের নিয়ে 'ন্যাশানাল থিয়েটারের' সঙ্গে সমস্ত সম্পর্ক ছিন্ন করে নতুন একটি নাট্যশালার অনুসন্ধান করতে থাকেন। এমন সময় হাতে চাঁদ পাবার মতই সুযোগ মিলে যায় অযাচিত ভাবে। গুর্মুখ রায় মুসাদ্দী নামে এক ধনী অবাঙালী যুবক, বিনোদিনীর রূপমুগ্ধ ছিলেন এবং প্রধানত বিনোদিনীর আকর্ষণে 'ন্যাশনালের' অভিনয় দেখতে যেতেন। গুর্মুখ রায় প্রস্তাব দেন, বিনোদিনীকে সঙ্গিনী হিসাবে পেলে নতুন একটি থিয়েটার নির্মাণের ব্যয়ভার বহন করতে তিনি প্রস্তুত আছেন। অন্যদিকে বিনোদিনীও স্বপ্ন দেখতেন এমন একটি রঙ্গালয়ের, যেখানে তিনি আরও স্বাধীনভাবে, আরও নিষ্ঠার সঙ্গে অভিনয়ে আত্ম নিয়োগ করতে পারবেন। তবুও গুর্মুখ রায়ের প্রস্তাব গ্রহণে তাঁর খুব একটা সম্মতি ছিল না। কিন্তু শেষ পর্যন্ত প্রধানত গিরিশচন্দ্রের অনুরোধে তিনি গুর্মুখের প্রস্তাবে সম্মত হন।[১১]

গুর্মুখ রায় বাগবাজারের কীর্তি চন্দ্র মিত্রের কাছ থেকে ৬৮ নং বিডন স্ট্রীটে থিয়েটার নির্মাণের জন্যে একটি জমি লীজ নেন। সেই জমির ওপরেই গড়ে ওঠে কলকাতার তৃতীয় সাধারণ নাট্যশালা গুর্মুখ রায় মুসাদ্দীর থিয়েটার ভবন। গুর্মুখের ইচ্ছা ছিল বিনোদিনীর নামানুসারে থিয়েটারের নাম হবে বিনোদিনী থিয়েটার, সংক্ষেপে বি থিয়েটার। এ ব্যাপারে বিনোদিনীর আকাঙ্ক্ষা ছিল সব থেকে বেশি। কিন্তু থিয়েটারের অন্যান্য কর্মীদের প্রবল আপত্তিতে শেষ পর্যন্ত সর্বসম্মতিক্রমে পরিবর্তিত নাম স্থির হয় 'স্টার থিয়েটার'। এই প্রসঙ্গে মর্মাহত বিনোদিনীকে গিরিশচন্দ্র বলেছিলেন যে, বিনোদিনীর নাম ইট-কাঠ লোহার মধ্যে বেঁচে থাকবে না, তাঁর নাম অমর হয়ে থাকবে মানুষের হৃদয়ে কালজয়ী অভিনেত্রী রূপে। গিরিশচন্দ্রের সেই ভবিষ্যদ্বাণী অক্ষরে অক্ষরে সত্য বলে প্রমাণিত হয়েছে।

'স্টারের' ইতিহাস যেমন বিচিত্র, তেমনি চমকপ্রদ; অনেক ভাঙ্গা গড়ার মধ্যে দিয়ে যুদ্ধকালীন ক্রান্তিলগ্নে তার পদার্পণ। সেই বিবর্তনের রূপ রেখাটি এখানে সংক্ষেপে স্মরণ করা আবশ্যক। গিরিশচন্দ্রের পৌরাণিক নাটক 'দক্ষযজ্ঞ'-র অভিনয় দিয়ে ২১শে জুলাই ১৮৮৩ তারিখে 'স্টার' থিয়েটারের দারোদ্ঘাটন হয় 'মিনার্ভা' প্রতিষ্ঠার ঠিক দশ বছর আগে। কিন্তু দ্বিতীয় নাটক অভিনয়ের পরই গুর্মুখ রায়কে এত সাধের 'স্টার

---

[১১] বিনোদিনী তাঁর আত্মজীবনীতে লিখেছেন - "অভিনেতারা আমাকে অতিশয় জেদের সহিত অনুরোধ করিতে লাগিলেন...। থিয়েটার করিতে আমার অনিচ্ছা ছিল না। তবে একজনের আশ্রয় ত্যাগ করিয়া অন্যায় রূপে আর একজনের আশ্রয় গ্রহণ করিতে আমার প্রবৃত্তি বাধা দিতে লাগিল। এদিকে থিয়েটারের বন্ধুগণের কাতর অনুরোধ। আমি উভয় সঙ্কটে পড়িলাম। সংকল্প দৃঢ় হইল, গুর্মুখ রায়কে অবলম্বন করিয়া থিয়েটার করিলাম।"

থিয়েটার' থেকে বিদায় নিতে হয়। ঐ বছরের শেষ দিকে অমৃতলাল মিত্র, অমৃতলাল বসু এবং দাসুচরণ নিয়োগী এগারোশো টাকায় 'স্টারের' স্বত্ব ক্রয় করেন। এই পর্বে 'স্টারে' অভিনীত নাটকের মধ্যে পৌরাণিক নাটকের সংখ্যাই বেশী।[১২] থিয়েটারের সুনাম যখন উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পেতে শুরু করেছে তখন একটি গোপন চক্রান্তের মুখোমুখি হতে হয় তাকে। গোপাল লাল শীল নামে একজন ধনবান ব্যক্তি গোপনে কীর্তিচন্দ্রের কাছ থেকে থিয়েটারের জমিটি কিনে নিয়ে থিয়েটার উচ্ছেদের নোটিশ দেন। পরিশেষে গিরিশচন্দ্রের প্রস্তাব মত গোপাল লাল 'স্টার' সম্প্রদায়কে তিরিশ হাজার টাকা দিয়ে নাট্যগৃহটি ক্রয় করেন। স্থির হয় 'স্টার' নামটি তিনি ব্যবহার করতে পারবেন না। গোপাল লাল নতুন নামকরণ করেন 'এমারেল্ড থিয়েটার'। ১৮৮৭ র ৩১শে জুলাই পুরাতন রঙ্গমঞ্চ থেকে বিদায় নিয়ে 'স্টার' সম্প্রদায় রণেন্দ্র কৃষ্ণ দেব এণ্ড ব্রাদার্সের কাছ থেকে সাতাশ হাজার টাকার বিনিময়ে ৭৬/৩ কর্ণওয়ালিশ স্ট্রীটে (বর্তমান বিধান সরণী) একটি জমি ক্রয় করে নতুন থিয়েটার ভবন নির্মাণ করেন। নতুন নাট্যগৃহ নির্মাণের অর্থ সংগৃহীত হয় সুকৌশলে; গোপাল লাল থিয়েটার চালাতে না পেরে গিরিশচন্দ্রের শরণাপন্ন হন এবং কুড়ি হাজার টাকা বোনাস ও মাসিক সাড়ে তিনশো টাকা মাইনে দিতে স্বীকৃত হন। গিরিশচন্দ্র দলের লোকজনের সঙ্গে পরামর্শ করে গোপাল লালের সঙ্গে পাঁচ বছরের জন্যে চুক্তিবদ্ধ হয়ে গোপাল লালের প্রদত্ত অর্থের ষোল হাজার টাকা 'স্টারের' গৃহ নির্মাণের জন্যে দান করেন। তবে চুক্তিবদ্ধ থাকায় এই সময় তিনি প্রকাশ্যে 'স্টারের' জন্যে কোন নাটকই লিখতে পারেন নি। অত্যন্ত গোপনে বাড়ির বাইরে ছদ্মবেশে তাঁকে 'স্টারের' জন্যে নাটক লিখতে হত। "সেবক" ছদ্মনামে গিরিশচন্দ্রের রচিত "নসিরাম" নাটকের অভিনয় দিয়ে ২৫শে মে ১৮৮৮ নতুন 'স্টারের' দ্বারোদ্ঘাটন হয়। কিন্তু অত্যন্ত দুর্ভাগ্যের বিষয়, 'স্টার' থিয়েটার প্রতিষ্ঠায় সর্বতোভাবে সাহায্য করেও অন্যায় অপবাদে ১৮৯১ এ গিরিশচন্দ্রকে সেখান থেকে বিদায় নিতে হয়। শারীরিক অসুস্থতায় তিনি নিয়মিত যোগাযোগ রাখতে পারতেন না বলে ভ্রান্ত ধারনার বশবর্তী হয়ে তাঁর অনুগামীরাই তাঁর বিরুদ্ধে জেহাদ ঘোষণা করেন। অভিনেতৃবর্গের কেউ কেউ তার প্রতিবাদে 'স্টারের' সঙ্গে সংশ্রব ছিন্ন করে 'বীনা থিয়েটারে' যোগ দিয়ে 'সিটি থিয়েটার' নাম নিয়ে অভিনয় করতে থাকেন।

গিরিশচন্দ্রের পর অমৃতলাল বসু ম্যানেজার নিযুক্ত হন এবং মাসিক একশো টাকা পারিশ্রমিকের বিনিময়ে নাটক রচনার দায়িত্ব গ্রহণ করেন নবাগত রাজকৃষ্ণ রায়। ১৮৯৬-এ গিরিশচন্দ্র পুনরায় 'স্টারে' যোগদান করেন। বিংশ শতাব্দীর প্রথম ভাগ থেকে একাধিক ব্যক্তি 'স্টারের' দায়িত্ব গ্রহণ করেছেন। কিন্তু তৎকালে 'স্টারের' আর্থিক অবস্থা বিশেষ

---

[১২] প্রসঙ্গত উল্লেখ করা যেতে পারে, ১৮৮৪-র ২১শে সেপ্টেম্বর যুগাবতার পরমহংস রামকৃষ্ণদেব 'স্টারে' 'চৈতন্যলীলা' নাটকের অভিনয় দেখে ভাব সমাধিতে মগ্ন হন। নাট্যকার গিরিশচন্দ্রকে এবং অভিনেতৃবর্গকে, বিশেষ করে বিনোদিনীকে দুর্লভ আশীর্বাদে ধন্য করেন তিনি।

অনুকূল ছিল না বলে, প্রায় কেউই শক্ত হাতে হাল ধরতে পারেননি। ১৯১১-তে অমরেন্দ্র নাথ দত্ত 'স্টার' থিয়েটার লীজ নেন। ১৯১৭ র সেপ্টেম্বরে লেসী নির্বাচিত হন অনঙ্গ মোহন হালদার নামে একজন বাঙালী খ্রীষ্টান ভদ্রলোক। এক বছরের মাথাতেই তিনি বিদায় গ্রহণ করেন এবং ১৯১৮তে তাঁর জায়গায় লেসী হয়ে আসেন গিরিমোহন মল্লিক; ১৯২০-তে ম্যানেজার অপরেশচন্দ্র মুখার্জী লেসীর দায়িত্ব গ্রহণ করেন। পরিশেষে ১৯২৩-এ কলকাতার বিশিষ্ট নাগরিকদের সহায়তায় কর্তৃপক্ষ 'আর্ট থিয়েটার লিমিটেড' নামে একটি যৌথ কমিটি গড়ে তোলেন। এই কমিটিতে ছিলেন —ন্যাশানাল ব্যাঙ্কের ম্যানেজার ভূপেন্দ্রনাথ ব্যানার্জী, সলিসিটর সতীশচন্দ্র সেন, প্রখ্যাত ব্যবসায়ী কুমার কৃষ্ণ মিত্র, সলিসিটর নির্মল চন্দ্র চন্দর, হরিদাস চ্যাটার্জী প্রমুখ। অপরেশচন্দ্র এই কমিটির ম্যানেজার নিযুক্ত হন এবং প্রবোধচন্দ্র গুহ সম্পাদকের দায়িত্ব গ্রহণ করেন। 'আর্ট থিয়েটার লিমিটেড' নতুন উদ্যমে স্টারের হৃত গৌরব পুনরুদ্ধারে সচেষ্ট হন এবং যথেষ্ট সাফল্যও লাভ করেন। এক সময় তারা (১৯২৭) যুগপৎ মনোমোহন মঞ্চেরও দায়িত্ব গ্রহণ করেন। কিন্তু ১৯৩৩ র মাঝামাঝি শেঠ সুখলাল করনানি থিয়েটারের বিরুদ্ধে মোকদ্দমায় কলকাতা হাইকোর্টের ডিক্রী লাভ করেন; ফলে 'আর্ট থিয়েটারের' বিলুপ্তি ঘটে। কান্তি চন্দ্র মুখার্জী রিসিভার নিযুক্ত হন। এরপর ১৯৩৪ এ শিশির কুমার ভাদুড়ী 'স্টার' মঞ্চ লীজ নিয়ে প্রথমে 'নাট্যমন্দির' (জানুয়ারী) এবং পরে 'নব নাট্যমন্দির' (জুলাই) নাম নিয়ে অভিনয় করতে থাকেন। ১৯৩৭-এ 'নব নাট্যমন্দিরের' বিলুপ্তি ঘটে।

'নব নাট্যমন্দিরের' বিলুপ্তির পর ১৯৩৭ র নভেম্বরে বিমল পালের তত্ত্বাবধানে পুনরায় 'স্টারের' অভিনয় শুরু হয়। পরের বছর ১৯৩৮ র ১২ই মার্চ শচীন্দ্রনাথ সেনগুপ্তের 'কালের দাবী' মঞ্চস্থ হবার পর বিমল পাল ক্ষমতা হস্তান্তর করেন 'মিনার্ভার' প্রযোজক উপেন্দ্র কুমার মিত্রের পুত্র সলিল কুমার মিত্রকে। সলিল কুমার পরবর্তী তেত্রিশ বছর 'স্টারের' সর্বাপেক্ষা যোগ্য ও সার্থক লেসী রূপে থিয়েটার পরিচালনা করেন। বঙ্গীয় নাট্যশালার ইতিহাসে কোন একটি রঙ্গমঞ্চে এত দীর্ঘকালের সুষ্ঠু পরিচালনার নজির আর নেই। 'স্টারের' সুনাম ও ঐতিহ্য রক্ষার পশ্চাতে সলিল কুমারের অবদান অস্বীকার করবার উপায় নেই। অত্যন্ত দক্ষতার সঙ্গে পারিপার্শ্বিক অবস্থা স্মরণে রেখে তিনি দর্শক সমাজকে অসাধারণ চৌম্বক শক্তিতে আকৃষ্ট করতে পেরেছিলেন। সলিল কুমারের নেতৃত্বে 'স্টারে' প্রথম নাটক অভিনীত হয় মহেন্দ্র গুপ্তের 'চক্রধারী', ১৯৩৮-র ৩রা জুন এবং শেষ নাটক অভিনীত হয় দেবনারায়ণ গুপ্তের 'সীমা' ১৮ই ফেব্রুয়ারী ১ [illegible]-এ। এই পর্বে 'স্টারে' নাট্যকার ও নাট্য নির্দেশক হিসাবে ছিলেন এ কালের অন্যতম খ্যাতনামা নাট্যকার মহেন্দ্র গুপ্ত।

'স্টার' থিয়েটার প্রথম থেকেই পৌরাণিক নাটকের অভিনয়কে প্রাধান্য দিয়েছে। তার কারণ, যে দুজন নাট্যকার 'স্টার' থিয়েটারের ইতিহাসে সর্বাধিক উল্লেখযোগ্য তাঁরা উভয়েই প্রধানত ভক্তিমূলক পৌরাণিক নাটকের প্রবর্তক; প্রথম জন স্বয়ং গিরিশচন্দ্র এবং দ্বিতীয়জন তাঁরই উত্তরসূরী মহেন্দ্র গুপ্ত। ১৯৩৯-এ 'স্টারে' অভিনীত নাটকের

সংখ্যা চারটি। প্রথমটি মহেন্দ্র গুপ্তের 'সোনার বাংলা', দ্বিতীয়টি ভূপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'দুর্গা শ্রীহরি', তৃতীয়টি ভোলানাথ কাব্যশাস্ত্রীর 'জাহ্নবী' এবং শেষটি সুধীন্দ্রনাথ রাহার 'জননী জন্মভূমি'। পরবর্তী দু'বছরেও 'স্টারে' দৃষ্টিভঙ্গি পরিবর্তনের তেমন কোন লক্ষণ দেখা যাচ্ছে না। প্রধানত মহেন্দ্র গুপ্তের পৌরাণিক নাটকগুলি ছিল তখন তার প্রধান আকর্ষণ। ১৯৪২ এ রাজনৈতিক প্রেক্ষাপট পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে স্বদেশ চেতনার প্রবল উন্মাদনা 'স্টারের' পরিচালক মণ্ডলীকেও দৃষ্টিভঙ্গি পরিবর্তনে কিছু পরিমাণে উদ্বুদ্ধ করেছে। তাই ১৯৪২ থেকে ১৯৪৫ পর্যন্ত সময় সীমার মধ্যে 'স্টারে' অভিনীত নাটকের অধিকাংশই 'ইতিহাস অবলম্বিত নাটক'। ইতিহাস অনুশীলনের মধ্যে দিয়ে স্বদেশ চেতনার ভাব প্রবাহে 'স্টারের' এই অন্তর্ভুক্তি যথেষ্ট তাৎপর্যপূর্ণ। সলিল কুমার মিত্রের মত লেসী, মহেন্দ্র গুপ্তের মত নাট্যকার ও অভিনয় শিক্ষক এবং সুদক্ষ অভিনেতৃবর্গের ত্রিশক্তি সমন্বয়ে 'স্টার' থিয়েটার সমকালীন নাট্যশালার ইতিহাসে গৌরবময় স্থান অধিকার করেছে।[১১]

॥ মিনার্ভা ॥

কলকাতার পেশাদারী নাট্যশালার বিবর্তন ধারায় সর্বাপেক্ষা দীর্ঘকালের ঐতিহ্য বহন করছে যে দুটি নাট্যশালা, তার প্রথমটি 'স্টার' এবং দ্বিতীয়টি 'মিনার্ভা থিয়েটার'। কলকাতা তথা বঙ্গদেশে প্রথম প্রাইভেট থিয়েটারের জনক, প্রসন্ন কুমার ঠাকুরের দৌহিত্র নাগেন্দ্র ভূষণ মুখোপাধ্যায় ১৮৯৩ সালে ৬নং বিডন স্ট্রীটে 'গ্রেট ন্যাশানালের' সমাধি ভূমির ওপরে প্রতিষ্ঠা করেন 'মিনার্ভা থিয়েটার'। মিনার্ভার উদ্বোধন ঘটে ঐ বছরের ২৪শে জানুয়ারী সেক্সপীয়রের 'ম্যাকবেথ' নাটকের গিরিশচন্দ্র কৃত বঙ্গানুবাদের মঞ্চায়ণ দিয়ে। উদ্ভব কাল থেকে চরম আর্থিক প্রতিকূলতা, মামলা মোকদ্দমা এবং বারংবার মালিকানা রদ-বদলের মধ্যে দিয়ে প্রায় তিরিশটি বছর অতিবাহিত করে 'মিনার্ভা'। অবশেষে ১৯২২-র ১৮ই অক্টোবর এক বিধ্বংসী অগ্নিকাণ্ডে থিয়েটার ভবন সম্পূর্ণ রূপে ভস্মীভূত হয়ে যায়। কিন্তু এই চরম দুর্দিনেও কর্তৃপক্ষ কলকাতায় বা কলকাতার বাইরে ভ্রাম্যমান নাট্য-সম্পদায় রূপে অস্তিত্ব বজায় রাখতে সক্ষম হয়েছিলেন। প্রায় তিন বছর পরে ১৯২৫-র ৮ই আগস্ট নব নির্মিত রঙ্গমঞ্চে 'মিনার্ভা সম্প্রদায়ের' পুনরাবির্ভাব ঘটে মহাতাপ চন্দ্র ঘোষের 'আত্মদর্শন' নাটক নিয়ে।

নটসূর্য অহীন্দ্র চৌধুরী ১৯৩০-এ 'স্টার' (আর্ট থিয়েটার) থিয়েটার পরিত্যাগ করে, 'মিনার্ভার' ম্যানেজার রূপে যোগদান করেন। ক্রমে তিনি 'মিনার্ভার' মুখ্য আকর্ষণ রূপে গণ্য হয়ে ওঠেন। কিন্তু সিনেমা শিল্পের ব্যাপক প্রসারে তখন বাংলা নাট্যাভিনয়ের জগতে কিছুটা অনিশ্চয়তা দেখা দিয়েছিল। এই নতুন তথা আকর্ষণীয় প্রমোদ উপকরণটির সঙ্গে সমান ভাবে পাল্লা দিতে গিয়ে 'মিনার্ভা' কর্তৃপক্ষ তাদের সর্বনিম্ন প্রবেশ মূল্য মাত্র চার আনায় নামিয়ে আনতে বাধ্য হন। তাতে দর্শক সংখ্যা কিছুটা বৃদ্ধি পেলেও দর্শকের

মান সেই পরিমাণে নিম্নগামী হয়ে পড়ে। সেই সব অতি সাধারণ দর্শকের না ছিল নাটক সম্পর্কে কোন সুস্পষ্ট ধারনা, না ছিল নাট্যরস পিপাসা চরিতাথ করণের মত মানসিক প্রস্তুতি। চলচ্চিত্রের বিকল্প প্রমোদ উপকরণ রূপেই নাটককে পেতে তাঁদের একটা বড় অংশ প্রত্যাশী ছিলেন। ফলে মঞ্চের ব্যবসায়িক সাফল্যের কথা চিন্তা করে সে সময়ের নাট্যশালাগুলিকে প্রয়োজনে অপেক্ষাকৃত নিম্নমানের নাটকও নির্বাচন করতে হয়েছে। কারণ, এই সাফল্য বা ব্যর্থতার ওপরে যেমন রঙ্গমঞ্চের স্থায়িত্ব নির্ভরশীল ছিল, তেমনি পৃষ্ঠপোষক ও অভিনেতৃবর্গের জীবিকা নির্বাহের দ্বিতীয় কোন পন্থা ছিল না - নাটক বা অভিনয় তখনও অফিস ফেরৎ নাট্যামোদীর অলস অবসর যাপনের বিনোদন-সামগ্রীতে পরিণত হয়নি। অভিনয় ছিল তাঁদের পেশা, নেশা এবং শিল্পী মানসের অনন্য আশ্রয়স্থল। প্রতি নাট্যশালাকেই সেদিন এই বাস্তব পরিস্থিতির সম্মুখীন হতে হয়েছিল। তাই শিল্পগুণ সম্পন্ন উৎকৃষ্ট নাটকের পাশাপাশি, দর্শককে ধরে রাখার তাগিদে সাধারণ মানের নাটক অভিনয়ের একটা ধারা সমান্তরাল গতিতে প্রবহমান দেখতে পাই। 'মিনার্ভা' থিয়েটারের ক্ষেত্রেও এই নিয়মের কোন ব্যতিক্রম ঘটেনি।

১৯৩৩ এ অহীন্দ্র চৌধুরী, কর্তৃপক্ষের সঙ্গে মত বিরোধের ফলে 'মিনার্ভা' ছেড়ে পুনরায় 'স্টারে' যোগদান করেন। অহীন্দ্র চৌধুরীর পর উপেন্দ্র কুমার মিত্র পরবর্তী পাঁচ বছর 'মিনার্ভার' কর্তৃত্বে থেকে অবশেষে ১৯৩৮ এ হেমেন্দ্র কুমার মজুমদারকে ক্ষমতা হস্তান্তর করেন। কিন্তু হেমেন্দ্র কুমার লীজ নিয়ে খুব শক্ত হাতে হাল ধরতে পারলেন না। পরের বছর ১৯৩৯ এ দিলওয়ার হোসেন এবং চণ্ডী বন্দ্যোপাধ্যায় 'মিনার্ভার' লেসী রূপে যোগদান করেন। কিন্তু বিগত কয়েক বছরে 'মিনার্ভা' নাট্য প্রয়োজনায় অথবা ব্যবসায়িক সাফল্য অর্জনে পুরোপুরি ব্যর্থই হয়েছে। নতুন লেসীদ্বয় সেই ব্যর্থতার দায় মাথায় নিয়ে হৃত গৌরব পুনরুদ্ধারের জন্যে আপ্রাণ চেষ্টা করেও শেষ পর্যন্ত বিশেষ কিছুই করে উঠতে পারলেন না। ততদিনে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের রণ দামামা প্রতিধ্বনিত হতে শুরু করেছে। তখন একক নেতৃত্বের পরিবর্তে চণ্ডী বন্দ্যোপাধ্যায় এবং দিলওয়ার হোসেন যৌথ সংস্থা গড়ে তোলার প্রয়োজনীয়তা অনুভব করেন। ১৯৪০ এ 'মিনার্ভা লিমিটেড কোম্পানী' গঠনের মধ্যে দিয়ে সেই প্রচেষ্টা বাস্তব রূপ লাভ করে। এই ভাবে 'মিনার্ভার' পরিচালক মণ্ডলীতে একটা নতুন উদ্যোগ লক্ষ্যণীয় হয়ে ওঠে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের ক্রান্তিলগ্নে। কোম্পানীর চেয়ারম্যান রূপে 'মিনার্ভায়' যোগদান করেন নরেশ চন্দ্র গুপ্ত; সাধারণ সদস্যবৃন্দের মধ্যে ছিলেন- দিলওয়ার হোসেন, চণ্ডী ব্যানার্জী, ধীরেন মুখার্জী প্রমুখ। কোম্পানী যুগ চেতনাকে স্বীকার করে নিয়ে 'পৌরাণিক' ও 'ঐতিহাসিক' নাটকের পরিবর্তে নতুন স্বাদের সমাজ সমস্যামূলক নাটককেই অগ্রাধিকার দিতে বিশেষ উদ্যোগ নিয়েছিলেন। এই জন্যেই দেখতে পাই, মোটামুটি ভাবে ১৯৪০-র শেষ থেকে 'মিনার্ভা'য় সামাজিক নাটকই অভিনীত হয়েছে। উল্লেখযোগ্য নাটকের মধ্যে আছে–ধীরেন মুখার্জীর 'জয়ন্তী' (অপেরা), বিধায়ক ভট্টাচার্যের 'কুহকিনী', জলধর চট্টোপাধ্যায়ের 'কবি কালিদাস' (জীবনী নাটক), 'হাউসফুল', বীরেন্দ্রকৃষ্ণ ভদ্রের 'ব্ল্যাক আউট', শচীন্দ্রনাথ সেনগুপ্তের

'সুপ্রিয়ার কীর্তি', গৌতম সেনের 'ডাক্তার' প্রভৃতি। মাঝে মাঝে অবশ্য দু-একটি পুরোনো 'পৌরাণিক' বা 'ঐতিহাসিক' নাটকও মঞ্চস্থ করতে হয়েছে. তবে সেগুলি নিছকই রুটিন মাফিক ব্যবস্থা।

১৯৪৪-এ 'নাট্যভারতীর' তৎকালীন লেসী মুরলীধর চট্টোপাধ্যায় থিয়েটার বন্ধ করে দিলে সেখানকার বেশ কয়েকজন খ্যাতনামা অভিনেতা-অভিনেত্রী 'মিনার্ভায়' যোগদান করেন। যুদ্ধকালীন সঙ্কট মুহূর্তে মনোরঞ্জন ভট্টাচার্য, ছবি বিশ্বাস, রবীন্দ্রমোহন রায়, নির্মলেন্দু লাহিড়ী, সরযূবালা, রাণীবালা প্রমুখ 'মিনার্ভাকে' আত্মশক্তি সঞ্চয়ে যথেষ্ট সাহায্য করেছিলেন। নিঃসন্দেহে 'মিনার্ভার' ইতিহাসে এই অন্তর্ভুক্তি অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ। কিন্তু বিগত কয়েক বছর ধরে বহু চেষ্টা করেও 'মিনার্ভা' তার অর্থনৈতিক প্রতিকূলতা কাটিয়ে উঠতে পারেনি। বিশেষ করে উপেন্দ্র কুমার মিত্র সংশ্রব ত্যাগ করার পর অবস্থার ক্রমশঃ অবনতি হতে তাকে। তাই সুযোগ্য অভিনেতা অভিনেত্রী এবং উৎকৃষ্ট নাটক হাতে পাওয়া সত্ত্বেও তার ভাগ্য মোটামুটি অপরিবর্তিতই থেকে যায়। শচীন্দ্রনাথ সেনগুপ্তের 'রাষ্ট্রবিপ্লব', 'ধাত্রীপান্না' বা তারাশঙ্করের 'দুই পুরুষের' মত একদা 'বক্স হিট' নাটক অভিনয় করেও শেষ পর্যন্ত নিরুপায় হয়ে ১৯৪৫ এ কর্তৃপক্ষ 'মিনার্ভার' দরজা বন্ধ করে দিতে বাধ্য হন।

॥ নাট্যনিকেতন ॥

১৯৩১ র মার্চ মাসে সেন্ট্রাল এভিনিউ (বর্তমান চিত্তরঞ্জন এভিনিউ) উত্তর প্রান্তে সম্প্রসারণের ফলে 'মনোমোহন থিয়েটার' কালের গর্ভে চিরকালের জন্যে লুপ্ত হয়ে যায়। 'মনোমোহন থিয়েটারের' শেষ লেসী, আর্ট থিয়েটারের জনক প্রবোধ চন্দ্র গুহ নতুন উদ্যম নিয়ে গড়ে তোলেন আর একটি নাট্যশালা---নাট্যনিকেতন। 'মনোমোহনে' শেষ অভিনয় তারিখ ১লা মার্চ, ১৯৩১ আর 'নাট্যনিকেতনের' আত্মপ্রকাশ ১৯৩১-র ১৪ই মার্চ। এত অল্প দিনের ব্যবধানে নতুন একটি নাট্যশালা গড়ে তুলতে যে কতখানি প্রচেষ্টা এবং মানসিক দৃঢ়তা প্রয়োজন, তা সহজেই অনুমেয়। 'নাট্যনিকেতন' নামটি সম্ভবত শিশিরকুমারের 'নাট্যমন্দির' নামটির প্রভাবজাত। 'স্টার' থিয়েটারের অনতিদূরে, ২/এ, রাজা রাজকিষেণ স্ট্রীটে, ইটের ভাটা বা তেলের মিলের জন্যে নির্ধারিত জমিতে 'মনোমোহনে' অভিনীত 'গৈরিক পতাকা' নাটকের নির্বাচিত অংশের অভিনয় দিয়ে শুভ উদ্বোধন ঘটে 'নাট্যনিকেতন' মঞ্চের। তবে 'নাট্যনিকেতনে' প্রথম পূর্ণাঙ্গ নাটকের অভিনয় হয় আরও দিন কয়েক পরে। ১৯৩১ র ২৩শে মার্চ, যতীন সিংহের উপন্যাসের নাট্যরূপ, হেমেন্দ্র কুমার রায়ের 'ধ্রুবব্রত' 'নাট্যনিকেতনের' প্রথম পূর্ণ পরিসরের নাটক।

১৯৩১ থেকে ১৯৩৫ পর্যন্ত 'নাট্যনিকেতনে' উল্লেখযোগ্য কোন পরিবর্তন ঘটেনি। এই ক'বছরে বেশ কয়েকটি মঞ্চ-সফল নাটকের অভিনয় হয় সেখানে। তন্মধ্যে মন্মথ রায়ের 'খনা' (১১ই জুলাই, ১৯৩৫) বিশেষ সমাদৃত হয়েছিল। কিন্তু ১৯৩৬-এ প্রবোধ চন্দ্র

গুহ 'নাট্যনিকেতনের' কর্তৃত্বভার পরিত্যাগ করেন; তাঁর জায়গায় নতুন ম্যানেজার নিযুক্ত হয়ে আসেন যশোদানন্দন ঘোষ। যশোদানন্দন ঘোষ 'ক্যালকাটা থিয়েটার্স লিমিটেড' নাম নিয়ে 'নাট্যনিকেতন' মঞ্চে প্রায় দু'বছর কাল অধিষ্ঠিত থেকে ১৯৩৮ র গোড়ার দিকে পুনরায় প্রবোধচন্দ্রকে থিয়েটারের দায়িত্ব অর্পণ করে বিদায় গ্রহণ করেন। প্রবোধচন্দ্র প্রত্যাবর্তন করে 'নাট্যনিকেতন' নামটির পুনঃপ্রবর্তন করেন এবং তারপরে 'নাট্যনিকেতনের' শেষ দিন পর্যন্ত তিনিই ছিলেন সেখানকার অবিসংবাদিত কর্ণধার।

প্রবোধচন্দ্র যুগের সঙ্গে তাল রেখে পুরোনো মঞ্চের কিছুটা সংস্কার সাধন করেন; কয়েকটি নতুন দৃশ্যপট নির্মাণ করানো হয়, প্রবেশ মূল্যও যৎসামান্য বৃদ্ধি করা হয়। বস্তুত পক্ষে প্রবোধচন্দ্রের প্রত্যাবর্তনে 'নাট্যনিকেতন' তার হৃত গৌরব পুনরুদ্ধার করতে সক্ষম হয়। তারই প্রমাণ আমরা পাই পরবর্তী দুটি নাটকের প্রযোজনায়। শচীন্দ্রনাথ সেনগুপ্তের 'সিরাজৌদ্দৌল্লা' নাটকের নাম ভূমিকায় নির্মলেন্দু লাহিড়ীর এবং উক্ত নাট্যকারের 'পথের দাবী' (শরৎ উপন্যাসের নাট্যরূপ) নাটকে নটসূর্য অহীন্দ্র চৌধুরীর অনবদ্য অভিনয় 'নাট্যনিকেতনের' ইতিহাসে স্মরণীয় হয়ে আছে। ১৯৩৯ এ 'পথের দাবীর' পর ঐ বছরের শেষভাগ থেকে 'নাট্যনিকেতন' মঞ্চে বেশ কয়েকটি সামাজিক নাটকের অভিনয় হয়। ১লা ডিসেম্বর শুভ উদ্বোধন ঘটে যোগেশচন্দ্র চৌধুরীর 'মহামায়ার চর' নাটকটির এবং ৩০শে ডিসেম্বর অভিনীত হয় সত্যেন্দ্র কৃষ্ণ গুপ্তের 'অগ্নিশিক্ষা'। কিন্তু এই দুটি নাটক বিশেষ ফলপ্রসূ হয়নি। তাছাড়া এই সময় 'নাট্যনিকেতনের' আর্থিক অবস্থাও বিশেষ অনুকূল ছিল না। ফলে নাট্যাভিনয় কিছুটা অনিয়মিত হয়ে পড়ে। এর পর 'নাট্যনিকেতনে' আবার অভিনয়ের সংবাদ পাওয়া যাচ্ছে পরের বছর অক্টোবরে। ১৯৪০ এ মাত্র দুটি নাটকের অভিনয়ের সংবাদ পাওয়া যাচ্ছে এখানে; অক্টোবরে অভিনীত হয় রমেশচন্দ্র গোস্বামীর 'বিদ্রোহী বাঙালী' এবং ডিসেম্বরে যোগেশ চন্দ্র চৌধুরীর 'পরিণীতা'। ১৯৪১-এও 'নাট্যনিকেতনের' ভাগ্য পরিবর্তনের কোন লক্ষণ দেখা গেল না। এপ্রিলে অভিনীত হল শচীন্দ্রনাথ সেনগুপ্তের আলোড়ন সৃষ্টিকারী নাটক 'ভারতবর্ষ' এবং জুলাই মাসে তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'কালিন্দী' উপন্যাসের নাট্যরূপ। কিন্তু ভাগ্যদেবী বোধ হয় 'নাট্যনিকেতনের' ওপরে সন্তুষ্ট ছিলেন না—তাই তার অন্তিম লগ্ন ঘনিয়ে এসেছিল অচিরেই।

'মনোমোহন থিয়েটারের' বিলুপ্তির পর প্রবোধচন্দ্র গুহ নতুন উদ্যমে যে নাট্যশালাটি বহু পরিশ্রমের বিনিময়ে প্রতিষ্ঠা করেছিলেন, তার স্থায়ীত্বকাল সুদীর্ঘ নয় ঠিকই, তবু এই স্বল্পকালের পথ পরিক্রমায় 'নাট্যনিকেতন' যথেষ্ট কৃতিত্ব অর্জন করেছে। সমসাময়িক সমাজ পরিবেশ সে কালের অনেক সম্ভাবনারই নির্দিষ্ট লক্ষ্য অর্জনে অন্তরায় সৃষ্টি করেছে; আর তাই শেষ পর্যন্ত ১৯৪১-র অক্টোবরে নব নির্মিত 'নাট্যনিকেতন' ও কালের গর্ভে চিরকালের জন্যে লীন হয়ে যায়। 'নাট্যনিকেতন' মঞ্চে আবির্ভাব ঘটে শিশির কুমার ভাদুড়ীর নেতৃত্বে নতুন একটি নাট্যশালার—'শ্রীরঙ্গম'—কিন্তু সে ইতিহাস এখন নয়।

॥ রঙমহল ॥

বৈচিত্র্যময় সামাজিক নাটককে অগ্রাধিক দিয়ে এবং Revolving Stage[৩৪] প্রবর্তন করে 'রঙমহল' বাংলা নাটক ও নাট্যশালার ইতিহাসে স্মরণীয় হয়ে আছে। 'রঙমহল'ই প্রথম সক্রিয়ভাবে গতানুগতিকতা ভঙ্গ করে পৌরাণিক বা ঐতিহাসিক নাটকের পরিবর্তে আধুনিক স্বাদের সামাজিক নাটক মঞ্চায়ণে নতুন যুগ সৃষ্টিতে প্রয়াসী হয়েছে। অন্যদিকে Revolving Stage বা ঘূর্ণায়মান মঞ্চ কৌশল প্রয়োগ করে বাংলা মঞ্চ জগতের জড়ত্ব মুক্তির পথিকৃৎ রূপে স্বীকৃতি লাভের যোগ্যতা অর্জন করেছে। ঘূর্ণায়মান মঞ্চ নিঃসন্দেহে আধুনিক মঞ্চ ব্যবস্থার প্রথম বলিষ্ঠ পদক্ষেপ। রঙমহল সম্পর্কে তাই অবশ্যই বলতে পারি : " Rungmahal was truly the city's first modern theatre It was the first theatre to practically do away with the old plays, discard the mythologicals and historicals, and concenrate on social plays of the new varity, as distinct from plays like Sarala, Prafulla or Balidan, and even different from those of Sarat Chandra The social dramas of Sachindranath Sengupta and Bidhayak Bhattacharya, Swami-Stri or Matir Ghar for example, struck a distinctly new note reflecting the swiftly changing society of the time "[৩৫]

১৯৩১ র মার্চ মাসে প্রতিষ্ঠিত হয় 'নাট্যনিকেতন' এবং তার মাস কয়েক পরে ৬৫/১ কর্ণওয়ালিশ স্ট্রীটে আত্মপ্রকাশ করে 'রঙমহল' থিয়েটার। শিশিরকুমার ভাদুড়ীর 'নাট্যমন্দিরের' দুই ঘনিষ্ঠ সহকর্মী অন্ধ সংগীত শিল্পী কৃষ্ণচন্দ্র দে এবং অভিনেতা রবি রায়ের যৌথ উদ্যোগে 'রঙমহল' থিয়েটারের উদ্ভব। তবে এই দুই উদ্যোক্তা একক নেতৃত্বের পরিবর্তে থিয়েটার পরিচালনায় সমবায় প্রচেষ্টাকে গুরুত্ব দিয়েছেন। ষষ্ঠী কুমার গাঙ্গুলী, নির্মল চন্দর চন্দ্র, হেমচন্দ্র দে, ডি.এন.ধর, এস আহমেদ, কৃষ্ণচন্দ্র দে, রবীন্দ্রমোহন রায় প্রমুখ সমাজের বিশিষ্ট ব্যক্তিদের নিয়ে গঠিত হয় একটি কার্য নির্বাহক কমিটি; কমিটির ম্যানেজিং ডিরেক্টর নিযুক্ত হন অমর ঘোষ এবং থিয়েটারের আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করেন অপরেশ চন্দ্র মুখার্জী। 'রঙমহল' কর্তৃপক্ষের দৃষ্টিভঙ্গির এই প্রসারতা অবশ্যই অভিনন্দনযোগ্য। ঠিক এই সময় মহাত্মা শিশিরকুমার এবং সতু সেন আমেরিকা থেকে প্রত্যাবর্তন করেন। শিশিরকুমার তাঁর দলের জন্যে একটি নাট্যশালার অনুসন্ধান করছেন খবর পেয়ে, 'রঙমহল' কর্তৃপক্ষ দশ হাজার টাকা বোনাস দিয়ে শিশির কুমারকে প্রধান অভিনেতা ও অভিনয় শিক্ষক রূপে নিয়ে আসেন। ঐ বছরের ৮ই আগস্ট যোগেশচন্দ্র চৌধুরীর 'শ্রীশ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া' নাটক দিয়ে 'রঙমহলের' আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন হয়। নিমাই চরিত্রে অবতীর্ণ হন মহাত্মা শিশিরকুমার।

---

[৩৪] রঙমহল থিয়েটারে যোগেশ চন্দ্র চৌধুরীর 'মহানিশা' নাটকে (অনুরূপা দেবীর উপন্যাসের নাট্যরূপ) ১৯৩৩-র ১৫ই এপ্রিল সর্বপ্রথম ঘূর্ণায়মান মঞ্চ প্রয়োগ করেন সদ্য আমেরিকা প্রত্যাগত সতু সেন। ঘূর্ণায়মান মঞ্চের প্রয়োগ বাংলা মঞ্চ জগতে বৈপ্লবিক পরিবর্তন এনে দিয়েছে।

[৩৫] The story of The Calcutta Theatres 1753-1980, Sushil Kumar Mukherjee, PP 242

কিন্তু শিশির কুমার কখনই অপরের দাসত্ব গ্রহণে প্রস্তুত ছিলেন না; ১৯৩২-র ফেব্রুয়ারী মাসে তিনি 'রঙমহল' পরিত্যাগ করেন এবং ১৯৩৪ এ 'স্টার থিয়েটার' ভাড়া নিয়ে প্রতিষ্ঠা করেন তাঁর স্বাধীন নাট্যশালা 'নব নাট্যমন্দির'। শিশিরকুমারের দলত্যাগ 'রঙমহলকে' যথেষ্ট অসুবিধায় ফেলেছিল; কয়েকটি সাধারণ নাটকের রুটিন মাফিক অভিনয় ছাড়া তেমন কোন আকর্ষণ সে তখন সৃষ্টি করতে পারেনি। পরিশেষে ১৯৩৩ র ১৫ই এপ্রিল নবনির্মিত ঘূর্ণায়মান মঞ্চে 'মহানিশা' নাটকের উপস্থাপনা 'রঙমহলকে' প্রথম চূড়ান্ত সাফল্য এনে দেয়। মঞ্চ ব্যবস্থার এই অকল্পনীয় অভিনবত্ব দর্শক সাধারণকে প্রবলভাবে আকর্ষণ করবে, তাতে আর আশ্চর্য কি ? এদিকে শিশির কুমারের দলত্যাগের পর থেকে রঙমহলের পরিচালক মণ্ডলীতে একের পর এক রদবদল ঘটতে থাকে। ১৯৩৩ এ শিশির মল্লিকের সঙ্গে যামিনী মিত্র এবং সতু সেন পরিচালন ভার গ্রহণ করেন। ১৯৩৫ এ শিশির মল্লিক অমর ঘোষকে কর্তৃত্ব অর্পণ করে 'রঙমহলের' নেপথ্য থেকে বিদায় নেন। কিন্তু এই ব্যবস্থাও স্থায়ী হয় না; ১৯৩৭ এ আবার যামিনী মিত্র, কৃষ্ণচন্দ্র দে ও রঘুনাথ মল্লিক থিয়েটারের নেপথ্য কর্ণধারের দায়িত্ব পান। ১৯৩৯ এ আবার যামিনী মিত্রের অধীনে ফিরে আসেন অমর ঘোষ এবং ম্যানেজার নিযুক্ত হন অভিনেতা প্রভাত সিংহ।

নতুন পরিচালক মণ্ডলী 'রঙমহলের' ঐতিহ্য অক্ষুণ্ণ রেখে বিধায়ক ভট্টাচার্য, অয়স্কান্ত বক্সী, আশুতোষ ভট্টাচার্য, যোগেশ চন্দ্র চৌধুরী প্রমুখ নাট্যকারের বেশ কিছু সামাজিক নাটক দর্শককে উপহার দিয়েছেন। তাঁদের কোন নাটকই চূড়ান্ত ভাবে ব্যর্থ হয়নি, বরং 'রঙমহলের' শ্রী ও সম্মান উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পেয়েছে। এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন, আগামী দিনের নাট্যজগতের অন্যতম পথিকৃৎ শম্ভু মিত্র বিধায়ক ভট্টাচার্যের 'মালা রায়' নাটকে সর্বপ্রথম সাধারণ রঙ্গমঞ্চে আত্মপ্রকাশ করেন। গৌর শী র 'ঘূর্ণি' এবং বিধায়ক ভট্টাচার্যের 'রত্নদীপ' নাটক দুটিতেও তিনি অসামান্য অভিনয় দ্বারা ভবিষ্যৎ নাট্যজগতে নিজের স্থান নিশ্চিত রূপে প্রতিষ্ঠা করতে সক্ষম হন। শম্ভু মিত্রের মত প্রতিভাবান অভিনেতাকে উপহার দেবার বিরল কৃতিত্ব নিঃসন্দেহে 'রঙমহলের' – যদিও শম্ভু মিত্রের সেখানে স্থায়িত্বকাল অতি সংক্ষিপ্ত।

'রত্নদীপ' অভিনয়ের পর কয়েক মাস 'রঙমহলে' আর কোন নাটক অভিনয়ের সংবাদ পাওয়া যায় না। ১৯৪১-এ মাত্র তিনটি নাটকের অভিনয় হয় সেখানে। এই সময় 'রঙমহলে' আবার দুর্ভাগ্য ঘনিয়ে আসে— আলোকসজ্জিত মঞ্চের নেপথ্যে যে নাটকের পৌনঃপুনিক অভিনয় বঙ্গ রঙ্গমঞ্চের গতিপথকে বারংবার শৃঙ্খলিত করেছে, 'রঙমহলের' নেপথ্যে আর একবার সেই পালাবদলের নাটক অভিনীত হয়ে গেল। ১৯৪২-এর ১লা জানুয়ারী অভিনেতা শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের হাতে ক্ষমতা হস্তান্তর করে 'রঙমহলের' নেপথ্য থেকে বিদায় নেন যামিনী মিত্র।

শরৎচন্দ্র যে সময় দায়িত্ব তুলে নিয়েছিলেন, শুধু 'রঙমহল' কেন সামগ্রিক ভাবে কলকাতার রঙ্গালয়ের জীবনে তার থেকে দুর্দিন বোধ হয় আর আসেনি। আগস্ট আন্দোলনের

গণবিক্ষোভ, কলকাতায় জাপানী বোমারু বিমান হানা, দুর্ভিক্ষ, বন্যা ও মন্বন্তরের অভিঘাতে কলকাতার জনজীবন বিপর্যস্ত, পঙ্গু হয়ে পড়েছিল। অর্থাৎ শিল্প সৃষ্টির পশ্চাতে বহুশ্রুত যে নান্দনিক পটভূমির অস্তিত্বে বিশ্বাসে আমরা চিরাভ্যস্ত উত্তর-চল্লিশের সামগ্রিক প্রেক্ষাপট সেই বিশ্বাসকেই নির্মূল করে দিয়েছিল। আকণ্ঠ পঙ্কে নিমজ্জিত এই অচলাবস্থা থেকে উত্তরণ ছিল প্রায় অসম্ভব। তবু প্রতিকূল পরিবেশেও শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় অত্যন্ত দক্ষতার সঙ্গে পরবর্তী প্রায় সাত বছর 'রঙমহলের' হাল ধরে রেখেছিলেন: 'জীবনী নাটক' থেকে 'লঘুনাট্য', 'উপন্যাসের নাট্যরূপ' থেকে 'সামাজিক নাটক' অভিনয়ে, বৈচিত্র্য সম্পাদনেও আয়োজনের কোন ত্রুটি ছিল না। ১৯৪৭-এ দেশ বিভাগের মধ্যে দিয়ে স্বাধীনতা লাভের প্রত্যক্ষ প্রভাবও দেখতে পাই স্বাধীনতা উত্তর 'রঙমহলের' নাট্য প্রযোজনায়। কিন্তু লেসীরূপে শরৎচন্দ্র সুযোগ্য হলেও পরিমিতি বোধের অভাবে ব্যয়বাহুল্যে বিপুল ঋণজালে জড়িয়ে পড়েন তিনি। শেষ পর্যন্ত আদালতের বিচারে দোষী সাব্যস্ত হয়ে 'রঙমহলের' নেপথ্য থেকে বিদায় নিতে হয় তাঁকে।

॥ নাট্যভারতী ॥

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ আনুষ্ঠানিক ভাবে শুরু হবার ঠিক একমাস পূর্বে উত্তর কলকাতায় আর একটি নাট্যশালার উদ্ভব ঘটে: 'নাট্যনিকেতনের' মত এর যাত্রাপথও মাত্র কয়েক বছরের মধ্যে সীমাবদ্ধ। প্রসঙ্গত আরও একটি বিষয়ের প্রতি এখানে আমরা দৃষ্টিপাত করতে পারি। ইতঃপূর্বে কলকাতার রঙ্গমঞ্চে 'ন্যাশালান', গ্রেট ন্যাশানাল' 'এমারেল্ড' প্রভৃতি ইংরেজি নামেরই প্রচলন দেখা গেছে। কিন্তু শিশির কুমার ভাদুড়ীর 'নাট্যমন্দির' পরভাষা তোষনের বিরুদ্ধে প্রথম বাঙালিয়ানার প্রবর্তক। উত্তরকালে 'নাট্যনিকেতনের' পর 'নাট্যভারতী' সশ্রদ্ধ স্বাদেশিকতার অন্যতম দৃষ্টান্ত। অবশ্য 'নাট্যভারতী' নামটিতে রবীন্দ্রনাথের 'বিশ্বভারতী' নামটির প্রত্যক্ষ প্রভাব আছে বলে মনে হয়।

'রঙমহলে' শচীন্দ্রনাথ সেনগুপ্তের 'তটিনীর বিচার' সাঁইত্রিশ রাত্রি (২০শে জানুয়ারী, ১৯৩৯) মঞ্চস্থ হবার পর আভ্যন্তরীণ সঙ্কটে 'রঙমহলের' দরজা কিছুকালের জন্যে বন্ধ হয়ে যায়। রঘুনাথ মল্লিক কয়েকজন অনুচর সহ 'রঙমহল' থেকে বের হয়ে এসে কলেজ স্ট্রীট মার্কেটের সন্নিকটে হ্যারিসন রোডে 'আলফ্রেড মঞ্চটি' (বর্তমান গ্রেস সিনেমা) ভাড়া নিয়ে প্রতিষ্ঠা করেন 'নাট্যভারতী'। চিরাচরিত থিয়েটার পাড়ার বাইরে রঘুনাথ মল্লিকের 'নাট্যভারতী' প্রথম নাট্যশালা। এই অঞ্চলটি তৎকালে অবাঙালী অধ্যুষিত এলাকা হিসাবে পরিচিত ছিল। সে দিক থেকে রঘুনাথ মল্লিক যথেষ্ট দুঃসাহসের পরিচয় দিয়েছেন, সন্দেহ নেই। তাছাড়া এমন একটি সময়ে তিনি নতুন থিয়েটারের কথা ভেবেছেন, যখন অবস্থা মোটেই অনুকূল ছিল না। কিন্তু 'নাট্যভারতীর' প্রায় অধিকাংশ নাটকই সগৌরবে উত্তীর্ণ হতে পেরেছে এইটিই বিস্ময়ের কথা।

'নাট্যভারতীর' দ্বারোদঘাটন হয় 'রঙমহলে' অভিনীত শচীন্দ্রনাথ সেনগুপ্তের দুটি পুরোনো নাটক দিয়ে: প্রথমে ৫ই আগস্ট ১৯৩৯, অভিনীত হয় 'আবুল হাসান' এবং

পরে 'তটিনীর বিচার'। তাদের প্রথম মৌলিক প্রয়াস বিদ্রোহী কবি কাজী নজরুল ইসলামের অপেরা 'মধুমালা' মঞ্চস্থ হয় ঐ বছরের ১৯শে অক্টোবর। ১৯৪১ র শেষ ভাগ পর্যন্ত 'নাট্যভারতী'-র অবস্থা পরিবর্তনের কোন উল্লেখযোগ্য তথ্য পাওয়া যায় না। এই সময়ের মধ্যে 'নাট্যভারতী' কোন নাটকেই চূড়ান্ত ভাবে ব্যর্থ হয়নি বরং তার সাফল্য ও জনপ্রিয়তা উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পেয়েছে। কিন্তু ১৯৪২ এ নতুন বছরের শুরুতে 'নাট্যভারতীর' সঙ্কটকাল ঘনিয়ে আসে: রঘুনাথ মল্লিক থিয়েটার চালাতে না পেরে তাঁর সত্ত্বাধিকার হস্তান্তর করেন মুরলীধর চট্টোপাধ্যায়কে। রঘুনাথ মল্লিকের সঙ্গে ছিলেন মনীন্দ্রনাথ দাস (নানুবাবু), বীরেন্দ্রকৃষ্ণ ভদ্র, রমেন্দ্রনাথ চ্যাটার্জী (দেবুবাবু) প্রমুখ মঞ্চ অভিজ্ঞ ব্যক্তিবর্গ। মুরলীধর চট্টোপাধ্যায় লেসী হবার পর ব্যবস্থাপনার দায়িত্ব পান শিশির মল্লিক। সেই সঙ্গে ছিলেন নরেশচন্দ্র মিত্র এবং সতু সেন। এই সময় 'নাট্যভারতী' মঞ্চ প্রয়োগে আরও কৃতিত্ব অর্জন করে কিন্তু আর্থিক সঙ্কটে পরিশেষে বছরের শেষে সাময়িকভাবে থিয়েটার বন্ধ হয়ে যায়।[৩৬]

তবুও শিশির মল্লিকের ব্যবস্থাপনায় 'নাট্যভারতী' ধীরে ধীরে এই সঙ্কট কাটিয়ে উঠতে আংশিক সফল হয়। আর্থিক সুরাহা বিশেষ সুবিধাজনক অবস্থায় না পৌঁছলেও পরবর্তী দু'বছরে যথেষ্ট দক্ষতার সঙ্গে এখানে বেশ কয়েকটি মঞ্চ সফল নাটকের অভিনয় দর্শনের সৌভাগ্য লাভ করেছিল দর্শক সাধারণ। কিন্তু আর্থিক বিপর্যয়ের কণ্টকাকীর্ণ পথ অতিক্রম করে 'নাট্যভারতী' অধিক দূর অগ্রসর হতে পারেনি। তৎকালীন রঙ্গমঞ্চের ইতিহাসের বহু ঘটিত ঘটনার আরও একবার পুনরাবৃত্তি ঘটে গেল 'নাট্যভারতীর' ভাগ্যচক্রে। ১৯৪৩-এ 'দেবদাস' অভিনয়ের সময় থেকেই অবস্থা মোটামুটি অনুভব করা যাচ্ছিল; তার পরেও ১৯৪৪-র জানুয়ারীতে 'নাট্যভারতী' শচীন্দ্রনাথ সেনগুপ্তের 'ধাত্রীপান্না' মঞ্চস্থ করে আত্মশক্তি পুনরুদ্ধারের অন্তিম চেষ্টা করেও পরাভব স্বীকার করে নিতে বাধ্য হয়। পরিশেষে লেসী মুরলীধর চট্টোপাধ্যায় থিয়েটার চালাতে সম্মত না হওয়ায় 'নাট্যভারতীর' অবলুপ্তি ঘটে।

॥ শ্রীরঙ্গম ॥

'নাট্যনিকেতনের' ভগ্নস্তূপের ওপরে শিশির কুমার ভাদুড়ীর 'শ্রীরঙ্গমের' আত্মপ্রকাশ ১৯৪১-র শেষার্ধে অপরিচিত এক নাট্যকারের আরও অপরিচিত একটি নাটক হাতে নিয়ে; ১৯৪১-র ২৮শে নভেম্বর তারাকুমার মুখার্জীর 'জীবনরঙ্গ' নাটকের আনুষ্ঠানিক অভিনয় দিয়ে কলকাতার রঙ্গমঞ্চের ইতিহাসে 'শ্রীরঙ্গম' তার নামটি সংযুক্ত করে এবং পরবর্তী চৌদ্দ বছর তার কালসীমা। শিশির কুমারের অকৃত্রিম নাট্যপ্রীতি জীবনের পড়ন্ত

[৩৬] 26th December 1942 "Amrita Bazar Patrika" য় 'নাট্যভারতী' এই মর্মে বিজ্ঞপ্তি জারি করে - "Existing conditions compel The Management to abandon the performance until further announcements "

বেলায় তাঁকে চতুর্থবার[৫৭] নতুন একটি নাট্যশালা প্রতিষ্ঠায় অনুপ্রাণিত করেছে। পারিপার্শ্বিক পরিস্থিতির প্রতিকূলতা সত্ত্বেও শিশিরকুমার এত বড় গুরুদায়িত্ব স্বেচ্ছায় কেন কাঁধে তুলে নিয়েছিলেন, তাঁর নিজের রচনা থেকেই তার সাক্ষ্য গ্রহণ করা যেতে পারে। 'শ্রীরঙ্গমে' নিত্য নতুন নাটক নিয়ে পরীক্ষা নিরীক্ষার হেতুটি উপলব্ধি করা সম্ভব হবে বলেই তাঁর রচনার অংশ বিশেষ এখানে উদ্ধার করছি। শিশিরকুমার লিখেছেন :

"The theatre is the centre of a nation's culture Drama is the supreme expression of art the most excellent among fine arts Drama is not complete unless it is acted Development of the theatre is a national necessity Whatever I have done, I have done to serve my motherland I wanted to serve the country and bring happiness to people through drama and the stage I wanted to set up a National Theatre, but did not succed "[৫৮]
তাই দেখতে পাই সামান্য পুঁজি সম্বল করে, ভাঙ্গা নাটকের দল নিয়ে ভগ্ন স্বাস্থ্যের এই মানুষটি কেবলমাত্র অমিত মনোবলে রাষ্ট্রীয় সঙ্কটের মুহূর্তেও নতুন একটি থিয়েটারের পরিকল্পনা করতে পেরেছিলেন।

'শ্রীরঙ্গমের' দ্বিতীয় প্রচেষ্টা অপর একজন অপরিচিত নাট্যকার নিতাই ভট্টাচার্যের 'উড়োচিঠি' মঞ্চস্থ হয় ১৯৪২ এ। তবে মঞ্চসফল হলেও, এই সমস্ত নাটকের অভিনয় শিশিরকুমারকে খুব একটা প্রতিষ্ঠা দিতে সক্ষম হয়নি। শ্রীরঙ্গমে প্রথম বড় ধরনের সাফল্য আসে নিতাই ভট্টাচার্যের 'মাইকেল'[৫৯] নাটকটি অভিনয়ে। নাটকটি বিশেষভাবে শিশির কুমারের অনবদ্য অভিনয় নৈপুণ্যের কথা স্মরণে রেখে নাট্যকার রচনা করেন। ১৯৪৩-র ২৩শে এপ্রিল 'মাইকেল' শ্রীরঙ্গম মঞ্চে মঞ্চস্থ হয় এবং নাম ভূমিকায় অবতীর্ণ হন মহাত্মা শিশিরকুমার। মাত্র কয়েক মাস পূর্বে 'রঙমহলে' মহেন্দ্র গুপ্তের 'মাইকেল মধুসূদন' নাটকে মাইকেলের ভূমিকায় অবতীর্ণ হতেন অপর এক শক্তিশালী অভিনেতা- তিনি নটসূর্য অহীন্দ্র চৌধুরী। কাজেই মাইকেল ছিল শিশির কুমারের কাছে একটা বড় ধরনের চ্যালেঞ্জ। দুঃখের বিষয় 'শ্রীরঙ্গমে' শিশির কুমারের সমতুল্য অভিনেতা অভিনেত্রী বড় একটা কেউ ছিলেন না; সাজ পোষাক, দৃশ্যপট প্রভৃতিরও যথেষ্ট ঘাটতি ছিল। তবু প্রধানত একক অভিনয়ের ওপরে নির্ভর করে শিশির কুমার 'মাইকেল' নাটকে অসাধারণ সাফল্য লাভ করেন। শুধুমাত্র ঐকান্তিক নিষ্ঠা মানুষের প্রচেষ্টাকে কতখানি সার্থক করে তোলে, 'শ্রীরঙ্গমের' 'মাইকেল' তার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত।

---

৫৭ মহাত্মা শিশির কুমারের প্রথম প্রচেষ্টা 'নাট্যমন্দির' (মনোমোহন, ১৯২৩), দ্বিতীয় 'নাট্যমন্দির লিমিটেড' (কর্ণওয়ালিশ, ১৯২৬) এবং তৃতীয় 'নবনাট্যমন্দির' (স্টার ১৯৩৪)। তবে শিশির কুমার সর্বাপেক্ষা সাফল্য অর্জন করেছেন জীবনের প্রায় শেষ সীমায় উপনীত হয়ে 'শ্রীরঙ্গম' প্রতিষ্ঠার মধ্যে দিয়ে।

৫৮ The Story of The Calcutta Theatres—S K Mukherjee, PP 280

৫৯ কেউ কেউ নাটকটি বনফুলের রচনা বলে ভুল করেছেন। কিন্তু বনফুলের কোন নাটকই সে কালের রঙ্গমঞ্চে অভিনীত হয়নি। এ সম্পর্কে বর্তমান গ্রন্থের অষ্টম অধ্যায়ে আলোচনা দ্রষ্টব্য।

ঐ বছরের শেষে নভেম্বর মাসে বিধায়ক ভট্টাচার্যের 'বিপ্রদাস' 'শ্রীরঙ্গমের' অন্যতম উল্লেখযোগ্য প্রযোজনা। স্বাস্থ্যের কারণে শিশির কুমার 'বিপ্রদাস' নাটকে সক্রিয়ভাবে অংশ গ্রহণ করতে পারেননি; শিশির কুমারের সহোদর বিশ্বনাথ ভাদুড়ী নাটকটির নির্দেশনায় ও অভিনয়ে অসাধারণ নৈপুণ্যের পরিচয় রাখেন। 'বিপ্রদাস' 'শ্রীরঙ্গমকে' যথেষ্ট আর্থিক সাফল্য এনে দিয়েছিল। পরপর কয়েকটি সিরিয়াস নাটক অভিনয়ের পর 'শ্রীরঙ্গম' বাঁক পরিবর্তন করে হাল্কা রসের লঘু নাট্যের দিকে। ১৯৪৪-এ মঞ্চস্থ হয় বিধায়ক ভট্টাচার্যের 'তাইতো' এবং মনোরঞ্জন ভট্টাচার্যের 'বন্দনার বিয়ে'। এ দুটি নাটকের কোনটিই খুব একটা ফলপ্রসূ হয়নি। সেদিক থেকে ঐ বছরের ডিসেম্বরে মঞ্চস্থ দেবনারায়ণ গুপ্তের 'বিন্দুর ছেলে' নাটকে শিশির কুমারের চমৎকার প্রয়োগ নৈপুণ্যের আর একবার পরিচয় মেলে। বহু পরিশ্রমে এবং অধ্যাবসায়ে অভিনেত্রী সাবিত্রীকে তিনি বিন্দু চরিত্রের উপযোগী করে গড়ে তোলেন। শরৎচন্দ্রের বিন্দু শিশির কুমারের সোনার কাঠির স্পর্শে যেন নতুন প্রাণরসে সঞ্জীবিত হয়ে ওঠে।

'শ্রীরঙ্গমের' সর্বশেষ উল্লেখযোগ্য প্রযোজনা ১৯৪৬ এ তুলসী লাহিড়ীর 'দুঃখীর ইমাম'। তারপর থেকে 'শ্রীরঙ্গমের' দরজা মাঝে মাঝেই বন্ধ থেকেছে। শারীরিক অসুস্থতা, দৃষ্টিশক্তির ক্ষীণতা, সর্বোপরি চরম অর্থনৈতিক সঙ্কটে শিশিরকুমারের মত ব্যক্তিত্বকেও পরাভব স্বীকার করতে হয়েছে। বড় সাধের 'শ্রীরঙ্গমকে' বাঁচিয়ে রাখার সর্বশেষ চেষ্টা করলেন শিশিরকুমার ১৯৫৩ তে সম্মিলিত অভিনয়ের আয়োজন করে। কিন্তু এত করেও দুর্ভাগ্যকে রোধ করা গেল না। ১৯৫৬ তে গিরিশচন্দ্রের 'প্রফুল্ল' নাটকে যোগেশের ভূমিকায় শেষ বারের জন্য শিশিরকুমারের কণ্ঠস্বর শোনা গেল-- 'আমার সাজানো বাগান শুকিয়ে গেল।' সত্যিই তাঁর সাজানো বাগান শুকিয়ে গেল। ২৪শে জানুয়ারী ১৯৫৬-তে 'শ্রীরঙ্গম' মঞ্চে যে যবনিকা নেমে এল, তা আর কোনদিনই উত্তোলিত হল না; যখন হল তখন তার অন্য রূপ, অন্য পরিচিতি- সে 'শ্রীরঙ্গম' নয়, সে 'বিশ্বরূপা'।

॥ কালিকা ॥

বঙ্গ রঙ্গমঞ্চের উত্থান-পতনের যে আবর্ত এতকাল উত্তর কলকাতার হাতিবাগান থেকে বিডন স্ট্রীট, চিৎপুরকে কেন্দ্র করে আবর্তিত হচ্ছিল, তা আরও সম্প্রসারিত হয়ে ক্রমে স্পর্শ করল দক্ষিণ কলকাতার প্রান্ত ভাগকেও। ১৯৪৪ র শেষ পর্বে যুগক্রান্তির বিক্ষুব্ধ মুহূর্তে দক্ষিণ কলকাতার নামও সংযুক্ত হল রঙ্গমঞ্চের প্রবহমান ধারায়। বৃটিশ-ভারতের সুদক্ষ পুলিশ অফিসার রাম চৌধুরী সম্পূর্ণ ব্যক্তিগত উদ্যোগে, ৫নং সদানন্দ রোডে দক্ষিণ কলকাতায় প্রতিষ্ঠা করেন প্রথম নাট্যশালা। অবশ্য ইতঃপূর্বে 'রসা থিয়েটার' (বর্তমান পূর্ণ সিনেমা) মাঝে মাঝে চলচ্চিত্রের পাশাপাশি দু' একটি নাটক মঞ্চায়নের ব্যবস্থা করেছে; কিন্তু সে ব্যবস্থা ছিল নিতান্ত সাময়িক। সেদিক থেকে রাম চৌধুরীর 'কালিকা থিয়েটার' দক্ষিণ কলকাতার স্থায়ী নাট্যশালার প্রথম পদক্ষেপ।

রাম চৌধুরী থিয়েটার সম্পর্কে উৎসাহী ছিলেন—অনেক সময় ছোট-খাটো চরিত্রে অভিনয় করে কিছুটা সুনামও অর্জন করেছেন। থিয়েটার সম্পর্কে যৎ-কিঞ্চিৎ ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা থাকার ফলে 'কালিকা থিয়েটারে' ঘূর্ণায়মান মঞ্চ থেকে শুরু করে আধুনিক ব্যবস্থার কোন ত্রুটিই তিনি রাখেননি। প্রথাগত থিয়েটার পাড়ার বাইরে দর্শকের দৃষ্টিকে নিবদ্ধ করতে হলে অথবা প্রতিষ্ঠা সম্পন্ন নাট্যশালাগুলির সঙ্গে প্রতিযোগিতায় টিকে থাকতে হলে আয়োজনে যে কোন ফাঁকি রাখলে চলবে না, এ কথা বুঝতে রাম চৌধুরীর মত দক্ষ পুলিশ অফিসারের বিলম্ব হয়নি।

১৯৪৪ র ১৫ই ডিসেম্বর 'কালিকা' থিয়েটারের আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করেন বাঙালীর জাতীয় ইতিহাসের খ্যাতনামা পুরুষ ডঃ শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়। তবে 'কালিকা' তার প্রথম নাটক মঞ্চস্থ করে তারও দিন কয়েক পরে—২২শে ডিসেম্বর তারিখে। 'কালিকা' তার যাত্রা শুরু করে কোন মৌলিক নাটক দিয়ে নয়; শরৎ উপন্যাসের নাট্যরূপ, বিধায়ক ভট্টাচার্যের 'বৈকুণ্ঠের উইল' 'কালিকা' র প্রথম প্রয়াস এবং প্রথম পদক্ষেপেই সে আশাতীত সাফল্য লাভ করে। সে তুলনায় পরবর্তী প্রযোজনা, ধীরেন্দ্র নারায়ণ রায়ের 'অচল প্রেম' বিশেষ সমাদৃত হয়নি। ফলে ১৯৪৫ এর ডিসেম্বরে কোন রকম ঝুঁকি না নিয়ে 'কালিকা' আবার শরৎচন্দ্রে প্রত্যাবর্তন করে তৃতীয় প্রযোজনায়; অভিনীত হয় 'মেজদিদি'।

'কালিকা' থিয়েটারের অস্তিত্ব ছিল মাত্র সাত বছর। এই সাত বছরের পথ-পরিক্রমায় সেখানে অভিনীত নাটকের সংখ্যা খুব বেশি নয়। তবে সংখ্যা বিচারে উল্লেখ্য না হলেও নাট্য নির্বাচন ও উপস্থাপনার ক্ষেত্রে 'কালিকা' সমকালীন জনচেতনাকে মূল্য দিতে চেষ্টা করেছে। 'সামাজিক' অথবা 'স্বদেশ চেতনামূলক' এবং কিছু অংশে 'জীবনী নাটক' ছিল 'কালিকার' মুখ্য আকর্ষণ। প্রসঙ্গত উল্লেখ করতে পারি, নটসূর্য অহীন্দ্র চৌধুরী তাঁর দলবল নিয়ে 'কালিকায়' কখনো কখনো অভিনয় করতেন বলে তাঁর আত্মজীবনীতে উল্লেখ করেছেন। এইভাবে 'কালিকা' যখন উত্তরোত্তর তার শ্রীবৃদ্ধির সোপানে উত্তীর্ণ হয়ে চলেছে, ঠিক সেই সময় এক অতর্কিত আঘাতে তার অপমৃত্যু ঘনিয়ে আসে। ১৯৫১ সালে কলকাতা কর্পোরেশনের সঙ্গে আইনগত বিবাদে 'কালিকা থিয়েটার' বন্ধ হয়ে যায়। রাম চৌধুরীর থিয়েটার ভবন পরিণত হয় সিনেমা হাউসে। কিন্তু রাম চৌধুরী এত সহজে হেরে যাবার পাত্র ছিলেন না। নতুন উদ্যমে তিনি ঐ সদানন্দ রোডেই ভারত-পাকিস্তান যুদ্ধে নিহত পুত্র তপন চৌধুরীর স্মৃতি রক্ষার্থে নির্মাণ শুরু করেন অপর একটি নাট্যশালার। দুর্ভাগ্যের বিষয় নির্মাণ কার্য সম্পূর্ণ হবার পূর্বেই তাঁর মৃত্যু ঘটে। তবে রাম চৌধুরী দেখে যেতে না পারলেও তাঁর পুত্রের স্মৃতি বিজরিত 'তপন থিয়েটার' আজও গর্বের সঙ্গে টিকে আছে।

॥ ইণ্ডিয়ান পিপলস্ থিয়েটার এসোসিয়েশন ॥

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধকালীন বাংলা নাটক ও নাট্যশালার গতিপ্রকৃতিতে 'ইণ্ডিয়ান পিপলস্ থিয়েটার এসোসিয়েশন' বা সংক্ষেপে 'I P T A'-র উদ্ভব একটা নতুন মাত্রা সংযোজিত

করেছে। ১৮৭২-এ যে উৎসাহ, উদ্দীপনা ও স্বাজাত্যবোধের প্রেরণা থেকে 'ন্যাশানাল থিয়েটারের' আত্মপ্রকাশ, তা-ই আরও সংহত, পরিবর্ধিত ও পরিমার্জিত রূপ পরিগ্রহ করে ১৯৪৩-র রাষ্ট্রীয় সন্ধিক্ষণে 'I P T A'-র জন্ম সম্ভব করেছে। নাটক আজ শুধু অবসর বিনোদনের উপকরণ নয়, সীমিত সংখ্যক শিক্ষাভিমানীর জন-চেতনার প্রকাশকও নয়—নাটক আজ সামগ্রিক জনগোষ্ঠীর প্রতিবাদের, প্রতিরোধের শ্রেষ্ঠ শৈল্পিক হাতিয়ার। বাংলা নাটকের এই পরিণতি শিল্প বিচারে কতদূর সমর্থনযোগ্য, কিম্বা এই পট পরিবর্তন উত্তরকালের নাট্যধারায় কতটা প্রভাব বিস্তার করেছে, আমরা যথা সময়ে তার আলোচনা করব; এখানে শুধু এইটুকু উল্লেখ করা প্রয়োজন যে ১৯৪৩-এ 'I P T A'-র প্রতিষ্ঠা এবং 'জবানবন্দী' ও 'নবান্ন' নাটকের অভিনয় বাংলা নাটকে নতুন দিগন্তের উন্মোচন করেছে-রবীন্দ্রনাথের পরে প্রথম সক্রিয় পথ নির্মিতির অকৃত্রিম প্রচেষ্টা দেখা গেছে 'I.P.T A'-র নাট্যচিন্তায়।

সাংস্কৃতিক জড়তা মুক্তির এই নান্দীপাঠ প্রথম শুরু হয়েছিল ইউরোপের মাটিতে। ক্রম বর্ধমান ফ্যাসীজমের বর্বর আক্রমণে বিপন্ন সংস্কৃতির উদ্ধারকল্পে রমাঁ রোঁলা, ম্যাক্সিম গোর্কী, আদ্রেজিঁদ, বারবুঁস, আলবার্ট আইনস্টাইন প্রমুখ গঠন করলেন- "International Association of Writers For The Defence of Culture Against Fascism"-- এই আন্তর্জাতিক সংস্কৃতি-মঞ্চের প্রধান উদ্দেশ্য ছিল বিশ্ব মানবগোষ্ঠীকে একটি সুসংহত পরিধিতে সমস্ত আক্রমণের বিরুদ্ধে প্রস্তুত করে তোলা। ভারতবর্ষেও সঙ্গে সঙ্গে তাকে আন্তরিক ভাবে স্বীকার করে নেওয়া হল। ১৯৩৬ এ সদ্য গঠিত 'প্রগতি লেখক সংঘের' পতাকা তলে মিলিত হলেন রাজনৈতিক ব্যক্তি থেকে শুরু করে বুদ্ধিজীবি পর্যন্ত সমাজের প্রায় সকল স্তরের মানুষ।

এদিকে বর্তমান শতাব্দীর তিরিশের দশক থেকে কলকাতার শিক্ষিত যুব সম্প্রদায়ের মধ্যে কমিউনিস্ট ভাবধারা ক্রমশঃ প্রতিষ্ঠা লাভ করতে থাকে। মার্কসীয় চিন্তায় লালিত ও পুষ্ট যুব সম্প্রদায় ফ্যাসিষ্ট আগ্রাসী নীতির বিরুদ্ধে জনমত গঠনের উদ্দেশ্যে ভারতীয় কমিউনিস্ট পার্টির ছাত্র ইউনিট রূপে সক্রিয় ভূমিকা গ্রহণ করে—গড়ে ওঠে ভারতীয় কমিউনিস্ট পার্টির যুবশাখা, 'স্টুডেন্টস ফেডারেশন অফ ইণ্ডিয়া'। সে কালের তরুণ শিল্পী, কবি ও লেখক গোষ্ঠীর একটা বড় অংশ সঙ্গত কারণেই এই ইউনিটের সঙ্গে প্রত্যক্ষ ভাবে যুক্ত ছিলেন। কর্মে ও কথায় সত্য আত্মীয়তা অর্জনের অদম্য অভিব্যক্তি প্রতিধ্বনিত করতে চাইলেন এঁরা সংগীত, শিল্প ও সাহিত্যে। এঁদেরই নেতৃত্বে ১৯৩৮-এ স্কটিশ চার্চ কলেজে সপ্তাহব্যাপী সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে অভাবনীয় সাফল্য দেখা গেল। এই সাফল্যে অনুপ্রাণিত হয়ে ১৯৪০-র মাঝামাঝি গণতান্ত্রিক লেখক-শিল্পী গোষ্ঠী প্রতিষ্ঠা করলেন 'ইয়ুথ কালচারাল ইনসটিটিউট' বা 'Y C I'। আন্তর্জাতিক সংস্কৃতি মঞ্চে আইনস্টাইন রমাঁ রোলাঁ, প্রমুখের নির্ভিক কণ্ঠে যে মাঙ্গলিক কিছু পূর্ব থেকে ধ্বনিত হচ্ছিল, এঁরা সেই নবযুগের সাংস্কৃতিক ঋকমন্ত্রেদীক্ষা গ্রহণ করলেন। প্রথমে এঁদের সদর দপ্তর ছিল মিশন রো, কেন্ট হাউসে, পরে তা স্থানান্তরিত হয় কমিউনিস্ট পার্টির হেডকোয়ার্টার ৪৬ নং

ধর্মতলা স্ট্রীটে (বর্তমান লেনিন সরণী)। উদ্যোক্তাদের মধ্যে ছিলেন—জলি কাউল, রেণু চক্রবর্তী, দেবব্রত বিশ্বাস, সুভাষ মুখোপাধ্যায়, জ্যোতিরিন্দ্র মৈত্র, চিন্মোহন সেহানবিশ, মোহিত ব্যানার্জী, সুনীল চ্যাটার্জী, বিজন ভট্টাচার্য ও শম্ভু মিত্র।

'Y C I' প্রথম দিকে 'Politicians', 'Take To Rowing', 'The Boy Grows up', 'In the Heart of China' প্রভৃতি কয়েকটি ইংরেজি নাটকের অভিনয় করে। কিন্তু ইংরেজি নাটকে সমস্যা দেখা গেল যে, বৃহত্তর জনগোষ্ঠীর কাছে তার আবেদন পৌঁছে দেওয়া সম্ভব হল না। তখন বাংলা নাটকের প্রয়োজন স্বীকৃত হল। কলেজ স্ট্রীটে Y M C A হলে 'Y C I' দুটি বাংলা নাটক মঞ্চস্থ করে- 'অঞ্জনগড়' এবং 'কেরাণী'। ঠিক এই সময় নাৎসী আগ্রাসনের বিরুদ্ধে সোভিয়েত রাশিয়ার যুদ্ধ ঘোষণায় ভারতীয় কমিউনিস্ট পার্টির নীতি নির্ধারণের প্রশ্নে বিতর্কিত অধ্যায়ের সূচনা করে। কিন্তু 'Y C I' তাদের আদর্শকে সামনে রেখে সংগ্রাম চালিয়ে যেতে দ্বিধা করেনি। ১৯৪৩ র মে মাসে ভারতীয় কমিউনিস্ট পার্টির নেতৃত্বে বোম্বাই শহরে 'গণতান্ত্রিক লেখক শিল্পী সংঘের' চতুর্থ বার্ষিক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হল। ঐ বছরের জুলাই মাসে সম্মেলনের প্রস্তাব অনুসারে এম.এম যোশীর সভাপতিত্বে প্রতিষ্ঠিত হল 'ইণ্ডিয়ান পিপলস থিয়েটার এসোসিয়েশন' বা 'I P T A'। কলকাতার 'Y C I' তখন 'I P T A' নামের অন্তরালে একটা সর্বভারতীয় পরিচিত লাভ করল।

'পিপলস থিয়েটার' কথাটির প্রবক্তা প্রগতিশীল সাংস্কৃতিক মঞ্চের অন্যতম পুরোধা রমাঁ রোলাঁ। রোলাঁ অনুভব করেছিলেন গতানুগতিক থিয়েটারের এক অদ্ভুত বিষণ্ণতা—যে থিয়েটার বহুকালাবধি মানুষকে কেবল ঘুম পাড়ানিয়া গানের মতই তন্দ্রাভিভূত করে রেখেছে। 'পিপলস্ থিয়েটার' সেই ভাবালুতার অচলায়তন ভেদ করে কঠোর জীবন সত্যের পথকে উন্মুক্ত করে দিতে চাইল মানুষের কাছে। এই আদর্শকে লক্ষ্য রেখেই গড়ে উঠল 'চীনা পিপলস থিয়েটার' এবং 'সোভিয়েত পিপলস্ থিয়েটার'; ক্রমে তা ভারতবর্ষের সচেতন শিল্পী মানসকে উদ্বুদ্ধ করে ভারতবর্ষের মাটিতে জন্ম দিল 'I P T A'-র। 'I P T A.' তাদের উদ্দেশ্য ও প্রকৃতি সম্পর্কে দ্বিধাহীন ভাষায় ব্যক্ত করেছে :

"To foster the development of the Theatre, music, dancing and other fine arts and literature in India, as an authentic expression of the social realities of our epoch and the inspirer of our people's efforts for the achievement of piece, democracy and cultural progress." [৪০]

উত্তরকালে- 'I P T A' আদর্শ ও প্রকৃতির ভিত্তিতে দ্বিধা বিভক্ত হয়ে পড়ে: 'পিপলস ড্রামা মুভমেন্ট' বা 'গণনাট্য আন্দোলন' মার্কসবাদের অনুসরণে শ্রেণী সংগ্রামকে মুখ্য উপজীব্য করে তোলে এবং 'নিউ ড্রামা মুভমেন্ট' বা 'নবনাট্য আন্দোলন' আঙ্গিক ও

---

৪০ I.P.T.A -র বুলেটিন দ্রষ্টব্য।

বিষয় বস্তুর পরীক্ষা-নিরীক্ষায় নতুন পথ সন্ধানে সচেষ্ট হয়। প্রথমটিকে বলতে পারি রাজনৈতিক থিয়েটার এবং দ্বিতীয়টিকে পরীক্ষামূলক থিয়েটার।

সাধারণ রঙ্গমঞ্চে 'IPTA'র আত্মপ্রকাশ ১৯৪৩ র একেবারে গোড়ার দিকে। ১৯৪৩ র মে মাসে 'নাট্যভারতী' তে বিজন ভট্টাচার্যের 'আগুন' এবং বিনয় ঘোষের 'ল্যাবরেটরি' নাটকের অভিনয় দিয়ে তার যাত্রা শুরু। পরের বছর ১৯৪৪-র ৩রা জানুয়ারী 'স্টার' রঙ্গমঞ্চে 'IPTA' মঞ্চস্থ করে মনোরঞ্জন ভট্টাচার্যের 'হোমিওপ্যাথি.' ৪ঠা জানুয়ারী বিজন ভট্টাচার্যের 'জবানবন্দী'. এবং বছরের শেষে ২৪শে অক্টোবর তারা 'শ্রীরঙ্গম' মঞ্চে মঞ্চস্থ করে বিজন ভট্টাচার্যের যুগান্তকারী নাটক 'নবান্ন'। 'IPTA'-র প্রযোজনা--বিশেষ করে 'নবান্ন'--বিষয়বস্তু ও আঙ্গিকে. প্রয়োগ নৈপুণ্য ও মঞ্চ ব্যবস্থায়. আলোক সম্পাতে ও আবহ সৃষ্টিতে এমন একটি স্বতন্ত্র রীতির প্রবর্তন করল যা বাংলা নাটককে সম্পূর্ণ নতুন খাতে প্রবাহিত করেছে। একক অভিনয় নির্ভরতা পুরোপুরি বর্জিত হয়ে. নাটকের বক্তব্য পরিস্ফুটনে সামগ্রিক অভিনয়ের উৎকর্ষতা বৃদ্ধির প্রয়োজন স্বীকৃত হল। নাটক খাঁটি অর্থে হয়ে উঠল বলিষ্ঠ 'টিম ওয়ার্ক'। পেশাদারী নাট্যশালার পাশাপাশি একটি অপেশাদারী গোষ্ঠী চেতনারও প্রকাশ দেখা গেল এই পর্বে এসে। উত্তরকালের নাট্য আন্দোলনের ধারায় এই সার্বিক গতি পরিবর্তন সুদূরপ্রসারী প্রভাব বিস্তার করেছে। শুধু কলকাতায় নয়---সমগ্র ভারতে 'IPTA'-র আঞ্চলিক শাখার বিস্তার গ্রুপ থিয়েটারে সামিল করেছে অসংখ্য অপেশাদারী নাট্যগোষ্ঠীকে।

দ্বিতীয় অধ্যায়

পালাবদলের ইঙ্গিত

ইতিহাসের পালাবদল যখন ঘটে, তখন ভেতরে ভেতরে তার আয়োজন পূর্ণ হতে থাকে বহু পূর্ব থেকে। অন্তঃসলিলা ফল্গুধারার মত নিঃশব্দে প্রবাহিত সেই পটক্ষেপের প্রস্তুতির পর্বটি। অর্থাৎ এ পরিবর্তন তাৎক্ষণিক নয়—কালের যাত্রার পথে, ঘাট থেকে ঘাটান্তরে অনুগমন দীর্ঘ বিবর্তনের পথ রেখায় অভিব্যক্ত। বিবর্তনের এই পথ-রেখা অনুসরণ করেই দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধকালীন বাংলা নাট্য-আন্দোলনের স্বরূপ উদঘাটিত করতে হবে; অন্যথায় তার মূল সূত্রগুলিকে খুঁজে পাওয়া যাবে না।

সংস্কৃতের বেড়ি-শৃঙ্খল মুক্ত বাংলা নাটককে বাঙালীর অঙ্গনে সাবলীল ছাড়পত্র দানের বিরল কৃতিত্ব নিঃসন্দেহে বাঙালীর প্রাণের কবি দত্তকুলোদ্ভব শ্রীমধুসূদনের। মধুসূদনের পর বাংলা নাটকের অনুবর্তন প্রধানত যে দুটি ধারায় দ্বিধা বিভক্ত হয়ে গঙ্গা-যমুনার মত মোহনার অভিমুখী—তার একটি রবীন্দ্র-প্রতিভার দুর্লভ স্পর্শে সঞ্জীবনী মন্ত্র লাভ করেছে; অন্যটি গিরিশচন্দ্র অমৃতলাল দ্বিজেন্দ্রলালের মধ্যে দিয়ে অবশেষে যুদ্ধকালীন ক্রান্তি-লগ্নে এসে পৌঁছেছে। রবীন্দ্রনাথের হাতে যে বাংলা নাটকে নতুন প্রাণ-সঞ্চার হয়েছে—এ কথা অকুণ্ঠ স্বীকার্য। তবু উত্তরকালের নাট্য-আন্দোলন রবীন্দ্রভাব-প্রবাহ থেকে যথেষ্ট দূরগামী। তার কারণ, সাধারণ রঙ্গালয়ের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের কোন রকম সংস্রব ছিল না; পেশাদারী নাট্যশালাগুলির ব্যবসায়িক সিদ্ধির প্রয়োজনেও তিনি নাটক লেখেন নি। সমকালীন সাধারণ দর্শক অপেক্ষা উত্তরকালের বিদগ্ধ পাঠকের প্রতি তাঁর অধিক লক্ষ্য। তাই তাঁর নাটকের দর্শক-সমাজ তখনো তৈরি হয়নি এবং উত্তরাধিকারী সৃষ্টিতেও অন্তরায় ঘটিয়েছে। তাছাড়া ঔপনিষদিক চেতনায় রবীন্দ্রনাথের লোকোত্তর প্রতিভা পূর্ণতাবাদের প্রবক্তা; খণ্ডসত্তা অপেক্ষা পরিপূর্ণের প্রতি তাঁর আস্থা। মহাযুদ্ধক্লান্ত হতাশা-যন্ত্রণা তাঁর সেই প্রত্যয়কে যেন আরও দৃঢ় করেছে। ফলে সমকালীন বস্তু জগতের ধ্বংসোন্মুখ চিত্রটি চূড়ান্ত সত্য হয়ে তাঁর নাটকে রূপ নিতে পারেনি। অথচ পুরোপুরি রঙ্গমঞ্চ-নির্ভর যুদ্ধকালীন বাংলা নাটকের প্রধান আশ্রয়স্থল হয়ে উঠতে চাইল সমকালীন জীবন যন্ত্রণায় বিভ্রান্ত মানুষ ও তার পরিজন। কাজেই রবীন্দ্র অনুসরণের পরিবর্তে বিকল্প কেন্দ্র সন্ধানের প্রয়োজন হয়ে পড়ল নিশ্চিত রূপে।

অন্যদিকে এই পট-বিক্ষেপের প্রাথমিক পূর্বাভাস দেখা গিয়েছিল স্বয়ং গিরিশচন্দ্রের মধ্যে। আর অমৃতলাল, দ্বিজেন্দ্রলাল থেকে মন্মথ রায় পর্যন্ত তারই অলক্ষ্য ভাঙ্গা-গড়ার কাজও অল্প-বিস্তর শুরু হয়ে গিয়েছিল। গিরিশচন্দ্রের প্রচেষ্টায় 'বাগবাজার এমেচার থিয়েটারের' নির্মোক থেকে 'ন্যাশানাল থিয়েটারের' আত্মপ্রকাশে (১৮৭২) বাংলা নাটক প্রথম দর্শকের দরবারে তার আর্জি নিয়ে উপস্থিত হবার সৌভাগ্য লাভ করল। রাজানুগ্রহের সৌখীন খাস-দরবার থেকে জনতার আম-দরবারে নাটকের এই অন্তর্ভুক্তি অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ; নাট্য-সাহিত্য ও তার প্রয়োগরীতির হর-গৌরী মিলনের উত্তরাধিকার নিয়েই পরবর্তীকালের বাংলা নাটকের জয়যাত্রা।

গিরিশচন্দ্র ভক্তিরসের উপাসক—পরমহংসদেবের উদার ধর্মনীতির আদর্শ তিনি সামনে পেয়েছিলেন। সেই কারণে অহৈতুকী ভক্তিরস তাঁর নাটকের মূল ভাবগ্রন্থি। এমন কি সমাজ-সমস্যামূলক নাটকের ক্ষেত্রেও ভক্তিভাব ও প্রাচীন আদর্শের প্রতি নাট্যকারের অতি-আনুগত্য গোপন থাকেনি—কোথাও কোথাও উৎকট ভাবেই প্রকাশিত। কিন্তু গিরিশচন্দ্রের ভক্তিভাবের উদ্দীপনার কেন্দ্রস্থল অবশ্যই বাংলার নাগরিক জীবন।[১] পাশ্চাত্ত্য প্রভাব পুষ্ট নব্যতন্ত্রের সংঘাত থেকে স্বাজাত্যবোধে উত্তরণে গিরিশচন্দ্র যে "great dramatist of a period"— তাতে কোন সন্দেহ নেই। স্বাজাত্যবোধের এই প্রেরণাই উত্তরকালে গিরিশচন্দ্রের প্রভাব কার্যকরী করেছে। গিরিশচন্দ্রের মত অমৃতলালও নাগরিক জীবনকে আশ্রয় হিসাবে বেছে নিয়েছেন। নবোদ্ভূত সামাজিক অসংগতির রূপায়ণে প্রতিপক্ষের বিরুদ্ধে তিনি ব্যঙ্গ-বিদ্রূপের তীক্ষ্ণ অস্ত্র শাণিয়ে তুলেছেন। অমৃতলালের কোন কোন প্রহসন গুণগত বিচারে উৎকৃষ্ট সন্দেহ নেই; তবু ক্ষেত্র সীমিত বলে পরবর্তী জীবন সঙ্কটের লগ্নে অমৃতলাল আদর্শ-স্থানীয় হয়ে উঠতে পারেননি। ক্ষীরোদপ্রসাদ প্রধানত গিরিশচন্দ্রের উত্তরসূরী—গিরিশচন্দ্র প্রবর্তিত ভক্তিভাবের অনুশীলনেই তিনি অনেক বেশি স্বাচ্ছন্দ্য অনুভব করেছেন। সেদিক থেকে বরং দ্বিজেন্দ্রলালের মধ্যে যুগ-যন্ত্রণার প্রকাশ অনেক ব্যাপক। দ্বিজেন্দ্রলাল ভক্তিরসের পরিবর্তে সমাজ ও ইতিহাসকে নাটকে অধিক পরিমাণে স্থান করে দিলেন। অর্থাৎ গিরিশচন্দ্র থেকে দ্বিজেন্দ্রলাল পর্যন্ত বাংলা নাটকে সচেতন ভাবে লক্ষ্যণীয় হয়ে উঠেছে বাংলার সামাজিক জীবন ও তার বহুবিধ সমস্যা; এই ভাব-চৈতন্য প্রধানত তিনটি বিন্দুতে প্রসারিত—তার এক প্রান্তে অবিমিশ্র ভক্তি ও সমাজ-সংস্কার, অন্য প্রান্তে ব্যঙ্গ ও প্রহসন এবং শেষ প্রান্তে স্বদেশ ও স্বজন। প্রথমটি গিরিশচন্দ্রের ও অংশতঃ ক্ষীরোদপ্রসাদের, দ্বিতীয়টি অমৃতলালের এবং শেষটি দ্বিজেন্দ্রলালের অধিকারভূমি। অবশ্যই এ হিসাব রবীন্দ্রনাথকে বাদ দিয়ে।

বাংলা নাটকের প্রাথমিক নির্মিতির আদর্শ এসেছিল সংস্কৃত নাটক ও যাত্রা থেকে। কালে তার ওপরে সংস্থাপিত ও সংপৃক্ত হয়েছে পাশ্চাত্ত্য নাটকের আঙ্গিক ও ভাবধারা।

---

[১] ডঃ আশুতোষ ভট্টাচার্য-"বাংলা নাট্য সাহিত্যের ইতিহাস" প্রথম খণ্ডে যথার্থই বলেছেন—"উনবিংশ শতাব্দীর শেষভাগের বাংলার নাগরিক সমাজই তাঁহার নাট্য সাহিত্যের ভিত্তি।" পৃ ৫৮১ দ্রষ্টব্য।

জনরুচির খাতিরেই বাংলা নাটকের, সংস্কৃত নাটক ও যাত্রার দ্বারা প্রভাবিত না হয়ে উপায় ছিল না- এবং নির্মম হলেও স্বীকার না করে উপায় নেই, দ্বিজেন্দ্রলাল পর্যন্ত বাংলা নাটকের এই সংস্কার-মুক্তিই ছিল প্রধান সমস্যা। কিন্তু অনতি-উত্তরকালে এই সমস্যা একটু একটু করে তিরোহিত হতে শুরু করেছিল প্রধানত দুটি কারণে: প্রথমতঃ প্রথম মহাযুদ্ধের ভাঙ্গা-গড়ায় কালের মাত্রার বিপর্যয়ে এবং দ্বিতীয়তঃ পাশ্চাত্ত্য-জগতের খোলা হাওয়ার অনুভূতির স্পর্শে। সূর্যোদয়ের প্রাক-মুহূর্তে যেমন উষার রক্তিম আভা তার আগমন বার্তা ঘোষণা করে তেমনি বাংলা নাটকের অঙ্গনেও সেই ব্রাহ্ম-মুহূর্তের স্পর্শ এসে লেগেছিল কিছু পরিমাণে।

পরবর্তী নাট্যধারা তাই একই সঙ্গে পুরাতনের অনুবর্তনপন্থী এবং নতুনত্বের সন্ধান প্রয়াসী। যে স্বাজাত্যবোধের অনুপ্রেরণা দ্বিজেন্দ্রলাল পর্যন্ত অতিমাত্রায় সক্রিয় এবং কি পৌরাণিক, কি ঐতিহাসিক, কি সমাজ-সমস্যামূলক নাটকে যে স্বাজাত্যবোধকে কেন্দ্র করে রোমান্সধর্মীতার উদ্ভব, এই পর্বে তা আরও বিশিষ্টতা লাভ করেছে স্বদেশী আন্দোলনের জোয়ারে। এক কথায় প্রথাগত রীতির ব্যত্যয় না ঘটিয়ে তাকে আরও সংহত ও পরিমার্জিত করে নেবার প্রয়াসই লক্ষ্যণীয় হয়ে উঠেছে। মন্মথ রায় থেকে শুরু করে প্রায় সকল নাট্যকারই চেতনে-অচেতনে তাকে স্বীকার করে নিয়েছেন। অথচ উত্তর-চল্লিশে উপনীত হয়ে এই সমস্ত নাট্যকারদের অনেকেই বিষয়ান্তরে মনোনিবেশ করেছেন। এরই পাশাপাশি নতুনতর ক্ষেত্র সন্ধানেও প্রবৃত্ত হতে চেয়েছেন কেউ কেউ। বিদেশী নাটকের বিশেষত ইংরেজি নাটকের ভাবানুসরণে কাহিনী গ্রহণের একটা প্রবণতাও তাই এই পর্বে লক্ষ্য করা যায়। বাংলা নাট্যজগতে অপরেশ চন্দ্রের আত্মপ্রকাশ এই রকম ইংরেজী নাটকের অনুবাদের বা অনুসরণের মধ্যে দিয়েই। কিন্তু বিদেশী ভাবধারাকে অঙ্গীকৃত করার মত মানসিক প্রস্তুতি বা প্রতিভার মহত্ব সকল সময় ছিল না বলেই শিল্প-রসোত্তীর্ণ সৃষ্টির পর্যায়ে পৌঁছাতে পারেনি অধিকাংশ প্রচেষ্টা। তবু অন্তত প্রাথমিক পথ-নির্দেশটুকুর জন্যে এই সমস্ত নাট্যকারদের কাছে উত্তরকালের ঋণ অবশ্য স্বীকার্য।[২] পাশ্চাত্ত্য সংস্কৃতির বিশিষ্ট চেতনাকে জাতীয় ভাবধারার অনুকূলে প্রবাহিত করার প্রাথমিক তাগিদ এই পর্বেই অঙ্কুড়িত হয়ে উঠেছিল এবং এইভাবেই আধুনিক বিশ্বনাট্যধারার সঙ্গে আত্মিক যোগাযোগ স্থাপনের একটা উদ্যোগ দেখা গিয়েছিল।

সর্বোপরি বাংলা নাটকে একক নেতৃত্বের অবসান ঘটল এই পর্বে এসে। এতকাল পর্যন্ত গিরিশচন্দ্র, ক্ষীরোদপ্রসাদ, দ্বিজেন্দ্রলাল প্রমুখ নাট্যকার বাংলা নাটকের বিভিন্ন পর্বে প্রায় অপ্রতিদ্বন্দ্বী নায়ক রূপে প্রতিষ্ঠা অর্জন করেছেন। বৃহৎ বনস্পতির মতই তাঁরা

---

[২] প্রসঙ্গত উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, আদি পর্ব থেকে প্রধানত ইংরেজি নাটকের অনুবাদ দিয়ে বাংলা নাটকের যাত্রা শুরু। বাংলা নাটকের অভাবে সেদিন ইংরেজি নাটক অনুবাদের দ্বারস্থ হতে হয়েছিল। কিন্তু আলোচ্য পর্বে বাংলা নাটকের উৎকর্ষ-বিধানে পাশ্চাত্ত্য ভাবধারার প্রতি দৃষ্টি আকৃষ্ট হয়েছিল। উভয়যুগের এই মৌলিক পার্থক্যটুকু লক্ষ্যণীয়।

তাঁদের যুগ প্রাঙ্গণকে আবৃত করে রেখেছিলেন। তারই ছায়ায় লালিত. পুষ্ট হয়েছেন অনেকে—কিন্তু মুক্ত আকাশের আলোর সন্ধানে বলিষ্ঠ শাখা-প্রশাখায় বিস্তার লাভ করেননি প্রায় কেউই। যুগ-নায়কত্বের সেই একতন্ত্রের পরিবর্তে এই পর্বে সমাজের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে অভিজ্ঞতার ফসল নিয়ে উঠে এলেন সমসাময়িক নাট্যকারবৃন্দ। যুগ ধর্মের বিচিত্র তরঙ্গসমূহ এমনই বহুমুখী আন্দোলনে আন্দোলিত হতে শুরু করেছিল যে. কোন একটি মাত্র ব্যক্তিকে আশ্রয় করে তার সম্যক প্রতিফলন বোধ হয় সম্ভব ছিল না। এইভাবে সমস্ত দিক দিয়ে আগামী দিনের একটা পূর্বাভাস সূচিত হয়ে উঠছিল যুগ-সঙ্কটের প্রাক্কালে।

আত্মপ্রস্তুতির এই লগ্নে নতুন মাত্রা সংযোজন করল দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সূচনা। জাতীয় জীবনের ভাবধারায় যে সমস্ত পরিবর্তন ও পরিবর্ধন ধীর লয়ে বিচ্ছুরিত হতে শুরু করেছিল এই পর্বে এসে অত্যন্ত দ্রুততার সঙ্গে তা সম্পাদিত হতে চাইল। বাংলা নাটক খুব স্বাভাবিক ভাবেই এই অভিনব ভাব-চৈতন্যকে অঙ্গীকৃত করে নতুন পথ-সন্ধানে উৎসুক হয়ে উঠল। তারই ফলশ্রুতিতে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের ক্রান্তিলগ্নে বাংলা নাট্যজগতে যুগান্তকারী পরিবর্তন দেখা গেল। বিষয়বস্তু অনুসারে এই পর্বে রচিত ও অভিনীত নাটকগুলিকে আমরা নিম্নোক্ত শ্রেণীতে বিন্যস্ত করে নিতে পারি ঃ

১। পৌরাণিক নাটক।
২। ইতিহাস-অবলম্বিত নাটক।
৩। দেশাত্মবোধক নাটক।
৪। সামাজিক নাটক।
৫। উপন্যাসের নাট্যরূপ।
৬। জীবনী নাটক।
৭। অন্যতর নাট্যপ্রয়াস।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধকালীন যুগ-সঙ্কটের প্রেক্ষাপটে এবং মঞ্চাভিনয়ের প্রামাণ্য তথ্যের পরিপ্রেক্ষিতে এখন বিভিন্ন শ্রেণীর নাটকের রস সমৃদ্ধ আলোচনায় অনুপ্রবেশ করা যেতে পারে।

তৃতীয় অধ্যায়

পৌরাণিক নাটক

পুরাণাশ্রিত কাহিনীকে ভিত্তি করে ঐকান্তিক ভক্তিরস প্রদর্শন কিংবা ধর্মীয় অনুভূতির আবেগদীপ্ত চেতনার প্রকাশ যে নাটকের মুখ্য উদ্দেশ্য, আমরা তাকে চিহ্নিত করতে পারি 'পৌরাণিক নাটক' হিসাবে। কাহিনী যেহেতু পুরাণ নির্ভর এবং ভক্তিরস কিম্বা ধর্মাবেগ যেহেতু মূল উপজীব্য বিষয়, বাস্তব বিমুখতা সেইহেতু এই শ্রেণীর নাটকের প্রধান বৈশিষ্ট্য; অথবা বলতে পারি পৌরাণিক যুগের বাস্তবতাই এই শ্রেণীর নাটকের প্রতিপাদ্য বিষয়। দর্শক সমাজেও তা কোন বিরূপ প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করেনা; কারণ বহুকালের সংস্কার-অভ্যস্থ বাঙালীর ভক্তি-দৌর্বল্য খুব স্বাভাবিক ভাবেই তাকে এ জাতীয় কাহিনীর প্রতি আকৃষ্ট করে। শুধু বাঙালী কেন, যুগে যুগে ধর্মপ্রাণ মানুষ তার প্রাণের ঠাকুরটিকে ঘিরে কতই না অসম্ভব গল্পের জাল বুনেছে! আর তাই এই শ্রেণীর নাটকে অলৌকিক কাহিনী, ঘটনা ও চরিত্রের সমবায়ে সৃষ্ট এক স্বতন্ত্র ভাবলোকের মোহাবিষ্ট জগতে অবগাহন করে দর্শক-মন পরিতৃপ্তি লাভ করতে চায়।

অধ্যাত্ম ক্ষেত্রে বাঙালী ভাববাদী—জন্মান্তরবাদের অভ্রান্ত বিশ্বাস তাকে অনেকাংশে ইহজীবন বিমুখ করে তুলেছে। তদুপরি হিন্দুর ধর্মীয় জগতে যুগে যুগে অবতার-কল্প পুরুষের আবির্ভাবে বাঙালীর মনের মাটি অধ্যাত্ম ভাবনার জারক-রসে অভিসিঞ্চিত হয়ে এসেছে। ইহজীবন অপেক্ষা পরকালের ভাবনাই তার জীবন-তরুকে পত্রে পল্লবে মুকুলিত করে তুলেছে। তাই দেখতে পাই, আদিযুগ থেকে বাংলা নাটকের একটা বড় অংশ জুড়ে আছে ইতিহাস-পুরাণ। তুলনায় তার ব্যক্তিগত সমাজ-পরিবার নাটকে স্থান লাভ করেছে অনেক পরে। পৌরাণিক নাটকেই একসময় বাঙালী যেন তার আশা আকাঙ্ক্ষাকে প্রতিফলিত দেখতে চেয়েছে এবং হয়ত পেয়েওছে।[১]

বাংলা ভক্তিমূলক পৌরাণিক নাটকের প্রথম সার্থক রূপকার নিঃসন্দেহে গিরিশচন্দ্র। শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ প্রবর্তিত নব্য ধর্ম আন্দোলনের জোয়ারে বাংলাদেশ সেদিন

---

[১] এই প্রসঙ্গে গিরিশচন্দ্র বলেছেন—"ধর্মপ্রাণ হিন্দু ধর্মপ্রাণ নাটকেরই স্থায়ী আদর করিবে। বাল্যকাল হইতেই হিন্দু—শ্রীরাম, শ্রীকৃষ্ণ, ভীষ্ম, অর্জুন, ভীম প্রভৃতিকে চিনে, সেই উচ্চ আদর্শে গঠিত নায়কই হিন্দুর হৃদয়গ্রাহী হওয়া সম্ভব।"

মাতোয়ারা হয়ে উঠেছিল। পরমহংসদেবের প্রসাদ-ধন্য গিরিশচন্দ্র প্রত্যক্ষ ভাবে সেই ভাবাবেগের সংস্পর্শে আসার সুযোগ পেয়েছিলেন। ফলে নট নাট্যকার গিরিশচন্দ্র ভক্তিরসের কাহিনী গ্রন্থণে অধিকতর স্বাচ্ছন্দ্য অনুভব করেছেন। বাঙালীর জাতীয় জীবনে সেদিন যে মোহমুক্তির তাগিদ অনুভূত হচ্ছিল, গিরিশচন্দ্র তাকে জাতীয় ভাবধারার অনুকূলে প্রবাহিত করতে চেয়েছেন। গিরিশচন্দ্রের পরে ক্ষীরোদপ্রসাদ এবং কিছু পরিমাণে মন্মথ রায় সেই ধারারই দীপশিখাটি সযত্নে জ্বালিয়ে রাখতে পেরেছেন। অন্যদিকে দ্বিজেন্দ্রলাল কয়েকটি পৌরাণিক নাটক রচনা করলেও ইতিহাস নিয়ে গল্প রচনাতে তিনি স্বভূমি অর্জন করেছেন। মনে রাখা প্রয়োজন, রঙ্গমঞ্চের প্রয়োজনে অন্যান্য শ্রেণীর নাটক গিরিশচন্দ্রকে লিখতে হলেও ভক্তিরসই তাঁর স্বক্ষেত্র: কিন্তু দ্বিজেন্দ্রলালকে আমরা সংস্থাপিত করতে পারি ইতিহাসের পটভূমিতে।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধকালীন পরিবর্তিত সমাজ পরিবেশ খুব স্বাভাবিক ভাবেই পৌরাণিক নাটক রচনার পক্ষে অনুকূল ছিল না। ভক্তির নৈবেদ্য সাজিয়ে দৈব মহিমার পাদপীঠে অকুণ্ঠ আত্ম নিবেদন তখন বাস্তব জগতের পরিপন্থী রূপেই গণ্য হচ্ছিল। কেননা নতুন দিনের অভিঘাতে বাঙালীর ধর্ম-ঐতিহ্যের প্রাণকেন্দ্রেও নিদারুণ সংশয় ঘনিয়ে উঠে অধ্যাত্ম ভাবনার প্রেক্ষাপটকে মসীলিপ্ত করে ফেলেছিল। পাপ পূণ্য, ন্যায় অন্যায়, শুভ অশুভ, মঙ্গল অমঙ্গলের সনাতন বিশ্বাসে সন্দিহান সমাজ মানসে বিপরীত মতবাদই সেদিন অতি মাত্রায় সক্রিয় হয়ে উঠতে চাইছিল। ফলে অলৌকিক ভাবরসে পরিপুষ্ট পৌরাণিক কাহিনীর প্রতি নতুন করে আগ্রহ সঞ্চারের কোন অবকাশ ছিল না। তবু এতকালের দৃঢ় প্রোথিত সংস্কার থেকে রাতারাতি মুক্ত হওয়াও সম্ভব হয়নি। সংস্কার মুক্তির জন্যেও তো কিছুটা সময় অপরিহার্য এবং নতুন পরিবেশে খাপ খাইয়ে নিতেও যথেষ্ট মানসিক প্রস্তুতির প্রয়োজন। পুরাতনের প্রতি অভ্যাসগত মমত্ববোধে আগ্রহ ছিল, কিন্তু ছিলনা আস্থা---আবার অভিজ্ঞতালব্ধ রূঢ় বাস্তবকেও অস্বীকার করবার উপায় ছিল না।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধকালীন পৌরাণিক নাটকে আমরা দ্বিধাগ্রস্ত এই সমাজ মানসই প্রতিফলিত হতে দেখি। পৌরাণিক নাটক পুরোপুরি বর্জিত হল না, বরং দেশকালের সঙ্গে সমতা রেখে দৃষ্টিকোণের পরিবর্তন সাধিত হল। অর্থাৎ ক্ষেত্র অবিকৃত রেখে তার নবরূপ নির্মিতির একটা তাগিদ স্বতঃস্ফূর্তভাবে দেখা দিল। চিরাচরিত প্রথায় অহৈতুকী ভক্তিরসের জয়গানে মুখর হতে চাইলেন না এ কালের নাট্যকার। 'যথা ধর্ম তথা জয়' এই সনাতন বিশ্বাসকেও তাঁরা যুক্তিবাদের সম্মোহনী মন্ত্রে ভেঙ্গে ফেললেন---অন্তত ভেঙ্গে ফেলতে দারুন ভাবে উদ্যোগী হলেন। সমকাল তাঁদের দৃষ্টান্ত হয়ে দাঁড়াল।

কিন্তু জীবনের এই সংশয়কেই তাঁরা ধ্রুব সত্য বলে মেনে নিতে চাইলেন না; সংশয় থেকে উত্তরণে শক্তির অন্বেষণ করতে গিয়ে তাঁরা প্রচলিত আখ্যান উপাখ্যানের মধ্যেই তার উৎস খুঁজে পেলেন। অসীম শক্তিধর পৌরাণিক চরিত্র কালের দাবীকে অঙ্গীকার করে উপস্থাপিত হল যুগ-সঙ্কটে সংগ্রামশীল মানবাত্মার প্রতিনিধি হিসাবে। আধুনিক

জীবন-দ্বন্দ্বের টানা পোড়েন, আবেগ অনুভূতি, রোমান্টিকতার সংস্থাপনে সমৃদ্ধ এই সমস্ত পৌরাণিক চরিত্র এ কালেরই মুখপাত্র হয়ে উঠল। আধুনিক মননের দ্বন্দ্ব-বিক্ষুব্ধ মনস্তাত্ত্বিক জটিলতা কম বেশি স্পর্শ করল এদের। প্রবণতা দেখা গেল বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিতে পুরাতন প্রসঙ্গ ও ঘটনার যুক্তিগ্রাহ্য সূত্র নির্ণয়ের। অর্থাৎ একদিকে যুক্তিবাদ এবং অন্যদিকে মানবতাবাদের সংযোজন ঘটিয়ে একালের নাট্যকার স্বর্গের উদ্যানকে মর্ত্যভূমে প্রতিষ্ঠা করতে চাইলেন। পৌরাণিক নাটকের এবংবিধ আধুনিকীকরণ গতানুগতিক ঐতিহ্যের ব্যর্থ অনুসৃতির দায়বদ্ধতাকে পুরোপুরি অস্বীকার করেছে।[:] অবশ্য এই প্রচেষ্টা যে সকল ক্ষেত্রে সার্থক হতে পেরেছে এমন নয়. তবে মোটের ওপর এই রকম একটা প্রবণতা প্রায় সব নাটকেই স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। রঙ্গমঞ্চের চারু শিল্পীদের ঐকান্তিক প্রচেষ্টায় দর্শকের কাছে তার চমৎকার উপস্থাপনাও সম্ভব হয়েছে। পৌরাণিক নাটকের এই প্রেক্ষাপটটি স্মরণে রেখে আমরা আলোচ্য পর্বের পৌরাণিক নাটকের বিচার বিশ্লেষণে অগ্রসর হব।

॥ জাহ্নবী ॥

'স্টার' থিয়েটারের ইতিহাসে প্রথম পর্বে প্রধানত পৌরাণিক এবং কিছু পরিমাণে ইতিহাস অবলম্বিত নাটকই অধিক সংখ্যায় অভিনীত হতে দেখা যায়। সম্ভবত ভক্তিমূলক পৌরাণিক নাটকের সার্থক রূপকার গিরিশচন্দ্র এবং তাঁর উত্তরসূরী মহেন্দ্র গুপ্তের নাট্যকার রূপে 'স্টারে' দীর্ঘকাল সংযুক্তিই তার হেতু। আমাদের আলোচ্য পর্বে 'স্টারে' অভিনীত প্রথম পৌরাণিক নাটক ভোলানাথ কাব্যশাস্ত্রীর 'জাহ্নবী'। ১৯৩৯-র ২রা সেপ্টেম্বর এই পৌরাণিক নাটকটি প্রথম মঞ্চস্থ হয় এবং দর্শক সমাজে বিপুল সমাদর লাভ করে। 'জাহ্নবী' নাটকের রচনাকাল বেশ কিছুকাল পূর্বে হলেও সাধারণ রঙ্গালয়ে তার আত্মপ্রকাশ এই সময়ে। আখ্যানবস্তু, অভিনয়ের উৎকর্ষতা এবং সামগ্রিক টিম ওয়ার্ক—এই ত্রিবিধ দিক থেকেই 'জাহ্নবী' সমকালীন দর্শকের প্রসংশাধন্য পৌরাণিক নাটক। সেকালের সংবাদ পত্র থেকে সাক্ষ্য দেওয়া যায় তার ঃ

" 'Jahnavi' under the able direction of Mr K P Ghose, B Sc , is yet another hit of the late Minerva Company, now playing at Star A mythological drama requires a special mode of treatment, in which the Star Theatre seems to be an adept quite in harmony with the devotional elements yet unfolding a strong dramatic story. Jahnavi has captivated the Theatre-going public

The scenes are praiseworthy, the songs are well tuned by the celebrated Mr K C De The show reveals a splendid teamwork "[৫]

[:] ষাটের দশকে বুদ্ধদেব বসু পৌরাণিক নাটকে আধুনিকতার স্বপক্ষে বলিষ্ঠ অভিমত ব্যক্ত করেছেন এইভাবে : "একটি পুরাণ কাহিনীকে আমি নিজের মনোমত করে নতুন ভাবে সাজিয়ে নিয়েছি, তাতে সঞ্চার করেছি আধুনিক মানুষের মানবসত্তা ও দ্বন্দ্ব বেদনা। বলা বাহুল্য এ ধরনের রচনায় অন্ধভাবে পুরাণের অনুসরণ চলে না, ... আমার কল্পিত ঋষ্যশৃঙ্গ ও তরঙ্গিনী পুরাকালের অধিবাসী হয়েও মনস্তত্ত্বে আমাদেরই সমকালীন।" (ভূমিকা : 'তপস্বী ও তরঙ্গিনী')।

[৫] The Amrita Bazar Patrika, 26th September, 1939

কালীপ্রসাদ ঘোষের নির্দেশনায় এবং কৃষ্ণচন্দ্র দে-র সুর সংযোজনায় 'জাহ্নবী' প্রথম মঞ্চস্থ হয়। দৃশ্যপট নির্মাণ করেন পরেশচন্দ্র বসু। এই নাটকের পূর্ণাঙ্গ চরিত্রলিপি উদ্ধার করা সম্ভব হয়নি। বিভিন্ন সূত্রে প্রাপ্ত তথ্যে দেখা যাচ্ছে- জীবেন গাঙ্গুলী, শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় (অভিনেতা), রঞ্জিত রায়, মিস লাইট, সরযূবালা, রাজলক্ষ্মী এবং দুর্গারাণী বিভিন্ন চরিত্রে অংশ গ্রহণ করেছিলেন।

'জাহ্নবী' বিশালায়তন পৌরাণিক নাটক। অলংকারশাস্ত্র নির্দেশিত রীতি-নীতি যথা সম্ভব রক্ষা করে নাট্যকার এই নাটকটি রচনা করেছেন। নাটকের আখ্যান ভাগে নাট্যকারের প্রগাঢ় শাস্ত্রজ্ঞানের পরিচয় ছড়িয়ে আছে। প্রাচীন শাস্ত্রাদিতে তাঁর গভীর আস্থা, বিশ্বাস এবং অটল ভক্তি দৌর্বল্য অনায়াসে খুঁজে পাওয়া যায় চরিত্র চিত্রণ, ঘটনা সংস্থাপন এবং কাহিনী পরিকল্পনায়। অপসৃয়মান যুগের জন্যে বেদনাবোধ এবং আগত দিনের জীবনাদর্শে প্রাচীন মূল্যবোধ বিস্মরণের আশঙ্কা সম্ভবত নাট্যকারকে বিচলিত করেছিল। যুগ সন্ধিক্ষণের মসীলিপ্ত পটভূমিতে দাঁড়িয়ে আর্য অধ্যুষিত ভারতবর্ষের মানুষকে তিনি আশার বাণী শোনাতে চেয়েছেন -যন্ত্রণাকাতর পিতার ন্যায়, পিতৃ-আদর্শে আস্থাহীন সন্তানদের যেন চিত্ত সংশোধনের অন্তিম চেষ্টা করেছেন। মুখবন্ধে সেই বেদনাতুর ব্যাকুলতা, সেই অভ্রান্ত বিশ্বাস অকপটে ব্যক্ত করেছেন নাট্যকার।[২]

প্রতিষ্ঠানপতি শৈব উপাসক সুহোত্র পুত্র, শিব অংশে জন্ম জহ্নুকে কেন্দ্র করে মহাদেব ও গঙ্গার বিরোধ, তার বিস্তৃতি, পরিশেষে জগৎ কল্যাণে জাহ্নবীরূপে গঙ্গার আত্মপ্রকাশে নাট্যকাহিনী বিধৃত। এই বিরোধে প্রকারান্তরে গঙ্গার মাহাত্ম্যই শেষ পর্যন্ত প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। মহাদেব ও গঙ্গা -যুযুধান দুই প্রতিপক্ষের অবিরাম সংঘর্ষ, কূট-কৌশল এবং শক্তি পরীক্ষায় প্রতিষ্ঠান রাজ্যের সেই সঙ্গে আজমীর ও প্রয়াগের রাজনৈতিক উত্থান পতনের ইতিবৃত্ত রচিত হয়েছে। নিঃসন্তান প্রতিষ্ঠানপতি সুহোত্র এবং মহিষী কেশিনী স্বয়ং মহাদেবকে পুত্ররূপে কামনা করে তপস্যা করেন। তপস্যায় তুষ্ট মহাদেবের অংশে জহ্নু তাঁদের পুত্ররূপে জন্ম গ্রহণ করে। কেবল ধর্ম রক্ষার্থে তার জন্ম হয়—সংসার জীবন যাপনের জন্যে নয়। বংশ রক্ষার্থে বিচলিত রাজ-দম্পতি পুনরায় মহাদেবের তপস্যা করে দ্বিতীয় পুত্র লাভ করেন। পুরুমীর রাজ্য-লোভে তাকে চুরি করে ধাত্রীর সহায়তায় এক মৃত সন্তানকে ভ্রাতা সুহোত্রের দ্বিতীয় পুত্র রূপে প্রচার করে। এ হেন অবস্থায় জহ্নুকে সংসারী করার বাসনায় সুহোত্র গঙ্গার শরণাপন্ন হন। আজমীর রাজ যুবনাশ্বের কন্যা কাবেরী রূপে গঙ্গা জন্ম গ্রহণ করে জহ্নুকে সংসারে বদ্ধ করতে সচেষ্ট

---

[২] নিবেদন অংশে নাট্যকার বলেছেন "আমি জাহ্নবী প্রকাশ করিলাম শুদ্ধ আর্য্য সন্তানগণকে জাগাইবার জন্য, তাঁহাদের লুপ্তপ্রায় পুরাযুগের গৌরব কাহিনী অলস চক্ষে ধরিবার জন্য, কর্মের বিষয়ে যাইহোক সেই পুণ্যক্ষেত্রে জন্মের কারণ আপনাদিগকে মনে মনে ধন্যবাদ দিবার জন্য। ... কোন কোন মহাপুরুষ বলেন, জাহ্নবী কপিল কোপে ভস্ম সগর বংশের উদ্ধার করিয়াছিলেন। তাই যদি হয়, তাহা হইলে এ জাহ্নবী কি আর্য্যবংশের ললাটস্থ ভস্মটীকার কণাংশ মুছিয়া দিতে পারিবে না ?"

হলে শিবের সঙ্গে গঙ্গার বিরোধের সূত্রপাত। গঙ্গার প্ররোচনায় কাবেরী মহাদেবকে তপস্যায় তুষ্ট করে কৌশলে বাক চাতুর্যে জহ্নুর সন্তানের জননী হবার বর লাভ করে। সাম্য তার সেই ইপ্সিতপুত্র। অবশেষে নানা ঘাত-প্রতিঘাতের মধ্যে দিয়ে সাধন মার্গের চূড়ান্ত সীমায় উপনীত জহ্নু তার যজ্ঞ পণ্ডকারী গঙ্গাকে এক গণ্ডূষে নিঃশেষে পান করে এবং ব্রহ্মার অনুরোধে জানু চিরে পুনরায় তাকে মুক্তি দান করে। মহাদেবের কৃপায় শিবত্ব প্রাপ্তি ঘটে জহ্নুর; আর জহ্নুর নামানুসারে গঙ্গা জাহ্নবী রূপে জগতের মুক্তিদাত্রী রূপে আত্মপ্রকাশ করে।

'জাহ্নবী' নাটকে নাট্যকারের বিশিষ্ট ঈশ্বর ভাবনা, কাহিনী বিন্যাসের মধ্যে দিয়ে প্রকাশ লাভ করেছে। পার্থিব জীবন সঙ্কটে ঈশ্বর আরাধনাই মানব মুক্তির শ্রেষ্ঠ পন্থা বলে বিবেচিত এ নাটকে। তবে তার জন্যে সংসার ত্যাগের কোন প্রয়োজন নেই; এমন কি সংসারের বহুবিধ বন্ধনের মধ্যে থেকেও শুধু ঐকান্তিক ঈশ্বর নিষ্ঠায় যে কোন সঙ্কট থেকে মুক্তি লাভ সম্ভব। মানুষ তার সাধনার জোরে সংসার আশ্রমের উপান্তে পৌঁছে ঈশ্বরের কৃপা লাভে ধন্য হতে পারে জহ্নুর জীবনাদর্শই তার প্রমাণ। অর্থ, ক্ষমতা, প্রতিপত্তি মানুষকে বিভ্রান্ত করে, তার জীবনপথে ঘনিয়ে তোলে রাত্রির অন্ধকার-- শুভবুদ্ধি, সৎ চিন্তার সম্মুখে সৃষ্টি করে বিস্তর অন্তরায়। সেই পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়া চাই। জহ্নুর শিবত্ব প্রাপ্তির গতিপথ বিশ্লেষণে এই সিদ্ধান্তেই উপনীত হতে হয়। শুধু জহ্নু কেন, স্বার্থসন্ধানী চৈতন্যও বৃন্দাবনে শ্যামসুন্দরের মনতুষ্টির ব্রত নিয়ে আত্মোপলব্ধির পথ খুঁজে পেয়েছে। রাজানুরাজের দাসত্ব কেবল যন্ত্রণা ও বঞ্চনার কারণ-- ঈশ্বরের প্রতি আনুগত্যে সকল যন্ত্রণার অবসান। আর ঈশ্বরের প্রতি আনুগত্য সকল সময় মানব কল্যাণের পক্ষে- তার পরিপন্থী নয় কখনই। সৃঞ্জয় মোক্ষ অপেক্ষা জন্মভূমির কল্যাণকেই বড় করে দেখেছে অর্থাৎ ঈশ্বর প্রীতির সঙ্গে স্বদেশপ্রেমকে, জগৎ কল্যাণকে নাট্যকার একই সূত্রে গ্রথিত করে নিয়েছেন। সমকালীন বিপন্ন দর্শকের কাছে এই আবেদন সম্মোহনের মত কাজ করেছে। 'জাহ্নবী' নাটকের মঞ্চ সাফল্যের পশ্চাতে পৌরাণিক নাটকের এই আধুনিক দৃষ্টিভঙ্গিই সব থেকে বড় কারণ।

কিন্তু তত্ত্ব হিসাবে যতই আকর্ষণীয় হোক না কেন, সমকালীন জীবন সঙ্কটের পটভূমিতে নাট্যকার নির্দেশিত অতি-সুলভ সমাধান সূত্র সত্যই কি গ্রহণযোগ্য ছিল? নাট্যকারের প্রত্যাশা 'মত আর্যবংশের ললাটস্থ ভস্ম টীকার কণাংশ' মুছে দিতে 'জাহ্নবী' অন্তত পারেনি। রঙ্গমঞ্চের চৌহদ্দির বাইরে বৃহৎ গণ জীবনে এর প্রভাব বিশেষ পড়েছিল বলে কোন প্রমাণ নেই। জনপ্রিয়তা পেলেও জন-জাগরণে 'জাহ্নবী'-কে ব্যর্থই বলতে হবে।

এই নাটকের আখ্যানভাগ অতি বিস্তৃত। সময়ের সীমারেখা নাট্যকার বিস্মৃত হয়েছেন। তত্ত্ব প্রচারে অধিক আগ্রহ কাহিনীকে অনাবশ্যক জটিল করে তুলেছে—কাহিনীর গতি শ্লথ হয়ে পড়েছে। বেগবতী জাহ্নবীর তরঙ্গ হিল্লোল নয়, ধীর সমীরে মন্থরগতি জাহ্নবীর পদধ্বনি শুনেছি আমরা। চরিত্র বিকাশ অনেকাংশে উপেক্ষিত। তবে চমৎকার এর গদ্য

পদ্যময় সংলাপ। দেব চরিত্রগুলির মুখে কাব্যময় সংলাপ সুললিত। এদিক দিয়ে নাট্যকার প্রশংসার দাবী রাখতে পারেন।

॥ সতী তুলসী ॥

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের ক্রান্তিলগ্নে মহেন্দ্র গুপ্তের প্রথম পৌরাণিক নাটক 'সতী তুলসী' 'স্টার' থিয়েটারের দ্বিতীয় পদক্ষেপ এবং 'স্টারের' সফলতম প্রচেষ্টাগুলির অন্যতম এই নাটক। এই পর্বে 'স্টারে' অভিনীত প্রতিটি পৌরাণিক নাটকই মঞ্চাভিনয়ে প্রভূত সাফল্য অর্জন করে। 'স্টার' থিয়েটারের দীর্ঘ ইতিহাসে নাট্য প্রযোজনার এই সাফল্য নিঃসন্দেহে গৌরবের। ১৯৪০ র ১৬ই মার্চ বিপুল দর্শক সমাগমে পরিপূর্ণ আত্মপ্রস্তুতি নিয়ে উপস্থিত হয় 'সতী তুলসী'; এবং কথাবস্তু ও অভিনয়ের সামগ্রিক উৎকর্ষতায় দর্শক সমাজকে অভিভূত করে তোলে। মুগ্ধ দর্শকের অভিব্যক্তি প্রকাশিত সেকালের সংবাদপত্রের পাতায় ঃ

"The new mythological drama "Sati Tulsi" at the Star Theatre is different from other mythological plays in more respects than one The production is at once so highly artistic and well-conceived as one hardly expects to see in a Bengal Theatre The seens the mood lighting and effect lighting and back ground music, in fact, the atmosphere of staging in quite refreshing The drama by Mr Mahendra Gupta is also written "[a]

বাংলা পৌরাণিক নাটকের গতানুগতিক ধারা থেকে স্বাতন্ত্র্য রক্ষার প্রচেষ্টা এই নাটকটিকে জনসমাজে সমাদৃত করেছে। কালী প্রসাদ ঘোষের নির্দেশনায় এবং অন্ধ সংগীত শিল্পী কৃষ্ণচন্দ্র দে'র সুর সংযোজনায় 'সতী তুলসী' আনুষ্ঠানিক ভাবে মঞ্চাভিনয় শুরু করে। এই নাটকের দৃশ্যপট নির্মাণ করেন পরেশ বসু। প্রথম অভিনয় রজনীতে অংশগ্রহণকারী অভিনেতৃবর্গ হলেন ঃ কৃষ্ণ সুশীল রায়; ইন্দ্র -দেবীদাস বন্দ্যোপাধ্যায়; পবন উমাপদ বসু; পুষ্পদন্ত—বঙ্কিম দত্ত; অংশুমান -শেফালিকা; অঙ্গিরা—জয়নারায়ণ মুখোপাধ্যায়; সুদামা বা শঙ্খচূড়—শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়; বৃহদ্রথ—সনৎ মুখোপাধ্যায়; গোকর্ণ—রঞ্জিত রায়; নট—ললিত কুমার; তুলসী—সরযূবালা; শ্রীরূপা—দুর্গারাণী; রূপমঞ্জরী—রাজলক্ষ্মী; নন্দিনী—লীলাবতী; এছাড়া সখী সংঘ। নাটকে আবহ সংগীত রচনা করেন দুলাল চন্দ্র মল্লিক। 'সতী তুলসী' নাটকের আশাতীত সাফল্যের পশ্চাতে 'স্টারের' তৎকালীন নাট্য নির্দেশক কালীপ্রসাদ ঘোষের কৃতিত্ব ছিল সব থেকে বেশি। অমৃতবাজারের মতে ঃ

"Mr K P Ghose , B Sc the veterun director deserves all the praise for this entirely novel production "[2]

'সতী তুলসী' বাংলা পৌরাণিক নাটকের ধারায় বিরল দৃষ্টান্ত নাটক। ভক্ত ও ভগবানের অনুপম লীলা অভিনব দৃষ্টিকোণে এই পৌরাণিক নাটকের আখ্যান অবলম্বনে

---

[2] The Amrita Bazar Patrika, 23rd March, 1940

পরিস্ফুটিত হয়েছে। ঐকান্তিক আকুতি, সাধনপথে একাগ্র নিষ্ঠা আর হৃদয় ধর্মের মহত্বে ভক্ত, ভগবানের ঊর্ধে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করেছে। নিছক ভগবদ্ভক্তি প্রদর্শন এই নাটকের উদ্দেশ্য নয়, দেবতার মাহাত্ম্য প্রচারও লক্ষ্য নয়- মানব-মহিমার বিজয়বার্তা প্রতিধ্বনিত এই নাটকে। সর্বশক্তিমান ঈশ্বরের কঠিন পরীক্ষায় সগৌরবে উত্তীর্ণ মানব-যাত্রী। 'সতী তুলসী' দেবতার বরমাল্য সংগ্রহ করে এনে দিয়েছে মানুষের কণ্ঠে। বাংলা পৌরাণিক নাটকের গতানুগতিক ধারায় এই স্বাতন্ত্রীকরণ নব যুগেরই সূচক।

একাগ্রতাই সাধনা বাধা বিঘ্নময় উচ্চাবচ যাত্রাপথের উপান্তে তার সিদ্ধিভূমি রচিত। অভীষ্ট লক্ষ্যে বিঘ্ন অপসারণইতো সাধনা: বিঘ্ন না থাকলে তার গৌরবই যে ম্লান হয়ে যায়। তুলসীর আত্মনিষ্ঠ সাধনা কৃষ্ণ লাভের। অন্তরের তীব্র আকুলতা এবং গভীর নিষ্ঠায় সে সমস্ত প্রতিকূলতাকে অতিক্রম করে তার প্রার্থিত বর লাভ করেছে। অঙ্গিরার অভিশাপের রূপ ধরে বিঘ্ন উপস্থিত তার সাধন পথে; তার অপরাধ সে অংশুমানের ছলনায় তাকে বালকরূপী কৃষ্ণজ্ঞানে পবিত্র গঙ্গাবারি, নারায়ণী শঙ্খ এবং তার তপঃশক্তি দান করেছিল। অংশুমানের ছলনার জন্যে শাস্তি পেতে হল শ্রেষ্ঠ সতী তুলসীকে—সে শাস্তিও অতি নির্মম তারই পরম আকাঙ্ক্ষিতকে বিস্মৃতির অভিশাপ! তুলসীর মধ্যে দিয়ে আত্মবিস্মৃত জাতিকে মুক্তির পথ দেখানো হয়েছে। এ যুগে কেবল আত্মমুক্তির জন্যেই সাধনা নয়, জগৎ কল্যাণও যে পরম কর্তব্য। পরমহংসদেব আর্তজনের উদ্ধারের নিমিত্ত বৈচিত্র্যময় লীলা করে গেছেন। কতিত অঙ্গ, দৃষ্টিশক্তি রহিত, কালসর্পের দংশনে জর্জরিত সুদামার মুক্তি সম্ভব করতেই তুলসীর অভিশপ্ত বর্ষের ব্রত উদযাপন। এই মহৎ কর্তব্য সমাপনান্তে সতী তুলসীর কৃষ্ণপ্রাপ্তি।

সুদামাও কৃষ্ণ অনুগত সাধক, তবে তার সাধনার পথ ভিন্ন। তুলসীর দয়িতরূপে, সুদামার সখা রূপে কৃষ্ণ উপাসনা। এই উপাসনার ফল স্বরূপ তার কাঙ্ক্ষিত বস্তু আর কিছু নয়, স্বয়ং কৃষ্ণপ্রিয়া। আয়ান ঘোষ তার সাধনার জোরে বৈকুণ্ঠের লক্ষ্মীকে ভার্যা রাধারূপে লাভ করতে সক্ষম হয়েছিল। আর এ নাটকে আত্ম নিবেদিত প্রাণ সুদামা অর্জন করেছে কৃষ্ণপ্রিয়া সতী তুলসীকে তারই তপস্যার ফল আয়ত্ব করে। কৃষ্ণ যে ভক্তবাঞ্ছাকল্পতরু ভক্তের মনোবাঞ্ছা পূরণ না করে যে তিনি পারেন না। সখারূপে সুদামা প্রত্যক্ষ করেছিল কৃষ্ণকে, তাই কৃষ্ণের সর্বাপেক্ষা প্রিয় বস্তুটিও সে পেয়েছে অনায়াসে। কিন্তু সুদামা আত্মভ্রষ্ট সাধক। স্বৈরাচারের মোহকে সে অতিক্রম করতে পারেনি। আর এইখানেই তার পতনের বীজ নিহিত। অন্যদিকে তার সাধনলব্ধ ধন কেবল আত্ম তৃপ্তির নিমিত্ত—জগৎ কল্যাণের পরিবর্তে জগতের ধ্বংস সাধনে তৎপর। কাজেই তার বিনাশ অবশ্যম্ভাবী। কৃষ্ণের দিব্যকান্তি লাভে বিকৃত অঙ্গ সুদামা সৌম্যদর্শন যুবক শঙ্খচূড়ে পরিণত, তুলসীর তপঃশক্তির প্রভাবে সে অসীম শক্তিধর নায়ক। অথচ শুধু তুলসীতেই সে তৃপ্ত রইল না, ধাবিত হল স্বেচ্ছাচারী রূপমঞ্জরির প্রতি; অর্জিত শক্তিকে সে ব্যবহার করতে চাইল দেবতার দেবত্ব হরণের কাজে। অতএব চূড়ান্ত সিদ্ধিতে সে ব্যর্থ।

এই নাটকে সর্বাপেক্ষা আকর্ষণীয় চরিত্র কৃষ্ণ। পৌরাণিক চরিত্র কৃষ্ণ এখানে মানবিক গুণ সম্পন্ন . মানবতাবোধের প্রেরণায় উজ্জীবিত। সুদামা এবং তুলসী উভয়েই তার একান্ত অনুগত ভক্ত। ভক্তের প্রীতির কাছে তিনি অঙ্গীকারবদ্ধ। অথচ সুদামা এবং তুলসী উভয়ের মনোবাঞ্ছা এমনই পরস্পর বিরোধী যে. দুজনকে একই সঙ্গে তৃপ্ত করা সম্ভব নয়। ভক্তের সাধনা ব্যর্থ করাও তার পক্ষে অসম্ভব অসম্ভব কোন একজনের প্রতি অকারণ পক্ষপাতও। এই দ্বন্দ্বে দোদুল্যমান শ্রীকৃষ্ণ। ভক্তের দুঃখ কর্ষণ করার জন্যেই তো তিনি কৃষ্ণ নইলে তার কৃষ্ণ নামই যে অসার্থক হয়ে পড়ে। তাই নিপুণ পরীক্ষার বন্দোবস্ত। সেই পরীক্ষায় শেষ পর্যন্ত অনুত্তীর্ণ রয়ে গেল সুদামা ওরফে শঙ্খচূড়: আর সসম্মানে উত্তীর্ণ হল সতী তুলসী। সেই অনুসারে পুরস্কারেরও তারতম্য। শঙ্খচূড়ের দেহ-অস্থি নির্মিত শঙ্খ. জগৎ কল্যাণে ব্যাপ্তি লাভ করল। অন্যদিকে নারায়ণ পূজার অপরিহার্য অঙ্গরূপে গ্রহণ করলেন তুলসীকে -- সতী তুলসীর গৌরব রক্ষার্থে তার অভিশাপ মস্তকে ধারণ করে নারায়ণ শালগ্রামরূপী শিলায় রূপান্তরিত হলেন। ভগবানের চরম পরীক্ষায় সতী তুলসী শঙ্খচূড়কে আলিঙ্গন দান করে সতীত্ব পর্যন্ত বিসর্জন দিতে প্রস্তুত হয়েছিল। ভগবান কি তাকে শ্রেষ্ঠ পুরস্কারে পুরস্কৃত না করে পারেন? তুলসীর মর্মান্তিক হৃদয়যন্ত্রণা. তাকে শঙ্খচূড়ের হস্তে সমর্পণের বেদনা. কাঁদিয়েছে কৃষ্ণকে। কিন্তু সতীশ্রেষ্ঠ তুলসীর বিনা অপরাধে এ হেন মর্মবেদনা কেন? তার কারণ. তুলসীর দুঃখ বরণের মধ্যে দিয়ে সুদামার মুক্তি লাভের পথ প্রস্তুত। দধীচী জগৎ কল্যাণে বজ্র নির্মাণের নিমিত্ত স্বেচ্ছায় আপন অস্থি দান করে মৃত্যু বরণ করেছিলেন। পরহিতায় আত্মোৎসর্গের এই মহান ব্রতই তো আমাদের আধ্যাত্মিক তত্ত্বের মর্মবাণী! এ কালের স্বার্থমগ্ন আত্ম সর্বস্ব সমাজ প্রেক্ষাপটে দাঁড়িয়ে নাট্যকার কি এই শিক্ষার গুরুত্ব উপলব্ধি করেছিলেন ?

মলয়ের রাণী রূপমঞ্জরী স্বেচ্ছাচারিণী। জরদ্গব গোকর্ণের হাতে দারিদ্র পীড়িত পিতা বৃহদ্রথ তাকে বিক্রী করেছিলেন। পিতার অক্ষমতার দায় তাকে বহন করতে হয়েছে। অসামান্যা রূপসী এই নারীর যৌবনের কোন চাহিদা পূরণের প্রয়োজনটুকু পর্যন্ত অনুভব করতে পারেনি গোকর্ণ। দরিদ্র পিতা এবং অপদার্থ স্বামীর ব্যর্থতার দায় সে বহন করবে কোন অপরাধে? তার এই নির্মম প্রশ্নের কোন সদুত্তর জানা ছিলনা বৃহদ্রথ কিম্বা গোকর্ণের। কাজেই তার সতীত্বের বিচার করবার অধিকার এদের দুজনের কারুরই নেই। নারী জাগরণের আধুনিক মন্ত্রে দীক্ষিত এই নারী—তার স্বেচ্ছাচারের পশ্চাতে রয়েছে বিনা কারণে প্রবঞ্চনার বিরুদ্ধে প্রকাশ্য বিদ্রোহ ঘোষণার স্বতঃস্ফূর্ত তাগিদ।

'সতী তুলসী' আধুনিক দৃষ্টিভঙ্গিতে রচিত পৌরাণিক নাটক। এই নাটকের সংলাপ অতি চমৎকার—কাহিনী গতিময়. চরিত্রগুলিও অত্যন্ত সজীব। সামগ্রিক বিচারে এই নাটক নিঃসন্দেহে প্রশংসার যোগ্য।

॥ উত্তরা ॥

মহেন্দ্র গুপ্তের দ্বিতীয় পৌরাণিক নাটক 'উত্তরা' 'স্টার' থিয়েটারে প্রথম আত্মপ্রকাশ করে ১৯৪০-র ১৮ই মে। উক্ত নাট্যকারের 'সতী তুলসী' নাটকে প্রভূত সাফল্য লাভের

পর 'স্টার' কর্তৃপক্ষ 'উত্তরা' নাটকটিকেও দর্শকের দরবারে আকর্ষণীয় করে তুলতে সক্ষম হন। নাট্যকার মহেন্দ্র গুপ্ত 'স্টার' থিয়েটারের সঙ্গে দীর্ঘকাল ঘনিষ্ঠ ভাবে যুক্ত ছিলেন। তাঁর অধিকাংশ নাটকই 'স্টার' রঙ্গমঞ্চে বিপুল জনসমর্থন অর্জন করতে সক্ষম হয়েছে। 'উত্তরা' নাটকেও তার কোন ব্যতিক্রম ঘটেনি। তৎকালীন সংবাদপত্রের পাতা থেকেই তার প্রমাণ মেলে: 'অমৃতবাজার পত্রিকা' নাটকটির অভিনয় সম্পর্কে অভিমত প্রকাশ করতে গিয়ে লিখেছে :

"Uttara the new mythological drama from the pen of Mr Mahendra Gupta which oppened at Star Theatre recently has received much popular acelaim From the enthusiasm of the theatre going public. the play is expected to enjoy bright days "[৭]

অবশ্য এই কৃতিত্বের সিংহভাগই প্রাপ্য খ্যাতনামা নাট্য পরিচালক শ্রীযুক্ত কালিপ্রসাদ ঘোষ এবং মঞ্চশিল্পী শ্রীযুক্ত পরেশ বসুর (পটলবাবু)। প্রথম অভিনয় রজনীতে উল্লেখযোগ্য চরিত্রে রূপদান করে স্মরণীয় হয়ে আছেন : শ্রীকৃষ্ণ ভূপেন চক্রবর্তী. ভীষ্ম পঞ্চানন চ্যাটার্জী. দ্রোণ অমূল্য মুখার্জী. ধৃতরাষ্ট্র গোষ্ঠ ঘোষাল. যুধিষ্ঠির সনৎ মুখার্জী. ভীম-গোপাল ভট্টাচার্য. অর্জুন অমল বন্দ্যোপাধ্যায়. ঘটোৎকচ জীবন গাঙ্গুলী. অভিমন্যু দেবীদাস (পরে মঙ্গল চক্রবর্তী). দুর্যোধন জয় নারায়ণ মুখার্জী. দুঃশাসন উমাপদ বসু. শকুনি মুরারী মুখার্জী. জয়দ্রথ বিমল ঘোষ. দ্রৌপদী মিস লাইট. সুভদ্রা সত্যবালা. রোহিণী রাজলক্ষ্মী. ধরিত্রী দুর্গারাণী এবং উত্তরার ভূমিকায় জনপ্রিয় অভিনেত্রী শেফালিকা (পুতুল)।

নাটকের আখ্যান ভাগ পরিকল্পিত হয়েছে 'মহাভারতের' বহুল পরিচিত উত্তরা অভিমন্যুর কাহিনী অবলম্বনে। 'মহাভারতের' কাহিনী অনুসারে গর্গঋষির শাপভ্রষ্ট চন্দ্রদেব. সুভদ্রা অর্জুনের পুত্ররূপে মানব জন্ম গ্রহণ করেন। এই পুত্র অভিমন্যু. বালক বয়সেই পিতার তুল্য বীরত্ব অর্জন করে খ্যাতিলাভ করে। দৈব নির্বন্ধে বিরাট রাজের কন্যা উত্তরার সঙ্গে তার বিবাহ হয়। 'দ্রোণ পর্বে' কুরুক্ষেত্র যুদ্ধে আচার্য দ্রোণ কৌশলে অর্জুনকে নারায়ণী সেনার সঙ্গে যুদ্ধে ব্যাপৃত রেখে চক্রব্যূহ রচনা করে পাণ্ডব সেনা সংহার শুরু করেন। ব্যূহের দ্বার রক্ষার দায়িত্বে ছিলেন. মহাদেবের বরে সেই যুদ্ধে অপরাজেয় সিন্ধুরাজ জয়দ্রথ। বালক বীর অভিমন্যু ছাড়া চক্রব্যূহ ভেদ করার কৌশল পাণ্ডব পক্ষে আর কেউ জানতেন না। বীর অভিমন্যু নির্ভয়ে ব্যূহ মধ্যে প্রবেশ করে শেষ পর্যন্ত অন্যায় সমরে সপ্তরথীর হাতে মৃত্যু বরণ করে এবং শাপমুক্ত চন্দ্রদেব চন্দ্রলোকে প্রত্যাবর্তন করেন। পুত্রহত্যার প্রতিশোধ গ্রহণে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ অর্জুনের হাতে মৃত্যু ঘটে সিন্ধুরাজের। এই পৌরাণিক কাহিনীর ওপরে ভিত্তি করে 'উত্তরা' নাটকের পটভূমি নির্মিত।

---

৭ The Amrita Bazar Patrika. 25th May. 1940

কিন্তু 'মহাভারতের' যথাযথ অনুসরণ নাট্যকার করেননি বরং মূল কথাবস্তুর কোন ব্যত্যয় না ঘটিয়ে তাকে নাটকের প্রয়োজনে মানবিক রসে অভিসিঞ্চিত করে নিয়েছেন। এ নাটকে উত্তরা অভিমন্যুর মিলন কেবল মাত্র দৈব নির্বন্ধে নয়, মহাদেবের স্বপ্ন নির্দেশে বিজন বনভূমে উত্তরা তার প্রার্থিত প্রেমাস্পদের অন্বেষণে এসে লাভ করেছে তাকে। উভয়ের চারচক্ষুর মিলনে স্বার্থক হয়েছে উত্তরার দীর্ঘ প্রতীক্ষা। বয়ঃসন্ধির নায়িকা উত্তরার পূর্বরাগে প্রেমের নিবিড়তা বৈষ্ণব কাব্যের শ্রীরাধার সঙ্গেই তুলনীয়। প্রেমের সোপানে সোপানে উত্তীর্ণ হয়ে এ নায়িকা প্রিয় মিলনে উন্মুখ হয়ে ওঠে. মায়া সরোবরের দুর্লভ কমল প্রত্যাশায় অনির্দেশ যাত্রা করে নির্ভয়ে. বীরপতিকে যুদ্ধযাত্রায় অগ্রসর হতে দেখে তার নারী হৃদয় অজানা আশঙ্কায় শঙ্কিত হয়ে ওঠে। কিন্তু সদ্য মুকুলিত এই নির্মল প্রেমের কুসুমটি পত্রে পত্রে পূর্ণ বিকশিত হবার পূর্বেই সংসারের রূঢ়তার চাপে দলিত পিষ্ট হয়ে বিবর্ণ হয়ে পড়েছে। রাত্রি শেষের নিদারুণ দুঃস্বপ্নের যে ভয়ঙ্কর বার্তা এসে পৌঁছেছে. সংসার অনভিজ্ঞা বালিকা উত্তরা তার ইঙ্গিত মাত্রে শিহরিত হয়েও তার মর্মোদ্ধার করতে পারেনি। তাই রোহিণীর ছলনায় সে প্রতারিত. রোহিণীর কূট চক্রান্তে সে নির্বাক দ্রষ্টা। তবে উত্তরার মত রোহিণীও প্রেমিকা নায়িকা. শুধু তফাৎ এই উভয়ের প্রেমের প্রকৃতি ভিন্ন। উত্তরার প্রেমে নিষ্ঠা আছে. মাধুর্য আছে. সে যেন আপনার ভারে আপনি অবনত। রোহিণী বঞ্চিতা. ক্রোধোন্মত্ত মুনির শাপে তার বাসরসজ্জা ধূলায় অবলুণ্ঠিত। ছলে বলে কৌশলে এই অপমানিতা নারী সত্তা তার বিস্মৃত অতীতকে পুনরুদ্ধারে দৃঢ় সঙ্কল্পবদ্ধ। পৌরাণিক চরিত্রের এই নব মূল্যায়ণ এ কালের পৌরাণিক নাটকেই সম্ভব। রোহিণীর প্রতিদ্বন্দ্বিতা উত্তরার সঙ্গে নয়. গর্গমুনির অন্যায় অভিশাপের বিরুদ্ধে তার আত্মপ্রতিষ্ঠার লড়াই।

'উত্তরা' একই সঙ্গে ধর্মভাবের এবং ধর্মীয় সঙ্কীর্ণতা মুক্তির নাটক। ধর্মভাবের চমৎকার অভিব্যক্তি অভিমন্যুর মধ্যে অভিব্যক্ত। সদ্য পরিণীতা প্রেয়সীর কোমল বাহু পাশ মুক্ত করে অভিমন্যুর চক্রব্যূহে অনুপ্রবেশ পরহিতার আত্মোৎসর্গের মহিমায় ভাস্বর। অনার্য রমণীর গর্ভজাত সন্তান ঘটোৎকচ সেই একই ধর্মবোধের প্রেরণায় বীরের বাঞ্ছিত মৃত্যুর প্রতীক্ষায় অধীর। 'মহাভারতের' মহাপরাক্রমশালী হিড়িম্বা পুত্র এ নাটকে দীনতার অভিমানে অভিমানী। কিন্তু এই ধর্মবোধ ধর্মীয় সঙ্কীর্ণতা মুক্তিকেই সুস্পষ্ট ভাবে ইঙ্গিত করেছে এবং এইখানেই নাটকটির প্রধান গৌরব। ঘটোৎকচের অনার্য জন্মের জন্যে আত্মধিক্কার শ্রীকৃষ্ণ. অভিমন্যু বা উত্তরার ধর্মীয় দৃষ্টিভঙ্গিকে সমস্ত সঙ্কীর্ণতা থেকে নির্মোহ হতে অনুপ্রাণিত করেছে। আর্য ও অনার্যের চিৎ বন্ধনে সৃষ্ট ভাব-সম্মিলনের নির্মল প্রবাহ এ দেশের মুক্তিকে ত্বরান্বিত করবে- এই সত্যটাই যেন প্রকাশিত হতে চেয়েছে। পূর্ববর্তী যুগের পৌরাণিক নাটকে সর্বধর্ম সমন্বয়ের এই তাত্ত্বিক উপলব্ধি অনুপস্থিত।

'উত্তরা' নাটকের বক্তব্য ও কাহিনী পরিকল্পনায় যথেষ্ট নতুনত্ব আছে - অন্তত নতুনত্ব সৃষ্টির প্রয়াস আছে। পুত্রের শোচনীয় মৃত্যু-সংবাদ প্রাপ্তির ঠিক পূর্ব মুহূর্তে অর্জুনের সমীপে, পুত্রশোকে কাতর কপিলের উপস্থিতি কি অর্জুনের মানসিক প্রস্তুতির জন্যেই?

নচেৎ এই উপকাহিনী সংযোজনের আর তো কোন সার্থকতা নেই। তবে এই ধরনের প্রয়াস যে সকল ক্ষেত্রে সার্থক এমন বলা চলে না। বিশেষ করে পুত্রহন্তা জয়দ্রথের প্রাণরক্ষার জন্যে জননী সুভদ্রার অকৃত্রিম প্রচেষ্টা আমাদের সমালোচনা বুদ্ধিকেও স্তম্ভিত করে। নিঃসংশয়ে এটি নাটকের ত্রুটি। নাটকের সংলাপ যথেষ্ট মার্জিত, অন্ত্যমিল অপেক্ষা কাব্যিক সংলাপে মধ্যমিলের প্রতি নাট্যকারের অতি প্রবণতা— মোটামুটি ছন্দময়। শুধু দুর্যোধনের সংলাপে রবীন্দ্রনাথের 'গান্ধারীর আবেদন' কাব্যনাট্যের প্রত্যক্ষ প্রভাব সুস্পষ্ট। সংগীতেও মাঝে মাঝে রবীন্দ্রনাথের ক্ষীণ কণ্ঠস্বর প্রতিধ্বনিত হয়েছে বলেই মনে হয়।

॥ উষা হরণ ॥

মহেন্দ্র গুপ্তের 'উষা হরণ' বাংলা পৌরাণিক নাটকের ধারায় একটি উল্লেখযোগ্য সংযোজন। সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত হিসাবে এ নাটক উদাহৃত হতে পারে। কাহিনী নির্বাচনে নাট্যকারের মনোগত অভিপ্রায়টি সম্ভবত সেই দিকে লক্ষ্য রেখে কাজ করেছে। অর্থাৎ 'উষা হরণ' পৌরাণিক কাঠামোয় রচিত সমকালীন যুগ ভাবনার চেতনাবাহী নাটক। ১৯৪০ র ২১শে ডিসেম্বর 'স্টার থিয়েটারে' 'উষাহরণ' প্রথম মঞ্চস্থ হয়ে যথেষ্ট আলোড়ন সৃষ্টি করে। প্রথম অভিনয় রজনীতে প্রধান পাত্র-পাত্রীদের মধ্যে ছিলেন ঃ মহাদেব সনৎ মুখোপাধ্যায়, শ্রীকৃষ্ণ ভূপেন চক্রবর্তী, বলরাম - বঙ্কিম দত্ত, অনিরুদ্ধ - অমল বন্দ্যোপাধ্যায়, সাত্যকী সন্তোষ ঘটক, ইন্দ্র – পঞ্চানন চট্টোপাধ্যায়, বৈশ্বানর— রবি রায় চৌধুরী, কার্তিক - উমাপদ বসু, বাণ - জয়নারায়ণ মুখোপাধ্যায়, সুভদ্র— গোপাল ভট্টাচার্য, বেত্রাসুর - বিমল ঘোষ, রোহিতাশ্ব রঞ্জিৎ রায়, পার্বতী -রাধারাণী, উর্বশী— তারকবালা, সুদক্ষিণা -নিভাননী, উষা মিস লাইট এবং বিরজা - দুর্গারাণী। নাট্য পরিচালকের হদিস এ পর্যন্ত পাওয়া যায়নি; অন্ধ সংগীত শিল্পী কৃষ্ণচন্দ্র দের সংগীতে সুর সংযোজনা এবং মঞ্চশিল্পী পরেশ বসুর দক্ষতা নাটকটির গুণগত উৎকর্ষ বিধানে যথেষ্ট সহায়ক হয়েছে।

মূল নাট্য বিশ্লেষণের পূর্বে প্রাচীন ভারতীয় সংস্কৃতির বিবর্তনের ঐতিহাসিক পটভূমিকাটি এখানে স্মরণ করা আবশ্যক। নচেৎ এই নাটকের অন্তর্নিহিত তাৎপর্য অনুধাবন দুরূহ হয়ে পড়বে। ভারতবর্ষের সংস্কৃতিতে আর্য অনার্যের বিরোধ ক্রমে ক্রমে অপসারিত হয়ে একটা পারস্পরিক সম্প্রীতির লক্ষ্যে অগ্রসর হতে থাকে। আর্য ঋষিরা প্রথম দিকের উন্নাসিকতা পরিহার করে অনার্য ধর্ম সংস্কারকে অঙ্গীভূত করতে সচেষ্ট হন। অনার্য দেবতারা ক্রমে আর্য ঋষিদের দ্বারা আদৃত হয়ে আর্য দেবতাদের পরিবারভুক্ত হয়ে পড়েন। তবে এই সংমিশ্রণের পশ্চাতে বহুযুগব্যাপী আর্য অনার্যের সংঘাতের একটা দীর্ঘ অধ্যায় আছে। আমাদের প্রাচীন পুরাণ-তন্ত্রে তার বহু নিদর্শন মেলে। এই নাটকের

আখ্যানভাগ সংস্কৃত পুরাণ তন্ত্র নির্ভর অনার্য শৈব উপাসকদের সঙ্গে আর্য কৃষ্ণ উপাসকদের সংঘাতের ওপরে ভিত্তি করে পরিকল্পিত।[১]

শিবভক্ত দৈত্যরাজ বাণের কন্যা উষাকে কৃষ্ণের পৌত্র অনিরুদ্ধ হরণ করে। ফলে বাণের সঙ্গে কৃষ্ণের প্রত্যক্ষ সংঘর্ষ উপস্থিত হয়। শিবের বরে বাণ অপরাজেয়. দেবরাজ ইন্দ্রের বজ্র কিম্বা শ্রীকৃষ্ণের সুদর্শন চক্র তার কেশাগ্র স্পর্শ করতে পারে না: তার বিরুদ্ধে প্রযুক্ত অস্ত্র স্বয়ং মহাদেব আপন হৃদয়ে গ্রহণ করেন। অনার্য দেবতা ভক্তবৎসল শিবের মহিমা প্রচারের জন্যেই এই রকম কাহিনীর সূত্রপাত। কেননা আর্য সংস্কার স্বীকরণের প্রবণতা অনার্য সমাজের ভেতর থেকেই ধীরে ধীরে শুরু হয়েছিল। এ নাটকে দৈত্যরাজ বাণের প্রবল প্রতিদ্বন্দ্বী শঠচূড়ামণি শ্রীকৃষ্ণ যতটা. তদপেক্ষাও অধিক. কন্যা উষা এবং মহিষী সুদক্ষিণা। এই অন্তর্ঘাত রোধের জন্যেই দেবতা শিবকে ভক্তের কাছে যথাসম্ভভ নির্ভরযোগ্য করে তোলার প্রযত্ন আছে। তবু ভক্তের সংশয় যায়নি: বাণের মহিষী সুদক্ষিণা মোহনমুরলীধারী কৃষ্ণ প্রেমে বিভোর. কন্যা উষা কৃষ্ণ সম্প্রদায়ে অনুপ্রবেশের জন্যে সদা ব্যস্ত। আসলে কৃষ্ণের মোহন মূর্তি এই দুই নারীকে প্রবলভাবে আকৃষ্ট করেছিল। নারী সুন্দরের উপাসক হাড় মালা বিভূষিত মহেশ্বর অপেক্ষা স্নিগ্ধ শ্যাম তনু গোবিন্দের প্রতি তাই তার পক্ষপাতিত্ব। এই পক্ষপাতকে স্তম্ভিত করতে দেবরাজ বাণ স্ত্রীর বিরুদ্ধে. কন্যার বিরুদ্ধে. আর্য দেবতাদের বিরুদ্ধে প্রতিহিংসা পরায়ণ। এমন কি এই প্রতিহিংসা বাণের নিজেরও ধর্ম বিশ্বাসের অন্ধ মমতার বিরুদ্ধে সক্রিয়।

কিন্তু শঠ চূড়ামণি শ্রীকৃষ্ণের শঠতার কাছে বাণের শক্তির দম্ভ ম্লান হয়ে গেছে। সাধনার দ্বারাই চেতনার জাগরণ সম্ভব: বাণের সাধনা কৃষ্ণ মহিমা খণ্ডনের- আর্যত্বের বিজয় রথকে চূর্ণ করে অনার্য মহিমার সুবর্ণ পতাকা উত্তোলন তার কর্ম সাধনার মূল লক্ষ্য। বাণের এই অনমনীয় দৃঢ়তা শ্রীকৃষ্ণকে বিচলিত করেছে— পদস্খলনের সম্ভাব্য দুর্গতির হাত থেকে নিস্তার লাভের সহজতম পন্থাটি তাই শ্রীকৃষ্ণকে বেছে নিতে হয়েছে। এই সহজতম পন্থাটি সিদ্ধিলাভেচ্ছু সাধককে পথভ্রষ্ট করে তার বিনাশকে নিশ্চিত করে তোলা। তবু আত্মরক্ষার কৌশলে আপাত বিজয় দৈত্যরাজ বাণের। আত্মসংযমী সাধকের দুশ্চর তপস্যার অনলে কৃষ্ণ প্রেরিত উর্বশীর কামকলার নির্লজ্জ প্রস্তাব ভস্মীভূত হয়ে গেছে। অতএব বিকল্প কৌশলের প্রয়োজন হয়ে পড়েছে। তাই উষা হরণের নিপুণ

---

[১] "পরিচয়" গ্রন্থের 'ভারতবর্ষে ইতিহাসের ধারা' প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথ এ বিষয়ে তথ্য নির্ভর আলোচনা করেছেন। প্রকৃত সত্য উদ্ঘাটনে সাহায্য করবে বলে এখানে কিছু অংশ উদ্ধার করছি। রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন-"আর্য-অনার্যে যখন অল্প অল্প করিয়া যোগ স্থাপন হইতেছে তখন অনার্যদের ধর্মের সঙ্গেও বোঝাপড়া করার প্রয়োজন ঘটিয়াছিল। এই সময়ে অনার্যদের দেবতা শিবের সঙ্গে আর্য উপাসকদের একটা বিরোধ চলিতেছিল. এবং সেই বিরোধে কখনো আর্যেরা কখনো অনার্যেরা জয়ী হইতেছিল। কৃষ্ণের অনুবর্তী অর্জুন কিরাতদের দেবতা শিবের কাছে একদিন হার মানিয়াছিলেন। শিবভক্ত বাণ অসুরের কন্যা উষাকে কৃষ্ণের পৌত্র অনিরুদ্ধ হরণ করিয়াছিলেন— এই সংগ্রামে কৃষ্ণ জয়ী হইয়াছিলেন।"

আয়োজন, বেত্রাসুর বধের পরিকল্পনা, মহাদেবের বরকে তারই বিরুদ্ধে কাজে লাগিয়ে রোহিতাশ্ব নিধন, মহাদেবের শক্তি গ্রহণ করে অনিরুদ্ধের নিরাপত্তার ব্যবস্থা। শ্রীকৃষ্ণের এই ছলনার বিরুদ্ধে ভক্তকে রক্ষা করতে স্বয়ং মহাদেবও অক্ষম। এ হেন পরিস্থিতিতে আত্মসমর্পণ ছাড়া বিগত শক্তি বাণের আর কোন উপায় ছিল না।

'মেঘনাদ বধ কাব্যের' রাবণ চরিত্রের সঙ্গে দৈত্যরাজ বাণের ভাগ্য বিপর্যয়ের অদ্ভুত সাদৃশ্য আছে। রাক্ষস রাজ রাবণের প্রতিদ্বন্দ্বী স্বয়ং ভগবান শ্রীরামচন্দ্র; দৈত্যরাজ বাণের বিরুদ্ধে সংগ্রামে অবতীর্ণ বিষ্ণুর অবতার শ্রীকৃষ্ণ। ভাগ্যের বিরূপতায় এবং দেবতার ছলনায় ত্রিলোক বিজয়ী রাবণের মর্মান্তিক পরাজয়; মহাদেবের শবরূপ ধারণে দৈত্যরাজ বাণের ভাগ্য বিপর্যয়ের শুরু এবং কৃষ্ণের চাতুর্যে তার বিনাশের ক্ষেত্র প্রস্তুত। রাণী মন্দোদরী স্বামীর পাপ কার্যকে সমর্থন করতে পারেনি, অন্তরে অন্তরে সে স্বামী বিরোধী; বাণ মহিষী সুদক্ষিণা স্বামীর কৃষ্ণ বিরোধে মর্ম যন্ত্রণায় দগ্ধ। মর্যাদার লড়াই-এ রাবণকে বিসর্জন দিতে হয়েছে লঙ্কার ভবিষ্যৎ, প্রিয়পুত্র মেঘনাদের সম্ভাবনাময় জীবন; আর কন্যা উষাকে কৃষ্ণের পদতলে সমর্পণ করে নিষ্কৃতির পথ খুঁজে নিতে হয়েছে দৈত্যরাজ বাণকে। পরিশেষে রাক্ষসরাজ রাবণের মতই দৈত্যরাজ বাণ শ্রীকৃষ্ণের শরণাগত-- একই দেহে হরিহরের উপলব্ধিতে সাম্যবাদী চেতনায় উন্নীত।

এ নাটকে মাঝে মাঝে নারী স্বাধীনতার প্রতি নাট্যকারের তীব্র ব্যঙ্গ প্রকাশিত হয়েছে। যুদ্ধের অভিঘাতে সামাজিক জড়ত্ব মুক্তির অন্যতম পদক্ষেপ হিসাবে গৃহমুখী নারীর, বিশ্বের উন্মুক্ত প্রাঙ্গণে আত্মপ্রকাশ, তখনো সমাজের সর্বস্তরে স্বীকৃতি লাভ করেনি। অন্যদিকে সতীধর্মের আদর্শকে উচ্চকণ্ঠে ঘোষণার অন্তিম চেষ্টাও এ নাটকে লক্ষ্যণীয় হয়ে উঠেছে। বাণের মহিষী সুদক্ষিণা স্বামীর আদর্শ বিরোধী হয়েও সতীত্বের প্রলোভনে প্রকাশ্য সংঘর্ষে বিমুখ। নাটকের সংলাপ সুখপাঠ্য। রোহিতাশ্বের সংলাপ Tragic relief সৃষ্টিতে এক কথায় চমৎকার।

॥ পুরীর মন্দির ॥

'স্টার' থিয়েটারে অভিনীত অশ্বিনী ঘোষের 'পুরীর মন্দির' এই পর্বের পৌরাণিক নাটকগুলির মধ্যে অন্যতম। ১৯৪২ র ১৮ই জুলাই নাটকটি প্রথম মঞ্চস্থ হয়ে বিপুল জন সমাদর লাভ করে। অস্পৃশ্যতা মুক্ত শুদ্ধ মানবতাবাদের আদর্শ, এই পৌরাণিক নাটকের আখ্যানের মধ্যে দিয়ে উচ্চকণ্ঠে ঘোষিত হয়েছে। সেকালের দর্শক সমাজে তা একটা স্বতন্ত্র আবেদন সৃষ্টি করেছিল। এইখানেই এর জনপ্রিয়তার উৎস নিহিত আছে। মহেন্দ্র গুপ্তের সুদক্ষ পরিচালনায় প্রথম অভিনয় রজনীতে বিভিন্ন চরিত্রে যাঁরা রূপদান করেন তাঁরা হলেন ঃ বলরাম -মঙ্গল চক্রবর্তী; নারায়ণ --শ্রীমতী শেফালী; বিশ্বকর্মা- পঞ্চানন চট্টোপাধ্যায়; ইন্দ্রদ্যুম্ন--জয়নারায়ণ মুখোপাধ্যায়; বিদ্যাপতি --সিদ্ধেশ্বর গাঙ্গুলী; শক্তিধর--আশুতোষ ভট্টাচার্য; বিশ্বাবসু -ভূপেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী; নীলাচলরাজ---গোপালচন্দ্র ভট্টাচার্য; রত্নসেন---সনৎ কুমার মুখোপাধ্যায়; মাতলা--পঞ্চানন বন্দ্যোপাধ্যায়; রাখাল---

মাস্টার সত্য: সুভদ্রা—রূপালী দাস: অবন্তীর রাণী—সন্ধ্যাদেবী: নীলাচল রাণী—তারকবালা: ললিতা—উষা দেবী: ময়না—বীণা: বুলবুলি—সরসী: এ ছাড়া সৈনিকগণ, ব্রাহ্মণগণ, সখীসঙ্ঘ প্রমুখ। এই নাটকের মঞ্চশিল্পী ছিলেন পরেশচন্দ্র বসু এবং সুরশিল্পী ধীরেন্দ্রনাথ দাস এবং গিরীন্দ্র চক্রবর্তী: নৃত্যশিল্পী ছিলেন হিমাংশু রায় এবং ব্রজবল্লভ পাল।

পুরীধামে মহাপ্রভু শ্রীশ্রীজগন্নাথ দেবের মন্দির প্রতিষ্ঠার পৌরাণিক আখ্যান অবলম্বনে 'পুরীর মন্দির' নাটকের বিষয়বস্তু পরিকল্পিত হয়েছে। কিন্তু কেবলমাত্র পৌরাণিক প্রসঙ্গের অবতারণা করেই নাট্যকার তাঁর দৃষ্টিভঙ্গিকে সীমায়িত রাখেননি। পুরাণ নির্ভর কাহিনীর সঙ্গে মানবতাবাদের সংমিশ্রণ ঘটিয়ে তাকে একালে উপযোগী করে পুনঃনির্মাণ করেছেন। অর্থাৎ পৌরাণিক উপাদানকে নতুন দিনের যুগ সঙ্কটের চিত্র রচনার উপকরণ হিসাবে সার্থক ব্যবহার করেছেন। মানবপ্রীতি—অস্পৃশ্যতা দোষ মুক্ত নির্মল মানব প্রীতি, ঈশ্বর প্রীতির শ্রেষ্ঠ পন্থা হিসাবে গুণীজন স্বীকৃত। এই তত্ত্ব ও আদর্শই যুদ্ধ বিধ্বস্ত মানব সমাজের সঙ্কট মুক্তির অনন্য পথ নির্দেশিকা হিসাবে এই নাটকে প্রতিষ্ঠিত এবং এইখানেই এই পৌরাণিক নাটক আধুনিকতার মন্ত্রে দীক্ষিত।

অবন্তীরাজ ইন্দ্রদ্যুম্ন মহারাণীর প্রসাধনের নিমিত্ত বণিক রত্নসেনের শ্রেষ্ঠ অগরু চন্দন লাভ করতে চান। তিনি রাজা, শক্তির উপাসক জগতের সমস্ত শ্রেষ্ঠ বস্তু কেবল তাঁরই ভোগের নিমিত্ত প্রস্তুত—এই অভ্রান্ত বিশ্বাসে তিনি অবিচল। তাঁর আদেশের বিরুদ্ধতাকে তিনি রাজদণ্ড এবং শক্তির অহংকারে চূর্ণ করতে বদ্ধপরিকর। বণিক রত্নসেন নীলমাধবের অনুগত ভক্ত। তাঁর জীবনের শ্রেষ্ঠ সম্পদ জগৎ পিতার পদতলে অর্পণ করে তিনি কৃতার্থ। দেবতার উদ্দেশ্যে নিবেদিত ধন তিনি রাজতুষ্টির প্রয়োজনে ব্যবহার করতে পারেন না। কেননা জগৎ কল্যাণের সঙ্গে তার কোন সম্পর্ক নেই—রাজ অন্তঃপুরের বিলাসমগ্নতায় জগতের অমূল্য সম্পদের বিনষ্টি তাঁর কাম্য নয়। যিনি জগন্নাথ, তাঁর বিশ্বসভায় ব্রাহ্মণ শবরে কোন ভেদ নেই, ভেদ নেই উচ্চ-নীচ, ধনবান-নির্ধনে: মানব-মৈত্রীর সেই মহাতীর্থে নিজেকে উজার করে দেবার ব্রত বণিক রত্নসেনের। রাজরোষ তাকে সংকল্পচ্যুত করতে পারে না। রত্নসেনের কল্যাণবোধের গুরুত্ব উপলব্ধির ক্ষমতা অবন্তী রাজের ছিল না। অহংবোধ তাঁর দৃষ্টিপথকে আচ্ছন্ন করে রেখেছিল। রাণীর মিনতিকেও উপেক্ষা করে তাই তিনি রত্নসেন ও তার পরিবারের সকলের হস্তপদ কর্তনের নির্দেশ দেন। ভক্তের এই যন্ত্রণা নিজ অঙ্গে ধারণ করে মহাপ্রভু হন ঠুঁটো জগন্নাথ।

রাণীর কাতর মিনতিতে স্বয়ং নারায়ণ আকাশ পথে দর্শন দিয়ে তাঁর প্রেমময় মোহনমূর্তির উপাসনার নির্দেশ দেন রাজাকে। নীলাচলনাথের কৃপাতেই হবে তাঁর ঔদ্ধত্যের অবসান। রাজা ঈশ্বরের প্রতিনিধি—প্রজাপীড়নে শক্তির অপচয় তিনি করতে পারেন না। ঈশ্বরের তা কাম্য নয়। ঈশ্বরের বিশ্বধ্বংসকারী রূপ কেবল দুষ্টের দমনের জন্যে, জগতে শান্তি, কল্যাণ প্রতিষ্ঠার জন্যে। কিন্তু অবন্তীরাজ তখনো সংশয়মুক্ত হতে পারেননি। নীলাচলনাথকে বন্দী করতে তিনি সেনা প্রেরণ করেন। ব্যর্থ হয় তারা। বাহুবলে তাঁকে লাভ করা যায় না—তিনি আসেন প্রেমের টানে। জাত্যাভিমান মুক্ত রাজ সেনাপতি

বিদ্যাপতি নিয়ে আসেন নীলাচলনাথ নীলমাধবকে। অবন্তীরাজ্যে শান্তি-প্রেম প্রতিষ্ঠার জন্যে, রাজার অহংকার চূর্ণ করার জন্যেই অবন্তীরাজ্যে তাঁর আগমন।

অবন্তী রাজের ভুল ভাঙতে তখনো কিছু বিলম্ব ছিল। অবন্তীর রাজপ্রাসাদে নীলাচলনাথ নীলমাধবের প্রতিষ্ঠা সম্পন্ন করলেন তিনি। সে মন্দিরে নিষিদ্ধ হল অব্রাহ্মণের প্রবেশাধিকার। কিন্তু শাস্ত্রমতে ব্রাহ্মণের নিবেদিত অন্ন গ্রহণ করলেন না নারায়ণ—পরম তৃপ্তিতে তিনি গ্রহণ করলেন অস্পৃশ্য শবররাজ বিশ্বাবসুর নিবেদিত অন্ন। খর্ব হল ব্রাহ্মণের মিথ্যা অহংকার। বিপন্ন রাজাকে রক্ষা করতে যশোদানন্দন গোপাল চক্রধারী নারায়ণ রূপে আত্মপ্রকাশ করে বিদিশা সৈন্যের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করলেন। চৈতন্য হল অবন্তীরাজের। তিনি উপলব্ধি করলেন—শক্তিতে নয়, ভক্তিতে জাগেন নারায়ণ। ভক্তির কোন জাত নেই, ধর্ম নেই, বর্ণ নেই। অবন্তীরাজের ভ্রাতৃত্ববোধে এই উত্তরণই আলোচ্য নাটকের মূল উপজীব্য বিষয়। দেবতাকে উপলক্ষ করে মানব চরিত্রের উন্নয়নের সম্ভাবনাকে নাট্যকার উজ্জ্বল করে তুলেছেন। সমকালীন জীবন সঙ্কটের লগ্নে এই প্রত্যয় ছিল বাঞ্ছিত—এইখানেই এ নাটকের ঐতিহাসিক গুরুত্ব।

অবন্তীরাজ ইন্দ্রদ্যুম্নের সংকল্পে কোন ফাঁকি ছিল না, ভ্রান্তি ছিল তাঁর অনুসৃত পন্থায়। এই পন্থাটুকু সংশোধনের প্রয়োজন ছিল। কেননা ইন্দ্রদ্যুম্ন আর বিশ্বাবসু—এই দুই পরস্পর বিরোধী শক্তির সম্মিলনেই প্রস্তুত হবে শ্রীক্ষেত্র পুরীতে মানব মিলনের মহাতীর্থ। সেখানে পরম ভক্ত রত্নসেনের কর্তিত অঙ্গের সাক্ষ্য বহন করে বিরাজ করবেন বিকলাঙ্গ নারায়ণ, বলরাম সুভদ্রাকে সঙ্গে নিয়ে। তাই অন্তর্হিত হলেন নীলমাধব অগাধ সমুদ্রে—ফিরে এলেন দারুমূর্তি নিয়ে বিশ্বাবসুর হাত ধরে। বৃদ্ধ স্থপতির ছদ্মবেশে দেবশিল্পী বিশ্বকর্মা ভার নিলেন দারুখণ্ড কেটে মূর্তি নির্মাণের। কিন্তু তাঁর শর্ত ছিল রুদ্ধদ্বার কক্ষে একুশটি দিন রাত্রি ধরে তিনি সম্পূর্ণ করবেন নির্মাণকার্য। তার পূর্বে কোনক্রমে দ্বার মুক্ত হলে সেই অসম্পূর্ণ অবস্থাতেই তিনি সাঙ্গ করবেন তাঁর নির্মাণ কার্য। দেবতার ছলনায় স্বয়ং রাণী চৌদ্দদিনে দ্বার মুক্ত করলে অন্তর্হিত হয়ে যান দেবশিল্পী বিশ্বকর্মা। রাণীকে উপলক্ষ করে এইভাবে বলরাম সুভদ্রাকে নিয়ে আত্মপ্রকাশ করেন অঙ্গহীন জগন্নাথ।

নীলমাধবের মহাসমুদ্রে অন্তর্ধান, বিশ্বাবসুর সমুদ্রগর্ভে আত্মাহুতি, ইন্দ্রদ্যুম্নের চৈতন্যোদয়, বিকলাঙ্গ জগন্নাথের আত্মপ্রকাশ—প্রভৃতি ঘটনার ব্যঞ্জনা অতীব গভীর। এই প্রকার অলৌকিক কাহিনীর নাট্যরূপদানও যথেষ্ট কঠিন। নাট্যকার অত্যন্ত কৃতিত্বের সঙ্গে এই সমস্ত অলৌকিক ঘটনার মধ্যে সুষ্ঠু সমন্বয় ঘটিয়েছেন। নীলমাধব তো আর কেউ নন, তিনি স্বয়ং নারায়ণ, তিনিই জগন্নাথ। সমুদ্রের মতই তিনি বিশাল এবং ব্যাপ্ত। আত্মনিষ্ঠ সাধক ছাড়া তাঁর এই রূপের আরাধনা সাধারণের ক্ষমতার বাইরে। বিশ্বাবসু ঐকান্তিক সাধক—তাঁর আত্মবৎ ঈশ্বরসেবা। তাই ঈশ্বরের ব্যাপ্তি ও বিশালতার মধ্যে তিনি লীন

হতে পেরেছিলেন।[১] ইন্দ্রদ্যুম্ন সেই অর্থে সাধক নন; তাঁর ভক্তি, ভগবান ও ভক্তের নিরাপদ দূরত্ব অতিক্রম করতে পারেনি। সংসারের আর্ত পীড়িত মানুষ সযত্ন রক্ষিত দূরত্বে ঈশ্বরের কৃপা প্রার্থনা করে। জগন্নাথ দেবের মন্দির সেই সব আর্ত-পীড়িত ব্রাহ্মণ, চণ্ডালের জন্য সদা উন্মুক্ত। ইন্দ্রদ্যুম্ন তার আদি রূপকার। জগন্নাথ জগতের নাথ— জগতের যেখানে যত ব্যথা, যত দুঃখ, যত গ্লানি বাজে যে তাঁরই বুকে। ভক্তের দুঃখ-বেদনাকে অঙ্গীকৃত করেই তো তিনি ঠুঁটো জগন্নাথ।

এই নাটকের সংলাপ অত্যন্ত চমৎকার। কোন কোন ক্ষেত্রে নাট্যকার ছন্দময় কাব্যিক বাকভঙ্গি ব্যবহার করেছেন। বিশেষ করে দেব চরিত্রগুলির মুখে কাব্যময় সংলাপ আলাদা ব্যঞ্জনা সৃষ্টি করেছে। নাটকের সংগীতগুলি শ্রুতিমধুর এবং ইঙ্গিতপূর্ণ। তবে চরিত্রগুলিতে অন্তর্দ্বন্দ্বের পরিচয় ততটা স্পষ্ট হয়ে ওঠেনি। এই কারণে চরিত্রগুলিকে অনেক সময় নিরুত্তাপ মনে হয়েছে। পিতা বিশ্বাবসুর জন্যে কন্যা ললিতার মমতা, উৎকণ্ঠা অত্যন্ত হৃদয়স্পর্শী। এই শবর কন্যাটি পাঠককে সর্বক্ষণ আকর্ষণ করে। মাতলা ও ময়না প্রসঙ্গ যথেষ্ট কৌতুকাবহ। সর্বোপরি মানবতাবাদের আদর্শ এই নাটকের আখ্যানকে অবলম্বন করে যেভাবে প্রকাশিত হয়েছে তা নিঃসন্দেহে প্রশংসার যোগ্য।

কথিত আছে, মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্য কৃষ্ণজ্ঞানে নীলাচলের সমুদ্রে ঝাঁপ দিয়ে পড়েছিলেন। আত্ম সমাহিত সাধকের এইরূপ ভাব সমাধি ঘটে থাকে। সংসারের বোধ বুদ্ধি দ্বারা তার ব্যাখ্যা চলে না।

চতুর্থ অধ্যায়

ইতিহাস-অবলম্বিত নাটক

ইতিহাসের বিষয় নিয়ে রচিত নাটক মাত্রই ঐতিহাসিক নাটক নয়; লক্ষণ বিচারে তার ক্ষেত্র সীমিত এবং স্বতন্ত্র। ইতিহাসের পাত্র পাত্রী ও ঘটনার সূত্র সমবায়ে নাট্যকার ঐতিহাসিক রস ঘনীভূত করে তোলেন এই শ্রেণীর নাটকে। ঐতিহাসিক নাটকেও কল্পনার অবকাশ আছে-- কিন্তু সে কল্পনা ইতিহাসকে লঙ্ঘন করে নয়, ইতিহাস যেখানে নীরব, কল্পনা সেখানে একটা যোগসূত্র রচনা করে মাত্র।[১] ইতিহাস কথাটির বুৎপত্তিগত অর্থ-- ইতি হ আস- -এই রূপই ছিল; অর্থাৎ অতীত দিনের আনুপূর্বিক বিবরণই ইতিহাস। যুক্তি ও তথ্যের প্রামাণিকতায় তা প্রতিষ্ঠিত। কিন্তু প্রচলিত ইতিহাসে অতীত দিনের সামগ্রিক চিত্র বহুলাংশে অনুপস্থিত। ইতিহাসের বাহন অবশ্যই রাষ্ট্র; রাষ্ট্র বলতে আমরা বুঝি একটি ভৌগোলিক পরিকাঠামোয় লক্ষ লক্ষ সাধারণ নরনারীর জীবনচর্যা—রাষ্ট্র কেবল রাষ্ট্রনায়কের রাজনৈতিক উত্থান পতনের রঙ্গভূমি নয়। রাজনীতির জটিল আবর্তে সাধারণ মানুষের জীবনে যে বিপর্যয়, যে মর্মান্তিক বেদনার হাহাকার, ইতিহাসের ঘটনা প্রবাহে হৃদয়দ্বন্দ্বের যে রহস্যময়তা ঘনিয়ে ওঠে প্রচলিত ইতিহাস সেখানে নীরব দর্শক মাত্র। আবার ইতিহাসখ্যাত রাষ্ট্রনায়কও রাজ্য ও রাজনীতি পরিচালনার হৃদয়হীন যন্ত্র মাত্র ছিলেন না; কেবলমাত্র যুদ্ধবিগ্রহ আর কঠিন কঠোর রাজকার্য পরিচালনার আবর্তে তাঁদের জীবনচক্র আবর্তিত হয়নি। রাজ্য-রাজনীতির বাইরে তাঁরাও মানুষ ছিলেন, তাঁদেরও ব্যক্তিগত একটা জীবন ছিল—মানব মনের বিচিত্র ভাবানুভূতি সে জীবনকেও কম বেশী আলোড়িত করেছিল। কিন্তু প্রচলিত ইতিহাসে রাজনৈতিক ব্যক্তিত্বের সেই মানবসত্তার পরিচয় সম্পূর্ণ অনুপস্থিত। শিল্পীর লক্ষ্য ইতিহাসের এই অলিখিত দিকটির প্রতি। অর্থাৎ ঐতিহাসিক সত্যকে অবিকৃত রেখে মানব মনের বিচিত্র ঘাত-প্রতিঘাতের

---

[১] ইতিহাস নিয়ে গল্প রচনায়, সাহিত্য ও ইতিহাসের পারস্পরিক সম্পর্কটি রবীন্দ্রনাথ সুন্দরভাবে ব্যাখ্যা করেছেন, তাঁর মতে –"রসের সৃজনটাই উদ্দেশ্য, অতএব সেজন্য ঐতিহাসিক উপকরণ যে পরিমাণে যতটুকু সাহায্য করে, সে পরিমাণে ততটুকু লইতে কবি কুণ্ঠিত হন না।"-'সাহিত্য' গ্রন্থের 'ঐতিহাসিক উপন্যাস' প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য।

রহস্য উদ্‌ঘাটন এই শ্রেণীর শিল্পের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য। ইতিহাসের ভগ্নস্তূপ থেকে তথ্য-সম্ভার চয়ন করে তার শিল্প-সম্মত রূপ নির্মিতি ঐতিহাসিক নাটককে নাটকের পর্যায়ে উন্নীত করে তোলে। ঐতিহাসিক সত্য ও তথ্যের নিরেট কাঠামোর ওপরে পরিশীলিত কল্পনার রূপসজ্জায় তা বিশিষ্টতা লাভ করে। তবে কল্পনা যদি ইতিহাসকে অতিক্রম করে যায় কিম্বা ঐতিহাসিক সত্য অপেক্ষা কাল্পনিক কাহিনী চরিত্র-ঘঠনা প্রাধান্য লাভ করে, তখন তাকে খাঁটি অর্থে ঐতিহাসিক নাটক বলা চলে না। আবার শুধু মাত্র ইতিহাসের প্রসঙ্গ অনাবশ্যক ভাবে নাট্যকাহিনীর গতি রোধ করে দাঁড়ালেও তাকে ঐতিহাসিক নাটক বলা যাবে না। অর্থাৎ তথ্য ও কল্পনার সুনির্দিষ্ট ভারসাম্য রক্ষাই এ ক্ষেত্রে মূল কথা।

আর তাই বাংলায় খাঁটি ঐতিহাসিক নাটকের সংখ্যা নিতান্তই সামান্য। সেই কারণে নাটকের শ্রেণী নির্ধারণে 'ঐতিহাসিক' বিশেষণটি গ্রহণ করতে অসুবিধার সৃষ্টি হয়েছে। সে ক্ষেত্রে খাঁটি অর্থে 'ঐতিহাসিক নাটক' ছাড়াও, ইতিহাসের প্রসঙ্গ কোন না কোন ভাবে আছে---এমন নাটকের জন্যে পৃথক শ্রেণী নির্ধারণ প্রয়োজন হয়ে পড়ে এবং সংখ্যায় এদেরই প্রাচুর্য। সম্ভবত এই বিতর্ক এড়াতে কোন কোন সমালোচক 'ইতিহাসাশ্রয়ী নাটক', 'ইতিহাস অনুসৃত নাটক' ইত্যাদি শ্রুতিমধুর নামের আড়ালে আত্মগোপন করে অর্থহীন চমক সৃষ্টিতে প্রয়াসী হয়েছেন। কিন্তু ইতিহাসকে মূল আশ্রয় করে অথবা ইতিহাসের যথাযথ অনুসরণ করে নাটক রচিত হলে 'ঐতিহাসিক' অভিধাটি স্বচ্ছন্দে ব্যবহার করা যেত - বিকল্প শব্দের অন্বেষণ প্রয়োজন হত না। বরং কাল্পনিক কাহিনী রসকে ঘনীভূত করে তোলার জন্যে অধিকাংশ বাংলা নাটকে ইতিহাসের পটভূমি সংস্থাপিত হয়েছে দেখতে পাই। ইতিহাসকে আশ্রয় করে নয়, ইতিহাসের যথাযথ অনুসরণ করেও নয়---ইতিহাসকে অন্যতম অবলম্বন করেই এই সমস্ত নাটক রচিত হয়েছে। তাই বাস্তব পরিস্থিতি স্মরণে রেখে এই সমস্ত নাটককে আমরা নির্দিষ্ট করেছি 'ইতিহাস-অবলম্বিত নাটক' রূপে। এই অভিধায় ইতিহাসের বিষয় নিয়ে রচিত নাটক মাত্রকে শ্রেণীভুক্ত করতে অসুবিধার কোন কারণ দেখি না।

গিরিশ যুগ প্রধানত 'পৌবাণিক নাটকের' যুগ। সেকালের রঙ্গমঞ্চের চাহিদা মেটাতে পৌরাণিক নাটকের বিশিষ্ট ভূমিকা ছিল। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের ক্রান্তিলগ্নে সেই চাহিদা মেটাতে অনেকাংশে এগিয়ে এসেছে 'ইতিহাস অবলম্বিত নাটক'। বিশ্বব্যাপী রণোন্মাদনার প্রেক্ষাপটে আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে বিপুল হতাশা, জাতীয় জীবনে অতীত ইতিহাসের পাতা উল্টে দেখতে এ দেশের মানুষকে অনুপ্রাণিত করেছিল। বঙ্গ রঙ্গমঞ্চে সেই প্রত্যাশার প্রতিফলন ছিল অপরিহার্য। এই দাবীকে স্বীকার করে নিয়েই এ কালের খ্যাতনামা নাট্যকারদের কেউ কেউ ইতিহাসের বিষয় নিয়ে নাটক লিখেছেন এবং রঙ্গমঞ্চের সর্বাঙ্গীন সাফল্যের পথে তা যথেষ্ট সহায়কও হয়েছে। তবে এই সমস্ত নাটকে ইতিহাসের বিশুদ্ধতা সব সময় রক্ষিত হয়নি। তার কারণ প্রথমতঃ অতীত গৌরবের স্মারক উদ্ধারে অতি-আগ্রহ দৃষ্টিভঙ্গিকে সব সময় নিরপেক্ষ থাকতে দেয়নি। দ্বিতীয়তঃ পরাধীন দেশের

নির্ভরযোগ্য ইতিহাস রচিত হবার মত বাতাবরণ তখনো সৃষ্টি হয়নি - রচিত হয়ওনি। প্রামাণ্য ঐতিহাসিক তথ্যের অভাবে ইতিহাস নির্ভর কিংবদন্তীর ওপরে নির্ভর করা ছাড়া গত্যন্তর ছিল না।

বিষয় নির্বাচনেও এ কালের নাট্যকার ভিন্ন পথের সন্ধান করেছেন। এতকাল বাংলা নাটকে প্রধানত মোঘল ইতিহাসের প্রাধান্য দেখা গেছে; দ্বিজেন্দ্রলালের নাটকগুলি তার প্রমাণ। কখনো কখনো রাজপুতানার বীরত্বব্যঞ্জক কাহিনী সংযুক্ত হয়েছে প্রচলিত ধারার পরিপূরক রূপে। কিন্তু যুগের প্রয়োজনে এই পর্বে এসে উৎসেরও পরিবর্তন দরকার হয়ে পড়ল। মোঘল ইতিহাসের রাজনৈতিক উত্থান-পতনের কাহিনী বহুল ব্যবহারে নব উদ্দীপনা সঞ্চারে বিশেষ সহায়ক ছিল না; এবং কালের বিস্তৃত ব্যবধানে সে স্মৃতিও অস্পষ্ট হয়ে পড়েছিল। তদুপরি বাঙালীর জাতীয় গৌরবের কোন দৃষ্টান্ত সে ইতিহাসে অনুপস্থিতই ছিল। ফলে বাংলা তথা ভারতের আঞ্চলিক রাজবংশের সেই সব গৌরবোজ্জ্বল অধ্যায়ের দিকে দৃষ্টি ফেরাতে হল, সমকালীন পরিস্থিতিতে জনমনে যা শ্রদ্ধার আসনে প্রতিষ্ঠিত এবং কালের বহু দূরত্ব যেখানে অস্পষ্টতা সৃষ্টি করেনি। মহারাজ নন্দকুমার, সুলতান টিপু বা রাণী ভবানী অনেক আগে থেকেই মানুষের হৃদয়ে স্থান লাভ করেছিলেন। ভারতের স্বাধীনতা যুদ্ধের প্রাক পুরোহিত রূপেই দেশের মানুষ তাঁদের চিহ্নিত করে রেখেছিল। সমকালীন রাষ্ট্রনৈতিক অনিশ্চয়তার যুগে এই সব বীরগাথা জনসমাজে যে সমাদৃত হবে তাতে আর আশ্চর্য কি? ইতিহাস চর্চার মধ্যে দিয়ে স্বদেশ ও স্বজন এই সমস্ত নাটকে একটা বিশিষ্ট রূপ লাভ করেছে। তৎসহ জাতীয় জীবনে শৃঙ্খল মুক্তির প্রবলতম অন্তরায় দূরীকরণে হিন্দু ও মুসলমানের পারস্পরিক সম্প্রীতির প্রশ্নটি সচেতন ভাবেই কোন কোন নাটকে উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে। অর্থাৎ সাম্প্রদায়িক বিভেদের ঊর্ধে সঙ্কীর্ণতামুক্ত বৈপ্লবিক সমাজ বিবর্তনের পথেই ভারতবর্ষের চরমতম সিদ্ধি ও আত্ম-প্রতিষ্ঠাকে, সর্বপ্রথম বৈজ্ঞানিক চেতনার আলোকে উপলব্ধি করেছেন এ কালের নাট্যকার।

॥ অভিযান ॥

১৯৩৯-এ দিলওয়ার হোসেন এবং চণ্ডী বন্দ্যোপাধ্যায় 'মিনার্ভা থিয়েটারে' লেসীরূপে যোগদান করেন। 'মিনার্ভা' র তখন টালমাটাল অবস্থা। উক্ত লেসীদ্বয়ের তত্ত্বাবধানে ১৯৩৯-র ১লা সেপ্টেম্বর 'মিনার্ভা' মঞ্চে প্রথম মঞ্চস্থ হয় মহেন্দ্র গুপ্তের ইতিহাস অবলম্বিত নাটক 'অভিযান'। হিটলারের নাৎসী বাহিনীর পোল্যাণ্ড আক্রমণের মধ্যে দিয়ে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের আনুষ্ঠানিক সূচনাও ঘটে ১৯৩৯-র ১লা সেপ্টেম্বর। সেদিক থেকে ঐ দিনটি নিশ্চয় উল্লেখযোগ্য। সে যাই হোক, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধকালীন বাংলা নাটকের ধারায় প্রথম অভিনীত নাটক হিসাবে আমরা পাই মহেন্দ্র গুপ্তের এই নাটকটি। নির্মলেন্দু লাহিড়ীর পরিচালনায় প্রথম অভিনয় রজনীর অভিনেতৃ তালিকাটি ছিল নিম্নরূপ : গিয়াসুদ্দীন তোঘলক—দেবেশ্বর ভট্টাচার্য; মহম্মদ তোঘলক—নির্মলেন্দু লাহিড়ী; মালেক খসরু—কামাখ্যা চট্টোপাধ্যায়; বাহাউদ্দীন—শৈলেন চ্যাটার্জী; ফিরোজ—দেবী মুখার্জী

(পরে সুনীল মুখার্জী); জাফর খাঁ - সত্যেন রায়; পীর বাহরাম - জীবন মুখার্জী; কিচলু খান সন্তোষ শীল; আবদাল্লা রজনী ভট্টাচার্য; ইব্রাহিম অরুণ চট্টোপাধ্যায়; আমেদ - রবীন চট্টোপাধ্যায়; বৃক্কা রায় - বিজয় নারায়ণ মুখার্জী; রণমল্ল মিহির মুখার্জী; আমেদ হোসেন - পান্নালাল মুখার্জী; গঙ্গু বাহমনী রমেশ মুন্সী (দাশগুপ্ত); প্রদীপ কুমার - শেফালিকা; আব্দুল খগেন দাস; হোসেন হরিদাস ব্যানার্জী; সানন্দা শ্রীমতি নিভাননী; শিরিবাণু - মিস উমা মুখার্জী; গুলবাণু - সুবাসিনী; মুন্না - মিস নীহারিকা দত্ত; এছাড়া ফকিরগণ, সুবাদারগণ, বেদুইনগণ, সখীগণ, জনতা ইত্যাদি। নাটকে সুরারোপ করেন রাধাচরণ ভট্টাচার্য এবং মঞ্চ পরিকল্পনায় ছিলেন রাজেনবাবু ও অনিল সর্বাধিকারী।

দিল্লীর সুলতানি আমলের ইতিহাস অবলম্বনে 'অভিযান' নাটকের বিষয়বস্তু পরিকল্পিত। তোঘলক বংশের প্রতিষ্ঠাতা গিয়াসুদ্দীন তোঘলকের পুত্র ইতিহাসের 'পাগলা রাজা' মহম্মদ বিন তোঘলকের উত্থান, পতন এবং রাজত্বকালের ইতিহাস বর্তমান নাটকের উপজীব্য বিষয়। ইতিহাসের বিচিত্র চরিত্র মহম্মদ বিন তোঘলক (তুঘলক) অসাধারণ পণ্ডিত, খামখেয়ালী, নিষ্ঠুর অস্থির চিত্ত; সুকৌশলে ইনি পিতার মৃত্যু ঘটিয়ে সিংহাসনে আরোহণ করেন। মহম্মদ বিন তোঘলক সাম্রাজ্যের মধ্যস্থলে, দাক্ষিণাত্যের দেবগিরিতে রাজধানী স্থানান্তরের চেষ্টা করলে সাধারণ প্রজারা বিপাকে পড়ে। মহম্মদের শাসনকালে সারা দেশে বিদ্রোহের আগুন ছড়িয়ে পড়ে- বাংলাদেশ স্বাধীনতা ঘোষণা করে; দক্ষিণ ভারতে বাহমনী নামে মুসলিম রাজ্যের, বিজয়নগরে হিন্দু রাজত্বের উদ্ভব ঘটে। একে একে সারা দেশ জুরে স্বতন্ত্র ছোট ছোট রাজ্য গড়ে ওঠে এবং অবশেষে সুলতানি সাম্রাজ্য ভেঙ্গে পড়ে। এই ঐতিহাসিক ঘটনা পরম্পরা নির্ভর করে 'অভিযান' নাটকের কাহিনী গড়ে উঠেছে। কিন্তু ইতিহাসের যথাযথ অনুসরণ নাট্যকার করেননি। ঐতিহাসিক সত্যকে যথা সম্ভব অক্ষুন্ন রেখে ইতিহাসের ঘটনাপুঞ্জকে নাটকীয় উপাদানের সংমিশ্রণে, নাট্যরস পরিবেশনে ব্যবহার করেছেন। ঐতিহাসিক মহম্মদ বিন তোঘলক নাট্যকারের সৃষ্টিতে রক্ত মাংসের মানুষ হয়ে উঠেছেন- -কালের দিক থেকে অতীতচারী হয়েও এই চরিত্রটি ভাল মন্দ, ন্যায়-অন্যায় স্নেহ-প্রেম প্রভৃতি মানবিক ঘাত-প্রতিঘাতে একালেরই মুখপাত্র হয়ে উঠেছে।

সুবে বাংলার বিদ্রোহ দমনকারী বৃদ্ধ পিতা সুলতান গিয়াসুদ্দীন তোঘলকের সাদর অভ্যর্থনার নিমিত্ত মহম্মদের শিল্পী মন নির্মাণ করিয়েছিল চন্দনকাঠের বিচিত্র তোরণ-মিনার। ভণ্ড ফকিরদের কূট কৌশলে মত্ত হাতীর পায়ের চাপে ভেঙ্গে পড়ে সেই মিনার- - অপমৃত্যু ঘটে বৃদ্ধ সুলতানের। পিতৃভক্ত মহম্মদ মর্মান্তিক বেদনায় হাহাকার করে ওঠেন। প্রজা-সাধারণ পিতৃহন্তা রূপে চিহ্নিত করে মহম্মদকে। ক্ষোভে, দুঃখে, যন্ত্রণায় সিংহাসনের উত্তরাধিকারী মহম্মদ নিষ্ঠুর আক্রোশে প্রজা পীড়নে উন্মত্ত হয়ে ওঠেন। এইখানেই ঐতিহাসিক মহম্মদের সঙ্গে এই মহম্মদের পার্থক্য—এ মহম্মদও প্রজা পীড়ক—কিন্তু তার মূলে আছে পিতৃবিয়োগের যন্ত্রণা এবং অপবাদের দুঃসহ জ্বালা।

মহম্মদ বিলাসকলায় অভ্যস্ত আয়েসী সুলতান মাত্র নন। তাঁর অবসর কাটে হারেমের মদিরা মত্ত কক্ষে নয় - দিল্লী প্রাসাদের পাঠাগারে, জ্ঞান চর্চায়। ধর্মের নামে ভণ্ডামি তিনি সহ্য করেন না; বুভুক্ষু নরনারীর ক্ষুধার জ্বালা মেটাতে রাজকোষ নিঃশেষ করে তিনি দান করেন; বিদ্রোহী হিন্দু রাজার মহিষীর সতীধর্ম রক্ষার্থে তিনি উন্মুক্ত কৃপাণ হস্তে এগিয়ে আসেন; মৃত্যু পথ যাত্রী সৈনিকের তৃষ্ণাকাতর আর্তনাদ তাঁর হৃদয়কে মর্মব্যথায় পীড়িত করে তোলে। ইতিহাসে এই মহম্মদকে আমরা পাইনা। মানব-দরদী মহান দেশনায়ক তাঁর অনন্যসাধারণ গৌরবে এই নাটকে উপস্থিত।

মহম্মদ কেবল সুলতান মাত্র নন, তিনিও পিতা সন্তান বাৎসল্যে আমাদেরই সগোত্রীয়। বেদুইন শেখের সদ্য মাতৃহারা রক্তস্নাত শিশুকন্যা শিরিবাণু শুধু তাঁর পালিত কন্যাই নয়—তাঁর আদরের নিধি, তাঁর যথা সর্বস্ব। এই সন্তানকে ঘিরেই তাঁর বাৎসল্য অনুরণিত হয়ে উঠেছে। কন্যা শিরীণার (শিরিবাণু) আনন্দে তিনি উৎফুল্ল হয়ে ওঠেন, তার দুঃখে তাঁর চোখ অশ্রু সজল হয়ে ওঠে। তার হাসিতে হাসি যোগ করে, তার কথায় সুর মিলিয়ে, তার প্রেম দিয়ে নিজের অতৃপ্তিকে তৃপ্ত করে মহম্মদ জীবনের অর্থ খুঁজে পান। আসলে বিপত্নীক মহম্মদ অন্তরে রিক্ত, দরিদ্র - তিনি সুলতান, বিপুল ঐশ্বর্য তাঁর ধনভাণ্ডারে, অসীম শৌর্য তার বাহুতে কিন্তু প্রেয়সী নারীর ভালবাসা থেকে তিনি বঞ্চিত। এই নিঃসঙ্গতাই মহম্মদকে প্রজানুরঞ্জক মহম্মদকে বহিরঙ্গে রূঢ়, নিষ্ঠুর করে তুলেছে। শিরিণার সান্নিধ্য, সাহচর্য তাঁকে রূঢ়তার খোলস থেকে মুক্ত করে নির্মল শ্বাস গ্রহণের সুযোগ দেয়। তাই শিরীণাকে হারাতে তিনি পারেন না, তার জন্ম বৃত্তান্ত সযত্নে গোপন রাখেন।

দেশ জুড়ে বিদ্রোহের আগুন দিল্লীর সিংহাসনকে ধীরে ধীরে গ্রাস করতে এগিয়ে আসছিল। দক্ষ প্রশাসক মহম্মদ সেই সম্ভাবনা সম্পর্কে সম্পূর্ণ সচেতন ছিলেন। দক্ষিণ ভারতে বিজয়নগরে বিদ্রোহী হিন্দু রাজা বুক্কারায়কে দমন করতে তিনি প্রেরণ করেন বিশ্বস্ত জাফর খাঁকে। জাফর খাঁ সুলতানের বিরুদ্ধে অস্ত্র ধারণে উদ্যত হয়। মহানুভব সুলতান তাকে প্রাণভিক্ষা দিয়ে পুনরায় প্রেরণ করেন দেবগিরির বিদ্রোহ দমনে। মহম্মদের মহানুভবতার সুযোগ নিয়ে বেইমান জাফর খাঁ স্বাধীন বাহমনী রাজ্যের সূচনা করে। জন্মভূমি দেবগিরি পুনরুদ্ধারে আজন্ম বিশ্বস্ত রাজ অনুচর মালেক খসরু এবং ফিরোজ খাঁকে দায়িত্ব দিয়ে পাঠান সেখানে। জন্মভূমির প্রতি খসরুর গভীর মমতায় অভিভূত মহম্মদ স্বদেশের সেবায় স্বাধীনভাবে আত্মনিয়োগে নিযুক্ত করেন তাকে। অন্যদিকে সানন্দাকে তিনি ভগিনী রূপে স্বীকার করেছিলেন; তাই বেইমান ভাগিনেয় কোষাধ্যক্ষ বাহাউদ্দীনকে বিতারিত করে স্বাধীন বিজয় নগরের শাসনকর্তা রূপে সগৌরবে স্বীকৃতি জানান বুক্কারায়কে। মহম্মদ বোধহয় বুঝে ছিলেন তাঁর বিদায়কাল সমাগত, নইলে অখণ্ড ভারতের স্বপ্নদ্রষ্টা সুলতানের এই বিপরীত চিন্তা কেন? তুষারাবৃত পর্বতের দুর্জ্ঞেয় রহস্যের মধ্যে মহম্মদের অন্তর্ধান, যেন তাঁর চিত্তবৃত্তিকেও গভীর রহস্যে আবৃত করে রেখেছে। সেই রহস্যেই নাটকের সমাপ্তি।

॥ রাণী দুর্গাবতী ॥

মহেন্দ্র গুপ্তের রাণী 'দুর্গাবতী' নাটকটি ১৯৪৩ র ১লা জানুয়ারী 'স্টার' রঙ্গমঞ্চে প্রথম আত্মপ্রকাশ করে তরঙ্গ বিক্ষুব্ধ ভারতবর্ষের উত্তাল পটভূমিতে! ১৯৪২-র আগস্ট আন্দোলনে সরকারী বঞ্চনা আর জনস্বার্থের প্রতি চরম ঔদাসীন্যের বিরুদ্ধে যে ক্ষোভ, বেদনা এবং জনরোষ গর্জে উঠেছিল, কলকাতার রঙ্গালয়গুলিতেও তার জোয়ার এসে লেগেছিল। দেশাত্মবোধের প্রেরণায় নতুন করে উদ্দীপ্ত হয়ে উঠেছিলেন রঙ্গালয়ের নেপথ্য সংগঠনকারীরা। একালের নাট্য নির্বাচন তথা অভিনয়ে তার প্রতিফলন যথেষ্ট। স্বদেশ ভাবনার বিশিষ্ট অঙ্গীকার নিয়েই রঙ্গমঞ্চে মহেন্দ্র গুপ্তের 'ইতিহাস অবলম্বিত নাটক' 'রাণী দুর্গাবতী'র আত্মপ্রকাশ।

'রাণী দুর্গাবতী' জনসমাদৃত নাটক; দুর্গাবতীর ত্যাগ, তিতিক্ষা, সর্বোপরী স্বদেশপ্রীতির সুমহান আদর্শ একালের নাট্যরসিক দর্শককে অনুপ্রাণিত করেছিল। নাট্যকারের নির্দেশনায় প্রথম অভিনয় রজনীতে বিভিন্ন চরিত্রে রূপদান করেন : আকবর ভূপেন চক্রবর্তী; বৈরাম খাঁ - জয়নারায়ণ মুখার্জী; বজবাহাদুর সিদ্ধেশ্বর গাঙ্গুলী; দলপৎশাহ কার্তিক চন্দ্র সরকার; বীরনারায়ণ -শ্রীমতি আশালতা; ভাওসিং গোপাল ভট্টাচার্য; আসফ খাঁ বিমল ঘোষ; পীর মহম্মদ পঞ্চানন চ্যাটার্জী; অধর সনৎ মুখার্জী; কেশর সিং- মুরারী মুখার্জী; বিক্রমজিৎ- রবি রায় চৌধুরী; আব্দার রহিম শ্রীমতি গীতা; ইসমাইল খাঁ -গোষ্ঠ ঘোষাল; আদম খাঁ মিহির মুখার্জী; রাণী দুর্গাবতী অপর্ণাদেবী; রূপমতী বীণা দেবী; সেলিমা উষা দেবী; মাহুম আঙ্গা- রাজলক্ষ্মী (বড়); গুলনেয়ার মুকুল জ্যোতি প্রমুখ। মঞ্চ ও সুর সংযোজনায় ছিলেন যথাক্রমে পরেশ বসু ও ধীরেন দাস।

গড়মণ্ডলাধিপতি দলপৎশাহের পত্নী বীরাঙ্গনা রাণী দুর্গাবতীর, দেশের স্বাধীনতা রক্ষায় আত্মাহুতির গৌরবময় ইতিহাস অবলম্বনে বর্তমান নাটকটি রচিত। বিপুল শক্তিধর মোঘল, প্রতিহিংসা পরায়ণ প্রতিবেশী রাজ্য মালব এবং সেনাপতি ভাও সিংহের বিশ্বাসঘাতকতা- এই তিন বিরুদ্ধ শক্তির মোকাবিলায় বিচক্ষণতা, কূটনীতি ও দূরদৃষ্টিতে রাণী দুর্গাবতী যথার্থই আপামর জনসাধারণের সুযোগ্যা 'মাতাজী'। রাজ্য পরিচালনায় - ঘোর সঙ্কটে রাজ্যের নীতি নির্ধারণে, গড়মণ্ডলের প্রখর রাজনীতি জ্ঞান সম্পন্না রাণী, রাণা দলপৎসাহের তুলনায় অগ্রগণ্যা। অমিত বিক্রম মোঘলের লোলুপ আগ্রাসন থেকে আত্মরক্ষা ও মর্যাদা রক্ষার প্রয়োজনে ভারতের স্বাধীন রাজ্যগুলির সমস্ত বিভেদের উর্ধে উঠে সঙ্ঘবদ্ধ হওয়াটাই যে বিপন্ন রাজনৈতিক পরিস্থিতিতে প্রধান বিচার্য বিষয় এই সত্য রাণী দুর্গাবতী মর্মে মর্মে উপলব্ধি করেছিলেন। তাই মালব রাজ্যের রাণী রূপমতীর রাখী বন্ধনের আমন্ত্রণে দলপৎশাহকে নিভৃত সাক্ষাতে উৎসাহিত করেছেন। এই বোধ থেকেই তিনি মালবের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণের শর্তে মোঘলের সন্ধির প্রস্তাব দৃঢ়চিত্তে প্রত্যাখ্যান করেছেন। মালবরাজ বজবাহাদুরের আচরণ ঘৃণ্য সন্দেহ নেই। নিরস্ত্র দলপৎকে অতর্কিতে অস্ত্রাঘাত করে তিনি গড়মণ্ডলকে অনর্থক শত্রু করে তুলেছেন; কিন্তু উভয় রাজ্যের এই

বিরোধকে উপলক্ষ করে মোঘলের সাম্রাজ্য বিস্তারের পথ যাতে সুগম না হয় তাই মাল্ডবের স্বাধীনতা হরণ করতে তিনি সম্মত হননি। রাণী স্বামীর ধর্মভগিনীর সম্ভাব্য বৈধব্যে শিহরিত হয়ে নিঃসঙ্কোচে ক্ষমা করেছেন বজবাহাদুরকে। এই বিচক্ষণতা, এই কূটনীতি জ্ঞান, এই সহমর্মীতা রাণী দূর্গাবতীকে বিরল মর্যাদায় ভূষিত করেছে। ভারত রাষ্ট্রের আভ্যন্তরীণ রাজ্যগুলির পারস্পরিক কলহ, বৃটিশ রাজশক্তিকে পরোক্ষে শক্তিদান করে ভারত রাষ্ট্রের স্বাধীনতা-পতাকাকে পদদলিত করে রাখার ঐতিহাসিক সত্যকে ভিন্ন প্রেক্ষাপটে উপস্থাপিত করেছেন নাট্যকার। বিচ্ছিন্নতাবাদ থেকে, অন্তর্কলহ থেকে বিরত হওয়ার সময় উপস্থিত- এই সত্যকে উপলব্ধি না করে সেদিন উপায় ছিল না। জাতি, ধর্ম, বর্ণ নির্বিশেষে ঐক্যের আমন্ত্রণ রাণী দূর্গাবতীর কণ্ঠে পৌনঃপুনিক উচ্চারিত হয়ে জাতিকে আত্ম বিশ্লেষণের পথ দেখিয়েছে।

ছদ্মবেশী সম্রাট আকবরের মহানুভবতায় বিপন্ন দলপৎকে ফিরে পেয়েছেন রাণী। সম্রাটকে শ্রদ্ধা জানাতেই তিনি সদ্য মৃত স্বামীর শোকপালনের জন্য, পক্ষকালের যুদ্ধ বিরতির প্রস্তাব নিয়ে দৌত্য কার্যে প্রেরণ করেন বালকপুত্র বীর নারায়ণকে। কিন্তু সিদ্ধান্তে ভুল ছিল রাণীর। মোঘল বাহিনীর নেপথ্য নির্ধারক সম্রাট আকবর নন- সম্রাটের অভিভাক বৈরাম খাঁ। বৈরামের নির্দেশ চালিত সেনাধ্যক্ষ পীর মহম্মদের কাছে এই সৌজন্য প্রদর্শন যুদ্ধ বিজয়ের অপ্রত্যাশিত সুযোগ রূপেই উপস্থিতঃ গড়মণ্ডলের বিশ্বাসঘাতক সেনাপতি তার সহায়- আর তারই ফলশ্রুতিতে বন্দী বীরনারায়ণ প্রেরিত হন আগ্রায়। তবে বৈরামের মোঘল বাহিনীর হিসাব যেমনই হোক, দূর্গাবতীর পদচ্ছায়ায় লালিত বিশ্বাসঘাতক ভাও সিংহের ছকে তো ভুল হবার কথা নয়। পুত্রশোকে কাতর রাণী মোঘলের দাসত্বে স্বীকৃত হয়ে পুত্রের প্রাণরক্ষা করতে চাইবেন – এ দুরাশা ভাওসিংহের হৃদয়ে জাগ্রত হল কি ভাবে? সিংহাসন লাভের কষ্ট কল্পনা সম্ভবত ভাও সিংহের বোধবুদ্ধি আচ্ছন্ন করে ফেলেছিল। অচিরেই তাকে প্রত্যক্ষ করতে হয়েছিল সদ্য স্বামীহারা এই রাজপুত রমণীর, একমাত্র পুত্রের প্রত্যাবর্তনের প্রত্যাশা প্রতিহত জননীর দুরন্ত বিক্রমে বিপর্যস্ত মোঘল বাহিনীর অসহায় পশ্চাদাপসরণ!

রাণী দূর্গাবতীর প্রতিদ্বন্দ্বী প্রকৃতপক্ষে সম্রাট আকবর নন, সম্রাটের অভিভাবক বৈরাম খাঁ। ইতিহাসখ্যাত বৈরাম খাঁর সঙ্গে এই বৈরামের পার্থক্য বিস্তর। ঐতিহাসিক বৈরাম খাঁ সম্রাট আকবরের অভিভাবক, পথ প্রদর্শক, তার পরম হিতাকাঙ্ক্ষী। কিন্তু এই নাটকে অভিভাবকত্বের সুযোগে বৈরাম খাঁ ক্ষমতালিপ্সু, স্বার্থান্বেষী, কর্তৃত্বের প্রতিযোগিতায় সে সম্রাটের ধাত্রীমাতা মাহম আঙ্গার বিরোধীপক্ষ। মাহম আঙ্গার সম্মুখে ক্ষমতা প্রদর্শনের নিমিত্তই তার সম্রাটের ইচ্ছার বিরুদ্ধে খুসরোজ উৎসব বন্ধের আদেশ প্রদান, কুমার বীর নারায়ণকে হত্যার সঙ্কল্প। বৈরাম খাঁর সঙ্গে আকবরের সংঘাত অনিবার্য ছিল—ধাত্রীমাতা মাহম আঙ্গা তাকে কিঞ্চিৎ ত্বরান্বিত করেছে। বৈরামের প্রভুত্ব খর্ব করাই ছিল তার প্রধান উদ্দেশ্য। বৈরামের উপস্থিতি মাহমের প্রতিষ্ঠা অর্জনের পথে সব থেকে বড় অন্তরায়—সে অন্তরায় দূর করতে তার সব থেকে বড় হাতিয়ার সেলিমা। আকবরের মনোনীতা পত্নী

সেলিমাবাণুকে বিবাহ করতে মাহুম উৎসাহিত করেছে বৈরামকে. অন্যদিকে সেই তথ্য আকবরের কাছে সরবরাহ করে বৈরামের বিরুদ্ধে দণ্ড দানে তাকে প্ররোচিত করেছে। কূট কৌশলে শেষ পর্যন্ত বৈরাম পরাজিত মাহুম আঙ্গার কাছে।

সম্রাট আকবর, বৈরাম খাঁ বনাম মাহুম আঙ্গার দ্বন্দ্বে দ্বিধাগ্রস্ত চরিত্র। সিদ্ধান্ত গ্রহণে দ্বৈধী মনোভাব সম্রাট আকবর চরিত্রের সর্বাপেক্ষা বড় ত্রুটি। দিগ্বিজয়ের নেশা পিতৃপুরুষের রক্তধারায় তার শিরায় শিরায় সঞ্চারিত। বৈরামের যুদ্ধোন্মাদনা তাকে অলক্ষ্যে তৃপ্ত করে। আবার প্রেয়সী নারীর সাহচর্য বঞ্চিত তার বুভুক্ষু হৃদয় বঞ্চিত, বিপন্নকে আশ্রয় দানের চেষ্টায় সদা উন্মুখ। এই দুই বিপরীত প্রবৃত্তির সংঘাতে ব্যক্তি আকবরের চরিত্র সমুজ্জ্বল।

বজ বাহাদুরের পত্নী রাণী রূপমতী স্বদেশ চেতনায় উদ্বুদ্ধ। বিপথগামী স্বামীর ভ্রান্তি নিরসন করে তাকে তিনি গৌরবের জয়মাল্য পরিয়েছেন। স্বামীর প্রতি তার অনুরাগ সংশয়ের উর্ধে। আসফ খা এবং পীর মহম্মদের কূট চক্রান্তও এই দুই নারী-পুরুষের হৃদয়ের সম্পর্কটিকে কলুষিত করতে পারেনি। সর্বোপরি এই নাটকে হিন্দু-মুসলমানের পারস্পরিক সম্প্রীতির বিষয়টিকে সর্বাধিক গুরুত্ব দিয়েছেন নাট্যকার।

॥ মহারাজ নন্দকুমার ॥

মহেন্দ্র গুপ্তের জনপ্রিয় 'ইতিহাস অবলম্বিত নাটক' 'মহারাজ নন্দকুমার' সম্ভবত ১৯৪৩-র মার্চ/এপ্রিল মাসের কোন সময়ে 'স্টার' রঙ্গমঞ্চে প্রথম আত্মপ্রকাশ করে। শ্রীযুক্ত সুশীল মুখোপাধ্যায় মহাশয় নাটকটির প্রথম অভিনয় তারিখ ৪ঠা জুন বলে উল্লেখ করেছেন।[১] সেকালে প্রধানত 'অমৃত বাজার পত্রিকায়' নাটকাভিনয়ের বিজ্ঞাপন, বিজ্ঞপ্তি নাট্য সমালোচনা প্রভৃতি নিয়মিত প্রকাশিত হত। 'অমৃত বাজার পত্রিকায়' ১৯৪৩-র ৪ঠা জুন তারিখে নাটকটির প্রথম অভিনয় সংক্রান্ত কোন বিজ্ঞাপন কোথাও প্রকাশিত হয়নি। বরং ঐ পত্রিকায় ১৯শে জুন থেকে কয়েকদিন নাটকটির অভিনয়ের সংবাদ পাওয়া যাচ্ছে।[২] কিন্তু তা পুনরভিনয় মাত্র—প্রথম অভিনয়ের কোন উল্লেখ সেখানে নেই। 'স্টারে' এর অব্যবহিত পূর্ববর্তী নাটক 'কৃষ্ণার্জুন' মঞ্চস্থ হয় ১৯৪৩-র ২রা ফেব্রুয়ারী তারিখে। তৎপূর্বে 'মহারাজ নন্দকুমার'-এর অভিনয়ের কোন সংবাদ নেই। অতএব নাটকটির ১৯৪৩-র ফেব্রুয়ারীর পর থেকে জুন মাসের মধ্যে প্রথম অভিনয় হবার সম্ভাবনা। অথচ সংবাদপত্রের পাতা তন্ন তন্ন করে খুঁজেও আমরা এই সংক্রান্ত কোন বিজ্ঞাপন বা বিজ্ঞপ্তি পাইনি। তবে ১৯৪৩-র মার্চ-এপ্রিলে একমাত্র 'মিনার্ভা' ছাড়া কোন নাট্যশালার কোন রকম বিজ্ঞাপন প্রকাশিত হয়নি। মুদ্রিত নাট্যগ্রন্থটিতেও প্রথম অভিনয় সংক্রান্ত কোন তথ্য পাওয়া যাচ্ছেনা। কাজেই বিরুদ্ধ প্রমাণ না পাওয়া পর্যন্ত,

---

১ The story of The Calcutta Theatres. pp 268

২ The Amrita Bazar Partrika. 18th. 19th. 20th June. 1943

যুক্তি নির্ভর অনুমানের ওপরে ভিত্তি করে মহারাজ নন্দকুমারের নাটমঞ্চে আত্মপ্রকাশের সময়-সীমা ১৯৪৩ র মার্চ/এপ্রিল মাসকে নির্দিষ্ট করা সব দিক থেকে সঙ্গত।

বিভিন্ন সূত্র থেকে 'মহারাজ নন্দকুমার' নাটকের প্রথম অভিনয়ের একটি অসম্পূর্ণ অভিনেতৃ তালিকা উদ্ধার করা সম্ভব হয়েছে। নাট্যকারের নির্দেশনায় অভিনীত এই নাটকে নামভূমিকায় অবতীর্ণ হন—জয় নারায়ণ মুখার্জী, কামালউদ্দীন—সিধু গাঙ্গুলী, ওয়ারেন হেস্টিংস—ভূপেন চক্রবর্তী, ক্লেভারিং—ভূমেন রায়, ক্ষমাদেবী—নিরুপমা, লুৎফউন্নিসা—বীণাদেবী এবং মণি বেগমের ভূমিকায় অপর্ণা; এ ছাড়া রেখা দত্ত এবং পঞ্চানন বন্দ্যোপাধ্যায়ের নাম তালিকায় পাওয়া যাচ্ছে, তবে কোন চরিত্রে কে অভিনয় করেছিলেন তার হদিস পাওয়া যায়নি। নাটকের দৃশ্যপট নির্মাণ করেন পরেশ বসু।

'মহারাজ নন্দকুমার' ঐতিহাসিক ব্যক্তিত্বের জীবন কথা নির্ভর নাটক। মহারাজা নন্দকুমারের রাজনৈতিক উত্থান পতনের মর্মন্তুদ কাহিনীকে অবলম্বন করে রোমান্সধর্মীতার উদ্ভব আলোচ্য নাটকে। নন্দকুমারের ত্যাগ তিতিক্ষা, ধৈর্য-নিষ্ঠা, আদর্শপরায়ণতা, স্বাধীনতা-স্পৃহা, 'ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীর' কূট চক্রান্তে জালিয়াতির অপবাদে ফাঁসির মঞ্চে জীবন বলিদান—নাটকীয় ঘাত প্রতিঘাতের মধ্যে দিয়ে বিন্যস্ত হয়েছে। বেনিয়া কোম্পানীর অপশাসনে বাংলা তথা ভারতের দুর্দশার চিত্র এখানে দেশ নায়কের কর্মকাণ্ডের গতিশীল প্রেক্ষাপট হিসাবে ব্যবহৃত হয়েছে। নন্দকুমারের কর্মময় জীবনালেখ্যকে যথা সম্ভব আলোকিত করতে সমকালীন ইতিহাসের দ্বন্দ্ব-বিক্ষুব্ধ পটভূমিতে নাট্যকার এই চরিত্রটিকে দাঁড় করাতে চেয়েছেন। এইভাবে ঐতিহাসিক চরিত্র মহারাজ নন্দকুমার স্বদেশ চেতনার গভীরতর উপলব্ধিতে উপনীত হয়ে একনিষ্ঠ দেশ নায়কের মর্যাদা লাভ করেছে। কিন্তু তৎসত্ত্বেও স্বদেশী আন্দোলনের বিস্তৃত পরিচয় এখানে অনুপস্থিত; নন্দকুমারের প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ প্রভাবজনিত গণ জাগরণের কোন ইঙ্গিতও এখানে নেই। তাই এই নাটকটিকে 'ইতিহাস অবলম্বিত নাটক' হিসাবে বিচার করাই সকল দিক থেকে শ্রেয়।

মহারাজ নন্দকুমার সম্পর্কিত ঐতিহাসিক তথ্য চয়ন করে নাটকটি রচিত। তবে ঐতিহাসিক তথ্যকে বাঙালী ভাবাবেগের জারক রসে জারিত করে নিয়েছেন নাট্যকার। তাতে সমকালীন দর্শকের প্রত্যাশা পূরণ হয়ত হয়েছে, কিন্তু চরিত্রটির ঐতিহাসিক মর্যাদা কিছু পরিমাণে ক্ষুণ্ণ হয়েছে। তৎকালীন বঙ্গদেশে মহারাজ নন্দকুমার বিরল-দৃষ্টান্ত ঐতিহাসিক ব্যক্তিত্ব। একাধিক নবাবের অধীনে তিনি উচ্চ-রাজপদ অলঙ্কৃত করেন; রাজকার্যে বিচক্ষণতার স্বীকৃতি স্বরূপ দেওয়ান নন্দকুমার দিল্লীশ্বরের প্রদত্ত মহারাজা উপাধিতে ভূষিত হন। ওয়ারেন হেস্টিংসের জন স্বার্থ বিরোধী রাজস্ব নীতির বিরোধিতার কারণে কোম্পানীর সঙ্গে তাঁর সংঘাতের সূত্রপাত এবং পরিশেষে বুলাকি দাসের উইল জালের দণ্ডনীয় অপরাধে প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত হন তিনি। নন্দকুমারের বিরুদ্ধে কোম্পানীর অভিযোগ জালিয়াতির—তবে সেটি নিতান্তই গৌণ; নন্দকুমারের সর্বাপেক্ষা গুরুতর অপরাধ, তিনি হেস্টিংসের বিরুদ্ধাচারী। তাই তাঁর নিধন অবশ্যম্ভাবী হয়ে পড়েছিল। অথচ হেস্টিংস তথা কোম্পানীর এই প্রতিহিংসাপরায়ণতার প্রতিবিধানকল্পে তিনি সক্রিয়ভাবে উদ্যোগী

নন; আবেগ-তাড়িত নন্দকুমার জীবন বিড়ম্বনার কেন্দ্রমূলে দৈব নির্বন্ধের অভ্রান্ত বিশ্বাসে স্থিতপ্রজ্ঞ দার্শনিক।

নাটকের শুরু মনসুরগঞ্জ প্রাসাদে (হীরাঝিলে) নবাব সিরাজের মর্মর মূর্তির পাদদেশে নতজানু নন্দকুমারের আত্মধিক্কারের মধ্যে দিয়ে। নবাবের বিরুদ্ধে বেইমানি ও ষড়যন্ত্রের গভীর লজ্জা ও তীব্র অনুশোচনাবোধ দগ্ধ করেছে নন্দকুমারকে; পলাশীর প্রান্তরে নবাব সিরাজের পরাজয় এবং ঘাতকের হাতে শোচনীয় মৃত্যু বরণ তার আত্ম সংশোধনের সম্ভাবনাটুকুও নির্মূল করে দিয়েছে। আত্মদহনের এই মর্মান্তিক পীড়া, একদা রাজদ্রোহের ভ্রান্ত দর্শন থেকে নন্দকুমারকে উপনীত করেছে গভীর রাষ্ট্রপ্রেমের নিঃসংশয় প্রত্যয়ে। এইখানেই চরিত্রটির নাটকীয় সার্থকতা। তবে নন্দকুমার বীর নায়ক কখনই নন --প্রতিবাদে তিনি সোচ্চার কিন্তু আপামর জন সাধারণের সুযোগ্য নেতারূপে প্রতিরোধের দুর্জয় সংকল্পের একান্ত অভাব তাঁর চরিত্রে। তাঁকে বিনম্র চিত্তে শ্রদ্ধা করা চলে কিন্তু তাঁর ওপর নির্ভর করা চলে না। তাই তাঁর নির্মম অপসৃতি ব্যাপক জনরোষে মূর্ত হয়ে ওঠেনি।

হিন্দু সংস্কার ও ঐতিহ্য নন্দকুমার চরিত্রের অদৃশ্য নিয়ন্ত্রাশক্তি তাঁর রাষ্ট্র প্রেমের গভীরে এই সংস্কারের উদ্দীপনা প্রবল। স্ত্রী ক্ষমাদেবীর মধ্যেও তা পূর্ণমাত্রায় বিদ্যমান। নন্দকুমার আসন্ন মৃত্যুর পরপারে সুনিশ্চিত প্রশান্তির প্রত্যাশায় আত্ম সমাহিত সাধক; লক্ষ ব্রাহ্মণের পদধূলি মস্তকে ধারণে বিপন্মুক্তিতে তাঁর গভীর আস্থা। বুলাকি দাসের দলিল ক্ষমাদেবীর কাছে সর্বনাশের প্রতীক, তুলসীমঞ্চে নির্বাপিত মঙ্গলদীপ তাঁর অন্তরাত্মাকে বিমূঢ় করে তোলে, লক্ষ্মীজনার্দনের ভগ্নমূর্তি আসন্ন দুর্দিনের ইঙ্গিত বহন করে আনে। এ হেন পরিস্থিতিতে এই নাটকে অন্তর্দ্বন্দ্বের ঘাত-প্রতিঘাত স্পষ্ট হয়ে ওঠেনি; পার্থিব জীবনে অপ্রাপ্তি, জনিত দুঃখ ও বেদনাবোধ যখন অতিলৌকিক নির্মল বিশ্বাসের দ্বারা পরিমার্জিত তখন হৃদয়-দ্বন্দ্বের কোন অবকাশ থাকে না; যন্ত্র ও যন্ত্রীর অলঙ্ঘনীয় বিধান-নির্ভরতা জীবন সংগ্রামের সৈনিককে পদে পদে শৃঙ্খলিতই করে। তাই কেবলমাত্র বহিরঙ্গ ঘটনাকে কেন্দ্র করে এখানে নাট্যদ্বন্দ্ব আবর্তিত হয়েছে। তার একপ্রান্তে এককভাবে মহারাজা নন্দকুমারের এবং অপর প্রান্তে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানী এবং তার অনুগামীবৃন্দের অবস্থান।

নন্দকুমারের বিচার কিম্বা বিচারের নামে প্রহসন, সুসভ্য ইংরেজ জাতির সভ্যতার অহংকারকে চুরমার করে দিয়েছে। জালিয়াতি দমনে কেবলমাত্র ইংল্যান্ডের জন্যে প্রবর্তিত হয়েছিল Statute of George II আইন--ভারতবর্ষে তা প্রযোজ্য নয়। অপরাধীর একমাত্র শাস্তি এই আইনে মৃত্যুদণ্ড। এই নতুন আইনে নিয়ম বহির্ভূত ভাবে নন্দকুমারের বিচারের ব্যবস্থা, বিচারের উদ্দেশ্যকে স্পষ্ট করে তুলেছে। এমনকি, জুরী নির্বাচনে বিচারপ্রার্থীর ইচ্ছা সেখানে উপেক্ষিত--বিচারের অধিকারও সুপ্রীম কোর্টের এক্তিয়ারের বাইরে। সুপ্রীম কোর্টের এলাকা কেবলমাত্র কলকাতা, কলকাতার বাইরে সুদূর মুর্শিদাবাদে সংঘটিত অপরাধের বিচারের দায়িত্ব তৎকালে সুপ্রীম কোর্টের ওপরে ন্যস্ত হয়নি। বিচারের নামে এই প্রহসন স্বয়ং লাটবাহাদুর হেস্টিংসের বিবেক বোধকেও আঘাত করেছে। তাই গঙ্গাগোবিন্দ

কামালউদ্দীন প্রমুখের আয়োজিত আনন্দ উৎসবে ক্লান্ত, অবসন্ন লাটবাহাদুর উপস্থিত থাকতে পারেননি। মর্মব্যথায় নিদারুণ পীড়িত ক্লেভারিং এবং তাঁর কন্যা। কিন্তু পরাধীন দেশের মেরুদণ্ডহীন জাতি এ যন্ত্রণা উপলব্ধির ক্ষমতাই হারিয়ে ফেলেছিল।

এডমন্ড বার্ক প্রসঙ্গ নাটকে কালানৌচিত্য দোষে দুষ্ট। ওয়ারেন হেস্টিংসকে তার অপশাসন এবং স্বেচ্ছাচারিতার জন্যে পরবর্তীকালে বৃটিশ পার্লামেন্টে অবনত মস্তকে জবাবদিহি করতে হয়েছিল। কিন্তু নন্দকুমারের জীবদ্দশায় সে ঘটনা ঘটেনি। নাটকের শেষ দৃশ্যে শবযাত্রার ধ্বনি এবং নতুন প্রভাতের সূর্যোদয় বৃটিশ শাসনের অবসানে স্বাধীন ভারতের অভ্যুদয়ের তাত্ত্বিক ব্যঞ্জনায় মূর্ত। ছিয়াত্তরের মন্বন্তরে অনাহার ক্লীষ্ট দেশবাসীর মর্মান্তিক হাহাকারের বিপরীতে হেস্টিংসের মদত পুষ্ট রেজা খাঁর চরম নির্মমতা এ নাটকে বৃটিশ শাসনের অবক্ষয়কে তুলে ধরেছে। নাটকের সংলাপ সাবলীল, গতিশীল এবং সঙ্গীত শ্রুতি মধুর।

॥ ধাত্রীপান্না ॥

'নাট্যভারতীতে' অভিনীত সর্বশেষ নাটক 'ধাত্রীপান্না'। 'নাট্যভারতীর' অন্তিম পর্বে আত্মরক্ষার এই শেষ প্রচেষ্টাটিও কার্যত ব্যর্থ হয়। অথচ সমালোচনার মানদণ্ডে শচীন্দ্রনাথ সেনগুপ্তের বিংশতি সংখ্যক নাটক 'ধাত্রীপান্না' তাঁর 'ইতিহাস অবলম্বিত নাটকের' শ্রেণীতে সর্বোৎকৃষ্ট রচনা। প্রযোজনা বা অভিনয়েও তেমন কোন ঘাটতি ছিলনা। তবু প্রধানত আভ্যন্তরীণ সঙ্কট এবং প্রবল অর্থাভাবে তাদের এই উদ্যোগ মোটেই ফলপ্রসূ হয়নি। 'নাট্যভারতী' মঞ্চে 'ধাত্রীপান্না', নাটকের শুভ উদ্বোধন ঘটে ১৯৪০ র ১৮ই নভেম্বর, শিশির মল্লিকের প্রযোজনায় এবং নরেশচন্দ্র মিত্র ও সতু সেনের যৌথ পরিচালনায়। সহকারী পরিচালক রূপে কাজ করেন রবীন্দ্র মোহন রায় এবং জহর গাঙ্গুলী। প্রথম অভিনয় রজনীর চরিত্রলিপি নিম্নরূপ ঃ বনবীর—জহর গাঙ্গুলী; জগমল—রবীন্দ্রমোহন রায়; বিক্রমজিৎ—কৃষ্ণধন মুখোপাধ্যায়; করমচাঁদ—শিবকালী চট্টোপাধ্যায়; বীরমল্ল—সনৎ মুখোপাধ্যায়; আপ্পা—কানন মুখোপাধ্যায়; নবকিশোর—শান্তি গুপ্ত; বারি—বেচু সিংহ; যোধমল—সলিল বন্দ্যোপাধ্যায়; কর্ণজি—কালী সরকার; মুকুলজি—মণি মজুমদার; রাঘব—সুধাংশু মুখোপাধ্যায়; পরভু—বিপিন বসু; সেনানী—কুমার মিত্র ও তুলসী চক্রবর্তী; পান্না—সরযূবালা; শীতলসেনী—প্রভা; উদয়—(বড়) বীণা, (ছোট) গীতা; চম্পা—ছায়া এবং কনক—কেতকী।

পান্নার গভীর দেশপ্রেম, অবিচল রাজভক্তি এবং বিরল দৃষ্টান্ত আত্মত্যাগের সকরুণ মহিমায় উজ্জ্বল 'ধাত্রীপান্না' নাটক। জননী শীতল সেনীর প্রতিহিংসা চালিত পুত্র বনবীরের নৃশংসতার সম্মুখে দণ্ডায়মান এই নারীর নিষ্ঠা ও কর্তব্য পরায়ণতা তার ললাটে অঙ্কন করেছে গৌরবের অশ্রু সজল রাজটীকা। গর্ভজাত নিষ্পাপ শিশুপুত্রের বক্ষরক্তে ধৌত করে সে নির্মল করেছে মেবারের রাজ সিংহাসন। পান্না তো শুধু উদয়সিংহের ধাত্রীমাতা নয়, কনককান্তির গর্ভধারিণী জননীও কেবল নয় সে—সে যে সমগ্র মেবারের পরম

করুণাময়ী কল্যাণকারিনী ধাত্রী জননী। প্রতিহিংসা পরায়ণা শীতল সেনী এবং তদীয় পুত্র নৃশংস বনবীরের কলুষ স্পর্শ থেকে মেবারের গৌরবময় রাজ সিংহাসন, মেবারের ইজ্জত রক্ষার ব্রত তার। হিমালয় দুহিতা পার্বতী যোগী শ্রেষ্ঠ মহাদেবের কৃপা বাঞ্ছায় পর্ণ গ্রহণ পর্যন্ত পরিত্যাগ করে অপর্ণা হয়েছিলেন—স্বদেশ ভূমি মেবারের মর্যাদা রক্ষায় ভগবান একলিঙ্গের যজ্ঞপীঠে অঙ্গজ পুত্র কনককান্তিকে বলিদান দিয়ে ধাত্রীপান্না বিশ্ব জননীর স্বর্ণাসনে প্রতিষ্ঠিতা। বীরাচারী সাধকের মতই সে সাধন মার্গের বিঘ্ন অপসারণে সন্তান বাৎসল্যের অপরিত্যাজ্য মমত্বকে পর্যন্ত নির্দ্বিধায় উৎসর্গ করে দুর্লভ সিদ্ধিলাভ করেছে। এই মহাযজ্ঞে শীতলসেনী তন্ত্রধারক, বনবীর ঘাতক, দেশমাতৃকা ও ভগবান একলিঙ্গ প্রকৃতি ও পুরুষ রূপী অর্ধনারীশ্বর মূর্তিতে বিরাজমান আর ধাত্রীপান্না স্থিরলক্ষ্য মহা সংযমী সাধিকা! ইন্দ্রত্বচ্যুতির আশঙ্কায় আশঙ্কিত দেবরাজ ইন্দ্রের নির্মম পরীক্ষায় সসম্মানে উত্তীর্ণ পৌরাণিক শিবিরাজ উশীনরের গৌরবকেও যেন ম্লান করে দিয়েছে পান্না ধাত্রীর ত্যাগ ও আত্মদানের মহিমা।

পান্নার বিচারে মহারাণা সঙ্গের সিংহাসনের উত্তরাধিকার জ্যেষ্ঠপুত্র বিক্রমজিতের পর তারই কনিষ্ঠ সহোদর উদয়সিংহের। পৃথ্বীরাজের অবৈধ সন্তান শীতলসেনীর গর্ভজাত বনবীরের তাতে কোন অধিকার নেই। কর্ণজি, করমচাঁদ, বীরমল্ল, মুকুলজি প্রমুখ মেবার সর্দারগণের, রাণা বিক্রমজিতের আচরণে অসহিষ্ণুতা জনিত রাজদ্রোহ রাণা বিক্রমজিতের গুপ্ত হত্যা নিশ্চিত করেছে; বালক উদয়সিংহের পথকে করেছে কণ্টকিত; রাজ্যের ভাগ্যকে করে তুলেছে অনিশ্চিত। অন্যদিকে অপমানিতা শীতলসেনীর সুপ্ত প্রতিশোধ স্পৃহাকে রূপান্তরিত করেছে জিঘাংসায়। এ হেন ঘোর সঙ্কটে কর্তব্য নির্ধারণ করতে বিলম্ব হয়নি ধাত্রীপান্নার। বনবীরের নির্মম ঘাতকের তীক্ষ্ণ অস্ত্রের লক্ষ্য এড়িয়ে উদয় সিংহের নিরাপদ আশ্রয়ের সন্ধানে গভীর অরণ্যপথে ব্যাপৃত সদ্য সন্তানহারা এই জননী, সন্তানের নিমিত্ত কান্নার অবকাশটুকুও পায়নি। শুধু ঐকান্তিক কর্তব্যনিষ্ঠা আর অমিত মনোবলে শেষ পর্যন্ত পঞ্চ সহস্র ভীলের নেতৃত্বে দ্বাদশ রাজপুত সর্দারের দ্বারা আসন্ন ফাল্গুনী পূর্ণিমায় উদয় সিংহের অভিষেকের আয়োজন সম্পূর্ণ করেছে সে; অনুতপ্ত মেবার সর্দারদের বিশ্বাস অর্জনে প্রাণহানির আশঙ্কা সত্ত্বেও বনবীরের সম্মুখে আত্মপ্রকাশেও বিন্দুমাত্র দ্বিধা করেনি। শীতলসেনীর শত অত্যাচারও তাকে টলাতে পারেনি—তার আত্মত্যাগের উজ্জ্বল কিরণে, নৃশংস বনবীরও লজ্জাবনত মস্তকে আত্ম-দৈন্যের মর্মপীড়ায় কাতর। পান্না চরিত্রের সর্বাপেক্ষা গৌরবময় দিক পুত্রহন্তা বনবীরের প্রতি নিঃশর্ত ক্ষমা প্রদর্শন। হিংসা নিবারণে প্রতিহিংসার পথ গ্রহণযোগ্য নয়—শান্তি দয়া, প্রেম আর ক্ষমা, হিংসা বিদ্বেষ জর্জরিত চিত্তকে সংশোধনে উদ্বুদ্ধ করে। উত্তরকালের বিশ্ব নাগরিকের সামনে ধাত্রীপান্না এই আদর্শই স্থাপন করে গেছে।

মেবার রাজ্যের নির্মম উপেক্ষা এবং রাণা বিক্রমজিতের নির্দয় অপমান, মহাবীর পৃথ্বীরাজের প্রেয়সী নারী শীতলসেনীর পক্ষে বিস্মৃত হওয়া সম্ভব ছিল না। রাজ ঐশ্বর্যের পরিবর্তে পুত্র বনবীরের দারিদ্রের সঙ্গে নিত্য সহবাস তার বেদনাতুর চিত্তে ক্ষোভের

আগুন জ্বালিয়ে রেখেছিল অনুক্ষণ। প্রতিবিধানের তীব্র বাসনা থাকলেও উপায় তার অনাবিষ্কৃতই ছিল। সর্দারবর্গের অযাচিত সাহায্যের প্রতিশ্রুতিতে মনোবাঞ্ছা পূরণে তার পক্ষে উৎসাহিত হওয়া খুবই স্বাভাবিক। তাই নির্বিরোধী পুত্র বনবীরের চিত্তে কামনার উদগ্র বাসনা সঞ্চারিত করতে সে দ্বিধা করেনি। তবু শীতলসেনী বিচক্ষণ এবং মর্যাদাবোধ সম্পন্না নারী- দয়ার দান হিসাবে নয়, বাহুবলে অর্জিত সিংহাসনই তার অধিক কাম্য। বনবীরকে এই মন্ত্রেই তিনি দীক্ষিত করে ক্রমাগত ইন্ধন জুগিয়েছেন। রাণার আসন শক্তির শক্ত জমির ওপরে প্রতিষ্ঠিত হওয়াটাই বাঞ্ছনীয়: পরনির্ভরতা কিম্বা অনুকম্পার দুর্বল ভিতের ওপরে স্থাপিত যে রাজাসন তার স্খলন অবশ্যম্ভাবী। রাণা বিক্রমজিত তার উৎকৃষ্ট উদাহরণ। বনবীর এই অভিপ্রায় অনুসারেই চালিত। শীতলসেনীর সঙ্কল্প সিদ্ধির প্রধান অন্তরায় দুটি --মহারাণা সঙ্গের শেষ উত্তরাধিকারী রূপে উদয় সিংহের উপস্থিতি এবং চম্পার প্রতি বনবীরের অনুরাগ। উদয়সিংহ অপেক্ষা শীতলসেনীর দুশ্চিন্তা চম্পাকে নিয়ে অধিক। উদয় সিংহের অপসারণে তার সহায় মেবারের বিদ্রোহী সর্দারবর্গ, পুত্র বনবীর: কিন্তু পুত্র বনবীরের হৃদয় কক্ষে চম্পার নিধন লৌহ নির্মিত অস্ত্রে সম্ভব নয়। তার একক বুদ্ধি নির্ভর নিপুণ চাতুরী নির্ভর করে তাকে অগ্রসর হতে হয়েছে। তাই জগমলকে চম্পার প্রতি প্রলুব্ধ করে কৌশলে তারই হস্ত প্রেরিত বিষ প্রয়োগে চম্পা নিধন। প্রতিহিংসা পরায়না শীতলসেনীর কাঁটা দিয়ে কাঁটা তোলার চক্রান্ত বিক্রমজিতের পার্শ্বচর জগমল শীতলসেনীর ব্যবহৃত সেই কণ্টক। কিন্তু রাজার বাহুবল দুর্বলকে রক্ষার পরিবর্তে পীড়নে প্রযুক্ত হলে, দুর্বলের সমবেত প্রতিরোধ তার বিনাশকেই নিশ্চিত করে- এই নির্মম সত্য শীতলসেনীর অজ্ঞাত ছিল: পুত্র বনবীরকে সহনশীলতার সেই শিক্ষা দানের প্রয়োজন তিনি অনুভব করেননি। তাই পান্নার পক্ষে বিদ্রোহী সর্দারদের বিপক্ষে চালিত করতে মোটেই বেগ পেতে হয়নি। আর যে নারী রাজ্যের কল্যাণে শিশুপুত্রকে বলি দিতে দ্বিধা করেনা, নিছক শারীরিক নির্যাতনে তাকে প্রতিহত করাও ছিল শীতলসেনীর ক্ষমতার বাইরে। অতএব পান্নার কাছে শীতলসেনীর পরাজয় নিশ্চিত।

শুধু পান্না কেন, পুত্র বনবীরের কাছেও শীতলসেনী পরাজিত। বনবীর তার অরণ্যচারী জীবনে চম্পার মনোরাজ্যের অধীশ্বর হয়ে তৃপ্ত ছিল। তার অতিরিক্ত কোন চাহিদা তার ছিল না। জননীর প্রতিশোধ লিপ্সা এবং মেবার সর্দারদের অপ্রত্যাশিত সহযোগিতা তার নির্মল চিত্তে নৃশংসতার বিষ প্রবাহ সংক্রামিত করেছে। তদুপরি মাতৃ আজ্ঞা লঙ্ঘনের সাহস বনবীরের ছিল না। বনবীরের মাতৃভীতি অতিমাত্রায় প্রবল---তার মাতৃভক্তির গভীরে নিহিত আছে শীতলসেনীর প্রখর ব্যক্তিত্বের অনতিক্রম্য প্রভাব। তার সমগ্র জীবন চক্র এরই দ্বারা নিয়ন্ত্রিত।[*] মাতৃ প্ররোচনায় সে সাময়িকভাবে নির্মম, নৃশংস: কিন্তু

---

[*] ডঃ অজিত কুমার ঘোষের মতে 'বনবীর নির্মম ও নৃশংস সর্বপ্রকার পাষণ্ডতা সত্ত্বেও তাহার মাতৃভক্তি বিশেষ উল্লেখযোগ্য' (বাংলা নাটকের ইতিহাস, পৃঃ ৪৪৬)। কিন্তু বনবীর প্রকৃত অর্থে নির্মম বা নৃশংস নয়, তার মাতৃভক্তি অপেক্ষা মাতৃ আজ্ঞা লঙ্ঘনে অক্ষমতা অধিক প্রবল।

পান্নার আত্মত্যাগের মহিমায়, চম্পার কাতরোক্তিতে এবং জননী শীতলসেনী কর্তৃক কৌশলে চম্পার হত্যায় বনবীরের জিঘাংসা বৃত্তির আরোপিত নির্মোক মুহূর্তের মধ্যেই খুলে পড়েছে। রাজপ্রাসাদের বিলাসকলা ছেড়ে অরণ্য প্রান্তের বিজন কুটীরে প্রত্যাবর্তনের জন্যে ব্যাকুল হয়ে উঠেছে তার অতৃপ্ত হৃদয়।

তবে পিতৃহন্তার প্রতি চম্পার অনুরাগ অবশিষ্ট থাকে কি প্রকারে? অপরের প্ররোচনায় সংঘটিত হত্যাকাণ্ডও অপরাধ বিজ্ঞানের বিচারে শাস্তিযোগ্য অপরাধ। অথচ বনবীরকে নির্দোষ প্রমাণে চম্পার, মেবার সর্দার এবং শীতলসেনীর বিরুদ্ধে বিষোদ্গার তার পিতৃভক্তিতে সন্দেহের উদ্রেক করে। প্ররোচনা যেদিক থেকেই আসুক তবু হত্যাকারী বনবীর: পিতৃহন্তার প্রতি এতখানি পক্ষপাতিত্ব কি খুবই স্বাভাবিক? চম্পার পিতৃবিয়োগের যন্ত্রণাকেও ছাপিয়ে গেছে তার বনবীরের প্রতি আসক্তি। চম্পার চরিত্রের এই অসঙ্গতি নাটকের ত্রুটি হিসাবেই বিবেচিত হবে। জগমলের রাজভক্তি এবং চম্পার প্রতি আকর্ষণের দ্বন্দ্ব যথেষ্ট উপভোগ্য।

॥ টিপু সুলতান ॥

যুদ্ধ বিধ্বস্ত পটভূমিকায় 'স্টারে' অভিনীত 'ইতিহাস অবলম্বিত' নাটকগুলির মধ্যে মহেন্দ্র গুপ্তের 'টিপু সুলতান' অন্যতম। 'স্টার' থিয়েটারে ১৯৪৪ র ১৯ শে মে প্রথম আত্মপ্রকাশ করে 'টিপু সুলতান' 'স্টারের' অভিনয় ধারা অব্যাহত রাখে। এরপর 'স্টারে' আবার নতুন নাটকের সন্ধান পাওয়া যাচ্ছে একেবারে ১৯৪৫ এর অক্টোবরে। মধ্যবর্তী সময়ে সেখানে আর কোন নতুন নাটকের অভিনয় হয়নি। সেদিক থেকে 'টিপু সুলতান' অবশ্যই জনপ্রিয় নাটক হিসাবে তার নাম তালিকাভুক্তির দাবী করতে পারে। এই জনপ্রিয়তার পশ্চাতে 'স্টারের' কুশলী অভিনেতৃবর্গের অভিনয় দক্ষতা এবং প্রয়োগ নৈপুণ্য বিশেষ ভাবে স্মরণযোগ্য। অন্যদিকে নাটকের আখ্যান ভাগে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির আবেদন, সমকালীন জনমানসে একটা বাড়তি আকর্ষণ সৃষ্টি করতে সক্ষম হয়েছিল। নাট্যকারের পরিচালনায় এই নাটকে প্রথম অভিনয় রজনীতে রূপদান করে যাঁরা পাদ-প্রদীপের আলোয় আত্মপ্রকাশ করেন, তাঁরা হলেন : হায়দার আলী—রবি রায়; টিপু—বিপিন গুপ্ত; মঁশিয়ে লালী—ভূমেন রায়; নানাফাড়নাবীশ—ভূপেন চক্রবর্তী; করিম শাহ—সিধু গাঙ্গুলী; পেশোয়া—সতু; পূর্ণিয়া—বিজন নারায়ণ মুখার্জী; নিজাম—পঞ্চানন বন্দ্যোপাধ্যায়; সিন্ধিয়া—গোপাল ভট্টাচার্য; ভোঁসলা—গোষ্ঠ রায়; হরিপন্থ—রবি রায় চৌধুরী; তুহব্বর জঙ্গ—বিমল ঘোষ; সৈয়দ গফফর—অবিনাশ দাস; কমরুদ্দীন—মণি চ্যাটার্জী; আব্দুল খালেক—গীতা; মোয়াজউদ্দীন—কণক; লর্ড কর্ণওয়ালিশ—জয়নারায়ণ মুখার্জী; ওয়েলেসলী—ম্যালকম; ব্রেথওয়েট—বীরেশ্বর সেন; বাপুজী—ধীরেন দাস; কৃষ্ণাবাঈ—অপর্ণা দেবী; রুণী বেগম—উমা মুখার্জী; সোফিয়া—বীণাদেবী এবং অপরাপর শিল্পীবৃন্দ।

'টিপু সুলতান' ইতিহাসাশ্রিত রোমান্স—হিন্দু ও মুসলমানের পারস্পরিক সম্প্রীতি নির্ভর করে এই রোমান্সধর্মিতার পরিকাঠামো নির্মাণ। ভারতবর্ষের জাতীয়তাবাদী আন্দোলনে হিন্দু ও মুসলমানের পারস্পরিক বিভেদ, একের প্রতি অপরের অনাস্থা, সহমর্মিতার পরিবর্তে অকারণ বিরুদ্ধাচারণ - সাম্রাজ্যবাদী শক্তির হাতকেই প্রকারন্তরে শক্ত করেছিল। এই ঐতিহাসিক সত্যের ওপরে 'টিপু সুলতান' নাটকের প্রতিষ্ঠা। মনে রাখতে হবে, এই নাটক যে সময় রচিত, তখনো '৪৬-র সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার ভয়াবহ পরিস্থিতির উদ্ভব ঘটেনি। তারও পূর্বে জাতীয় জীবনের মারাত্মক ক্ষত নিরাময়ের মৌলিক পন্থা নির্ধারণ করে নাট্যকার সুগভীর মননশীলতার পরিচয় দিয়েছেন। ভারত-আত্মার মুক্তি নির্দেশিকা রূপে অবশ্যই গণ্য হতে পারে এই নাটক এবং সেখানেই এর গৌরব। অর্থাৎ সুলতান টিপুর বিজয় কাহিনী এবং পরিশেষে নিদারুণ ব্যর্থতার আনুপূর্বিক ইতিবৃত্ত রচনার মধ্যে এই নাটকের বক্তব্য সীমাবদ্ধ নয়।

স্বাধীনচেতা, উন্নতশির, মহীশূর সুলতান বৃদ্ধ হায়দার আলি প্রকৃত অর্থেই গভীর স্বদেশ-ভাবনায় উদ্বুদ্ধ-প্রাণ অক্লান্ত সৈনিক; অশীতিপর বৃদ্ধের হৃদয়ে তারুণ্যের দুর্জয় সঙ্কল্প—মহীশূর, মারাঠা এবং নিজাম—এই ত্রিশক্তি সমন্বয়ে ইংরেজের বিরুদ্ধে ভারতব্যাপী অপ্রতিরোধ্য অবরোধ গড়ে তুলতে বদ্ধপরিকর তিনি। পলাশীর প্রান্তরে রোপিত বিষবৃক্ষের মূল উৎপাটনের গভীরতম প্রত্যাশায় উদ্ভাসিত এই চরিত্রটি। কিন্তু দেশদ্রোহের সংক্রামিত ব্যাধির আরোগ্য লাভের পথ তখনো অনাবিষ্কৃতই ছিল। তার সংক্রমণের নিলর্জ্জ বহিঃপ্রকাশ বৃদ্ধ সুলতানের হৃদয়োৎসারিত স্ফুলিঙ্গকে চিরতরে নির্বাপিত করে দিয়েছে।

পুত্র টিপু পিতার আদর্শে অনুপ্রাণিত; পিতার অবর্তমানে সুলতান টিপু দেশব্যাপী কর্মকাণ্ডের সুযোগ্য নায়ক। তার প্রবল পরাক্রমের কাছে বারংবার বিপর্যস্ত সুসভ্য ইংরেজের যুদ্ধ-নিপুণ সেনাবাহিনী। সম্মুখ সমরে তার পরাজয় বুঝি সম্ভব ছিল না—তাই পলাশীর অনুকরণে গভীর ষড়যন্ত্রের বীজ বপন। এই ষড়যন্ত্রে লর্ড কর্ণওয়ালিশের প্রধানতম হাতিয়ার টিপুর কনিষ্ঠ ভ্রাতা খলনায়ক, সিংহাসন লোলুপ অপদার্থ করিম শাহ। তবু করিমশাহের চরিত্রে রাজদ্রোহের বলিষ্ঠতা ছিল না—নিতান্ত নপুংসক এই চরিত্রটি সুচতুর ইংরেজের ক্রীড়নক মাত্র। ত্রিশক্তি সমন্বয়ের সম্ভাবনাকে অঙ্কুড়েই বিনষ্ট করেছিল সাম্রাজ্যবাদী ইংরেজের বিভেদ নীতির নিপুণ কৌশল; জাতপাতের সংবেদনশীল ইসুতে সিন্ধিয়া, ভোঁসলা প্রমুখ মহারাষ্ট্রের নায়কবৃন্দ পূর্বেই প্রেক্ষাপট থেকে কৌশলে অপসারিত। দেশের কল্যাণ অপেক্ষা নাবালক পুত্রের কল্যাণ কামনায় অন্ধ পেশোয়া জননী কৃষ্ণাবাঈ বিপথগামী—নানাফাড়নাবীশের অভিভাবকত্বও সেখানে অন্যায় সন্দেহে পরিত্যাজ্য। অনুরূপ স্বার্থ চিন্তায় নিজামশাহী বাহিনীর পশ্চাদাপসরণ। এমনই এক মসীলিপ্ত ইতিহাসের পটভূমিতে সাম্রাজ্যবাদী ইংরেজের তুরুপের তাস করিমশাহ।

আনুগত্য ও কর্তব্যপরায়ণতার প্রতীক মঁশিয়ে লালী। জন্মসূত্রে ফরাসী, হায়দার আলির এই বিশ্বস্ত সেনানায়ক রাজানুরক্তির বিরল দৃষ্টান্ত। যে স্বদেশানুরাগ ভারতবাসীর মধ্যে অন্তত কিছু পরিমাণেও প্রত্যাশিত ছিল, অথচ যার অভাবটাই সত্য হয়ে উঠে

ভারতবর্ষের পরাধীনতার লজ্জাকে উৎকট করে তুলেছিল, লালীর মধ্যে তার স্ফূরণ একেবারেই অপ্রত্যাশিত মনে হতে পারে! আসলে লালী নাট্যকার তথা আমাদের অভিপ্রেত ধর্মাচরণের প্রবক্তা। জন্মসূত্রে স্বাধীন দেশের নাগরিক এই বিদেশীর সমস্ত ধিক্কার দেশদ্রোহের বিরুদ্ধে। বিশেষ ভাবে ভারতবর্ষের অস্তমিত স্বাধীনতার জন্যে তার কোন ক্ষোভ থাকার কথা নয় -তা নেইও। ক্ষুদ্র ব্যক্তি স্বার্থ, সাম্প্রদায়িক বিভেদ বুদ্ধি একটি সমৃদ্ধ স্বাধীন দেশের সমস্ত গৌরবকে কি ভাবে ভূ লুণ্ঠিত করে দিতে পারে- এই মর্মযন্ত্রণা লালীকে পীড়িত করেছে। এই হীনমন্যতাকে সে আন্তরিক ভাবেই ঘৃণা করে। তাই উন্নতশির টিপুর দেশহিতে আত্মবলিদানের গৌরবে সে গর্বিত।

এই নাটকে নারী চরিত্রগুলির বিকাশ খুব স্বাভাবিক নয়। কৃষ্ণাবাঈ কিম্বা রুণী বেগম আবেগ তাড়িত হৃদয়বৃত্তির দ্বারা চালিত। তুলনায় সোফিয়ার বাস্তবতাবোধ অনেকাংশে সহজ এবং স্বাভাবিক। সোফিয়ার ভবিষ্যদ্বাণী জ্যোতিষচর্চার বিশিষ্ট জ্ঞান থেকে নয়। ভারতবর্ষের বাস্তব পরিস্থিতি সম্পর্কে অভিজ্ঞতালব্ধ জ্ঞানই তার নির্ভুল ভবিষ্যদ্বাণীর প্রধান উৎস। পলাশীর প্রহসন তার সমস্ত হিসাবের কেন্দ্রবিন্দু। অন্যদিকে এই বাস্তবতা বোধের অভাবই টিপুর মহিষী রুণী বেগমের চরিত্রের স্বাভাবিক বিকাশের গতি রোধ করেছে। সুলতানের তথা রাজ্যের ঘোর সঙ্কটকালে সুলতান-ঘরণীর উদ্বেগ, উৎকণ্ঠা নিশ্চয় সত্য---কিন্তু টিপুর বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রের নির্মম অভিজ্ঞতা সত্ত্বেও, তার অজ্ঞাত-পরিচয় ফকিরের স্বপ্ন দর্শনের উদ্ভট কল্পনায় এ হেন আস্থা প্রকাশ বাস্তবোচিত নয়। পেশোয়া জননী কৃষ্ণাবাঈ সন্তানের হিতার্থে রাজনীতির অন্ধকার অলিন্দে অনুপ্রবেশ করতে গিয়ে পরিস্থিতিকে অনাবশ্যক জটিল করে তুলেছেন।

নাটকের সংলাপ সাবলীল এবং সুখপাঠ্য। বিভিন্ন সিচুয়েশনের ব্যঞ্জনায় সংগীতের সুষ্ঠু প্রয়োগ নাট্যকার করেছেন। তবে সন্ধির শর্ত হিসাবে সাম্রাজ্যবাদী ইংরেজের হাতে ঔরসজাত সন্তানদের সমর্পণে টিপুর পিতৃসত্তা পুরোপুরি উপেক্ষিত; তিনি সুলতান হলেও পিতা---সুলতান টিপুর স্বদেশ প্রীতির প্রবল জোয়ারে পিতার স্বাভাবিক সন্তান বাৎসল্য অঙ্কুড়িত হবার সুযোগই পায়নি! এই অতিনাটকীয়তা পৌরাণিক কাহিনী অথবা মহাকাব্যে দূষণীয় না হলেও আধুনিক নাটকে কখনই সমর্থনযোগ্য নয়।

॥ পলাশী ॥

হীরেন্দ্র নারায়ণ মুখোপাধ্যায়ের 'ইতিহাস অবলম্বিত নাটক' 'পলাশী' ১৯৪৫-র ১১ই অক্টোবর 'স্টার' থিয়েটারে মহেন্দ্র গুপ্তের পরিচালনায় প্রথম আত্মপ্রকাশ করে। 'স্টারে' অভিনীত 'ইতিহাস অবলম্বিত নাটকের' মধ্যে 'পলাশী' অন্যতম। 'স্টারের' স্বত্বাধিকারী সলিল কুমার মিত্র এবং মহেন্দ্র গুপ্তের চেষ্টাতে এই নাটকটি মঞ্চস্থ হয়। তাঁদের উদ্যোগকে অস্বীকার করা যায় না। নাট্যকার স্বয়ং কৃতজ্ঞ চিত্তে তাঁদের কাছে তাঁর ঋণ স্বীকার

করেছেন।[৫] প্রথম অভিনয় রজনীতে অংশগ্রহণকারী রূপশিল্পীদের তালিকাটি এই প্রকার : আলিবর্দী—জয়নারায়ণ মুখোপাধ্যায়; সিরাজ—ভূপেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী; মীরজাফর—শিবকালী চট্টোপাধ্যায়; মোহনলাল—ভূমেন রায় (পরে সত্য পাঠক); আলিহোসেন (পুরন্দর)—বাণীব্রত মুখোপাধ্যায়; মাণিক চাঁদ—বিমল চন্দ্র ঘোষ; উমিচাঁদ—দেবেন্দ্র নাথ বন্দ্যোপাধ্যায়; আগা সমসের—নগেন্দ্রনাথ সমাদ্দার; আমীর খাঁ—শান্তি গুপ্ত; মীর নাজির—গোপাল মুখোপাধ্যায়; সোলেমান—সত্যেন্দ্রনাথ দাস; মি. হলওয়েল—বিজয় নারায়ণ মুখোপাধ্যায়; স্বামীজি—তারাপদ ভট্টাচার্য; শান্তশীল—বিমল মুখোপাধ্যায়; বালাজী—মি. ম্যালকম; দয়ানন্দ—গোপাল ভট্টাচার্য; দানশা—পঞ্চানন বন্দ্যোপাধ্যায়; আলতাফ—অবিনাস দাস; মেহের উন্নিসা (বা ঘসেটি)—অপর্ণা দেবী; সেলিনা (করুণা)—বীনাদেবী; লুৎফা—রেখা দত্ত; লক্ষ্মীবাঈ—দুনিয়াবালা; সৌরভী—যূথিকা দেবী। নাটকে সুর সংযোগ করেন ধীরেন্দ্রনাথ দাস ও তারাপদ ভট্টাচার্য, নৃত্যশিল্পী ছিলেন ললিত মোহন গোস্বামী এবং মঞ্চ নির্মাতা যতীন্দ্রনাথ চক্রবর্তী।

'পলাশী' নাটকের কেন্দ্রীয় চরিত্র মোহনলাল। নবাব আলিবর্দীর মৃত্যুর অব্যবহিত পূর্বে বাংলার মসনদের উত্তরাধিকার নিয়ে গুপ্ত ষড়যন্ত্র আর বিশ্বাসঘাতকতার সূত্রে অনিশ্চিত বাঙলার ভাগ্যের সঙ্গে যুক্ত হয়ে পড়েছে একনিষ্ঠ দেশপ্রেমিক, সৎ, আদর্শবান, মোহনলালের ভাগ্য বিড়ম্বনার ইতিবৃত্ত। বিশ্বস্ত সেনাপতি মোহনলালের দেশ হিতৈষণা ও কর্তব্যনিষ্ঠা এই নাটকে উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে। মোহনলালই এই নাটকের নায়ক। গভীর চক্রান্তের মসীলিপ্ত বাঙলাদেশের এই অমর সন্তানের আত্মোৎসর্গের আলেখ্য বর্তমান নাটকের উপজীব্য বিষয়। সেই অনুসারে এই নাটকের নাম 'পলাশী' না হয়ে নাটকের নামকরণ মোহনলালের ব্যক্তি চরিত্রের সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ হওয়া বাঞ্ছনীয় ছিল। পলাশী যুদ্ধের প্রহসন এই নাটকের উপসংহার মাত্র। তদপেক্ষাও গুরুত্বপূর্ণ তার প্রস্তুতির বিবর্তনে এই মহান দেশনায়কের কর্মধারা।

ওলন্দাজ বোম্বেটে কর্তৃক ভগিনী করুণার হরণ এবং মারাঠা দস্যুদের হস্তে তার পুনঃসমর্পণ, মোহনলালকে টেনে এনেছে রাজ্য রাজনীতির উত্তাল তটভূমির বৃহত্তর অঙ্গনে। নারীর সম্মান রক্ষায় ব্যর্থ তত্ত্বদর্শী সমাজপতিদের অদ্ভুত বিচারে এই অপরাধে মোহনলাল জাতিচ্যুত, তার বংশ গৌরব কলুষিত। ভগিনীর সম্মান হারানোর যন্ত্রণায় বেদনাতুর মোহনলাল উদ্ভ্রান্তের ন্যায় অগ্নিদাহে তার জন্মভূমি নন্দীগ্রাম ধ্বংস করতে উদ্যত। তার কাছে বিজাতীয় পুরুষের কলুষ স্পর্শে ভগিনী করুণার অপমান, বিদেশী দস্যু কর্তৃক দেশ মাতৃকার লাঞ্ছনার ব্যঞ্জনায় মূর্ত। মোহনলালের আশঙ্কা, বাংলার গৌরব

---

৫ নাট্যকার বলেছেন 'স্টার রঙ্গমঞ্চের স্বত্বাধিকারী শ্রীযুক্ত সলিল কুমার মিত্র, বি.কম এবং লব্ধ প্রতিষ্ঠ নাট্যকার ও প্রযোজক শ্রীযুক্ত মহেন্দ্রনাথ গুপ্ত, এম এ মহাশয়কে আমার আন্তরিক ধন্যবাদ জানাইতেছি। 'পলাশী' কে মঞ্চস্থ করিতে শ্রীযুক্ত মহেন্দ্রবাবু যে যত্ন ও পরিশ্রম করিয়াছেন, সেজন্য তাঁহার নিকট কৃতজ্ঞ না হইয়া পারিনা।'

একদিন এমনি করেই অপহৃত হবে: তৎপূর্বে তার ধ্বংসই শ্রেয়। এই অগ্নিশিখা মোহনলালের হৃদয়েও প্রজ্জ্বলিত হয়ে উঠেছে বিধ্বংসী রূপে: নারী হরণের সমুচিত দণ্ডদানে বর্গীদমনে কৃত সংকল্প মোহনলাল। আলিহোসেনের ছদ্মবেশে পুরন্দর নবাব আলিবর্দীর পূর্ণ সহযোগিতার সংবাদ বহন করে আনে। বর্গীদমনে বারংবার ব্যর্থ নবাব বাঙলার দুর্দশা মোচনে মোহনলালকে ব্যবহার করতে চেয়েছেন। বাঙলার ভবিষ্যৎ নিয়ে চিন্তিত নবাব মোহনলালের মধ্যে আবিষ্কার করেছেন একজন সত্যিকারের দেশ নায়ককে। তাই পাঁচ হাজারি মনসবদারের জায়গীর দান করে তাকে সৈনাপত্যে বরণ করেছেন তিনি। বিচক্ষণ নবাব বৃদ্ধ আলিবর্দীর বুঝতে বিলম্ব হয়নি, আগামী দিনে বাঙলার ভবিষ্যৎ নবাব সিরাজদ্দৌলার সব থেকে বড় শত্রু ইংরেজ আর ফরাসী বণিকদের মোকাবিলায় এই হিন্দু সেনাপতিই হবে তার একান্ত অনুগত পার্শ্বচর।

মোহনলাল আদর্শ পরায়ণ বীর নায়ক। অন্যায়ের বিরুদ্ধে তার প্রতিবাদ। তাই করুণা হরণে মারাঠা নায়ক ভাস্কর পণ্ডিতের নিরপেক্ষ ভূমিকা জ্ঞাত হওয়া মাত্র যুদ্ধ প্রত্যাহার করে সসৈন্যে প্রত্যাবর্তন করেছে সে। পুরস্কার স্বরূপ ভাস্কর পণ্ডিতের মানসকন্যা রাণী লক্ষ্মীবাঈ রঘুজী ভোঁসলার নামাঙ্কিত অঙ্গুরীয় প্রদান করে তাকে। এই গর্হিত কর্মের জন্য তীরস্কৃত হতে হয় রাণী লক্ষ্মীবাঈকে। কিন্তু রাণী লক্ষ্মীবাঈ মানুষ চিনতে ভুল করেনি। অর্থলোলুপ দয়ানন্দ এবং সৌরভীর ছলনায় উমিচাঁদের গৃহবন্দী রাণী লক্ষ্মীবাঈকে সেলিনা ও সোলেমানের সহযোগিতায় মুক্ত করে মোহনলাল তার ন্যায় পরায়ণতাকে প্রতিষ্ঠিত করেছে। নবাব আলিবর্দীর কৌশলে ভাস্কর পণ্ডিতের গুপ্তহত্যায় গভীর মর্মব্যথায় পীড়িত তার নীতিজ্ঞান; প্রতিহিংসাপরায়ণ সিরাজের কৃষ্ণদাসকে হত্যার প্রচেষ্টার বিরুদ্ধেও প্রতিবাদে সোচ্চার হয়ে ওঠে তার বীর হৃদয়। মীরজাফরের শত প্রলোভনও তাকে নবাবের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রে লিপ্ত করতে পারেনি। পলাশী যুদ্ধের অন্তিম মুহূর্তে এই বীর আদর্শনিষ্ঠ নায়ক সমস্ত বেইমানির বিরুদ্ধে মুক্ত কৃপাণ হস্তে একক সংগ্রামে উদ্ভাসিত। মোহনলালের অভিধানে শঠতা, বেইমানি আর বিশ্বাসঘাতকতার কোন স্থান নেই। ভারতবর্ষের মুক্তিযুদ্ধে যে সকল বীর সেনানী সর্বস্ব পণ করে অক্লেশে প্রাণ বিসর্জন দিয়েছেন— মোহনলাল সেই সমস্ত বীর শহীদদের অগ্রগণ্য।

নবাবী সিংহাসনের অন্যতম দাবীদার, আলিবর্দীর জ্যেষ্ঠা কন্যা মেহের উন্নিসা ওরফে ঘসেটি বেগম সম্ভবত দ্বিতীয় ব্যক্তি—মোহনলালের স্বরূপ উপলব্ধিতে যার বিন্দুমাত্র ভুল হয়নি। নবাব আলিবর্দী কর্তৃক সেনাপতি পদে মোহনলালকে নিয়োগে তাই তার ঘোর আপত্তি। সিরাজের পার্শ্বচররূপে এই হিন্দু সেনাপতির অবস্থান, নবাবী মসনদকে ঘিরে তার ব্যক্তিগত উচ্চাশার পথে প্রধান অন্তরায় রূপে চিহ্নিত বহু পূর্বেই। মোহনলালকে প্রতিহত করতেই ঘসেটি জাফর আলি খাঁর শরণাপন্ন। প্রলোভনের পর প্রলোভন দেখিয়ে ধর্মভীরু জাফর আলি খাঁ (মীরজাফর) কে ঘসেটি অধর্মাচারে লিপ্ত করতে অবশেষে সক্ষম; আর তারই দ্বারা মোহনলালকে উৎখাতের তার নিপুণ পরিকল্পনা।

এই নাটকে বিশ্বাসঘাতকরূপে ইতিহাস নিন্দিত মীরজাফরকে পাই নবরূপে। মীরজাফর এই নাটকে ধর্মভীরু, সৎ, বিশ্বস্ত সেনাপতি। ঘসেটির অবিরাম প্ররোচনায় ভালো-মন্দ, ধর্ম-অধর্ম, পাপ-পুণ্যের দোলায় দোদুল্যমান মীরজাফর চরিত্রটি অতীব আকর্ষণীয়। সিরাজের পরিবর্তে শওকৎজঙ্গকে আলিবর্দীর উত্তরাধিকারীরূপে ঘসেটির নির্বাচন সমর্থন করতে পারেনি মীরজাফর। এই অধর্মাচরণে সম্মত হতে পারেনি ধর্মভীরু মীরজাফর—সবিনয়ে প্রত্যাখ্যান করেছে ঘসেটিকে সহযোগিতার অন্যায় প্রস্তাব। পূর্ণিয়া বিজয়ে মোহনলালকে প্রতিহত করতে মীর নাজির এবং আগা সামসেরকে ঘসেটির প্রেরণেরও বিরোধী মীরজাফর। মোহনলালের বিরুদ্ধে কুৎসা রটনাতেও সায় ছিল না তার। সে যে 'কোরাণ' স্পর্শ করে শপথ নিয়েছে—অধর্মাচরণ তার পক্ষে কি করে সম্ভব? নবাবী মসনদ অপেক্ষা বেহস্তের পবিত্র হাতছানি তাকে অধিক আকর্ষণ করে। কিন্তু ধর্মাচারী হলেও সেও তো মানুষ -মানব প্রকৃতির রিপু দংশন জনিত সকল প্রকার তাড়নার উর্ধে তো সে নয়। তাই ঘসেটির অবিরাম প্ররোচনায় নবাবী মসনদের আকর্ষণ অনুভব করে মীরজাফরকে এক সময় ভাবতে হয়েছে 'খোদা মালেক, দেনেওয়ালা'— অতএব পশ্চাদাপসরণ মূর্খতা। মনে রাখতে হবে, ঘসেটিই মীরজাফরের চিত্তে মসনদের প্রলোভন সৃষ্টি করেছে, নচেৎ মীরজাফর আদ্যোপান্ত বেইমান ছিল না।

'পলাশী' নাটকের মূল ভাব হিন্দু মুসলমানের পারস্পরিক ঐক্য। হিন্দু ও মুসলমানের বিভেদকে মূলধন করেই এ দেশে সাম্রাজ্যবাদী শক্তির সদম্ভ আত্মপ্রকাশ। এই বিভেদ বৈষম্য মুক্ত সমাজ গঠনের ওপরেই নাট্যকার জোর দিয়েছেন। কেননা ভারতবর্ষের মুক্তি অপেক্ষা করে আছে হিন্দু ও মুসলমানের মিলিত শক্তির ঐক্যবদ্ধ আন্দোলনের ওপর। এই নাটকে ঘটনার বিন্যাস মোটেই শিথিল নয়; বরং টান টান উত্তেজনায় তীব্র গতিশীল নাটকীয় কাহিনী। প্রতিটি চরিত্রই স্বকীয় ভঙ্গিতে উজ্জ্বল। ঐতিহাসিক সত্যের যথাযথ অনুসরণ হয়ত নাট্যকার করেননি; কিন্তু তাতে নাটকীয় রস কোন ভাবেই বিঘ্নিত হয়নি। প্রথম শ্রেণীর নাটক হিসাবে পলাশী তার মর্যাদা অবশ্যই দাবী করতে পারে।

পঞ্চম অধ্যায়

দেশাত্মবোধক নাটক

সিপাহী বিদ্রোহোত্তর বৃটিশ ভারতে রাজ শক্তির নিদারুণ অত্যাচারে যন্ত্রণাকাতর দেশবাসীর রুদ্ধ নিঃশ্বাস বাক্-রূপ পেয়েছে দিল্লীর উর্দু কবি গালিবের কবিতায়--

"কোই উম্মীদ বাঢ় নাহি আতি
কোই সুরভ নজর নাহি আতি
মৌত কা এক দিন মোয়া ঐন হ্যায়,
নিদ কিউ রাত ভর নাহি আতি. ।"

পদানত বিজিত জাতির চিত্তে দানা বেঁধে ওঠা স্বাধীনতা স্পৃহাকে অঙ্কুড়েই চিরতরে উন্মূল করার ব্যাপক প্রস্তুতি সেদিন শুরু হয়েছিল: শাসনযন্ত্রের নিষ্পেষণে পরাধীন জাতির এ হেন স্পর্ধাকে চরম শিক্ষাদানের একমাত্র পন্থা হিসাবে দেশজুড়ে শুরু হয়েছিল দমন-পীড়নের প্রভূত আয়োজন---শতবর্ষব্যাপী তার বিস্তার। কিন্তু শাসকবর্গের নিষ্ঠুর নিপীড়নে মুক্তিকামী জাতির আশা ভঙ্গের বেদনা, বিক্ষোভ-প্রতিবাদে সোচ্চার হয়ে উঠে পরিশেষে সশস্ত্র বিপ্লবের পথ পরিগ্রহ করেছে। বর্তমান শতাব্দীর তিরিশের দশকে এসে স্পষ্টই অনুভূত হচ্ছিল যে, সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে রক্তক্ষয়ী সংগ্রামই শেষ কথা। সমকালীন আন্তর্জাতিক রাজনীতির প্রেক্ষাপট এই প্রত্যয়কে আরও দৃঢ় করেছিল।

রাষ্ট্রনৈতিক সন্ধিক্ষণের এই অধ্যায়টি সম্পর্কে এ কালের নাট্যকার পুরোপুরি উদাসীন ছিলেন না। স্বদেশচর্চার প্রবল উন্মাদনাকে তাঁরা নাটকে রূপ দিতে কম বেশি প্রয়াসী হলেন। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের ক্রান্তিলগ্নে বাংলা নাটকের ধারায় 'দেশাত্মবোধক নাটক' এক নতুন মাত্রা সংযোজন করল। অবশ্য বাংলা নাটকে স্বদেশচর্চার প্রাথমিক স্রষ্টা এবং রূপকার নিঃসন্দেহে দ্বিজেন্দ্রলাল। ক্ষীরোদপ্রসাদের 'প্রতাপাদিত্য' থেকে যে স্বদেশ ভাবনার সূত্রপাত---'প্রতাপসিংহ', 'দুর্গাদাস' এবং 'মেবার পতন' এ তা আরও সংহত ও পরিমার্জিত রূপ পরিগ্রহ করে দ্বিজেন্দ্র নাটকে বিশিষ্টতা লাভ করেছে। তৎসত্ত্বেও এ কথা ভুললে চলবে না যে, দ্বিজেন্দ্রলালের দেশাত্মবোধের পশ্চাতে তাঁর বিশিষ্ট সামাজিক মতবাদই প্রতিষ্ঠিত হবার সচেতন প্রয়াস পেয়েছে। স্বদেশী আন্দোলনের মূল আদর্শ বা গতিবিধি তাঁর এই সমস্ত নাটকে ততটা স্পষ্টরূপে ধরা পড়েনি। তার কারণ বোধ হয়, দ্বিজেন্দ্রলাল

স্বদেশী আন্দোলনকে সর্বাংশে সমর্থন করতে পারেননি।[১] দ্বিজেন্দ্রলালের স্বদেশপ্রীতি সংশয়াতীত, তবু আদর্শগত মত পার্থক্য হেতু তাঁর নাটক দেশাত্মবোধক নাটক হিসাবে বিবেচ্য নয়।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সঙ্কট মুহূর্তে ভারতবর্ষের রাজনীতি সমাজনীতি জনিত পরিবেশ পরিস্থিতি স্বদেশচর্চার অভিনব উদ্দীপনাকে অঙ্গীকার করে নাট্য সৃষ্টির বিপুল সম্ভাবনার ক্ষেত্র প্রস্তুত করেছিল। 'আগস্ট আন্দোলন' 'কুইট ইণ্ডিয়া মুভমেন্ট' প্রভৃতির মত বিরল ঐতিহাসিক কর্মকাণ্ডের ঘাত প্রতিঘাত বাংলা নাটকে প্রতিবিম্বিত হয়ে উঠবে এটাই প্রত্যাশিত ছিল। অথচ বাস্তব ক্ষেত্রে দেখা গেল, স্বদেশী আন্দোলনের গতি-প্রকৃতির বহুমুখী ভাবানুভূতি সমকালীন নট নটীদের হাত ধরে রঙ্গমঞ্চে প্রবেশাধিকার লাভে অনেকখানি বঞ্চিতই থেকে গেছে। স্বাধীনতা লাভের অদম্য আকাঙ্ক্ষায় যে বৈপ্লবিক কর্মকাণ্ড সমস্ত দেশ জুড়ে সঞ্চারিত হয়েছিল তার স্পষ্ট ও প্রত্যক্ষ পরিচয় বড় বেশি পাওয়া যাবে না সমকালীন নাট্যধারায়। তার কারণ, প্রথমতঃ ভারতবর্ষের জাতীয়তাবাদী আন্দোলন কখনই সোভিয়েত রাষ্ট্রের মত গণ বিদ্রোহের চেহারা নেয়নি --নাট্যকারদের সম্মুখে সে দৃষ্টান্ত ছিল না; বরং 'অনুশীলন সমিতি', 'যুগান্তর', 'গুপ্ত সমিতি' প্রভৃতি গোপন সংগঠনের বৈপ্লবিক ক্রিয়াকলাপ অত্যন্ত সতর্কতার সঙ্গে লোক সাধারণের অগোচরে অনেক বেশি সক্রিয় ছিল। প্রচার বিমুখতার জন্যে ওই সমস্ত সংগঠনের ক্রিয়াকর্মের আনুপূর্বিক বিবরণ রচনা তৎকালে সম্ভব ছিল না। দ্বিতীয়তঃ 'অভিনয় নিয়ন্ত্রণ আইনের' কঠোর রজ্জুপাশ বাংলা নাটকের স্বাভাবিক গতিকে ব্যাহত করেছে অনেকাংশে; রাজদ্রোহিতার অজুহাতে বাংলা নাটকে স্বদেশ চর্চার সম্ভাবনা রঙ্গমঞ্চে অনুপ্রবেশের ছাড়পত্র আদায় করতে পারেনি কখনই। তৃতীয়তঃ বাংলা নাটক তখনো পর্যন্ত একক অভিনয় নির্ভরতা পুরোপুরি কাটিয়ে উঠতে পারেনি; ফলে গণ আন্দোলনের নাট্যিক রূপায়ণের সম্ভাবনা বিলম্বিত হয়েছে। চতুর্থতঃ ইতিহাস, পুরাণ কিম্বা সামাজিক জীবন—যে কোন বিষয় নিয়ে কাহিনী গ্রন্থণে স্বভাবসিদ্ধ রোমান্সধর্মিতা নাট্যরীতির কক্ষ পরিবর্তনে কিছুটা অন্তরায় সৃষ্টি করেছে। পঞ্চমতঃ দর্শক প্রতিক্রিয়া সম্পর্কে সংশয় ছিল, তাই বাংলা নাটকে স্বদেশচর্চার প্রসঙ্গ যুক্ত হল একটু অন্যভাবে। দেশ মাতৃকার পূজায় নিঃশর্ত আত্মোৎসর্গের—প্রয়োজনে আত্মবলিদানের অনমনীয় অঙ্গীকার নিয়ে ঐতিহাসিক ব্যক্তিত্বের আত্মপ্রকাশ ঘটলো বাংলা নাটকে। ঐতিহাসিক চরিত্রের জীবনকথা এইভাবে মুক্তি আন্দোলনের ব্যাপ্তিতে একটা নান্দনিক মাত্রা পেল।

প্রধানত ইতিহাস নির্ভর উপাদান চয়ন করেই এই সমস্ত নাটক রচিত হয়েছে। তবু রসের বিচারে নিছক 'ইতিহাস অবলম্বিত নাটক' হিসাবে এগুলি বিবেচ্য নয়। 'ইতিহাস

---

[১] দেবকুমার রায় চৌধুরী 'দ্বিজেন্দ্রলাল' গ্রন্থে লিখেছেন - 'দেশের আবাল বৃদ্ধ বনিতা সকলেই যে বঙ্গ বিভাগের অপকারিতা সম্বন্ধে সন্ত্রস্ত ও শঙ্কিত হইয়া উঠিলেন, দ্বিজেন্দ্রলাল ধীরভাবে তাহারই বহু গুণ ও কল্যাণকর পরিনাম, নিঃসংশয় দৃঢ়তার সঙ্গে অনুকূল যুক্তি বলে প্রচার করিতে ব্যস্ত হইয়া পড়িলেন।' পৃঃ৩৯৫ দ্রষ্টব্য।

অবলম্বিত নাটক প্রধানত ঐতিহাসিক রস-সঞ্চারী—তারই পরিপূরক রূপে অঙ্গীভূত হয়েছে স্বদেশ ভাবনার প্রসঙ্গ। অন্যদিকে দেশাত্মবোধক নাটকের মূল সুরটি অনুরণিত হয়েছে স্বদেশচর্চাকে কেন্দ্র করে—ঐতিহাসিক পটভূমিতে সংস্থাপন তার বিশ্বাসযোগ্যতাকে প্রতিষ্ঠিত করেছে। স্বদেশী আন্দোলনকে স্পষ্ট ও প্রত্যক্ষ করে তোলার জন্যে কাল্পনিক কাহিনী, ঘটনা ও চরিত্র অপেক্ষা ইতিহাসের পাতা থেকে উপাদান চয়ন করে নাট্যকারেরা অনেক বেশি বাস্তবতার পরিচয় দিয়েছেন।

॥ পাঞ্জাব কেশরী রণজিৎ সিংহ ॥

মহেন্দ্র গুপ্তের 'পাঞ্জাব কেশরী রণজিৎ সিংহ' নাটকটি বৃটিশ সরকারের দুশ্চিন্তার কারণ হয়ে উঠেছিল। তৎকালীন রঙ্গমঞ্চে যে অল্প কয়েকটি নাটক তীব্র স্বাজাত্যবোধের প্রেরণায় বিদেশী শাসকবর্গকে বিব্রত করে তুলেছিল 'রণজিৎ সিংহ' তার মধ্যে অন্যতম। 'স্টার' রঙ্গমঞ্চে ১৩ই জুলাই ১৯৪০ তারিখে নাটকটি প্রথম মঞ্চস্থ হয়ে দর্শক সমাজে অভাবনীয় সাড়া জাগিয়েছিল। খুব স্বাভাবিক ভাবেই এই রকম একটি বিস্ফোরক নাটকের অভিনয় চলতে দেওয়া সরকার নিরাপদ মনে করেন নি। মাত্র দিন কয়েক পরে ৫ই আগস্ট থেকে নাটকটিকে নিষিদ্ধ ঘোষণা করা হয় এবং 'রণজিৎ সিংহ' তখনকার মত রঙ্গমঞ্চ থেকে বিদায় গ্রহণ করে।[১] প্রথম অভিনয় রজনীতে কালীপ্রসাদ ঘোষের পরিচালনায় অভিনয়ে অংশগ্রহণ করেন ঃ রণজিৎ সিংহ—জীবনকুমার গাঙ্গুলী, খড়্গ সিংহ—অমল বন্দ্যোপাধ্যায়, নওনিহাল—শেফালী (ছোট), দলীপ—শান্তি, মোকামচাঁদ—বিমলচন্দ্র ঘোষ (২নং), কর্ণেল ভেঞ্চুরা—জয়নারায়ণ মুখোপাধ্যায়, ক্যাপ্টেন ওয়েড—উমাপদ বসু, কাণ সিংহ—রণজিৎ রায়, সাহেব সিংহ—বঙ্কিম দত্ত, চৈৎ সিংহ—গোপাল চন্দ্র ভট্টাচার্য, শাহসুজা—ভুপেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী, আবুতোরাব—বাণী মুখোপাধ্যায়, গোলাপ সিংহ—পঞ্চানন চট্টোপাধ্যায়, রাজকৌড়—নিভাননী, ঝিন্দন কৌড়—মিস লাইট, চাঁদকৌড়—দুর্গারাণী এবং মোহরা বাঈজী-রাজলক্ষ্মী। নাটকটির সুরকার ছিলেন সঙ্গীতাচার্য কৃষ্ণচন্দ্র দে এবং মঞ্চশিল্পী পরেশ বসু। 'রণজিৎ সিংহ' নাট্যকারের পরিচালনায় 'স্টারে' পুনরায় আত্মপ্রকাশ করে ১৯৪৩-র ১২ই আগস্ট। অবশ্য আপত্তিকর অংশ বাদ দেবার পরই পুনরভিনয়ের ছাড়পত্র মেলে। জন চেতনাকে উদ্দীপ্ত করতে একটি নাটক যে কত বড় ভূমিকা গ্রহণ করতে পারে, এই ঘটনা তারই সাক্ষ্য বহন করে।

'রণজিৎ সিংহ' নাটকের আখ্যান ভাগ ইতিহাসের পটভূমিকায় পরিকল্পিত হলেও এটি 'ইতিহাস অবলম্বিত নাটকের' পর্যায়ভুক্ত নয়; মহারাণা রণজিৎ সিংহের নিছক দিগ্বিজয়ের কাহিনী হিসাবে এ নাটক বিবেচিত হতে পারে না। রণজিৎ সিংহের রাজ্য

---

[১] 6th August, 1940 Amrita Bazar-এ 'স্টার'-এ সম্পর্কে বিজ্ঞপ্তি জারি করে- "The Public will be extremeley grieved to learn that our sensational new historical drama Ranjit Sing has been stopped as from Yesterday. Though we are trying our utmost it is not known wheather or when we shall be in a position to revive the drama."

বিস্তার, সাম্রাজ্যের পরিসীমা বৃদ্ধির তাগিদে নয়—তার একমাত্র লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য বহুধা বিভক্ত শিখ জাতিকে একই পতাকা তলে উপনীত করে সাম্রাজ্যবাদী শক্তির বিরুদ্ধে সংগঠিত করে তোলা। একদিকে সাম্রাজ্যলোভী ইংরেজ, দুরন্ত আফগান এবং অন্যদিকে ঘরের শত্রু প্রবল পরাক্রমশালী মারাঠা বাহিনী—এই ত্রিশক্তির বিরুদ্ধে সংগ্রামে সমগ্র শিখ জাতিকে মর্যাদা রক্ষার লড়াই-এ নেতৃত্ব দিয়েছেন মহারাণা রণজিৎ সিংহ এবং এইখানেই তিনি জাতীয় নেতার আসনে প্রতিষ্ঠা লাভ করেছেন। 'রণজিৎ সিংহ' সমগ্র শিখ জাতির স্বাধীনতার মন্ত্রে উদ্বুদ্ধ হবার এক দুরন্ত সংগ্রামের নাটক। স্বদেশ ভাবনার এই বিশিষ্টতা নাটকটিকে একটা নতুন মাত্রা দান করেছে।

মহারাণা রণজিৎ সিংহ কর্তব্যনিষ্ঠ আদর্শবাদী দেশনায়ক— পরাধীনতার শৃঙ্খল মোচনে তিনি দৃঢ় প্রতিজ্ঞ সৈনিক। কোন প্রতিকূলতাই তাঁর দুর্দমনীয় স্বাধীনতা-স্পৃহাকে কিছুমাত্র বিচলিত করতে পারে না। প্রয়োজনে তিনি বিপথগামী অপদার্থ পুত্রকে শাস্তি দানে কুণ্ঠিত হন না, এমন কি ভ্রান্তবুদ্ধি গর্ভধারিণী জননীকেও শৃঙ্খলিত করতে তাঁর অন্তরাত্মা বিচলিত হয় না; জননীর কঠিন লৌহ-শৃঙ্খল তাঁর কাছে প্রতিভাত হয়ে ওঠে শৃঙ্খলিত দেশ মাতৃকার প্রতীকী মূর্তিতে। বন্দিনী জননীর নিঃশব্দ শৃঙ্খল-ঝঙ্কার রণজিৎ সিংহকে অলক্ষ্যে থেকে প্রতি নিয়ত অনুপ্রাণিত করেছে। সেই শক্তিতে তিনি শতদ্রু থেকে পেশোয়ার পর্যন্ত অখণ্ড শিখ সাম্রাজ্য স্থাপন করতে সক্ষম হয়েছেন। রণজিৎ সিংহের বিপুল কর্মসাধনা অবশেষে ইপ্সিত লক্ষ্য অর্জনে সফল হয়েছে। কিন্তু তার জন্যে চরম মূল্য দিতে হয়েছে এই মহান দেশ নায়ককে—শৃঙ্খলিত জননীর নিষ্ঠুর হত্যার বিনিময়ে দেশ মাতৃকার পূজার অর্ঘ রচিত হয়েছে; এই অপরিমেয় বেদনাই রণজিৎ সিংহকে ট্র্যাজিক নায়কের মর্যাদায় উন্নীত করেছে।

মহারাণা রণজিৎ সিংহের দুরন্ত সংগ্রামের পথে প্রধান অন্তরায় চৈৎ সিংহ, কানসিংহ এবং সাহেব সিংহের বিশ্বাসঘাতকতা ও কূট চক্রান্ত। এই ত্রয়ী অশুভ শক্তির গভীর ষড়যন্ত্রের শিকার ব্যক্তিত্বহীন যুবরাজ খড়্গ সিংহ এবং তার ফলভোক্তা স্বয়ং মহারাণা রণজিৎ সিংহ। খড়্গ সিংহ কুচক্রীদের হাতের পুতুল—এই চরিত্রটি রবীন্দ্রনাথের বিসর্জন নাটকের নক্ষত্র রায়ের সঙ্গে তুলনীয়। রঘুপতির মতই রাজবিদ্রোহের হোতা সুচতুর চৈৎ সিংহের প্ররোচনায় সে পিতৃদ্রোহী তথা দেশদ্রোহী। অথচ দেশদ্রোহিতা সম্পর্কে সুস্পষ্ট কোন ধারনা খড়্গ সিংহের নেই। তাই অতি সহজেই তাকে সুরা এবং নারীর নেশায় মশগুল রেখে চৈৎ সিংহ তার দুরভিসন্ধি চরিতার্থ করতে সক্ষম হয়েছে। কিন্তু মহারাণা রণজিৎ সিংহের ক্ষমতা ও দক্ষতা সম্পর্কে সঠিক ধারনা বোধহয় চৈৎ সিংহেরও ছিল না। রাজ্য লাভের দুর্বার বাসনা যখন অচিরেই বিনষ্ট হয়ে গেল, এমন কি বালক নওনিহালের তেজদীপ্তি যুবরাজ খড়্গ সিংহের ওপরে তার নিয়ন্ত্রণকে দুর্বল করে দিল, তখন রাজমাতা রাজকৌড়কে কৌশলে হত্যা করে চৈৎ সিংহ শেষ আঘাত হানতে চেয়েছিল। কিন্তু এই আকস্মিক অঘটন তার বিনাশকেই নিশ্চিত করে তুলল এবং শেষ আঘাতটি তাকে মাথা পেতে নিতে হল অনুতপ্ত খড়্গ সিংহেরই হাতে।

রাজমাতা রাজকৌড় জাতীয়তাবোধে উদ্বুদ্ধ ভারতীয় নারী। তবু স্নেহ বনাম কর্তব্যের দ্বন্দ্বে অবিরাম বিচলিত এই নারী রণজিৎ সিংহের স্বপ্ন ও সাধনাকে পদে পদে জটিল করে তুলেছেন। স্নেহ যখন অন্ধ হয়ে পড়ে, কর্তব্যের গুরুভার বহনে তখন তা অক্ষম। খড়্গ সিংহের প্রতি রাজকৌড়ের অন্ধ স্নেহ ঘটনাচক্রের অদৃশ্য নিয়ন্ত্রক এ কথা অস্বীকার করবার উপায় নেই। খড়্গ সিংহের প্রতি তার প্রচ্ছন্ন সহানুভূতি পরোক্ষে চৈৎ সিংহের হাত শক্ত করেছে; সেই সঙ্গে চাঁদকৌড়ের তীব্র মানসিক যন্ত্রণাকে অহর্নিশ বাড়িয়ে তুলেছে। রাজকৌড়ের মত মহারাণী ঝিন্দন কৌড়ও তীব্র জাতীয়তাবোধে উদ্বুদ্ধ। ঝিন্দন কৌড় মহারাণা রণজিৎ সিংহের যোগ্য সহধর্মিনী। কিন্তু খড়্গ সিংহের প্রতি ঝিন্দন কৌড়ের অতি বাৎসল্য আমাদের ঔচিত্যবোধের কাছে পীড়াদায়ক হয়ে উঠেছে। সপত্নী পুত্র খড়্গ সিংহকে মহারাণার ক্রোধ থেকে বাঁচাতে বিমাতা ঝিন্দনকৌড় যে ভাবে গর্ভজাত বালকপুত্র দলীপ সিংহকে নির্দ্বিধায় এগিয়ে দিয়েছেন তা মাতৃধর্মের পরিপন্থি। ঝিন্দনকৌড়ের এই আচরণ নাটকের ত্রুটি হিসাবেই বিবেচ্য।

নাটকের সংলাপ শ্রুতিমধুর। সংগীত পরিকল্পনায় দেশাত্মবোধের প্রেরণা আছে। সামগ্রিক বিচারে নাটকের রসস্ফূর্তিতে কাহিনী, চরিত্র, সংলাপ ও সিচুয়েশনের সুষ্ঠ সমন্বয় ঘটেছে।

॥ রাণী ভবানী ॥

মহেন্দ্র গুপ্তের ইতিহাসের পটভূমিকায় রচিত দেশাত্মবোধক নাটক 'রাণী ভবানী' ১৯৪২-র ২৪শে আগস্ট 'স্টার' থিয়েটারে স্বয়ং নাট্যকারের পরিচালনা ও নির্দেশনায় প্রথম অভিনীত হয়। সে কালে মুষ্টিমেয় যে কয়েকটি স্বদেশ চেতনা মূলক নাটক রাজরোষের স্পর্শ বাঁচিয়ে রঙ্গমঞ্চে প্রবেশাধিকার লাভ করেছিল 'রাণী ভবানী' তন্মধ্যে অন্যতম। নাটকটি সেকালে যথেষ্ট জনপ্রিয়তা অর্জন করে। এ নাটকের চরিত্রলিপিটি অতি দীর্ঘ। কেবলমাত্র উল্লেখযোগ্য চরিত্রে 'স্টারের' যে সমস্ত শিল্পী অংশগ্রহণ করেছিলেন তার একটি তালিকা নিম্নে পেশ করা হল ঃ

রায় রায়ান দয়ারাম—জয়নারায়ণ মুখার্জী; রাজা রামকান্ত—পঞ্চানন বন্দ্যোপাধ্যায়; দেবকী প্রসাদ—সিদ্ধেশ্বর গাঙ্গুলী; সিরাজদৌল্লা—ভূপেন চক্রবর্তী; মীরজাফর—সনৎ মুখার্জী; জগৎ শেঠ এবং রুদ্রানন্দ—গোষ্ঠ ঘোষাল; রাজবল্লভ—আশুতোষ ভট্টাচার্য; মোহনলাল—গোপাল চট্টোপাধ্যায়; রাজা কৃষ্ণচন্দ্র—ব্রজেন বাবু; রামকৃষ্ণ—মাঃ সতু; নকরি সামন্ত—মুরারী মুখার্জী; সাধু মস্তরাম—মঙ্গল চক্রবর্তী; রাণী ভবানী—মিস্ লাইট; সীতাদেবী—ঊষা দেবী; লুৎফাউন্নিসা—বীণা দেবী; কল্যাণী—তারকবালা; এবং আরো অনেকে। কৃষ্ণচন্দ্র দে এবং প্রণব দে সুরারোপিত এই নাটকে আবহ নিয়ন্ত্রক ছিলেন দুলাল মল্লিক এবং মঞ্চ রচনায় ছিলেন পরেশ বসু।

'রাণী ভবানী' খাঁটি অর্থে দেশাত্মবোধক নাটক। ইতিহাসের প্রেক্ষাপটে স্বদেশচর্চার প্রসঙ্গই এ নাটকে অধিক গুরুত্বপূর্ণ। রাজা রামকান্ত এবং তদীয় পত্নী রাণী ভবানীর

রাজনৈতিক উত্থান পতনের ইতিবৃত্ত এই নাটকের শেষ কথা নয়। রাজা রামকান্তের রাজত্বকালে ঐতিহাসিক সন্ন্যাসী বিদ্রোহের পটভূমিকায় নাটকটি রচিত হয়েছে। দেশমাতৃকার মুক্তি সাধনে সন্ন্যাসী সম্প্রদায়ের বিদ্রোহ ঘোষণা, তাদের সংগঠিত আন্দোলন এবং তারই পাশাপাশি দেশভক্তির অনুপম দৃষ্টান্ত সহ বেইমানী ও ষড়যন্ত্রের ঘাত প্রতিঘাতে নাট্যকাহিনী দানা বেঁধেছে। সৌভ্রাতৃত্ববোধ এবং বিস্মৃত অতীতের পুনরুদ্ধার জাতির মুক্তিকে তরান্বিত করবে—এমন একটা প্রত্যাশাও এ নাটকে প্রতিধ্বনিত হয়েছে। অর্থাৎ রাজশক্তির বিরুদ্ধে সংগঠিত আন্দোলনের পাশাপাশি আত্মসংশোধনটুকুও অপরিহার্য উত্তরকালের শোষণমুক্ত উন্নত সমাজ গঠনে।

মোগল-পাঠানের স্বৈরাচার, হিন্দু জমিদারদের অত্যাচার, পর্তুগীজ লুণ্ঠন, সাম্রাজ্যবাদী ইংরেজের কূটচক্রান্ত ও ষড়যন্ত্রকারীদের চক্রান্তে অরাজক বাঙলার মুক্তিকল্পে 'আনন্দমঠে' সংঘবদ্ধ প্রায় বাইশ হাজার সন্ন্যাসী। এর সঙ্গে যুক্ত হয়েছে রঙপুরে ভবানী পাঠক এবং দেবী চৌধুরানীর পরিচালনাধীন দুধর্ষ লাঠিয়াল বাহিনী। শক্তির জাগরণ তাদের সাধনা—শৃঙ্খলিতা দেশমাতৃকার মধ্যে তারা আবিষ্কার করেছে সেই মহাশক্তিকে। সেই শক্তির উপাসনায় সন্ন্যাসী সম্প্রদায় মন্তরামের নেতৃত্বে শাস্ত্র ত্যাগ করে হাতে তুলে নিয়েছে অস্ত্র। বাঙলাকে শোষণ করে বাঙলার সম্পদ তারা বাঙলার বাইরে যেতে দেবেনা। মরণপণ ব্রত তাদের। সন্ন্যাসী বিদ্রোহ এখানে দুটি পর্বে বিভক্ত। প্রথম পর্বে তাদের বিদ্রোহ দেশীয় রাজন্যবর্গের বিরুদ্ধে, বাঙলার নবাবের বিরুদ্ধে। তাই নবাবের উদ্দেশ্যে রাজা রামকান্তের প্রেরিত রাজস্ব লুট, নবাবী সৈন্যের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা। দ্বিতীয় পর্বে বিদেশী ইংরেজের আগ্রাসনের প্রতিরোধের নিমিত্ত নবাবের অনুকূলে ষড়যন্ত্রকারীদের বিরুদ্ধে সংঘবদ্ধ বিদ্রোহের গতিপথ পরিবর্তিত।

বঙ্কিমচন্দ্রের 'আনন্দমঠ' উপন্যাসের প্রত্যক্ষ প্রভাব এই নাটকে সহজেই অনুভব করা যায়। সন্ন্যাসী সম্প্রদায়ের সৃষ্ট 'আনন্দমঠ' বঙ্কিম উপন্যাসের প্রত্যক্ষ প্রভাবজাত। রুদ্রানন্দ, ভৈরবানন্দ--সন্ন্যাসী সম্প্রদায়ের ইত্যাদি নামকরণে বঙ্কিমচন্দ্রের রীতিকেই স্মরণ করিয়ে দেয়। 'আনন্দমঠ' উপন্যাসে মুসলমান অপশাসনের বিরুদ্ধে সন্ন্যাসীরা অস্ত্র ধারণ করেছে। মন্বন্তর ক্লিষ্ট জন্মভূমির সঙ্কট মোচন তাদের জীবনের মহাব্রত। বর্তমান নাটকে বাঙলার নবাব ও দেশীয় রাজন্যবর্গের কুশাসনে অরাজক বাঙলার মুক্তি সাধনের সঙ্কল্প মন্তরামের নেতৃত্বাধীন সন্ন্যাসী সম্প্রদায়ের। পরে তা ইংরেজদের বিরুদ্ধে প্রবাহিত। মহেন্দ্র ও কল্যাণী সেখানে 'আনন্দমঠের' সংস্পর্শে এসে স্বদেশ চেতনায় উদ্বুদ্ধ হয়েছে। আর এখানে রাজ্যসুখ পরিত্যক্ত রাণী ভবানী লোক-কল্যাণের ব্রতে উৎসর্গীকৃত প্রাণ। ভবানী পাঠক কিম্বা দেবী চৌধুরাণীও আমাদের পূর্ব পরিচিত।

আলোচ্য নাটকের কেন্দ্রিয় চরিত্র রাণী ভবানী অথবা রাজা রামকান্ত নন—এই নাটকের সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য চরিত্র রায় রায়ান দয়ারাম। সমস্ত ঘটনার নেপথ্য নায়ক দেশভক্ত, নীতিবাদী ও আদর্শবান এই চরিত্রটি। নাটোর রাজ্যের ভাগ্য নিয়ন্ত্রকের ভূমিকায় দেখতে পাই এই চরিত্রটিকে। দেওয়ান দয়ারাম শুধু রামকান্ত-ভবানীর অভিভাবকই নন,

তার বিচক্ষণতা ও রাজভক্তির ওপর নির্ভর করেই রাজা ও রাণীর রাজকার্য পরিচালিত হয়ে থাকে। প্রকৃত অর্থে তিনিই রাজ্যের ভাগ্য নির্ধারক। অতি বিশ্বস্ত রাজকর্মচারী এই ব্যক্তিটির বিচক্ষণতায় রক্ষা পেয়েছে মূল্যবান দলিলপত্র, বানচাল হয়ে গেছে রাজ্যলোভী দেবকী প্রসাদের গভীর ষড়যন্ত্র, নবাবের রোষ থেকে রক্ষা পেয়েছেন রাণী ভবানী এবং রামকান্ত। দেবকী প্রসাদের কূট চক্রান্তে বুদ্ধিভ্রষ্ট রামকান্তের নির্বাসন দণ্ড শিরোধার্য করেও আদর্শনিষ্ঠ দয়ারামের গভীর কর্তব্যজ্ঞান, অবিচল দেশভক্তি, রাজ্যের স্বার্থরক্ষায় নিরাসক্ত প্রচেষ্টা আমাদের শ্রদ্ধা উদ্রেক করে। সন্ন্যাসী বিদ্রোহের নায়ক মন্তরামের সহায়তায় দয়ারাম রাজ্যচ্যুত রামকান্তকে নবাবের কাছে নির্দোষ প্রতিপন্ন করে সিংহাসনে পুনঃপ্রতিষ্ঠা করেছেন এবং বেইমান দেবকী প্রসাদের শাস্তি বিধানে তৎপর হয়েছেন। তিনিই সমস্ত ঘটনার নেপথ্য নায়ক, সকল কান্ডের কাণ্ডারী, সমস্ত ঘাত প্রতিঘাতের সঙ্গে অনিবার্য যোগসূত্র তাঁরই। অতএব নায়ক চরিত্র রূপে রায় রায়ান দয়ারাম চরিত্রটিকেই গণ্য করতে হয়।

সিংহাসন লোভী স্খলিত চরিত্র দেবকী প্রসাদ রাজদ্রোহী -রাজদ্রোহ থেকে তার দেশদ্রোহের সূচনা। প্রয়াত রাজা রামজীবনের সিংহাসনের ন্যায়সঙ্গত উত্তরাধিকার তারই। অথচ বিলাসমত্ত অপদার্থ মাদকাসক্ত কনিষ্ঠ ভ্রাতুষ্পুত্রের পরিবর্তে, রাজ্যের কল্যাণে রাজা রামজীবন তার উত্তরাধিকারী নির্দিষ্ট করে গেছেন পালিত পুত্র রামকান্তকে। এর পশ্চাতে প্রচ্ছন্ন সম্মতি ছিল প্রবীণ দেওয়ান দয়ারামের। অতএব দেবকীপ্রসাদের সমস্ত ক্রোধ গিয়ে পড়েছে একদিকে দয়ারাম এবং অন্যদিকে রামকান্তের ওপরে। দয়ারামের সতর্ক রাজনীতি জ্ঞানের প্রহরা বেষ্টিত রামকান্তকে সিংহাসনচ্যুত করা তার পক্ষে সম্ভব ছিল না। তাই জালিয়াত নকুড়ের পরিকল্পনা মাফিক দয়ারামকে রামকান্তের চোখে বেইমান প্রতিপন্ন করে, রাজ্য থেকে তাকে বিতাড়নের ব্যবস্থা এবং পরে নবাবী সৈন্যের সাহায্যে অনভিজ্ঞ রামকান্তকে সরিয়ে তার সিংহাসন লাভের নিপুণ বন্দোবস্ত। এই চক্রান্তে প্রথমদিকে সফল দেবকীপ্রসাদ। কিন্তু রাজনীতির মারপ্যাঁচে অনেক বেশি সিদ্ধহস্ত অভিজ্ঞ দয়ারাম; তদুপরি দয়ারামের রাজভক্তি, দেশভক্তি সন্দেহাতীত। অতএব দেবকীপ্রসাদের স্বরূপ উদ্ঘাটনে অধিক বিলম্ব হয়নি।

মহানুভবতার দিক দিয়ে এই নাটকের নারী চরিত্রগুলি বিশেষ মর্যাদার দাবী করতে পারে। রাণী ভবানী নিছক রাজ মহিষী মাত্র নন-- তিনি আপামর জনগণের জননীতুল্যা। লোক কল্যাণের ব্রত তার। রাজ্যসুখ বঞ্চিত হয়েও তিনি দুস্থ ব্রাহ্মণের সেবায় নিয়োজিত প্রাণ। পলাশীর যুদ্ধে পরাজিত বিপন্ন সিরাজের প্রাণ রক্ষার্থে কাশী থেকে ছুটে এসেছেন তিনি। এমনকি ক্রুদ্ধ সন্ন্যাসীদের নির্মম প্রতিহিংসার আগুন থেকে ভ্রাতৃস্নেহে প্রাণরক্ষা করেছেন রাজদ্রোহী দেবকীপ্রসাদের। তার মহানুভবতার আলোক স্পর্শে পাপমুক্ত দেবকীপ্রসাদ স্বদেশ চেতনায় উদ্বুদ্ধ। দেবকী জায়া সীতাদেবী স্বামীর পাপকর্মের বিরোধীতা করে পদে পদে লাঞ্ছিতা। রাজমহিষীর পদ মর্যাদা তাকে প্রলুব্ধ করতে পারে না। বিলাসমত্ত প্রজাপীড়ক হঠাৎ রাজা দেবকীপ্রসাদ তারই ঐকান্তিক চেষ্টায় নবাব সৈন্যের

হাতে বন্দী হয়েছে- অপশাসন থেকে মুক্ত হয়েছে নাটোর রাজ্যের উৎকণ্ঠিত জনগণ। বেগম লুৎফাউন্নিসা নবাব সিরাজের ছায়াসঙ্গিনী। ষড়যন্ত্রের চাপে রাজ্যচ্যুত নবাব তার প্রাণপ্রিয় বেগমের হৃদয়াসন থেকে নির্বাসিত হননি কখনই।

অপ্রধান চরিত্রগুলির মধ্যে বিশেষ ভাবে উল্লেখযোগ্য রাণী ভবানীর পালিতপুত্র বালক রামকৃষ্ণ, বিশ্বাসঘাতক মীরজাফর এবং দানশা ফকির। রাণী ভবানীর কল্যাণ বোধের প্রেরণার অদৃশ্য নিয়ামক বালক রামকৃষ্ণ। ভণ্ড ফকির দানশা ছদ্মবেশী সিরাজকে ধরিয়ে দিয়ে পাপকর্মের বিবেক দংশনে ক্ষত বিক্ষত, উন্মাদপ্রায়। অবাধ্য সন্তান মীরণের নিষ্ঠুরতার লজ্জায় নতমস্তক বেইমান মীরজাফর। এই দুটি অতি পরিচিত ঐতিহাসিক চরিত্র মানবিক দ্বিধাদ্বন্দ্বে নবরূপে চিত্রিত এই নাটকে। তবে সিরাজদ্দৌল্লার প্রসঙ্গ নাট্যকাহিনীব পক্ষে অপরিহার্য নয়। নাটকের সংলাপ সুখপাঠ্য, কাহিনী গতিময়।

॥ শতবর্ষ আগে ॥

যুদ্ধকালীন বাংলা নাটকের ধারায় একেবারে শেষ পর্বে অভিনীত নাটক মহেন্দ্র গুপ্তের 'শতবর্ষ আগে'। 'স্টার' রঙ্গমঞ্চে ১৯৪৫ র ২১শে ডিসেম্বর নাটকটির আনুষ্ঠানিক অভিনয় শুরু হয়। তৎকালীন পুলিশ কমিশনার কর্তৃক নাটকটির অভিনয প্রথমে নিষিদ্ধ ঘোষিত হয়। পরে তাঁর নির্দেশ মত কয়েকটি অংশ বর্জন করার পর অভিনয়ের ছাড়পত্র পাওয়া যায়। গণচেতনায় বিন্দুমাত্র স্ফুলিঙ্গ সঞ্চার করতে পারে এ রকম বহু নাটকের অভিনয় সেকালে হয় নিষিদ্ধ ঘোষিত হয়েছিল নতুবা সংশোধন পরিমার্জনের পরে অভিনয়ের অনুমতি পাওয়া গিয়েছিল। সিপাহী বিদ্রোহের পটভূমিকায় রচিত মহেন্দ্র গুপ্তের 'শতবর্ষ আগে' নাটকটির ক্ষেত্রেও সে নিয়মের কোন ব্যতিক্রম হয়নি।

নাট্যকারের পরিচালনায় 'শতবর্ষ আগে' মঞ্চাভিনয়ে অভূতপূর্ব সাফল্য অর্জন করে। প্রথম অভিনয় রজনীতে বিভিন্ন চরিত্রে রূপদান করেছিলেন ঃ তাত্যাটোপী বিমল ঘোষ, নানাসাহেব ভূপাল সেন, রাওসাহেব- পঞ্চানন ব্যানার্জী, আজিমূল্যা সিধু গাঙ্গুলী, দামোদর কনকলতা, লক্ষ্মণ রাও রবীন বোস, গঙ্গাধর তারা ভট্টাচার্য, জেমিগ্রীন— ভূমেন রায়, মাইকেল জয়নারায়ণ মুখার্জী, বিদ্যাসাগর কালী ব্যানার্জী, গিরিশচন্দ্র - মাঃ অনু, শরৎচন্দ্র- কমল ব্যানার্জী, ওয়াজেদ আলি কুমার ঘোষ, টিকা সিং—সত্যপাঠক, জাওলাপ্রসাদ শান্তি দাশগুপ্ত, রাইমোহন— শিবকালী চ্যাটার্জী, বলদেও— কালীপদ চক্রবর্তী, লর্ড ক্যানিং -প্রবোধ মুখার্জী, এডমন্ড স্টোন—বাণী মুখার্জী, মেজর কিরকে—সুধাংশু গুহ, রাণী লক্ষ্মীবাঈ- শান্তি গুপ্তা, লুনা - পূর্ণিমা, সুলতনা - হরিমতী, ময়নাবাঈ—জ্যোৎস্না, হোসেনী খানুম অপর্ণা দেবী এবং আরও অনেকে। মঞ্চ পরিকল্পনায় ছিলেন জহর কুণ্ডু এবং নাটকে সুরারোপ করেন ধীরেন দাস এবং পবিত্র দাশগুপ্ত।

সিপাহী বিদ্রোহের ঐতিহাসিক ঘটনা অবলম্বনে নাটকটির আখ্যানভাগ পরিকল্পিত হয়েছে। পলাশী যুদ্ধের ঠিক একশো বছর পরে ১৮৫৭ খ্রীষ্টাব্দে সমগ্র দেশজুড়ে সিপাহী বিদ্রোহের যে আগুন বিধ্বংসী রূপে জ্বলে উঠেছিল --তার সূচনা, ব্যাপ্তি, গভীরতা এবং

পরিশেষে নিদারুণ ব্যর্থতার প্রামাণ্য দলিল হিসাবে নাটকটি গণ্য হতে পারে। ঐতিহাসিক সত্য ও তথ্যকে যথাসম্ভব অবিকৃত রেখে দেশব্যাপী বিদ্রোহের সর্বাত্মক রূপালেখ্য নির্মাণ করতে চেয়েছেন নাট্যকার। সেদিক থেকে সুগভীর জাতীয়তাবাদের প্রথম সার্থক নাট্যিক প্রকাশ হিসাবে নাটকটির স্বতন্ত্র মূল্য আছে এবং ইতিহাসাশ্রিত রোমান্সের সঙ্গে নাটকটির মৌলিক পার্থক্য এইখানে।[৫]

সিপাহী বিদ্রোহ ভারত ইতিহাসে কোন তাৎক্ষণিক ঘটনার আকস্মিক বহিঃপ্রকাশ নয়; বহুদিন ধরে ক্রমান্বয়ে সঞ্চিত ক্ষোভ ও বেদনা কোন একটা উপলক্ষে বিস্ফোরিত হবার জন্যে অপেক্ষা করছিল। ব্যারাকপুর সেনা ছাউনিতে নিষিদ্ধ চর্বি মেশোনো টোটা সেই আয়োজন সম্পূর্ণ করেছিল এবং মঙ্গল পাঁড়ে প্রাথমিক অগ্নি সংযোগের কাজটুকু সম্পন্ন করেছিলেন। নইলে এই সামান্য ঘটনার প্রতিক্রিয়া সমগ্র দেশজুড়ে ব্যাপক বিদ্রোহের আকারে সঙ্গে সঙ্গে মূর্ত হয়ে উঠত না। সাম্রাজ্যবাদী শক্তির দম্ভ ও অহংকারের বিরুদ্ধে সিপাহী বিদ্রোহ সমগ্র জাতির প্রথম সশস্ত্র প্রতিবাদ। তবু যে এই বিদ্রোহ শেষ পর্যন্ত সফল হতে পারেনি, তার প্রধান কারণ উপযুক্ত নেতৃত্বের অভাব। ভারতব্যাপী বহু বিভক্ত বিদ্রোহী শক্তিগুলি সম্মিলিত রূপে সুযোগ্য একক নেতৃত্বের অধীনে সেদিন আত্মপ্রকাশ করতে পারেনি। বিশেষ করে হিন্দু ও মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের পারস্পরিক নির্ভরতা এবং বিশ্বাসযোগ্যতার প্রশ্নটি নিদারুণ ভাবে উপেক্ষিতই হয়েছে। একদিকে দিল্লীর মসনদে বৃদ্ধ বাহাদুরশা'র নেতৃত্বে মুসলমান সাম্রাজ্য পুনঃপ্রতিষ্ঠার প্রচেষ্টা এবং অন্যদিকে নানাসাহেবকে কেন্দ্র করে স্বাধীন মহারাষ্ট্র সাম্রাজ্যের পরিকল্পনা, স্পষ্টতই সংগঠিত বিদ্রোহের লক্ষ্য ও সম্ভাবনাকে দ্বিধা বিভক্ত করে দিয়েছিল। রাষ্ট্র সঙ্কটের এই প্রেক্ষাপটটি এই নাটকে উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে।

'শতবর্ষ আগে' ঠিক নাটক নয়—নাট্যচিত্র; ভারতের বিভিন্ন প্রান্তে বিদ্রোহের বহ্নিশিখার এক একটি স্ফুলিঙ্গ ইতিহাসের গহ্বর থেকে সযত্নে চয়ন করেছেন নাট্যকার। দিল্লীতে বাহাদুর শাহ, মহারাষ্ট্রে নানা সাহেব, ঝাঁসিতে বীরাঙ্গনা লক্ষ্মীবাঈ, বিহারে কুমার সিংহের নেতৃত্বে প্রজ্জ্বলিত হোমাগ্নি দাবানলের মত বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদকে গ্রাস করতে উদ্যত। তার ব্যাপ্তি ও গভীরতা স্বয়ং বড়লাট ক্যানিংকে পর্যন্ত অতিমাত্রায় বিচলিত করেছিল, তাই ভারতীয় সিপাহীদের নিরস্ত্রীকরণের আশু প্রয়োজন হয়ে উঠেছিল জরুরী। আত্মরক্ষার তাগিদে সাম্রাজ্যবাদের এই পীড়ন-নীতি বাস্তব ক্ষেত্রে বিদ্রোহের বহ্ন্যুৎসবে অতিরিক্ত

---

[৫] ভূমিকায় নাট্যকার বলেছেন "বহু নেতা যে ঘটনার সঙ্গে বিজড়িত তা নিয়ে নাটক রচনা করা দুঃসাধ্য ব্যাপার। ... ভারতের বিভিন্ন অংশের বিদ্রোহের আলেখ্য অঙ্কিত করতে তাই আমাকে খানিকটা experimental technique অবলম্বন করতে হয়েছে। .. এ নাটকে কোথাও কোন কাল্পনিক কাহিনীর অবতারণা করা হয়নি; এর প্রত্যেকটা চরিত্র ও ঘটনা ইতিহাস সম্মত। তবে নির্জলা ইতিহাসে নাটক হয় না; তাই যেখানে অতি সামান্য ভাবে কল্পনার আশ্রয় নিয়েছি তা কেবল নাটকটে নাটকত্ব দেবার জন্যে।"

উপকরণই সংযুক্ত করেছিল। অন্যদিকে দেশীয় রাজশক্তিগুলিকে বহুভাবে বঞ্চনা করে তাদের শ্রী ও শক্তি হ্রাসের ব্যাপক আয়োজন, মর্যাদার প্রশ্নে তাদের রণক্ষেত্র অভিমুখে ধাবিত করেছিল। ভারতীয় সিপাহীরা এই সব রাজশক্তির ছত্রছায়ায় যুদ্ধ জয়ের বিরল সম্ভাবনায় উন্মুখ হয়ে উঠেছিল। কিন্তু সমন্বয়ের একান্ত অভাব সেই বিরল সম্ভাবনার পথকে অনেকখানি অবরুদ্ধ করে রেখেছিল। তদুপরি বিশ্বাসঘাতকতার নিপুণ চক্রান্ত সন্তর্পণে তার সমাধি রচনার ক্ষেত্র প্রস্তুত করে তুলেছিল।

আজিমুল্যা ও হুইলার-কন্যা লুনার প্রণয় এই নাটকের প্রধান ত্রুটি। আজিমুল্যা অনন্য সাধারণ বীর---নানা সাহেবের বিশ্বস্ত অনুচর, তার প্রজ্ঞা দেশে ও বিদেশে প্রভূত সমাদৃতঃ দেশ মাতৃকাকে বিদেশী শাসন মুক্তির দুর্জয় সংকল্প তার জীবনের একমাত্র ব্রত। অথচ বলিষ্ঠ চরিত্র আজিমুল্যার জীবনাদর্শ হুইলার কন্যা লুনার ভ্রুভঙ্গির আঘাতে সম্পূর্ণ রূপে বিপর্যস্ত। দেশের মুক্তি অপেক্ষা প্রণয়প্রার্থী লুনার নিরাপত্তা ও ভবিষ্যৎ নিয়ে তার উদ্বেগ, অতি-ব্যস্ততা চরিত্রটির আদর্শ ও কর্মপন্থাকে একটি সুগভীর প্রশ্নচিহ্নের সম্মুখে দাঁড় করিয়ে দিয়েছে। আজিমুল্যা চরিত্রে পূর্বাপর সঙ্গিত নেই—মন্ত্রের সাধন কিম্বা শরীর পাতনের অগ্নিদীক্ষায় দীক্ষিত এই চরিত্রের এ হেন করুণ পরিণতি, চরিত্রটির বিশ্বাসযোগ্যতা পুরোপুরি নষ্ট করেছে। কোন ক্ষীণ অজুহাতেও তাকে অব্যাহতি দেওয়া যাবে না। বরং হোসেনী খানুমের নৃসংশতা, বর্বরোচিত আচরণ এবং প্রতিহিংসা পরায়ণতা সহৃদয় বিচারকের দরবারে তার আর্জি পেশ করতে পারে। লক্ষ্যভ্রষ্ট শর কোন একটা উপলক্ষকে সমভাবেই বিদ্ধ করে থাকে। হোসেনী খানুম নারী বলেই বলিষ্ঠ ব্যক্তিত্ব আজিমুল্যাকে তার হৃদয় সমর্পণ করে বসে ছিল এবং আজিমুল্যারও তা অগোচর ছিল না। কিন্তু হোসেনীর পরিবর্তে লুনার কণ্ঠে দুলে উঠল আজিমুল্যার প্রণয়-মাল্য। বাঞ্ছিত পুরুষের এবং বিধ অবমাননা হোসেনীর বক্ষস্থিত প্রণয় তৃষ্ণাকে পরিণত করেছে প্রতিহিংসায়। লুনাকে সামনে রেখেই হোসেনীর ধনুতে জ্যা রোপণ—তারই অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ বিবিঘরে বন্দীহত্যার পরিকল্পনা, অবাধ্য লুনাকে কৌশলে হত্যার ষড়যন্ত্র, রাওসাহেবকে নিপুণ ভাবে ব্যবহার করে নানাসাহেবের চরিত্রে কলঙ্ক লেপন।

নাটকীয় ত্রি-ঐক্য এই নাটকে রক্ষিত হয়নি—বিশেষ করে স্থানগত এবং ঘটনাগত ঐক্যের যথেষ্ট অভাব আছে নাটকটিতে। ভারতবর্ষের বিভিন্ন প্রান্তে সংঘটিত বিদ্রোহের আলেখ্য নির্মাণের পরিকল্পনা হেতু এখানে স্থানগত ঐক্য বিঘ্নিত হয়েছে। সিপাহী বিদ্রোহের পটভূমিকায় দেশের বিভিন্ন প্রান্তে ক্রিয়াশীল কর্মকাণ্ডগুলির মধ্যে নাট্য ঐতিহ্যগত যোগসূত্রও অত্যন্ত দুর্বল। নাটকের প্রথম এবং শেষ দৃশ্য, মূল কাহিনীর সঙ্গে পুরোপুরি সম্পর্ক রহিত- ঘটনা ধারার পরিপূরক তো নয়ই, বরং অবান্তর। সংলাপ ও সঙ্গীত মোটের উপর সার্থক।

ষষ্ঠ অধ্যায়

সামাজিক নাটক

যুদ্ধকালীন ক্রান্তি লগ্নের শ্রেষ্ঠ ফসল এই পর্বের সামাজিক নাটকগুলি। বৃহত্তর সমাজ পরিবেশ বাংলা নাটকে এমন বৈচিত্র্যমণ্ডিত রূপে ইতঃপূর্বে আত্মপ্রকাশ করেনি। অবশ্য আদি পর্ব থেকেই সামাজিক জীবনের বহুবিধ সমস্যা বাংলা নাটকের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য হয়ে উঠেছিল ঠিকই; কিন্তু এতখানি ব্যাপ্তি ও গভীরতা সমাজের সর্বস্তরের মানুষের সুখ দুঃখের এমন প্রত্যক্ষ প্রতিফলন এর আগে বাংলা নাটকে দেখা যায়নি। পরিবেশ ও পরিস্থিতির দ্রুত পরিবর্তনে বাঙলার সামাজিক ও পারিবারিক জীবনে ঘনায়মান আবর্ত পঙ্কিলতা বাংলা সামাজিক নাটককে বলিষ্ঠতা ও ঋজুতা দান করে তাকে বহুলাংশে সমৃদ্ধ করেছে। বস্তুত এই পর্ব থেকেই যথার্থ সামাজিক নাটকের যুগের সূচনা: এই পর্ব থেকেই নিশ্চিত রূপে অনুভূত হচ্ছিল. উত্তরকালে বাংলা সামাজিক নাটক অন্য সমস্ত শ্রেণীর নাটককে ছাড়িয়ে একচ্ছত্র আধিপত্য বিস্তার করে দর্শক সমাজের রসতৃষ্ণা নিবারণ করে চলবে।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সর্বনাশা অভিঘাতে বাংলার পল্লীকেন্দ্রিক কৃষিনির্ভর সামাজিক ও পারিবারিক জীবনের শান্তির নীড় তাসের ঘরের মতই ভেঙ্গে পড়েছিল। অতর্কিত সংঘাতের মুখোমুখি হবার মত সেদিন সামান্যতম মানসিক প্রস্তুতিও ছিল না--প্লাবনের বেগ ঠিক মত বুঝে উঠবার আগেই প্লাবনের তোড়ে ভেসে গিয়েছিল সমস্ত কিছু। অর্থনৈতিক সঙ্কট, দুর্ভিক্ষ, বন্যা ও মন্বন্তরের পটভূমিকায় উপনীত হয়ে শাপভ্রষ্ট বাঙলার মানুষ নিরাপদ আশ্রয়ের সন্ধানে পল্লী-সমাজের বাতাবরণ ভেদ করে এক অনিকেত যাত্রায় পা বাড়িয়েছিল। ভূমিজীবী সমাজ ব্যবস্থার ভাঙন, একান্নবর্তী পরিবারের স্নেহ--মোহ-বন্ধনকে অনায়াসে অতিক্রম করবার অলক্ষ্য শক্তি দান করে তার গৃহত্যাগের সম্ভাবনাকে আরও নিশ্চিত করে তুলেছিল। বহু পুরুষের স্মৃতি বিজড়িত বাস্তুভিটে হারানোর নৈর্ব্যক্তিক যন্ত্রণা এবং তারই অপর পিঠে নগর সভ্যতার অনিশ্চিত ভবিতব্যের কাছে অসহায় আত্মসমর্পণ, ঐতিহ্যগত সংস্কারের দ্রুত অপসারণে সহায়ক হয়ে উঠেছিল। সামাজিক জীবনের এই বিপর্যয় নৈতিক মূল্যবোধের সংবক্ষিত ক্ষেত্রেও তীব্র সংশয়ের সৃষ্টি করেছিল।

বিরুদ্ধ পরিস্থিতিতে জীবন ও জীবিকার আশু প্রয়োজনে কল-কারখানা বা সওদাগরী অফিসে শ্রমিক ও কেরানীর বৃত্তি দারুণ ভাবে প্রলুব্ধ করল বুভুক্ষ মানুষকে। কিন্তু

সৌভাগ্যের সেই অমৃতবারির স্পর্শলাভও সকলের পক্ষে সম্ভবপর ছিল না; তাদের অধিকাংশের স্বপ্নবাসর নির্দিষ্ট ছিল পার্কের কোণে, ফুটপাতের ধূলিশয্যায় অথবা ডাস্টবীনের আসে পাশে কুকুর বেড়ালের সঙ্গে সহবাসে! গৃহমুখী নারী তার লজ্জা সংস্কারের প্রথম বাধাটুকু অতিক্রম করে এসেছিল গৃহত্যাগের সঙ্গে সঙ্গেই। এখন কর্ম জগতে সেও পুরুষের সমকক্ষ হিসাবে অর্থনৈতিক নিশ্চয়তার পথ খুঁজে পেতে চাইল। এমন কি সতীত্বের বহুশ্রুত আদর্শকে অনাবশ্যক বাহুল্য বোধে অনায়াসে বিসর্জন দিয়ে গণিকাবৃত্তির অন্তিম সোপানেও পদার্পণ করতে দেখা গেল তাকে।

কিন্তু জীবন সেখানেও নিরুদ্বিগ্ন ছিল না। দুর্ভিক্ষ পীড়িত মানুষ যখন আর্তরবে 'ফ্যান দাও, ফ্যান দাও' বলে মাথা খুঁড়ে মরছে, সমাজের অন্যপ্রান্তে তখন বিলাস মত্ত এক শ্রেণীর উন্মত্ত মানুষকে দেখা গেল হোটেল-বার-ক্যাবারে ম্যাসাজ ক্লিনিকে! অভাবিতপূর্ব অর্থনৈতিক কৌলিন্যে দিশেহারা হয়ে ব্যভিচারের সম্ভাব্য সমস্ত পথগুলিকে উন্মত্তের মত আঁকড়ে ধরতে চাইলেন এঁরা। তার সঙ্গে যুক্ত হল সরকারী মদতপুষ্ট আমলাতন্ত্রের কালোবাজারী, মজুতদারী, মুনাফাবাজী আর দুর্নীতির অবাধ প্রবাহ। রাজনীতিতে এল মার্কসবাদী চিন্তাধারা; শ্রেণীসংগ্রাম ব্যাপক না হলেও তার প্রস্তুতি চলল ভেতরে ভেতরে। বৃহত্তর পট ভূমিতে এই অবক্ষয়িত সমাজ মানসই একালের সামাজিক নাটকের আশ্রয়।

সমাজের সর্বস্তরে অতি দ্রুত পট পরিবর্তন বাংলা সামাজিক নাটকের ক্ষেত্রকেও পরিবর্তিত করেছে। পল্লীসমাজের নিদারুণ ভাঙ্গনের সঙ্গে সঙ্গে পল্লীজীবনের প্রতি অন্ধ মমতা পরিহার করে সমস্যাবহুল নগর জীবনকে আশ্রয় করেছে একালের বাংলা নাটক। সে জীবনও বহুলাংশে স্নিগ্ধ সুন্দর নয় - তার অঙ্গ প্রত্যঙ্গে রোগ, শোক, পাপ, তাপ আর দুর্নীতি, ব্যাভিচারের পঙ্কিল আবর্তের চিহ্ন। কেবলমাত্র সুন্দর নয় বলেই তা পরিত্যাজ্য হল না। কারণ বাস্তব অভিজ্ঞতায় সুন্দর, মঙ্গল কল্যাণের পরিবর্তে জান্তব প্রবৃত্তির নগ্ন রূপ স্পষ্ট প্রত্যক্ষ করেছিলেন এই পর্বের নাট্যকারেরা। সমস্ত দুনিয়া যখন শয়তানের জয়গানে মুখরিত, তখন নিছক আত্মতৃপ্তির খাতিরে দেবতার বরমাল্য রচনার মত মিথ্যাচারের দায় মাথা পেতে নিতে তাঁরা মোটেই উৎসুক ছিলেন না। কেন না সত্যই সাহিত্যের চিরন্তন ভিত্তি। শচীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত, বিধায়ক ভট্টাচার্য, অয়স্কান্ত বক্সী, জলধর চট্টোপাধ্যায়, তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়, মনোজ বসু কিম্বা বিজন ভট্টাচার্য প্রমুখ নাট্যকারের নাটকের ক্যানভাসে প্রধানত এই নগর জীবনের চিত্র অঙ্কিত। নান্দনিক ছুঁৎমার্গের মিথ্যা প্রলোভনে প্রলুব্ধ হননি এঁরা। তার অভাব জনিত কোন প্রকার বেদনাবোধও এঁদের কাছে হয়ে উঠল নিরর্থক।

বর্ণ কৌলীন্যের পরিবর্তে সমাজে অর্থ কৌলীন্যের মর্যাদা বৃদ্ধি পাওয়ায় চরিত্র নির্মিতিতেও এল আমূল পরিবর্তন। অভিজাত বা উচ্চবিত্তের পরিবর্তে নিম্নবিত্তের মানুষই হয়ে উঠল নাটকের প্রধান পাত্র পাত্রী। বহুল প্রচলিত সামাজিক বিধানে তথাকথিত কলঙ্কিত চরিত্ররাও এসে নাটকে বিশিষ্ট স্থান করে নিল। এদেরই জীবনকথা হয়ে উঠল নাট্যকাহিনীর উপজীব্য বিষয়। অর্থাৎ চরিত্র সম্পর্কে সমস্ত রকমের শুচিবায়ু বর্জনের

প্রবল উদ্দীপনা দেখা দিল। তার বিপরীতে দেখা গেল অর্থবান অভিজাত সম্প্রদায়ের বিবেক বর্জিত ঘৃণ্য নীতি। ফ্রয়েডীয় মনস্তত্ত্বের নিপুণ প্রয়োগে চরিত্র পরিকল্পনায় মনোজগতের জটিল ক্রিয়ার গ্রন্থি মোচন নিতান্ত আবশ্যক হয়ে পড়ল। চরিত্রের এই জটিলতা নাট্য কাহিনীকেও অনিবার্য ভাবে জটিল করে তুলল। অর্থাৎ বহিরঙ্গ ঘটনার নেপথ্যে মানসিক গতিবিধির নিয়ন্ত্রণ নির্ণয়ের প্রচেষ্টা অতিমাত্রায় সক্রিয় হয়ে উঠল। শব্দ, আলো এবং আবহের ব্যঞ্জনাময় ব্যবহার মঞ্চায়নে তাকে স্পষ্ট ও প্রত্যক্ষ করে তুলতে চাইল। ইবসেন, ব্রেখট্ বা গলস্‌ওয়ার্দির ভাবশিষ্য এ কালের নাট্যকার মঞ্চ প্রয়োগে নিয়ে এলেন বৈজ্ঞানিক কলা কৌশলের অভূতপূর্ব ব্যবহার।

সর্বোপরি সামাজিক নাটকে সমস্যার ক্ষেত্র পরিবর্তিত হল দ্রুত লয়ে। গিরিশচন্দ্র থেকে দ্বিজেন্দ্রলাল পর্যন্ত নাটকে সমস্যা ছিল, হয় ধর্ম-বিশ্বাসগত নতুবা সমাজ-সংস্কারগত। ধর্ম-পুরাণ-ইতিহাস ও সমাজ সংস্কারকে তাঁরা শিল্প প্রয়োগে নান্দনিক মাত্রা দান করতে চেয়েছিলেন। কিন্তু যুগধর্মের নিজস্ব নিয়মে এই পর্বে ধর্ম-পুরাণ-সমাজসংস্কার অপেক্ষা মানুষের কাছে তার ব্যক্তিগত সুখ-দুঃখ, জীবন-মরণের প্রশ্নটাই বড় বেশি সত্য হয়ে উঠল। আর সব কিছুর পশ্চাতে নিয়ন্ত্রক শক্তিরূপে প্রতিভাত হল অর্থনৈতিক অনিশ্চয়তা। এই পর্বের সামাজিক নাটকে তারই সার্থক প্রতিফলন দেখতে পাই। তবে সমস্যার উপস্থাপনা যতখানি আছে, সমাধানের প্রচেষ্টা ততখানি নেই। কেননা সমাধানের পথই যে তখনো নির্ণীত হয়নি। কেউ কেউ লঘু চপল হাল্কা চালে অম্ল-কটু বিষয়ের অবতাড়না করেছেন। হাসির ক্ষুরধারে সেখানে জীবনের জটিল সমস্যা শাণিত দীপ্তি লাভ করেছে। টুকরো টুকরো হাসির কশাঘাতে সময়ের পেলব শরীর হঠাৎ হঠাৎ শিহরিত হয়ে উঠেছে।

একালের সামাজিক নাটকের বিচার-বিশ্লেষণে এই সামগ্রিক প্রেক্ষাপটটি স্মরণে রেখেই অগ্রসর হতে হবে।

॥ মাটির ঘর ॥

বিধায়ক ভট্টাচার্যের শ্রেষ্ঠ সামাজিক নাটক 'মাটির ঘর' 'রঙমহলে' অভিনীত হয়ে বিপুল জনপ্রিয়তা লাভ করে। নাটকটি অভিনয়ের একটি ছোট ইতিহাস আছে; এই রকম একটি বিয়োগান্ত নাটকের অভিনয় সাফল্য সম্পর্কে স্বয়ং নাট্যকারও নিশ্চিত ছিলেন না—নাটকটি অভিনয়ের কোন চেষ্টাও তিনি করেননি।[১] প্রধানত শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রনাথ ঠাকুরের উৎসাহে এবং 'রঙমহলের' তৎকালীন ম্যানেজার প্রভাত সিংহের প্রচেষ্টায় ১৯৩৯-র ৯ই সেপ্টেম্বর 'মাটির ঘর' আনুষ্ঠানিক ভাবে মঞ্চস্থ হয়। পরিশেষে নাট্যকারের সমস্ত আশঙ্কাকে

---

১ 'পূর্বকথা'-য় নাট্যকার লিখেছেন—মাটির ঘর রচনা করে আমি বাড়িতেই ফেলে রেখেছিলাম, কারণ আমার মনে হয়েছিল এ ধরনের বিয়োগান্ত নাটক সাধারণ রঙ্গালয়ে জমবে না, অতএব অনর্থক প্রত্যাখ্যাত হবার লজ্জাটুকু স্বীকার করি কেন?' কিন্তু 'মাটির ঘর' প্রত্যাখ্যাত হয়নি বরং সাদরে গৃহীত হয়েছিল।

মিথ্যে প্রমাণ করে দিয়ে পূর্ণ প্রেক্ষাগৃহে 'মাটির ঘর' তার সুবর্ণ জয়ন্তী উদযাপন করে ১৬ই ডিসেম্বর তারিখে; কেননা বাঙালী দর্শকের মন ও মেজাজ ততদিনে বিয়োগান্ত নাটকের রস সম্ভোগের জন্যে প্রস্তুত হয়ে গিয়েছিল। অভিনয়ের প্রয়োজনে অভিনেতা মনোরঞ্জন ভট্টাচার্য কিছুটা সংশোধন অবশ্য করে নিয়েছিলেন; তবে 'মাটির ঘর' এর অভিনয় সাফল্যের পশ্চাতে সব থেকে বড় কৃতিত্ব যে দুজনের, তাঁরা হলে দৃশ্যপটের যাদুকর মনীন্দ্রনাথ দাস (নানুবাবু) এবং প্রখ্যাত নট ও নির্দেশক দুর্গাদাস বন্দ্যোপাধ্যায়। দুর্গাদাস বন্দ্যোপাধ্যায়ের নির্দেশনায় ও অলক চরিত্রে অসাধারণ অভিনয়ে, নানুবাবুর দৃশ্যপটের কৌলীন্যে এবং 'রঙমহলের' সুচারু অভিনেতৃবর্গের অভিনয় দক্ষতায় 'মাটির ঘর' রঙ্গমঞ্চের ইতিহাসের স্মরণীয় হয়ে আছে। অন্যান্য চরিত্রে যাঁরা রূপদান করেছিলেন তাঁদের মধ্যে আছেন, সত্য প্রসন্নের ভূমিকায় মনোরঞ্জন ভট্টাচার্য, কল্যাণ চরিত্রে প্রভাত সিংহ (পরে রবীন্দ্র মোহন রায়), চঞ্চল চরিত্রে সিধু গাঙ্গুলী; তন্দ্রা নন্দা ও ছন্দার ভূমিকায় যথাক্রমে পদ্মাবতী, ঊষা দেবী ও শান্তি গুপ্তা। অলোক চরিত্রে কিছুদিন ভূমেন রায় অবতীর্ণ হয়েছেন বলে সংবাদপত্রে উল্লেখ পাচ্ছি।

অলক ও তন্দ্রার সমস্যাই এ নাটকের প্রধান সমস্যা। পরস্ত্রী তন্দ্রার প্রতি প্রাক্তন প্রণয়ী অলকের অকারণ জবরদস্তি, সত্যপ্রসন্নের 'মাটির ঘর'কে সংশয়ের ঘূর্ণাবর্তে আবর্তিত করেছে; আর চঞ্চলের হৃদয়হীন লাম্পট্যে নন্দার আত্মহনন এবং সভাবভীরু অতি রোমান্টিক উৎপলের পিতৃ ইচ্ছায় ছন্দাকে প্রত্যাখ্যান, সেই প্রজ্জ্বলিত হোমশিখায় ঘৃতাহুতি প্রদান করে তাকে আরও বিধ্বংসী করে তুলেছে। তার জ্বলন্ত ফুৎকারে ছিন্নভিন্ন হয়ে গেছে সত্যপ্রসন্নের জীবনবেদ, তার আশা-আকাঙ্ক্ষা, ভাল মন্দ, তার সংসার নির্বাহ। অলক যুগক্রান্তি পর্বের 'আদর্শচ্যুত সমাজ মানসের প্রতিনিধি। তাই 'হঠাৎ গজিয়ে ওঠা' স্বামীর প্রতি তন্দ্রার পাতিব্রত্যকে নিঃসংশয়ে উপেক্ষা করতে তার বাধেনি; তেমনি তন্দ্রার শয়নকক্ষে তার গোপন উপস্থিতির চিহ্ন স্বরূপ সিগারেটের পোড়া অংশ ফেলে আসা, কিম্বা পূর্ব প্রণয়ের প্রমাণ স্বরূপ চিঠিপত্র, ছবি প্রভৃতি কল্যাণের কাছে দাখিল করবার ভয় দেখিয়ে তন্দ্রাকে তার অভিপ্রায় অনুযায়ী চলতে বাধ্য করার চেষ্টা, অলকের দিক থেকে সঙ্গতিপূর্ণ। কিন্তু অলক প্রসঙ্গে এইটিই শেষ কথা নয়—অলক প্রেমিক, ব্যর্থ প্রেমিক -প্রেমের ক্ষেত্রে সর্ববিধ ব্যর্থতাই তাকে সমাজ জীবনে রূঢ় হৃদয়হীন মানুষে পরিণত করেছে। তন্দ্রাকে সে ভালবেসেছিল, সেই ভালবাসার মধ্যে কোন ফাঁকি ছিল না। অথচ তন্দ্রাকে তাকে হারাতে হয়েছে। ভাগ্যের এই বঞ্চনা—প্রেয়সীর জীবনে পরপুরুষের এই হঠাৎ আবির্ভাব, অলকের পক্ষে নীরবে মেনে নেওয়া সম্ভব ছিল না। পুরুষের প্রেম বাঁধভাঙ্গা স্রোতের মতই দুর্বার। একবার তার উৎস-মুখ উৎসারিত হয়ে গেলে সমাজ সংসারের কোন বিধি নিষেধ তার অপ্রতিহত জয়যাত্রার পথে অন্তরায় সৃষ্টি করতে পারে না। প্রেয়সী নারীর মধ্যেও সে শক্তির এই মূর্তিকে প্রত্যক্ষ করতে ভালবাসে। তন্দ্রা সেইভাবে সকল সংস্কারের উর্দ্ধে তার ভালবাসাকে প্রতিষ্ঠিত করতে পারেনি। অলকের যা কিছু রূঢ়তা তা তন্দ্রার এই অচল সংস্কারের বিরুদ্ধে।

তবু অলকের প্রতি তন্দ্রার বিদ্বেষ বা বিতৃষ্ণা ছিল না, ছিল প্রচ্ছন্ন ভালবাসা; চেষ্টা-অর্জিত স্বামী সংস্কার সেই ভালবাসাকে অবদমিত করে রেখেছিল মাত্র—বিলুপ্ত করতে পারেনি। তার অবচেতন মন অলকের সঙ্গে ঘর ছাড়বার জন্যে তৈরি হয়েই ছিল; শুধু সুপ্ত স্বামী-সংস্কার সেই বাসনার গতিপথে একটা ক্ষীণ অবরোধ সৃষ্টি করে রেখেছিল মাত্র। স্বামীর অবিশ্বাসের ফলে অবরোধের ক্ষীণ আবরণ যখন ভেঙ্গে পড়ল তখন খুব স্বাভাবিক ভাবেই তার ভালবাসা অলকের প্রতি পুনর্বার ধাবিত হবার পথ খুঁজে পেল। তদুপরি নারীর প্রেম দীপ্ত পৌরুষের কাছে আত্মসমর্পণ করে পরিপূর্ণতা লাভ করতে চায়—এই দ্বিধাহীন আত্মসমর্পণেই তার সম্যক বিকাশ, চরম সার্থকতা; তাকে দৃপ্ত বলে আয়ত্ত করতে হয়, পৌরুষের অপরিমেয় শক্তি দ্বারা অর্জন করতে হয়! ভিক্ষুকের ভিক্ষাপাত্রে তার স্থান সঙ্কুলান হয়ে ওঠে না। কল্যাণের মধ্যে পৌরুষের সেই শক্তির অভাব ছিল বলেই অলকের সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতায় তাকে পরাজিত হতে হয়েছে। কিন্তু নন্দার আত্মহননে দুর্বল-চিত্ত তন্দ্রার মানসিক বিপর্যয়, প্রবৃত্তির দুর্দমনীয় তাড়না থেকে অলককে মুক্ত করে স্থিতাবস্থায় ফিরিয়ে এনেছে। তাই কল্যাণের অন্তিম ইচ্ছায় কর্তব্যের গুরুভার বহনে অলক পরিণত হয়েছে সৌম্যকান্তি পুরোহিতে।

নন্দার আত্মহনন জীবনের ব্যর্থতায় নয়—তা বিদ্রোহের দীপ্ত মন্ত্রে উদ্ভাসিত। নন্দার বিদ্রোহ, অপদার্থ অত্যাচারী পুরুষ সমাজের বিরুদ্ধে; আমাদের সমাজে পুরুষের হাতে আছে আইন; তার সমস্ত শক্তির দম্ভ, তার অহংকার, লাম্পট্য আইনের দ্বারা সুরক্ষিত। নারী সেখানে পণ্য হিসাবেই গণ্য; অটুট পতিভক্তি তার বাধ্যতামূলক। পতিভক্তির এই বহুশ্রুত আদর্শ, আদর্শ হলেও যে ঝুটা এবং ঝুটা বলেই যে তা বর্জনীয়, নন্দার আত্মহনন তার জ্বলন্ত দৃষ্টান্ত। ছন্দাও প্রতিবাদে সোচ্চার- তারও প্রতিবাদ পুরুষের অক্ষমতার বিরুদ্ধে। শুধু বৃদ্ধ পিতার প্রতি কন্যার অকৃত্রিম প্রতি বাৎসল্য তার ওপরে একটা স্নিগ্ধ আস্তরণ বিছিয়ে দিয়েছে। ছন্দার আত্মসমর্পণ অলকের কাছে নয়; নিছক কর্তব্যের খাতিরেও নয়—তার আত্মাহুতি সত্যপ্রসন্নের মর্মান্তিক হৃদয় যন্ত্রণার কাছে। অনেক দুর্ভোগের মধ্যে অন্তত একটি উদ্বেগের হাত থেকে হতচেতন বৃদ্ধ পিতাকে সে মুক্তি দিতে পেরেছে, এইটুকুই তার সাথকতা—সে উদ্বেগ তারই ভবিষ্যৎ নিয়ে।

'মাটির ঘর'-এর ট্র্যাজেডি[১] কার? বলা বাহুল্য একক ভাবে কারুরই নয়; এমন কি এ ট্র্যাজেডি পারিবারিক নয়, সামাজিকও নয়—এ একটি বিশেষ যুগের ট্র্যাজেডি। বৃহত্তর পটভূমিতে যুগধর্মের প্রভাবে যে অবক্ষয় সূচিত হচ্ছিল, যে অবক্ষয় দেশের মানুষকে প্রচলিত মূল্যবোধের জীর্ণ আবরণ ভেদ করে সম্পূর্ণ অপরিচিত পথে টেনে এনে

---

[১] ডঃ অজিত কুমারের ঘোষের মতে 'মাটির ঘর'-এর ট্র্যাজেডি সত্যপ্রসন্নের। 'বাংলা নাটকের ইতিহাস' পৃঃ ৪৫৬ দ্রষ্টব্য। ডঃ আশুতোষ ভট্টাচার্য তাঁর 'বাংলা নাট্যসাহিত্যের ইতিহাস' গ্রন্থে বলেছেন এই নাটকের সমস্যা কেবলমাত্র একটি পরিবারের সমস্যা (পৃঃ ৪৮৯)। কিন্তু উভয় অভিমতই যুক্তিযুক্ত নয় বলে মনে হয়।

নিষ্ঠুর সত্যের সম্মুখীন করেছিল. এ সেই যুগধর্মের ট্র্যাজেডি, সেই যন্ত্রণাদীর্ণ নবযুগ নির্মিতির বাস্তব আলেখ্য। তবে জনপ্রিয়তার শীর্ষে পৌঁছালেও 'মাটির ঘর' নাটক হিসাবে ত্রুটি মুক্ত নয়। নাটকীয় ত্রি-ঐক্য এখানে রক্ষিত হয়নি। সংগীত ও কাব্যের বাড়াবাড়ি অনেক সময় ক্লান্তিকর হয়ে উঠেছে। কল্যাণের অসহনীয় বক্ষপীড়া ও মৃত্যুরও কোন সঙ্গত কারণ খুঁজে পাওয়া যায় না। দ্বিতীয় দৃশ্যে রিহার্স্যালের প্রসঙ্গটিও মোটেই অপরিহার্য নয়। সেদিক থেকে বরং অঞ্জনার কাটাকাটা সংলাপ Tragic relief সৃষ্টিতে যথেষ্ট উপভোগ্য হয়েছে।

॥ মহামায়ার চর ॥

অর্থনৈতিক প্রতিকূলতা এবং আভ্যন্তরীণ সঙ্কটে 'নাট্যনিকেতনের' যখন টাল-মাটাল অবস্থা, তখন প্রবোধচন্দ্র গুহ নতুন স্বাদের সমাজ সমস্যা-মূলক নাটককে অগ্রাধিকার দিতে বিশেষ উদ্যোগ গ্রহণ করেন। ১৯৩৯ র শেষভাগ থেকে 'নাট্যনিকেতন' মঞ্চে এই উদ্যোগের প্রতিফলন লক্ষ্য করা যায়। এই রকম প্রচেষ্টারই সাক্ষ্য বহন করছে, ইংরেজি নাটকের ছায়া[*] অবলম্বনে রচিত যোগেশচন্দ্র চৌধুরীর 'মহামায়ার চর' নাটকটি। ১৯৩৯-র ১লা ডিসেম্বর সুধীর চন্দ্র গুহের প্রযোজনায় এবং সতু সেনের নির্দেশনায় 'মহামায়ার চর' 'নাট্যনিকেতন' মঞ্চে প্রথম মঞ্চস্থ হয়। তবে নাটকটি রচিত ও প্রকাশিত হয়েছে তারও বেশ কিছু পূর্বে। 'মহামায়ার চর' সেকালের সংবাদ পত্রে বহু আলোচিত ও সমাদৃত নাটক; অর্থাৎ এই নাটকের জনপ্রিয়তা নিয়ে সংশয়ের কোন অবকাশ নেই। সংবাদ পত্রের অভিমত :

"The play was an all round success Those who have faith in spiritualism and super-human powers will find it more interesting."[8]

কিন্তু প্রধানত আভ্যন্তরীণ সঙ্কটে 'নাট্যনিকেতন' কর্তৃপক্ষ এই জনপ্রিয়তাকে আর্থিক প্রতিকূলতা দূর করার কাজে ঠিকমত ব্যবহার করতে পারেননি—এটাই দুর্ভাগ্যের বিষয়।

চমকপ্রদ কাহিনী এবং উৎকৃষ্ট অভিনয় নাটকটিকে দর্শকের কাছে আকর্ষণীয় করে তুলেছিল। কাহিনী বিশ্লেষণের পূর্বে প্রথম অভিনয় রজনীর অভিনেতৃ তালিকাটি এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে। যথা : মৃত্যুঞ্জয়—যোগেশচন্দ্র চৌধুরী; শচীন—নির্মলেন্দু লাহিড়ী; উমাচরণ—উৎপলেন্দু সেন; অতুল—ভূপেন চক্রবর্তী; দ্বিজবর—শিবকালী চ্যাটার্জী; দুঃখিরাম—কুঞ্জ সেন; হেরম্ব—যুগল দত্ত; মধুসূদন—অমূল্য হালদার; জগদ্ধাত্রী—শেফালিকা; বিজনবালা—অপর্ণা; এবং সুবর্ণলতা—নীহারবালা। নাটকে সুর সংযোজনা করেন অমর বসু। গুণীজনের প্রসংশাধন্য, এই নাটকের চমৎকার অভিনয়। সংবাদপত্রের পাতাতেই তার নিদর্শন পাওয়া যায়। তাদের বিচারে :

---

* ভূমিকায় নাট্যকার ইংরেজি নাটকটির নামোল্লেখ করেননি।

8 'The Amrita Bazar Patrika', 3rd December, 1939

"The acting is superb Specially the parts played by the author himself, Babu Nirmalendu Lahiri, Sreemati Shepalika (Putul), Sm Niharbala, Sm Aparna, Babu Bhupen Chakrabarty are unique Babus Shivakali Chatterjee and Utpal Sen must rise up to the mark of their co-artistis [৫]

অভিনয় উৎকর্ষতার স্বপক্ষে অধিক মন্তব্য নিষ্প্রয়োজন। দর্শকের চাহিদা পূরণে অভিনেতৃবর্গের সাফল্যে সন্দেহের কোন অবকাশ নেই।

নিত্য ও অনিত্যের টানা-পোড়েনে বিপর্যস্ত মানব জীবনের অসহায় অবস্থাকে উপজীব্য করে 'মহামায়ার চর' নাটকের কথাবস্তু নির্মিত। সামাজিক নাটকের পরিকাঠামোয় এই অতিলৌকিক প্রসঙ্গের অবতাড়না আখ্যানভাগকে কিছুটা দুর্বল নিশ্চয় করেছে। এ কালের সামাজিক নাটকে এ হেন দুর্বলতা কাম্য নয়। মহামায়ার চর নিত্য, সনাতন—মহাকালের নিয়ন্ত্রাশক্তির লীলাভূমি। জীবন-নদের অপর পাড়ে তার অবস্থান, জ্ঞানরূপ তরণীতে সেখানে মানুষের যাওয়া-আসা; দ্বিজবর তার কাণ্ডারী। এই চর লোকশ্রুতিতে স্থির নয়, সচল—অর্থাৎ ক্রিয়াশীল। সংসার কামনায় উন্মত্ত মানুষ মায়া প্রভাবে নিত্যের সঙ্গে তার সম্পর্কটিকে বিস্মৃত হয়ে থাকে। চর তাকে প্রতিনিয়ত আকর্ষণ করে -তার অপার্থিব পুষ্পের শোভা, অমৃতলোকের সুরপ্রবাহ হত-চেতন মানুষের হৃদয়দ্বারে ব্যর্থ আঘাত করে বারবার ফিরে যায়। তাই তার অনুপম সৌন্দর্য সংসারমগ্ন মানুষের কাছে অনুপলব্ধই থেকে যায়। শংকরাচার্য বলেছেন, এই জগৎ সংসার মিথ্যা মায়া মাত্র; নিদ্রিত মানুষ স্বপ্নে যা কিছু উপভোগ করে, নিদ্রান্তে তার কোন মূল্য থাকে না। তেমনি মোহভঙ্গ মানুষই কেবল অনিত্য জগৎ-সংসারকে তুচ্ছ জ্ঞান করে নিত্যের আকর্ষণে ধাবিত হয়। জগদ্ধাত্রী নিত্যের টানে ধাবমান শুদ্ধ-চিত্ত মনুষ্যের অগ্রগণ্য। চরের আহ্বান সে শুনেছিল।

কৃষ্ণ সান্নিধ্যে থেকেও বৃন্দাবনের ষোলশ' গোপিনীর মধ্যে সংসার বন্ধন মুক্ত শ্রীমতী রাধিকাই শুধু কৃষ্ণকে লাভ করেছিল। অন্যেরা সংসার বন্ধন ছিন্ন করতে পারেনি বলে চরম প্রাপ্তি তাদের ভাগ্যে ঘটেনি। জগদ্ধাত্রীর চেতনে অচেতনে চরের তীব্র আকর্ষণ তাকে নিত্যের টানে ব্যাকুল করে তুলেছে। সে তাকে উপেক্ষা করতে পারেনি, তন্ময় হয়ে ছুটে গেছে—পরম প্রাপ্তির মধ্যে নিজেকে বিলীন করে দিয়েছে। কিন্তু বৃন্দাবনের অবশিষ্ট গোপীদের মতই কখনো জনক-জননী, কখনো স্বামী-সন্তান জনিত পার্থিব জগতের বহুবিধ বন্ধন তার চিত্তকে বিভ্রান্ত করেছে। সে প্রত্যাবর্তন করেছে সংসারের কিনারায়। চর আর ঘরের এই দোটানায় দোদুল্যমান জগদ্ধাত্রী। শ্রীমতি রাধার মত সংসার বন্ধন ছিন্ন করে সে যেতে পারে না; পরম প্রাপ্তির সেই নির্মল আনন্দও তার সংসারের উপান্তে এসে বিস্মৃতির অন্ধকারে হারিয়ে যায়। এই দুয়ের সামঞ্জস্য বিধানের আপ্রাণ চেষ্টাই তার জীবনের ট্র্যাজেডি। সংসার তার নিজস্ব নিয়মে এগিয়ে চলে দ্রুতগতিতে, তার থেমে

---

[৫] 'The Amrita Bazar Patrika', 10th December, 1939

থাকার উপায় নেই; সেই দূরন্ত গতির সঙ্গে পাল্লা দিয়ে ছোটার ক্ষমতা নেই সংসার অনভিজ্ঞা জগদ্ধাত্রীর। তাই সংসারের হিসাবে তার বয়স বাড়েনা। অন্তরের তীব্র ব্যাকুলতায় ক্রমে ক্রমে জগদ্ধাত্রী উপনীত হয়েছে সিদ্ধির সর্বশেষ শিখরে। এত দিনের চেনা সংসার সত্যদ্রষ্টা জগদ্ধাত্রীর কাছে হয়ে উঠেছে সম্পূর্ণ অপরিচিত, অনাত্মীয়। জগতের চোখে সে তখন উন্মাদিনী মাত্র। মুক্তচিত্ত ও পরমজ্ঞানী, জগতের সঙ্কীর্ণ দৃষ্টিতে পাগল ছাড়া আর কি? অনিত্য এই সংসারেও তখন তার নির্বিকার বিচরণ। স্বয়ংসিদ্ধা জগদ্ধাত্রীর দীর্ঘ পঁচিশ বছর পরে সেই ভাবেই সংসারে প্রত্যাবর্তন।

মহামায়ার চর তার দুর্নিবার আকর্ষণে প্রতি নিয়ত আকৃষ্ট করে চলে সংসারের উত্তাল তটভূমিকে; সে ডাক আপনি এসে পৌঁছয় মৃত্যুঞ্জয়, শচীন, উমাচরণ কিম্বা অতুলের মত প্রমত্ত মানুষের কাছেও। মৃত্যুঞ্জয় কিম্বা শচীন অভিসারী হয়েও ঐকান্তিক আত্মনিবেদনের ব্যর্থতায় শেষ পর্যন্ত সিদ্ধিলাভে ব্যর্থ। আর উমাচরণ কিম্বা অতুল অস্থিরচিত্ত মানব সমাজের প্রতিনিধি তারা সংসারের ঘূর্ণাবর্তে বারংবার বিপথগামী। এই আবর্তে সুবর্ণলতা, বিজনবালা, হেরম্ব, সকলেই দারুন ভাবে আবর্তিত। আখ্যান রীতির এই অভিনবত্ব সম্পর্কে তাই বলতে পারিঃ

"The story is wonderful both in conception and execution Characters are conspicuous, free and living in flesh and blood Situation are mervellous and the fine dialogue and the refine test of the Author have made the play a charming piece which we are quite sure will attract both the mass and the class audience of Bengal "*

এই নাটকে সংগীতের বাহুল্য আছে, সর্বমোট তেরোটি গান এখানে সন্নিবিষ্ট হয়েছে। সংগীতগুলি তত্ত্বধর্মী এবং সিচুয়েশনের ব্যঞ্জনা প্রকাশক। সংলাপ চমৎকার– আঞ্চলিক ভাষা প্রয়োগেও নাট্যকার সার্থক। এই নাটকে flash back রীতির প্রয়োগ ঘটিয়েছেন নাট্যকার।

॥ বিশ বছর আগে ॥

বিধায়ক ভট্টাচার্যের দ্বিতীয় জনপ্রিয় নাটক 'বিশ বছর আগে' বিশেষভাবে ঘূর্ণায়মান মঞ্চের (Revolivng stage) কথা স্মরণে রেখে রচিত। এই নাটকেই বিধায়ক বাবু সর্বপ্রথম সার্থক ভাবে flash back রীতি ব্যবহার করেছেন; এর আগে কোন বাংলা নাটকে এই রীতির এমন চমৎকার ব্যবহার দেখা যায়নি। নাটকের টেকনিক, উপস্থাপনা বা আঙ্গিক নিয়ে তখন যে নানাভাবে পরীক্ষা-নিরীক্ষা শুরু হয়েছিল 'বিশবছর আগে' নাটকটি তার প্রমাণ। সেদিক থেকে নাটকটির ঐতিহাসিক গুরুত্ব অপরিসীম। 'মাটির ঘর'-এ অভূতপূর্ব সাফল্যের পর 'রঙমহল' কর্তৃপক্ষ ১৯৩৯-র ২৭শে ডিসেম্বর মঞ্চস্থ করে 'বিশ বছর আগে'। যদিও বিষয়বস্তুতে নাট্যকার কোন অভিনবত্ব সৃষ্টি করতে পারেননি, তবু উপস্থাপন

* 'The Amrita Bazar Patrika', 10th December, 1939

ভঙ্গি ও উচ্চ মানের অভিনয়ের গুণে 'বিশ বছর আগে' বিপুল জন সমর্থন আদায় করতে পেরেছিল। প্রখ্যাত নট ও নির্দেশক দুর্গাদাস বন্দ্যোপাধ্যায়ের নির্দেশনা ও অনবদ্য অভিনয় এবং নানুবাবুর দৃশ্যপটের চমৎকারিত্ব নাটকটির সাফল্যের অন্যতম হেতু। অন্যান্য চরিত্রে সিধু গাঙ্গুলী (প্রকাশ), প্রভাত সিংহ (দীপক), পদ্মাবতী (মনীষা), শান্তি গুপ্তা (তমসা) এবং ঊষাদেবী (তন্বী) যথেষ্ট অভিনয় নৈপুণ্যের পরিচয় দিয়েছেন।

নাটকের সমস্যা তিনটি বিন্দুতে প্রসারিত তার এক প্রান্তে তমসা, অন্য দুই প্রান্তে প্রদীপ ও দীপক। প্রদীপ ও দীপক দুই বন্ধু, তাদের বিরোধ তমসার প্রতি প্রেমের অধিকার নিয়ে। প্রদীপ যত বেশী করে তমসাকে আয়ত্ব করতে চেয়েছে, তমসা ততই যেন দুর্নিবার আকর্ষণে ধাবিত হয়েছে উদাসীন দীপকের প্রতি। নারীর মন স্বভাবতঃই জটিল। প্রেমের ক্ষেত্রে কাঙালপনা তার ধাতে সয় না, বরং উদাসীনের প্রতিই তার পক্ষপাতিত্ব; তাকে জয় করার মধ্যেই যেন তার আনন্দ, তার গভীরতর তৃপ্তি। মহাদেবের চরম ঔদাসীন্যই তো পার্বতীকে তপোভঙ্গের শক্তি দান করেছিল! কিন্তু তমসার উপেক্ষা, দীপকের প্রতি তার অন্ধ আনুগত্য, প্রদীপের বন্ধুপ্রীতিকে পরিণত করেছে ঈর্ষায়, দুর্দান্ত ক্রোধে। তার অন্তরের দানবীয় প্রকৃতিটি আভিজাত্যের খোলস ছিঁড়ে রুদ্ধ আক্রোশে মাথা তুলে দাঁড়িয়েছে। তার এই আক্রোশ আরও অসহনীয় হয়ে উঠেছে দীপকের অদ্ভুত নিঃস্পৃহতায়। ফলে অন্ধ নির্মমতায় সে প্রতিপক্ষের বিরুদ্ধে যতই আঘাত হানতে চেষ্টা করেছে, সে আঘাত ততই বুমেরাং হয়ে ফিরে এসেছে তারই মস্তকে। আপন ভ্রান্ত ধারনায় সৃষ্ট কাল্পনিক প্রতিপক্ষের বিরুদ্ধে অস্ত্র চালনা করলে নিজেরই অঙ্গহানি হবার সম্ভাবনা প্রবল হয়ে ওঠে; হয়েছেও তাই। তমসার হৃদয়ে তার যেটুকু আসন সংরক্ষিত ছিল, সেখান থেকেও নির্বাসিত হতে হয়েছে প্রদীপকে। আবার এই নির্বাসন থেকে পুনর্বাসনটিও ঘটেছে প্রতিপক্ষ দীপকেরই অনুকম্পায়। দক্ষ অভিনয়ে দীপক তমসার চোখে নিজেকে ঘৃণ্য করে তুলতে সক্ষম হয়েছে। আর সেই জন্যেই দীপকের প্রতি প্রদীপ এত নিষ্ঠুর। প্রতিপক্ষের আঘাত যেখানে প্রত্যাশিত, তার নীরবতা সেখানে অসহ্য . পরোক্ষ সহানুভূতি বোধ করি আরও অসহনীয়, ক্ষমার অযোগ্য! প্রেয়সীর হৃদয় যখন আপন আন্তরিক মহত্বে লাভ করা গেল না, যখন তা বন্ধুর পরোক্ষ দান হিসাবে ভিক্ষুকের মত তাকে গ্রহণ করতে হল– তখন প্রেমের এই ব্যর্থতা, হৃদয়ের এই দৈন্য গোপন করতে দীপকের প্রতি চরম নিষ্ঠুরতা ছাড়া প্রদীপের আর কোন পথ ছিল না।

কিন্তু তমসা? মায়ের আদেশে প্রদীপ বা দীপকের যে কোন একজনকে তাকে জীবনসঙ্গী নির্বাচন করে নিতে হবে। অথচ মন তার অনেক আগে থেকেই সঙ্গী নির্বাচন করে রেখেছে দীপককে। তাহলে মায়ের আদেশের প্রশ্ন তুলে তার এই অদ্ভুত হেঁয়ালী কেন? আসলে তমসার আশঙ্কা ছিল, প্রদীপ তার প্রত্যাখ্যান সহজে মেনে নিতে পারবে না; আর আশা ছিল, দীপকের প্রখর ব্যক্তিত্ব তাকে সেই আশঙ্কা থেকে নিরাপদ রাখবে। তমসা চেয়েছিল দীপক বলিষ্ঠ ভাষায় তাকে দাবী করুক, তাহলে প্রদীপের ক্ষীণ প্রত্যাশা দীপকের ব্যক্তিত্বের কাছে প্রতিহত হয়ে ফিরে যাবে। কিন্তু এইখানেই তার error of judgment—

দীপক সে ভাবে ডাক দিল না. দাবী উঠল প্রদীপের দিক থেকেই। মায়ের আদেশ পালনটাই যদি বড় কথা হত তাহলে এই নিপুণ কৌশলের প্রয়োজন হতনা।

অন্যদিকে দীপকের বিতৃষ্ণা তার নিজের প্রতিও নয়, বিশেষ কোন নারীর প্রতিও নয়; বিধির বিড়ম্বনায় সে যে নির্মম ভাগ্য-বঞ্চনার ক্রীড়নক মাত্র, এই যন্ত্রণাদীর্ণ উপলব্ধি তাকে অনেকাংশে জীবন বিমুখ করে তুলেছে। অন্তরের স্বাভাবিক প্রবৃত্তি তাকেও ভালবাসতে প্ররোচিত করেছিল—তন্বীকেও সে ভালবেসেছিল, তমসাকেও ভালবেসেছিল। তবু সেই ভালবাসাকে উচ্চকণ্ঠে ঘোষণা করবার মত মানসিক জোর খুঁজে পায়নি সমাজের পঙ্কিল আবর্তে আজন্ম নিমজ্জিত দীপক। কিন্তু হৃদয়ের ভাষা তো সকল সময় মুখের অপেক্ষা রাখে না. দীপকের অন্তরমথিত গভীর প্রেম-তৃষ্ণা তার সকল অঙ্গ ছেয়ে বাঙ্ময় হয়ে উঠেছে প্রেমেরই স্বভাবধর্মে। তমসা বা তন্বী কেবল মাত্র নারী বলেই সেই অনুচ্চারিত আমন্ত্রণ মর্মে মর্মে অনুভব করেছিল। তাকে উপেক্ষা করার মত শক্তি দুজনের কারুরই ছিল না। দীপকের মর্মযন্ত্রণা তাই আরও মর্মান্তিক. প্রেমের ফাঁদ পাতা ভুবনে দুটি নারীর সুপ্ত বাসনা অদৃশ্য উর্ণাতন্তুর মত তাকে শতপাকে ক্রমশঃ বেষ্টিত করে ফেলেছে; সেই অদৃশ্য বেষ্টনি থেকে তাকে যে মুক্তি পেতেই হবে, মদের নেশায় মশগুল থেকে নিজেকে আড়াল করবার তাই তার আপ্রাণ চেষ্টা! নচেৎ তন্বীকে উদ্ধার করতে যাবার বা তমসার প্রতি প্রদীপের অবিচারের শাস্তি দিতে যাবার কোন অর্থ হয় না। কোন কোন সমালোচক দীপকের মহত্ত্বে অহেতুক সন্দেহ প্রকাশ করেছেন।[৭] এ সন্দেহের কোন অবকাশ নেই। দীপক শিল্পী, দীপক স্রষ্টা - হৃদয়-বীণার তন্ত্রীতে তন্ত্রীতে তার যত ব্যথা বেজেছে, নীলকণ্ঠের মত তাকে আকণ্ঠ পান করে সে অমৃতের অংশটুকু তুলে দিয়েছে সকলের জন্যে। এইখানেই তার চরিত্রের সার্থকতা।

বিধায়কবাবু রঙ্গমঞ্চের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ ভাবে যুক্ত ছিলেন। রঙ্গমঞ্চের নেপথ্য জীবনের সুখ-দুঃখের বাস্তব অভিজ্ঞতা তাঁর ছিল। তাঁর অনেক নাটকে রঙ্গমঞ্চের নানা প্রসঙ্গ এসেছে। রঙ্গমঞ্চের জীবন নিয়ে পূর্ণাঙ্গ নাটকও তিনি রচনা করেছেন। এ নাটকেও মনীষা, হেনা, তন্বী, প্রকাশ, নরেশ প্রভৃতি চরিত্রকে কেন্দ্র করে রঙ্গমঞ্চের নেপথ্য কাহিনী চমৎকার করুণ-মধুর রসে অভিসিঞ্চিত হয়েছে। বনলতা, যদুপতি ও নিতাই-র পারিবারিক চিত্রটিও চমৎকার। এ যেন জীবনের অবক্ষয়ের আঘাতে ঝরে পড়বার পূর্ব মুহূর্তে নির্মল একটি হীরের টুকরোর একটুখানি ঝলক—বিষণ্ণ বেদনার ভারে মনকে ভারাক্রান্ত করে তোলে। দুঃখদহন ও তরলিকার সংলাপ খুবই উপভোগ্য হয়েছে। তবে দশম দৃশ্যে তন্বী ও দুঃখদহনের আত্মহত্যা, অন্তরাল থেকে মনীষার রিভলবারের গুলিতে প্রদীপের মৃত্যু, নাটকীয় কাহিনীর মধ্যে দিয়ে বিন্যস্ত না হয়ে শিল্পরীতিকে লঙ্ঘন করেছে। নাট্যকার যেন হঠাৎ অত্যন্ত দ্রুততার সঙ্গে শেষ পর্বটি সমাধান করতে চেয়েছেন।

---

৭ ডঃ অজিত কুমার ঘোষের 'বাংলা নাটকের ইতিহাস', পৃঃ ৪৫৮ দ্রষ্টব্য।

নাটকের উপস্থাপন ভঙ্গিটি চমৎকার—সে কালে প্রায় বিরল দৃষ্টান্ত। বন্ধু প্রদীপকে হত্যার মিথ্যা অপবাদে দ্বীপান্তরিত আসামী দীপক বিশ বছর পরে ঘটনাস্থলে ফিরে এসেছে প্রকৃত রহস্য উদ্ঘাটনের তীব্র মানসিক যন্ত্রণা নিয়ে। তারই সূত্র ধরে দর্শকও যেন অনায়াসে গিয়ে পৌঁছে যায় বিশ বছর আগের রঙ্গভূমিতে এবং পরিশেষে আবার একইভাবে ফিরে আসে বর্তমানে। রহস্যের জট ততক্ষণে খুলতে শুরু করেছে, সমাধান হয়ে গেছে সমস্যার। এই উলম্ফনটি আরও সার্থক হতে পেরেছে ঘূর্ণায়মান মঞ্চের কারিগরী কৌশলে।

॥ আগামী কাল ॥

আশুতোষ ভট্টাচার্যের সামাজিক নাটক 'আগামী কাল' নটসূর্য অহীন্দ্র চৌধুরীর পরিচালনায়, ১৯৪০-র ১৫ই মে 'রঙমহল' থিয়েটারে প্রথম মঞ্চস্থ হয়। নিত্য নতুন সামাজিক নাটক, নাট্যরসিক দর্শককে উপহার দিয়ে 'রঙমহল' সে সময় যথেষ্ট সুনাম অর্জন করেছিল। বর্তমান নাটকটি প্রযোজনাতেও সেই কৃতিত্ব 'রঙমহল' অক্ষুন্ন রাখতে সক্ষম হয়েছিল। আগামীকাল পূর্ণ প্রেক্ষাগৃহে বেশ কিছুদিন সগৌরবে নিয়মিত অভিনীত হয়েছিল। এই নাটকের আকর্ষণ আরও বৃদ্ধি করেছিল নটসূর্য অহীন্দ্র চৌধুরীর সুষ্ঠু পরিচালনা এবং উমাপ্রসন্ন চরিত্রে অনবদ্য অভিনয়। অপরাপর চরিত্রে যাঁরা অভিনয় করেন তাঁরা হলেন ঃ মাধব--রবি রায়; যতীন্দ্র—সিধু গাঙ্গুলী; বিমল--ভূমেন রায়; প্রেমেন--গিরিজা সাধু; বরেন্দ্র--তারাকুমার ভট্টাচার্য (পরে ভানু চট্টোপাধ্যায়); ধীরেশ— গোপাল মুখোপাধ্যায়; শ্রীনাথ--কৃষ্ণচন্দ্র দে (পরে তারাকুমার ভট্টাচার্য); মহীতোষ-বিপিন বসু; যদু—আশুতোষ বসু; করুণা--বেলারাণী (পরে ঊষাবতী বা পটল); অপর্ণা--পদ্মাবতী; সুনন্দা—ঊষা দেবী; এবং অণিমা--জ্যোতির্ময়ী। নাটকে সুর সংযোগ করেন স্বনামখ্যাত শ্রী কৃষ্ণচন্দ্র দে এবং মঞ্চ নির্মাণ করেন পরেশ বসু।

পিতা ও পুত্রের আদর্শগত মত-পার্থক্যকে কেন্দ্র করে 'আগামী কাল' নাটকে নাট্যদ্বন্দ্বের সূচনা। সমকালীন সমাজ বিবর্তনের প্রেক্ষাপটে অতীত ও বর্তমানের এই দ্বন্দ্ব সেদিন অতিমাত্রায় প্রকট হয়ে উঠেছিল। বহিরঙ্গে বৈচিত্র্যময় বহু উপাদানের আকস্মিক উপস্থিতি, বাঙলার সামাজিক-গার্হস্থ্য জীবনের কেন্দ্রস্থলে অতীত ও বর্তমানের মতাদর্শগত বিরোধকে স্পষ্ট করে তুলেছিল। দুই ভিন্ন যুগের একত্র সহাবস্থান কোন কালে সম্ভবও নয়, কাম্যও নয়—এই অনিবার্য সত্যকে অঙ্গীকৃত করেই সমাজ-প্রগতির রূপরেখা নির্মিত; তা কোন জটিল সামাজিক সঙ্কটও সৃষ্টি করেনা। কিন্তু যখন তা নির্মমভাবে বিরোধ-সংঘাতের পর্যায়ে এসে পৌঁছায়, তখনই আসন্ন করে তোলে যুগসঙ্কট। 'আগামী কাল' অপরিত্যাজ্য যুগ-সঙ্কটের দিনলিপি। উমাপ্রসন্ন এবং যতীন্দ্র এ নাটকে সঙ্কটাপন্ন সামাজিক প্রেক্ষাপটে মুখোমুখি দাঁড়িয়ে যুযুধান দুই প্রতিপক্ষ।

উমাপ্রসন্ন নিষ্ঠাবান ব্রাহ্মণ; গভীর শাস্ত্রজ্ঞান দ্বারা তার মনন চিন্তন পরিশীলিত। সামাজিক অনুশাসনকেও সে উপেক্ষা করতে পারে না। বরং শাস্ত্র, ধর্ম, সমাজ—এই

তিনের মধ্যে সমন্বয় সাধনের লক্ষ্যে উমাপ্রসন্নের জীবনাদর্শ গড়ে উঠেছে। ব্যক্তি জীবনে ধর্মপথের অনুগামী উমাপ্রসন্নের কাছে সমাজ বিধান অলঙ্ঘ্য—কেননা সমাজই তার আশ্রয়, সমাজেই সে প্রতিপালিত। একে সে সামাজিক কর্তব্য জ্ঞান করে—সমাজদ্রোহিতা তার কাছে ধর্মদ্রোহিতার নামান্তর। পুত্র যতীন্দ্র তার এই প্রত্যয়ের মর্মমূলে আঘাত করে বসেছে অজ্ঞাত কুলশীলা সুনন্দাকে বিবাহ করে। সমাজ এ বিবাহ অনুমোদন করেনা। তদুপরি যতীন্দ্রের এ হেন কাজ ব্যক্তিস্বার্থে সমাজের বিরুদ্ধে প্রকাশ্য বিদ্রোহ ঘোষণা। তাই সে উমাপ্রসন্নের সমর্থন বা স্বীকৃতি লাভে ব্যর্থ। কিন্তু উমাপ্রসন্ন যে পিতা, অকৃত্রিম তার পুত্র বাৎসল্য; সহায়হীন, বিপথগামী পুত্রের প্রতি গভীর তার ভালবাসা; পুত্রের দুঃখে অশ্রুসজল তার সমবেদনা এমন কি পিতা হয়ে পুত্রের দুঃখ মোচনে, তাকে আশ্রয়দানে তার অক্ষমতা এ ব্যথা যে তার মর্মান্তিক। উমাপ্রসন্নের সন্তান বাৎসল্য অপরিচিতা অজ্ঞাতকুলশীলা সুনন্দার প্রতিও সমভাবে ধাবিত। অর্থাৎ তার বিরোধিতা সুনন্দার প্রতি নয়, যতীন্দ্রের আচরণের বিরুদ্ধে সে নির্মম। বিবাহিতা স্ত্রীর প্রতি যতীন্দ্রের অবজ্ঞা, অবহেলা, তাকে নিরাপত্তা দানে চরম ব্যর্থতা, উমাপ্রসন্নের বিচারে সুনন্দার কুলত্যাগের একমাত্র কারণ। সর্বোপরি যতীন্দ্রের ধর্মপত্নী পরিত্যাগ, ঘোরতর অধর্মাচরণ বলেই সে তার বিরুদ্ধে সোচ্চার।

যতীন্দ্র আধুনিক যুক্তিবাদী জীবন দর্শনের উপাসক ধর্ম কিম্বা সমাজ তার কাছে খুব বড় কথা নয়। 'সবার উপরে মানুষ সত্য তাহার উপরে নাই' আধুনিক শিক্ষার উন্মুক্ত প্রবাহ তাকে এই ভাবনায় ভাবিত হতে শিখিয়েছে। তাই সুনন্দাকে স্ত্রী রূপে গ্রহণে কুলশীল সম্পর্কিত প্রশ্নটি তার কাছে কোন সমস্যাই সৃষ্টি করেনি। যতীন্দ্র অবশ্যই পিতৃভক্ত, তার যাতনা পীড়িত চিত্ত পিতার আশ্রয়ে এসেই বারংবার নির্মল প্রশান্তির সন্ধান করেছে। উমাপ্রসন্নের ধর্মবোধ ও সমাজ আনুগত্য, যতীন্দ্রের বিচারে ভ্রান্ত আদর্শের ব্যর্থ অনুসৃতির দায়ে অভিযুক্ত; কেবল এইখানেই সে পিতৃদ্রোহী। যতীন্দ্র ও উমাপ্রসন্ন দুই ভিন্ন যুগের প্রতিনিধি, ভিন্ন আদর্শের অনুসারী—এদের সংঘাত অনিবার্য।

কিন্তু যতীন্দ্রের যুক্তিবাদ কিম্বা আধুনিকতা বোধের ভিত্তি খুব মজবুত নয়। অন্তত দাম্পত্য সম্পর্ক নির্ধারণে সে প্রচলিত সামাজিক সংস্কারের গণ্ডী অতিক্রম করতে পারেনি; তাকে অতিক্রম করার মত শক্তি তার ছিল না। সুনন্দা তার বিবাহিতা স্ত্রী—তার কর্তৃত্বের অধীনে নিঃসংশয় আনুগত্য, স্ত্রীর কাছে তার কেবল প্রত্যাশা নয়, একমাত্র দাবী; এবং এর অন্যথা তার কাছে পৌরুষের অবমাননা। অতএব তাকে যে কোন উপায়ে দমন করতে না পারলে যতীন্দ্রের পৌরুষের অধিকার, স্বামীত্বের অধিকার খর্ব হয়ে পড়ে। তার ফেলে আশা গ্রাম্য সমাজ কিম্বা নব্যতন্ত্রবাদী নাগরিক জীবনে নিজের এ হেন লজ্জাজনক অবস্থান কল্পনা করে সে রীতিমত শঙ্কিত। তাই অবাধ্য স্ত্রীকে কঠোর শাসন করে সে তার স্বামীত্বের অধিকার, প্রভুত্বের অধিকার প্রতিষ্ঠায় বদ্ধপরিকর। সুনন্দা তার স্ত্রী হলেও, সেও যে আধুনিক শিক্ষায় শিক্ষিতা নারী—ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবোধ, আত্ম-মর্যাদাবোধের বিনিময়ে স্বামীর প্রতি ঐকান্তিক আনুগত্য প্রকাশ তার পক্ষে যে সম্ভব নয়—এ সত্যকে

কিঞ্চিন্মাত্র মূল্য দিতে যতীন্দ্র নারাজ। নইলে সুনন্দার সামাজিক কর্তব্যবোধ, বিমুখ শ্বশুরের প্রতি যথোপযুক্ত সম্মান প্রদর্শন, অপর্ণার প্রতি ভালবাসা যতীন্দ্রের দৃষ্টির অগোচরে রইবে কেন? আসলে পুরুষ তার পৌরুষের দাবী তুলে অন্যায় অধিকারে নারীর ব্যক্তি-স্বাধীনতাকে অস্বীকার করেছে—নারী প্রগতিকে সে তার অনুকম্পার বিষয় বলে গণ্য করতেই চিরাভ্যস্ত, এখানে আধুনিক অনাধুনিকে কোন ভেদ নাই। ধর্মপুত্র যুধিষ্ঠিরও পাশাখেলায় স্ত্রীকে সম্পত্তিজ্ঞানে বাজী ধরতে কুণ্ঠিত হননি। যতীন্দ্রের নির্মমতায় সুনন্দার গৃহত্যাগ, নইলে সে ব্যভিচারিনী নয়।

অণিমা, বরেন্দ্র, ধীরেশ, মহীতোষ, প্রেমেন, নব্যতন্ত্রের ধ্বজাধারী মূল্যবোধহীন যুব-সমাজের প্রতিনিধি। ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদের মন্ত্রে এরা দীক্ষিত। সামাজিক জীবনের যা কিছু ঐতিহ্য—যা কিছু সংস্কার তাকে নির্মমভাবে আঘাত করাকেই এরা পরম কর্তব্য জ্ঞান করে। আসলে ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবোধ কিম্বা ব্যক্তি স্বাধীনতা সম্পর্কে এদের ধারনা আদৌ স্পষ্ট নয়। স্বাধীনতা এবং স্বেচ্ছাচারিতার মৌলিক পার্থক্যটুকু এদের কাছে অজ্ঞাতই থেকে গেছে। সে অজ্ঞতা চূড়ান্ত ভোগলিপ্সার অতন্দ্র প্রহরায় সযত্নে সংরক্ষিত। সুনন্দাও নব্যতন্ত্রের এই বাতাবরণের মধ্যে লালিত নারী। সাংসারিক পরিমণ্ডলে, যতীন্দ্রের সঙ্গে তার দাম্পত্য সম্পর্কে, তার বদ্ধমূল স্বাতন্ত্র্যবাদের ধারনা বারে বারে সঙ্কটের সৃষ্টি করেছে। তার অসহিষ্ণু চিত্ত এই সঙ্কট থেকে উত্তরণের উপায় অন্বেষণ করছিল। উমাপ্রসন্ন, মাধব, বিমল ও অপর্ণার সমবেত প্রচেষ্টা অপ্রত্যাশিত সুযোগ করে দিয়েছিল তাকে। তবু সংশয় যেতে চায়নি তার। অবশেষে তারই আজন্ম উপাস্য নব্যতন্ত্রের নির্লজ্জ কামনার আগ্রাসন তাকেও গ্রাস করতে উদ্যত হলে, তার সংশয় দূর হতে বিলম্ব হয়নি। অণিমাকে এ ভাবে জীবন-সঙ্কটের মুখোমুখি দাঁড়াতে হয়নি বলে তার মোহভঙ্গ হয়নি।

বর্তমানের এই সামাজিক সঙ্কট থেকে আগামী দিনে মুক্তির প্রত্যাশায় নাটকের সমাপ্তি। আগামী কালের সেই নতুন সমাজ গড়ে উঠবে উমাপ্রসন্নের নিরবচ্ছিন্ন অতীত-চারিতায় নয়, নব্যতন্ত্রবাদীদের উন্নাসিকতাতেও নয়—গড়ে উঠবে কেবল মানবতাবাদের ওপর ভিত্তি করে। সত্যদ্রষ্টা মাধব তার পূজারী, বিমল-অপর্ণা তার অগ্রদূত; অন্ধ শ্রীনাথ তার সুর-সাধক। নাটকের সংলাপ সাবলীল—সংগীত অতি চমৎকার এবং ব্যঞ্জনাপূর্ণ।

॥ নার্সিং হোম ॥

১৯৩৯-এ প্রতিষ্ঠা লগ্ন থেকে ১৯৪১ র শেষভাগ পর্যন্ত মোটামুটিভাবে 'নাট্যভারতী'র শ্রী ও সমৃদ্ধির পর্ব। এই সময় সীমার মধ্যে তাদের প্রায় প্রতিটি নাটকই চূড়ান্তভাবে সফল। এই সফল প্রচেষ্টাগুলির অন্যতম ১৯৪০-র ১৩ই জুন প্রথম অভিনীত প্রথিতযশা নাট্যকার শচীন্দ্রনাথ সেনগুপ্তের 'নার্সিং হোম' নাটকটি। রঘুনাথ মল্লিকের প্রযোজনায় এবং বিদ্যাধর মল্লিকের ব্যবস্থাপনায় 'নাট্যভারতী' মঞ্চে 'নার্সিং হোম' এর শুভ উদ্বোধন ঘটে। নাট্য পরিচালক রূপে তাঁকে সাহায্য করেন রতীন বন্দ্যোপাধ্যায় ও সন্তোষ সিংহ। কবি শৈলেন রায়ের রচিত সংগীতে সুরারোপ করে শ্রীযুক্ত তুলসী লাহিড়ী অতিরিক্ত

আকর্ষণ সংযোজনা করেন। এই নাটকের দৃশ্যপট নির্মাণ করেন গদাধর মল্লিক এবং মঞ্চাধ্যক্ষ ছিলেন পূর্ণ দে। প্রথম অভিনয় রজনীর চরিত্রলিপি নিম্নরূপ : ডাঃ বিক্রমাদিত্য রায় অহীন্দ্র চৌধুরী; রামকমল- -জহর গাঙ্গুলী; তারিণী - সন্তোষ সিংহ; নিরূপম- রতীন বন্দ্যোপাধ্যায়; সুশান্ত- মিহির ভট্টাচার্য; সিধু- -বিজয় কার্তিক দাস; পরমা— তুলসী চক্রবর্তী; ইনসপেক্টর- বিজয় মুখার্জী; কুন্তলা— রাণীবালা: মণিমালা —নিরুপমা: শীলা--সুহাসিনী; কমলা - সাবিত্রী; লেখা--বিদ্যুল্লতা; এবং পরিচারিকা—রাজলক্ষ্মী (পচী)।

সামাজিক জীবনে আধুনিকতার সংস্পর্শ, বিকারগ্রস্ত অসুস্থ মনন চিন্তনের উদ্ভাবক। নগরকেন্দ্রিক ধনতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থার অনিবার্য ফললাভ এই সংক্রামক ব্যাধি এবং তার বিষক্রিয়া মানব মনের গভীরে গিয়ে নিঃশব্দে সংক্রমণ ঘটায়- তার সৎ প্রবৃত্তির অস্তিত্বকে বিপন্ন করে। উর্ধগামী কামনার তাড়নায় অতৃপ্ত মানবকুল অলব্ধ তৃপ্তির সন্ধানে নিয়ত তাড়িত: সমাজের সর্বস্তরেই এ হেন রুগ্ন মানুষের ভিড়। বিক্রমাদিত্য, তারিণী, কুন্তলা শীলা কিম্বা সুশান্ত - এরা কেউ সুস্থ নয়, জটিল দূরারোগ্য এই ব্যাধিতে আক্রান্ত। এদের কর্মে, চিন্তায়, পরিকল্পনায়, ভবিষ্যৎ ভাবনায় সুস্থতার কোন লক্ষণ নেই। এমন কি এরা অচেতনও নয় তবু মাদকাসক্তের ন্যায এই সব নরনারী প্রবৃত্তির ঘূর্ণায়মান আবর্তে নিমজ্জিত না থেকে পারেনা। উৎকট এই ব্যাধির গ্লানি মাঝে মাঝে তাদের চিত্তকে পীড়িত করে তাদের নিজের বিরুদ্ধেই বিদ্রোহী করে তোলে। কিন্তু আত্মশুদ্ধির পথ এদের কাছে অনাবিষ্কৃত, পশ্চাদাপসরণ অসম্ভব প্রায়। 'নার্সিং হোম' এই সব রুগ্ন মানুষের আরোগ্যের নিমিত্ত একটি কর্মময় প্রতিষ্ঠান। এখানে কেউ ডাক্তারের ভূমিকায়, কেই তার সহকারী রূপে, কেউ সিস্টারের বেশে, কেউ রোগীর আত্মীয় পরিজন রূপে, কেউ বা নিছক রোগীর ভূমিকায় বিচিত্র কর্মে অনুশীলনরত। শুধু তফাৎ এই -বৈচিত্র্যময় কর্মপ্রবাহে নানাভাবে সংযুক্ত এরা কেউই ব্যাধিমুক্ত নয়।* তাদের আচরণ ও চিন্তনের মধ্যেই রোগের লক্ষণ নানাভাবে প্রকাশিত। এই নার্সিং হোম তাই রোগারোগ্যের নয়; রোগ অনুশীলনের কেন্দ্রে পরিণত ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠান। প্রশ্ন এই— সমাজের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে উঠে আসা এই সব সংক্রামিত ব্যাধিগ্রস্ত মানুষের নিরাময়ের উপায় কি? রামকমল বলে—'স্নেহ অভিষিক্ত সেবাই মানুষের কল্যাণজনক। স্নেহ পেলে মানুষ উগ্র হবে না, উদ্ধত হবে না।' অর্থাৎ মুক্তিলাভের এটাই একমাত্র উপায়। কিন্তু এই সহজ সমাধান কি গ্রহণযোগ্য?

ডাক্তার বিক্রমাদিত্য রায় নার্সিং হোমের প্রতিষ্ঠাতা এবং কর্ণধার। হৃদয়হীন অর্থপিশাচ এই মানুষটি ডাক্তারের ছদ্মবেশে আসলে মূর্তিমান শয়তান। অর্থ--অর্থ—এবং আরও অর্থ উপার্জনের নেশায় সে উন্মত্ত। ভোগলিপ্সা চরিতার্থ করাটাই তার জীবনের একমাত্র ব্রত। আর সে পথের যে কোন বাধা নিষ্ঠুরতম উপায়ে অপসারণ করতে তার বাধে না।

* "এটা সত্যিকারের নার্সিং হোম নয় বলিয়াই তাহাদিগকে কর্মব্যস্ত রাখিয়া আমি তাহাদের মনের ব্যাধি প্রকাশ করিয়া দিয়াছি।' 'ভূমিকা' অংশে নাট্যকারের বক্তব্য।

সুদূর রেঙ্গুনে ছিল তার এককালের কর্মকেন্দ্র; গোয়েন্দা-পুলিশের ভয়ে সেখান থেকে বাধ্য হয়ে তার বঙ্গদেশে প্রত্যাবর্তন। দক্ষ অভিনেতা, চতুর ডাক্তার বিক্রমাদিত্য রায়, নারী-হৃদয়ের দুর্বলতার সুযোগ নিয়ে তাদের আকর্ষণ করে, প্রলুব্ধ করে—অবশেষে উদ্দেশ্য সিদ্ধিতে নির্মম ভাবে তাদের ব্যবহার করে। ঊর্ননাভের মতই তার নিখুঁত পরিকল্পনার ঊর্ণাতন্তুতে সে তার নিকটস্থ বাসনালুব্ধ মানুষকে শতপাকে বেষ্টন করতে সিদ্ধহস্ত। সেখান থেকে শত চেষ্টাতেও কেউ বের হতে পারেনা। শীলা, আরও একাধিক নারী, তরুণ ডাক্তার সুশান্ত, তাড়িনী, কুন্তলা, ডাক্তারের প্রলোভনের ফাঁদে পা দিয়ে অবশেষে তারই ক্রীড়নকে পরিণত। কিন্তু কুকর্মে সতত ক্রীয়াশীল বিক্রমাদিত্যও জীবনের এই বিকৃতি, রোগক্লিষ্ট মানসিকতার এই উৎকট পীড়নের হাত থেকে নিষ্কৃতির পথ খোঁজে - প্রবল আত্মগ্লানি থেকে মুক্তির পথ অন্বেষণে বিভ্রান্ত হয়ে নিজ দেহে বিষাক্ত ওষুধ ইন্জেকশন করে।

বিক্রমাদিত্যের সহকারী সিস্টার শীলা এবং ডাক্তার সুশান্ত নার্সিং হোমের প্রতারণা ব্যবসার সঙ্গে ঘনিষ্ঠ ভাবে যুক্ত। বিক্রমাদিত্যের অঙ্গুলী হেলনে তাদের প্রতিটি পদক্ষেপ নিয়ন্ত্রিত। ভিন্ন ভিন্ন প্রবৃত্তির তাড়নায় এরা এসে স্বেচ্ছায় ধরা দিয়েছে বিক্রমাদিত্যের সাজানো ফাঁদে। বিক্রমাদিত্য মানব মনের এই দুর্বলতার কথা জানে—মনোহরণের, চিত্ত আকর্ষণের কৌশলে সে অতি দক্ষ; শীলা কিম্বা সুশান্ত তার চাতুর্যের সন্ধান পায় না, যখন পায় সে অতি বিলম্বে—প্রত্যাবর্তনের পথ তখন রুদ্ধ এবং সে ইচ্ছাও অবলুপ্ত। শীলা রেঙ্গুন থেকে বিক্রমাদিত্যের বিশ্বস্ত সহচরী, কুকর্মে ডাক্তার বিক্রমাদিত্যের দক্ষিণ হস্ত। বিগত যৌবনা এই নারী তার যৌবনের অপব্যয়ের বেদনায় ক্লান্ত অবসন্ন—তাই যৌবনবতী নারীর প্রতি তার আক্রোশ সীমাহীন! কিন্তু আত্ম বঞ্চনার এই গ্লানি শীলাকেও বিকল্প পথ-সন্ধানে—প্ররোচিত করে। বিক্রমাদিত্যকে অবলম্বন করে সেও শান্তির নীড় রচনা করতে চায়। সুশান্তর মোহভঙ্গ ঘটিয়েছে কমলার সান্নিধ্য এবং মণিমালার সাহচর্য। তার মুক্তিকামী চিত্ত ক্লেদলিপ্ত পঙ্কিলতা থেকে ঊর্ধায়নের বিপুল আশায় শেষ পর্যন্ত বিক্রমাদিত্যের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করে।

কুন্তলা নগর কেন্দ্রিক ভোগলিপ্সু জীবন-দর্শনের অন্ধ উপাসক। ইহজীবনের কোন ভোগাকাঙ্ক্ষাই সে অপূর্ণ রাখতে রাজী নয়। তর ভার বহনের ক্ষমতা তরিণীর নিঃশেষিতপ্রায় বলেই তারিণীর বিরুদ্ধে তার তীব্র অভিযোগ। বিকারগ্রস্ত তারিণীও; সখ নয়, সঞ্চয়ে তার অসীম আগ্রহ। উদ্দেশ্য হয়ত ভিন্ন কিন্তু এই অসুস্থ দম্পতির লক্ষ্য একই—কমলার সম্পত্তি আত্মসাৎ। সঙ্কল্প সিদ্ধির তাগিদে তারা বিক্রমাদিত্যের শরণাপন্ন। আর ধূর্ত বিক্রমাদিত্যের ব্যবসায়িক সাফল্যের মূল উপাদান এদের নির্লজ্জ কামনা-বাসনা। পরিপক্ক মস্তিষ্ক বিক্রমাদিত্যের তুলনায় কুন্তলা-তারিণী কূট কৌশলে নেহাৎই অপরিণত। তাই তাদের সিদ্ধিতে অন্তরায়। অপ্রত্যাশিত এই ব্যর্থতা তাদের আত্ম সমীক্ষার মধ্যে দিয়ে দুষ্কৃতি মুক্ত হতে সচেষ্ট করেছে। বিকারগ্রস্ত এত মানুষের ভিড়ে কেবল নিরুপম, মণিমালা, রামকমল স্থিরচিত্ত - কোন প্রকার প্রলোভনে প্রলুব্দ নয়।

ধনতন্ত্রের নির্মম পেষণে আত্ম বিকৃতির দুরারোগ্য পীড়া, তার গ্লানি সমাজের সর্বস্তরে ধীর লয়ে সংক্রামিত হয়ে সমগ্র সমাজকে গ্রাস করে ফেলছিল। তারই প্রতিচ্ছবি দেখতে পাই এ নাটকে। নার্সিং হোম এ হেন রোগ নিরাময়ের যোগ্য প্রতিষ্ঠান। তবে সে নার্সিং হোম কোন ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠান নয় - স্নেহ প্রেম সেবার আদর্শে নির্মিত প্রতিটি গৃহই সেই নার্সিং হোম।

নাটকের সংলাপ চমৎকার, কাহিনীর গতি সাবলীল, সংগীত সুমধুর। তবে নাটকীয় ত্রি ঐক্য কোন কোন ক্ষেত্রে লঙ্ঘিত হয়েছে।

॥ মালা রায় ॥

বিধায়ক ভট্টাচার্যের সামাজিক নাটক 'মালা রায়' 'রঙমহল' থিয়েটারে ১৯৪০-র জুলাই মাসে অভিনয়ের জন্যে মনোনীত হয়। প্রস্তুতির কাজ বেশ কিছুটা অগ্রসর হবার পরও অনিবার্য কারণবশতঃ 'রঙমহল' কর্তৃপক্ষ 'মালা রায়' নাটকটি অভিনয়ের সিদ্ধান্ত থেকে তখনকার মত সরে আসেন। নতুন সিদ্ধান্ত অনুসারে বর্তমান নাট্যকারের অপর একটি নতুন নাটক 'আঁধার পথে' অভিনয়ের ব্যবস্থা হয়। কিন্তু তৎকালীন পুলিশ কমিশনারের নির্দেশে এই নাটক তাঁরা প্রত্যাহার করে নিতে বাধ্য হন।[১] এই অবস্থায় 'রঙমহলের' অন্যতম বলিষ্ঠ অভিনেতা ভূমেন রায়ের প্রস্তাব অনুসারে 'মালা রায়' দ্বিতীয়বার নির্বাচিত হয়ে ১৯৪০-র ১৪ই আগস্ট পাদপ্রদীপের আলোয় আত্মপ্রকাশ করে। তবে মাত্র তিনটি দৃশ্যে রচিত নাটকটিকে পরিচালক নরেশচন্দ্র মিত্র এবং অমর ঘোষ আদ্যোপান্ত সংস্কার করে নেন; বহু জায়গায় নতুন সংলাপ তাঁরা সংযোজন করেন, নাটকের কলেবর বৃদ্ধি পায়, পরিবেশ পরিস্থিতির পরিবর্তন ঘটে; রহস্য রোমাঞ্চের সন্ধানে নাট্যকাহিনী ও ঘটনাকে তাঁরা অনাবশ্যক জটিল করে তোলেন। নাট্যকার বন্ধুত্বের দায়ে তাকে 'দুর্লভ সম্পদ' হিসাবে গণ্য করতে পারেন হয়তঃ কিন্তু এই অবাঞ্ছিত হস্তক্ষেপে নাটকটি যে যথেষ্ট দুর্বল হয়ে পড়েছে - তাতে কোন সন্দেহ নেই। সে আলোচনা আমরা যথা সময়ে করব; তৎপূর্বে প্রথম অভিনয়ের রূপ শিল্পীদের তালিকাটি এখানে উদ্ধার করা প্রয়োজন। যথা : মিঃ সেন—নরেশচন্দ্র মিত্র; অবিনাশ—রবীন্দ্রমোহন রায়; সুবিনয়—গিরিজা সাধু; অপরূপ—ভূমেন রায়; বিজন—সিধু গাঙ্গুলী; অসিত—ধীরেন দাস; সমীর—শম্ভু মিত্র; জনার্দন—আশু বোস; বিমান—ভানু চট্টোপাধ্যায়; সরোজ—বিপিন বসু; সর্দার—পূর্ণ দাস; মদন—কালাচাঁদ দাস; মিসেস সেন—ঊষাবতী; মালা—শান্তি গুপ্তা; মায়া—পদ্মাবতী; সন্ধ্যা—ঊষা দেবী; বেণু—জ্যোতির্ময়ী; লীনা—ছায়া দেবী; মতি—আঙুরবালা; কাজল—

---

[১] রঙমহল কর্তৃপক্ষ আঁধার পথে। নাটক বন্ধের বিজ্ঞপ্তি জারি করেন এইভাবে :

"There will be no performance of ANDHAR PATHE to night the 7th July as previously announced as the drama has been banned by the Commissioner of Police, Calcutta."—The Amrita Bazar Patrika, 7th July 1940

রাণীবালা; বন্ধুগণ-- গোপাল নন্দী, গোপী দে, নেপালচন্দ্র বসু। এ ছাড়া আবহসংগীত রচনা করেন ধীরেন দাস এবং মঞ্চ সজ্জার দায়িত্ব গ্রহণ করেন মনীন্দ্রনাথ দাস। এখানে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য, বাংলা নাট্য জগতের অন্যতম পথিকৃৎ শ্রীযুক্ত শম্ভু মিত্র এই নাটকেই প্রথম অভিনেতা রূপে আত্মপ্রকাশ করেন। সেদিক থেকে নাটকটির ঐতিহাসিক মূল্য অনেকখানি।

'মালা রায়' জটিল মনস্তত্ত্ব মূলক নাটক। যুদ্ধ বিধ্বস্ত ছিন্নমূল মানব-হৃদয় এই নাটকের ক্রীড়াভূমি। গতানুগতিক সামাজিক নাটকের ধারায় এই নাটককে বিচার করলে ভুল হবে। মহাযুদ্ধকালীন জীবন-যন্ত্রণার ব্যঞ্জনাময় অভিব্যক্তি ঘটেছে এ নাটকে। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ বাংলার সামাজিক, পারিবারিক রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক -এক কথায় সামগ্রিক জীবন প্রবাহে যে ছন্দপতন ঘটিয়েছিল তা কেবল বহিরঙ্গ ক্রিয়াকলাপের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল না; মনোজগতেও ঘনিয়ে তুলেছিল নিদারুণ সঙ্কট। মানুষের ভাবনা চিন্তার মৌলিক সূত্রগুলোই সেদিন ছিন্ন-ভিন্ন হয়ে গিয়েছিল। ব্যক্তি জীবনকে, তার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যকে সেদিন যেন কিছুতেই চিরাচরিত জীবন সংজ্ঞার সঙ্গে মেলোনো সম্ভব হচ্ছিল না। সম্পূর্ণ অজ্ঞাত এবং অনিকেত জীবন দর্শন তাকে আলেয়ার মতই দুর্নিবার আকর্ষণে অপরিচয়ের দিকে টেনে নিয়ে গিয়েছিল। 'মালা রায়' অবসাদগ্রস্ত মানব মনের অনিকেত যাত্রার নাটক---অচলায়তনের ভগ্নস্তূপ থেকে মানব মনের নিরুদ্দেশ যাত্রার নাটক।

মি. সেনের Experiment মালা রায় সেই ভ্রষ্টনীড় যাত্রাপথের নিঃসঙ্গ পথিক। নিঃসঙ্গ, কেননা-- সঙ্গ মানেই পশ্চাতের টান, অগ্রগমনের বিরাট অন্তরায়। যেখানে বন্ধন, সেখানেই যন্ত্রণা—সেখানেই বিশ্রামের প্রলোভন। তাই বন্ধনে তার আতঙ্ক। মালা সুবিনয়ের বিবাহিতা স্ত্রী। যক্ষা রোগাক্রান্ত মৃত্যুপথযাত্রী স্বামীর জন্যে তার করুণা আছে, সমবেদনা আছে। তার সেবাটুকুও আন্তরিক, তবে তা লোকসমাজের বাহবার প্রত্যাশী নয়। সুবিনয়ের মৃত্যুঘণ্টা যে বাজতে শুরু করেছে এ কথা মালা নিশ্চিত ভাবে জানে। কিন্তু তার জন্যে তার বিন্দুমাত্র উদ্বেগ নেই। দাম্পত্য জীবনের ভার তার কাছে দুর্বহ হয়ে উঠেছিল। তবে এই দুর্বহতার কারণ সাংসারিক জীবনের কোন প্রকার অপ্রাপ্তি নয়। তা যদি হত, তাহলে স্বামীর বন্ধু অপরূপের বারংবার প্রস্তাব এবং প্ররোচনায় তার পক্ষে অবিচল থাকা সম্ভব হত না। বিজনের লুব্ধ কামনাকে এমন স্নিগ্ধভাবে প্রত্যাখ্যান করাও তার পক্ষে সম্ভব হতনা। লক্ষ্যণীয়, রূঢ়তার বিন্দুমাত্র প্রকাশ মালার আচরণে কথাবার্তায় প্রকাশ পায়নি। অবদমিত কামনা বাসনাই তো মানুষকে রূঢ় করে তোলে। মুক্তিই তার একমাত্র কাম্য—সমস্ত বন্ধন, চিরাচরিত ঐতিহ্য থেকে মুক্তি। সুবিনয়কে বিবাহ মালার জীবনের মারাত্মক ভ্রান্তি। তার প্রকৃতির সঙ্গে, জীবনবোধের সঙ্গে তা কিছুতেই মেলে না। তাই অপরূপ বা বিজনকে উপলক্ষ করে সে একই ভুল দ্বিতীয় বার করতে চায়নি। পুরুষের ভালবাসা রূপের মোহমাত্র—সুন্দরী স্ত্রীর গর্ব, নির্লজ্জ অহংকার পুরুষের চরিত্রকে করেছে কলঙ্কিত, পৌরুষকে করেছে খণ্ডিত। মালা তাকে প্রেম বলে স্বীকার করে না। প্রেম মানে সহস্র পাকে বন্ধন নয়—প্রেম মানে মুক্তি। মালা মেলাতে পারেনি সুবিনয়ের সঙ্গে,

অপরূপের সঙ্গে, বিজনের সঙ্গে, এমনকি তারই স্রষ্টা মি সেনের সঙ্গেও। এইখানে স্রষ্টাকেও ছাড়িয়ে গেছে তার সৃষ্টি। বেদের মেয়ে মায়ার হাত ধরে যাযাবর বৃত্তি অবলম্বনে সে পৌঁছাতে চেয়েছে তার ইপ্সিত লক্ষ্যে। 'মেলাবেন তিনি মেলাবেন' এই তত্ত্বে মালা বিশ্বাসী নয়।

কিন্তু মালা সংস্কারকে অতিক্রম করতে চাইলেও তার অন্তর্জগৎ অনেকাংশে সামাজিক সংস্কারের অধীন। সুবিনয়ের মৃত্যুতে সেও অন্তত ক্ষণকালের জন্যে বিচলিত হয়ে পড়ে, নিজের কলঙ্কিত জন্ম বৃত্তান্ত শ্রবণে প্রতিহিংসা পরায়ণ হয়ে ওঠে। সে যে মি সেনের অবৈধ সন্তান, প্রেম বিবাহহীন মুহূর্তের লালসায় তার জন্ম এই মর্মান্তিক যন্ত্রণাকে সে জীবনের সব থেকে বড় বঞ্চনা বলে গণ্য করে। গতানুগতিক ঐতিহ্য থেকে মুক্তি প্রয়াসী তার মন, সামাজিক জীবনের এই বঞ্চনাকে অতিক্রম করবে কোন উপায়ে? মালা তা পারেনি।

ব্যর্থকাম মি ও মিসেস সেন, অপরূপ, বিজন, জনার্দন, বেনু, অবিনাশ, সুবিনয় এরা সকলেই, শুধু তফাৎ এই, এদের প্রত্যেকের প্রকৃতি ও গতি ভিন্ন- প্রবৃত্তির বেগ বিচিত্রমুখী। নবাগত জীবন দর্শন এদের সম্মুখে ভোগবাদের পথকে প্রশস্থ করেছিল শতধারায়। ইচ্ছায় হোক, অনিচ্ছায় হোক, সেই দুরন্ত বেগের মধ্যে এরা ঝাঁপ দিয়ে পড়েছে। মি সেন তার প্রথম যৌবনের পদস্খলনের লজ্জা গোপনে তৎপর, অথচ কৃতকর্মের জন্যে অনুশোচনাহীন। অপরূপ সদ্য বিধবা বিপন্ন বন্ধু পত্নীর আসঙ্গ লিপ্সায় উন্মাদ। এমনকি অন্ধ স্ত্রী সন্ধ্যাকে ছলনা করতেও তার বাধে না নিজের মহত্বকে সে অস্বীকার করে। বিজন মালার রূপমুগ্ধ, তাকে প্রত্যাশা করে। সুবিনয়ের যন্ত্রণা আরও বেশী মৃত্যু তার শিয়রে জীবনের সমস্ত সাধ অপূর্ণ রেখেই তাকে চলে যেতে হবে। এই যন্ত্রণা তার শারীরিক যন্ত্রণার থেকেও অধিক। অবিনাশ মি সেনের কুকর্মের সহায়ক এবং নিজেও সে ব্যাপারে সিদ্ধহস্ত। তার লালসা অর্থের প্রতি। জনার্দন অর্থ আর প্রাচুর্যের, বিত্ত আর সম্পদের বিনিময়ে জীবনের সমস্ত আকাঙ্ক্ষা করায়ত্ত করতে বদ্ধ পরিকর। বেনুকে সে এই মূল্যেই ক্রয় করতে চায়। মিসেস সেন তার সহায় এবং অবিনাশ তার পরামর্শদাতা, পথ প্রদর্শক। মিসেস সেন তার অভিজ্ঞতায় বুঝেছেন অর্থই পরমার্থ লাভের সহজতম পন্থা। তাই কন্যা বেনুকে তিনি প্রলুব্ধ করেন, জনার্দনকে উৎসাহিত করেন। আর বেনুর কাছে হীরের ব্রেসলেট, পছন্দমাফিক টুসীটার পাওয়াই শেষ কথা। দাতার চরিত্র কিম্বা হৃদয় নিয়ে বিচার বিশ্লেষণের অবকাশ তার নেই। ভোগবাদী জীবন দর্শনের মর্মান্তিক পীড়া অতৃপ্তি: এই অতৃপ্তির তাড়নায় তাড়িত এই সকল চরিত্র সমকালীন সমাজের প্রতিনিধি অবসাদগ্রস্ত সমাজ মানসের প্রতিনিধি।

বেদের মেয়ে মালা। তার সহজ, সরল, অনাড়ম্বর জীবনের যাত্রাপথে একদিন কুগ্রহের মত এসে পড়েছিল অবিনাশ। তার সরল-বিশ্বাসী মায়ের চরিত্র হননকারী অবিনাশকে সে ক্ষমা করতে পারে না। প্রতিশোধস্পৃহায় জ্বলন্ত এই চরিত্রটি। 'মালা রায়' নাটকে আছে চমকের পর চমক। তাতে নাট্যকাহিনী অনাবশ্যক জটিল হয়ে উঠেছে।

এই জটিলতা শিল্প-কৌশলগত ত্রুটি বলেই বিবেচিত হবে। বেদেনী মালার মুখে একেবারে বিশুদ্ধ বাংলা একটু বিসদৃশ ঠেকে। ৩য় দৃশ্যে অসিত ও বেনুর দীর্ঘ দ্বৈত-সংগীত যথেষ্ট ক্লান্তিকর। নাটকে স্থান-কাল এবং ঘটনাগত ঐক্য রক্ষিত হয়নি।

॥ সিঁথির সিঁদুর ॥

জলধর চট্টোপাধ্যায়ের জনপ্রিয় সামাজিক নাটক 'সিঁথির সিঁদুর' ১৯৪০-র ১৪ই আগস্ট নির্মলেন্দু লাহিড়ীর পরিচালনায় নাট্যভারতীতে প্রথম মঞ্চস্থ হয়। সহকারী পরিচালক রূপে তাঁকে সাহায্য করেন রতীন বন্দ্যোপাধ্যায়, সন্তোষ সিংহ এবং জহর গঙ্গোপাধ্যায়। নাট্যকারের স্বরচিত সংগীতে সুরারোপ করেন তুলসী লাহিড়ী, দৃশ্যপট নির্মাণ করেন মনীন্দ্রনাথ দাস এবং আবহসঙ্গীত ঘন্টেশ্বর প্রামাণিক। ভাগিনেয় অমল এবং চিত্রলেখার শুভ বিবাহের স্মৃতি রক্ষার্থে জলধর চট্টোপাধ্যায় (সেজমামা) 'সিঁথির সিঁদুর' নাটকটি রচনা করেন। অতীত ও বর্তমানের সংঘাতের আলেখ্য এই নাটকের প্রথম অভিনয় রজনীতে বিভিন্ন চরিত্রে যাঁরা রূপদান করেন, তাঁরা হলেন ঃ মাধব রায়—নির্মলেন্দু লাহিড়ী; কনক রায়—জহর গাঙ্গুলী; মহীতোষ—সন্তোষ সিংহ; অশোক সেন—রতীন বন্দ্যোপাধ্যায়; নিবারণ—শান্তি দাশগুপ্ত; কৈলাস বিজয় কার্তিক দাস; লালু- যতীন্দ্রনাথ দাস; রামকানু—তুলসী চক্রবর্তী; মণীষা- সুহাসিনী; রাণী—নির্মলা (যূথিকা); মানদা—রাজলক্ষ্মী (বড়); সুন্দরী—রাজলক্ষ্মী (পচি); মালা—বিজলী; দারোগা—জ্যোৎকুমার মুখোপাধ্যায়; দারোয়ান—বটকৃষ্ণ দে; ভৃত্য—গিরীশ দে; মুটে—যতীন দে; কনস্টেবল—গিরীন দে, অনিল দে; বরকন্দাজ—জ্ঞান চট্টোপাধ্যায়, কমল বর্ধন।

'সিঁথির সিঁদুর' মঞ্চ সফল নাটক; এই নাটকের অভিনয়ের উৎকর্ষতা প্রসঙ্গে অমৃত বাজার পত্রিকা লিখেছে ঃ

"Nirmalendu Lahiri as Madhav Roy, the old type Zaminder, and Ratin Banerjee as Asoke Sen M A a modern reformist on one side and Suhasini as Manisha Sircar, B.A and Juthika as Borwani-the illiterate emblem of innocense and purity, on the other, make the contrast of characters enjoyable Sj Jahar Ganguly as Kanak Roy and Sj Tulsi Chakrabarty as Ramkanu—have never laughed, but the audience could not help laughing all through Sj Santosh Sinha as Prof Sircar has been an excellent type On the whole the play is a interesting one and is expected to score popularly with the stage-lovers "[১০]

অর্থাৎ যুগোপযোগী তীব্র গতিশীল কাহিনী সামগ্রিক অভিনয়ের বলিষ্ঠতায় সমকালীন দর্শককে রঙ্গমঞ্চ অভিমুখী করেছিল। এই পর্বের অধিকাংশ সামজিক নাটকে দ্রুত পরিবর্তনশীল সমাজ-মানসের বিচিত্র অভিঘাত প্রতিফলিত; সমাজ সচেতন নাট্যকার

---

[১০] 'The Amrita Bazar Patrika', 7th September, 1940

জলধর চট্টোপাধ্যায় সামাজিক সমস্যার রূপায়ণে বাংলা সামাজিক নাটকের ধারায় বিশিষ্ট স্থানের অধিকারী। তাঁর 'সিঁথির সিঁদুর' নাটকে অতীত ও বর্তমানের দ্বন্দ্বটি চমৎকার ধরা পড়েছে। সমসাময়িক নাট্য রসিক দর্শকের বিচারে : "It has been a vivid picture of cultural conflict of past and present "[১১]

এই নাটকের নাট্যদ্বন্দ্বের প্রধান কেন্দ্রবিন্দু চরণবিল: চরণবিলকে উপলক্ষ করেই অতীত ও বর্তমান -দুই ভিন্ন যুগের প্রতিনিধি পরস্পর পরস্পরের বিরুদ্ধে সংগ্রামে অবতীর্ণ। মাধব রায়ের অতীতচারী জীবনাদর্শের স্থবিরতার সাক্ষ্য বহন করছে চরণবিলের বহুকালাবধি আবদ্ধ জলাশয়। মাধব রায় জমিদার - দাঙ্গা, খুন প্রজাপীড়নের বহু কলঙ্কিত ঘটনার কূট কৌশলে সিদ্ধহস্ত গর্বিত নেপথ্য নায়ক। জমিদারতন্ত্রের অলঙ্ঘনীয় বিধান অনুসারে জনস্বার্থ অপেক্ষা ব্যক্তিস্বার্থ রক্ষা প্রতাপশালী জমিদার মাধব রায়ের প্রধান কর্তব্য। জমিদারের লভ্যাংশের অনেকটাই উঠে আসে বিপন্ন প্রজার কাতর আর্তনাদকে নির্মম উপেক্ষার পথ বেয়ে- এ কথা ঐতিহাসিক সত্য। সাধারণ প্রজার শোক তাপ, রোগ ব্যাধি, যন্ত্রণা-মৃত্যুর অভিশপ্ত উৎস চরণবিল, ক্ষয়িষ্ণু জমিদারতন্ত্রের মুনাফা অর্জনের ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠানের তুল্য। নিছক প্রজার স্বাস্থ্য কিম্বা ফসল রক্ষার্থে তার সংস্কার সাধনের যে কোন উদ্যোগ মাধব রায়ের স্বার্থহানি ঘটায়: অতএব যে কোন মূল্যে তাকে রুখতে মাধব রায় বদ্ধ পরিকর। জমিদার এবং প্রজা, উভয়ের স্বার্থরক্ষা তো একই সঙ্গে সম্ভব নয়। এতকাল জমিদারের স্বার্থকেই প্রজারা অধিক মূল্য দিয়ে এসেছে—ধর্ম আর নীতির দোহাই দিয়ে তাদের সেইভাবে ভাবিত হতে শেখানো হয়েছে: পুরোহিত, নায়েব, গোমস্তার সম্মিলিত চেষ্টায় এ হেন আত্মহননকেই তারা গর্বের বস্তু হিসাবে গণ্য করেছে। কাজেই মাধব রায়ের দুশ্চিন্তার কোন কারণ ঘটেনি। কিন্তু আজ অতি চেনা মুখের অচেনা অভিব্যক্তি মাধব রায়কে দারুন উদ্বেগের মধ্যে ঠেলে দিয়েছে।

মাধব রায় স্পষ্ট অনুভব করতে পারছিলেন ক্ষয়িষ্ণু জমিদারতন্ত্র পায়ের তলায় ক্রমশঃ মাটি হারাতে বসেছে। অশোক নামক চাল-চুলোহীন অবাঞ্ছিত উৎপাতের সান্নিধ্যে এসে তাঁরই অধীনস্থ প্রজা, নির্বোধ চাষার দল তাঁর আদেশ অমান্য করবার স্পর্ধা অর্জন করেছে। এই দুঃসহ স্পর্ধা তিনি উপেক্ষা করেন কি করে? তাই সেই অবাঞ্ছিত কণ্টকটি উৎপাটনে তিনি অতি তৎপর, কিন্তু অত্যন্ত সতর্কতার সঙ্গে। অশোক নিধন মাধব রায়ের পক্ষে খুব একটা শক্ত কাজ ছিল না: সে ক্ষেত্রে প্রজা অসন্তোষ ব্যাপক বিদ্রোহে রূপান্তরিত হয়ে ওঠার সম্ভাবনা উজ্জ্বল হয়ে ওঠে। অতএব পতিতালয় গমন, মদ্যপান, চৌর্যবৃত্তি এবং পতিতা খুনের দায়ে কৌশলে অভিযুক্ত করে কলঙ্কিত নায়ক রূপে সর্বসমক্ষে তাকে প্রতিষ্ঠিত করার নিপুণ চক্রান্ত: এবং এই শঠতায় মাধব রায় আংশিক সফল।

অশোক নতুন দিনের পথিকৃৎ—অচলায়তনের জীর্ণ প্রাচীর ভেঙ্গে নতুন পথ গড়ার কারিগর। বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা তাকে সংস্কার-মুক্ত মন নিয়ে ভাবতে শিখিয়েছে।

---

[১১] 'The Amrita Bazar Patrika', 7th September, 1940

চরণবিলের বদ্ধ জলাশয় জনস্বার্থের পরিপন্থি- তাকে ভাঙ্গনের মধ্যে দিয়ে তাতে গতি সঞ্চার করতে পারলে তা মানব কল্যাণের অনুকূলে প্রবাহিত হতে পারে: গতিহীনতাই মৃত্যু—গতিশীলতাই জীবন। কূপমণ্ডুক পল্লীজীবনে প্রবহমানতার, প্রগতির এই বেগ সঞ্চারের ব্রত অশোকের। নইলে জমিদার মাধব রায়ের সঙ্গে তার বিরোধের অন্য কোন হেতু নেই। অশোকের নেতৃত্বে সংগঠিত হাজার হাজার কৃষকের কোদাল গাঁইতির আঘাতে অবশেষে চরণবিলের আবদ্ধ জলাশয়ে এসেছে প্লাবনের বেগ। সংগঠিত এই কৃষক আন্দোলন কি ঐতিহাসিক 'চুয়ার বিদ্রোহের' কথাই স্মরণ করিয়ে দেয় না?

মাধব রায়ের নির্মক্ষিক অন্দর মহলে বিধবা পুত্রবধূ মানদার সতর্ক প্রহরায় মধ্যযুগীয় সংস্কারের সযত্ন সংরক্ষণ। গৃহবধূর সেখানে শিক্ষা কিম্বা সংগীত চর্চা সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ। মানদার প্রবল আপত্তিতে এবং ব্যক্তিগত উন্নাসিকতার মোহে মাধব রায় কেবলমাত্র লেখাপড়া জানার অপরাধে মণীষাকে উচ্চশিক্ষিত পৌত্র কনকের সহধর্মিনীরূপে নির্বাচন করতে পারেননি। কোন এক 'চাষার মেয়ে' অশিক্ষিতা সেবা পরায়ণা রাণীর সঙ্গে কনকের বিবাহ দিয়েছেন। শাশুড়ী মানদার কঠোর অনুশাসনে রাণীর প্রতিটি পদক্ষেপ নিয়ন্ত্রিত। রাণীর দিক থেকেও তা নিয়ে কোন ক্ষোভ ছিল না। অশিক্ষার অন্ধকার লালিত এই নারী শাশুড়ী নির্দেশিত পথে বীতরাগ স্বামীর সংসার কর্তব্যে নিযুক্ত থাকাটাকেই পরম সৌভাগ্য জ্ঞান করেছিল। অকস্মাৎ সেখানে মণীষার আগমন এবং স্থিতি যে বিপরীত পরিমণ্ডলের সৃষ্টি করেছে তাতে উদ্বিগ্ন হয়ে উঠেছেন মাধব, মানদা এমনকি কুৎসা পরায়ণা সুন্দরী ঝি পর্যন্ত। মণীষার চোখ দিয়ে রাণী জগৎকে নতুন রূপে দেখতে শিখেছে; কিন্তু সংস্কারের গণ্ডী অতিক্রমের শক্তি বা সাহস তার ছিল না। এমনকি মণীষার সঙ্গ লাভে কনকের অত্যুৎসাহেও সে নির্বাক দ্রষ্টা-- প্রতিবাদী নয়। কনকের ধমনীতে প্রবাহিত অপরাধ প্রবণ জমিদারী রক্ত, সেই প্রবাহই তাকে প্ররোচিত করে অন্য নারীতে ধাবিত হতে— উচ্চশিক্ষার সাধ্য কি তার গতিরোধ করে? কিন্তু রাণীর মধ্যে মণীষা আবিষ্কার করেছে সত্য, প্রেম ও নিষ্ঠার অপূর্ব সমন্বয়। 'চাষার মেয়ের' অজুহাতে উপেক্ষার বস্তু সে নয়; বরং মণীষার মত শিক্ষাভিমানী নারীরও তার কাছে কিছু গ্রহণীয় আছে।

মাধব রায়ের বর্হিজগতে প্রতিদ্বন্দ্বী অশোক এবং অন্দর মহলে মণীষা। শত চেষ্টাতেও অশোকের গতি তিনি রোধ করতে পারেননি—চরণবিলের মুক্ত প্রবাহ তাঁকে মেনে নিতে হয়েছে। আর অন্দর মহলে তাঁর নিজের অস্ত্রেই তিনি মণীষার কাছে পরাভূত। মাধব রায়ের সংস্কার-আনুগত্য অশোকের ভাবশিষ্যা মণীষার স্বচ্ছ দৃষ্টিতে ধরা পড়তে বিলম্ব হয়নি। অশোকের বিরুদ্ধে মাধবকে নিবৃত্ত করতে মণীষা তার সিঁথিতে সিঁদুর নিয়ে মাধবের সম্মুখে গিয়ে দাঁড়িয়েছে অশোকের স্ত্রীরূপে—আহ্বান জানিয়েছে সেই সিঁদুর মুছে দিতে। সংস্কারবদ্ধ মাধব সভয়ে পিছিয়ে গিয়েছেন, 'সতী সীমন্তিনীর ও সিঁদুর' তিনি মুছতে পারেন না। অবশেষে পরাজয় স্বীকার করে অশোক নিগ্রহে ক্ষান্ত হন মাধব রায়। মণীষা ও অশোকের এই বিজয়ে অতীতের বিরুদ্ধে বর্তমানের বিজয় বার্তাই ঘোষিত।

॥ রণদাপ্রসাদ ॥

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের ক্রান্তিলগ্নে 'স্টার' থিয়েটারে অভিনীত নাটকগুলির মধ্যে সামাজিক নাটকের সংখ্যা তুলনায় যথেষ্ট কম। ইতিহাস পুরাণ নির্ভর নাটকই সেখানে বেশি অভিনীত হয়েছে। এই ধারার পরিপূরক রূপে কয়েকটি সমাজ-সমস্যা মূলক নাটক 'স্টার' কর্তৃপক্ষ বিভিন্ন সময়ে মঞ্চস্থ করে। সুধীন্দ্রনাথ রাহার বিপুলায়তন সামাজিক নাটক 'রণদাপ্রসাদ' সেই সূত্রে 'স্টার' থিয়েটারে আত্মপ্রকাশ করে ১৯৪০ র ২৮শে সেপ্টেম্বর তারিখে। কালীপ্রসাদ ঘোষের প্রযোজনায়, কৃষ্ণচন্দ্র দের সুর সংযোজনায় এবং পরেশচন্দ্র বসুর মঞ্চ পরিকল্পনায় 'রণদাপ্রসাদ' স্টার' রঙ্গমঞ্চে স্বল্পকাল অভিনীত হয়। বলা বাহুল্য এই নাটকটি সমকালীন দর্শক সমাজে বিন্দুমাত্র সাড়া জাগাতে পারেনি। সেদিক থেকে এটিকে 'স্টার' কর্তৃপক্ষের ব্যর্থতার নিদর্শন হিসাবেই গণ্য করতে হবে। নাটকটির সাহিত্য গুণ বিচারের পূর্বে প্রথম অভিনয় রজনীর অভিনেতৃবর্গের তালিকাটি এখানে পেশ করা যেতে পারে : মতিলাল - সনৎ কুমার মুখোপাধ্যায়; সূর্যকান্ত—জয়নারায়ণ মুখোপাধ্যায়; শঙ্করলাল বঙ্কিমচন্দ্র দত্ত; নলিনাক্ষ- ভূপেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী; রণদাপ্রসাদ--অমল বন্দ্যোপাধ্যায়; সমরদাস উমাপদ বসু; চন্দ্রমোহন রঞ্জিত রায়; ত্রিলোচন—নলিন বাগ; জেলার মুরারিমোহন মুখোপাধ্যায়; ইন্দুলেখা শ্রীমতি নিভাননী; দীপ্তি—মিস লাইট; গৌরী--শ্রীমতি তারকবালা; এবং অপ্রধান চরিত্রে বিমল ঘোষ, গোষ্ঠ ঘোষাল, অমূল্য মুখোপাধ্যায় প্রমুখ।

'রণদাপ্রসাদ' নাটকাকারে উপন্যাস ..উপন্যাসের মতই ঘটনাবহুল এই নাটক; বিস্তৃত এর পটভূমি এবং পরিকল্পনা। চারটি অঙ্কে সর্বমোট সতেরটি অতিদীর্ঘ দৃশ্যে নাট্যকাহিনী বিধৃত হয়েছে। অঙ্ক ও দৃশ্য নির্মাণে সুপরিকল্পিত বিন্যাস রীতির অভাবও সচেতন পাঠকের দৃষ্টি এড়ায় না। স্থান, কাল এবং ঘটনাগত নাটকীয় ত্রি-ঐক্য এই নাটকে রক্ষিত হয়নি। আবার সনাতন নাট্যশাস্ত্রগত বিধি-বিধান অতিক্রম করে মৌলিক নাট্য-নির্মিতির বলিষ্ঠ সচেতন প্রয়াসও নাট্যকারের কলমে অনুপস্থিত। বরং গল্পের পর গল্প বলার লোভ নাট্যকার সম্বরণ করতে পারেননি; সেই কারণে আখ্যান ঠিকমত দানা বাঁধতে পারেনি . চরিত্রগুলিও নিজস্ব স্বকীয়তায় বিন্যস্ত হবার সুযোগ লাভে বঞ্চিত হয়েছে। মহাযুদ্ধকালীন জীবন বিপর্যয়ের বিশ্বাসযোগ্য আলেখ্য রচনায় নাটকীয় উপাদান সমূহের যথোপযুক্ত ব্যবহারেও নাট্যকার সফল হননি। অথচ উপাদান তাঁর হাতে যথেষ্টই ছিল। নাট্যকার সযত্নে মনোরম পুষ্প চয়ন করেছেন কিন্তু সুগ্রথিত মাল্য রচনায় বিশেষ নৈপুণ্যের পরিচয় দিতে পারেননি।

রাজগঞ্জ আয়রণ ফ্যাক্টরীর ফোরম্যান রণদাপ্রসাদের রোমহর্ষক উত্থান পতন বর্তমান নাটকের মূল উপজীব্য বিষয়। ফ্যাক্টরীর সামান্য ফোরম্যান সে—অথচ শিক্ষাগত যোগ্যতায় সে ইঞ্জিনীয়র; শুধু শ্রমিক কল্যাণের চিন্তায় তাদের সঙ্গে সহবাসে তার আনন্দ এবং এই সামান্য পেশা গ্রহণ। শ্রমিকেরা তাকে জানে তাদেরই একজন বলে, তার উচ্চশিক্ষার

তকমাটুকুও তাদের অজ্ঞাত। এ হেন রণদাপ্রসাদ শৈশবে পিতৃ-মাতৃহীন: ভাগ্য বিড়ম্বনায় কিছুকাল জালিয়াত চন্দ্রমোহনের প্রতিপালিত এবং পরে স্বনামধন্য ট্রেড ইউনিয়ন প্রেসিডেন্ট মতিলালের অনুকম্পায় তার জীবন-চক্র আবর্তিত। শৈশবের অনেক লুপ্ত স্মৃতির মত চন্দ্রমোহনের পর্বটি রণদাপ্রসাদের স্মৃতিপট থেকে বিস্মরণের অন্ধকারে বিলুপ্ত। আর এই বিস্মৃত অতীত মতিলালের হাতের তুরুপের তাস- রণদাপ্রসাদের আনুগত্যে বিন্দুমাত্র সন্দেহ দেখা দিলে এই অস্ত্রটিকে তিনি ব্যবহারের প্রয়োজনে সযত্নে সঞ্চয় করে রেখেছেন। আধুনিকা, শিক্ষিতা একমাত্র কন্যা গৌরীর যোগ্য পাত্র রূপে তিনি নির্বাচিত করে রেখেছেন এই কুড়িয়ে পাওয়া পালিত পুত্রটিকে। জনক-জননীর স্নেহ সান্নিধ্য বঞ্চিত রণদাপ্রসাদও পালক-পিতা মতিলালের একান্ত অনুগত। অবশ্য তার আনুগত্যের অতিরিক্ত আকর্ষণটুকুর লক্ষ্য মতিলাল নন—লক্ষ্য তাঁর কন্যা গৌরী। আর সেই লক্ষ্যে জ্যা রোপণ করে শ্রমিক দরদী রণদাপ্রসাদের, গৌরীর অনাগত ফাল্গুনের আগমন প্রত্যাশায় ব্যাকুল প্রতীক্ষা। এমনকি ফ্যাক্টরীর মালিকপক্ষের লোভনীয় প্রস্তাবও তাকে বিচলিত করতে পারেনা।

রণদাপ্রসাদের ভাগ্যচক্রের নেপথ্য নিয়ন্ত্রক, একদা সহায় সম্বলহীন শ্রমিক—বর্তমান ট্রেড ইউনিয়ন নেতা, ডার্বি বিজেতা মতিলাল। ক্ষমতার লড়াই এ মতিলালের প্রধান হাতিয়ার তাঁরই হাতে গড়া রণদাপ্রদাস। রণদাপ্রসাদের জন সম্মোহনী ক্ষমতার সুবাদে কাউন্সিলে শ্রমিক প্রতিনিধি হিসাবে তাকে বসাতে চান তিনি। আর কন্যা গৌরীর সঙ্গে পাকাপাকি গাঁটছাড়া বন্ধনের সূত্রে রণদাপ্রসাদের নিয়ন্ত্রকের ভূমিকায় অবতীর্ণ হতে চান তিনি। ঝানু রাজনীতিবিদ মতিলালের এই নিখুত হিসাবে গরমিল হবার সম্ভাবনা মোটেই ছিলনা। রণদা সম্পর্কে সিদ্ধান্তে গৌরীর অহেতুক বিলম্বই সেখানে অনিশ্চয়তা ঘনিয়ে তুলেছে। উচ্চশিক্ষা আর আভিজাত্যের অহংকারে শ্রমিক সান্নিধ্য লাভেচ্ছু ফোরম্যান রণদাপ্রসাদকে গ্রহণ করতে গৌরীর দ্বিধা তাকে ধাবিত করেছে সূর্যকান্তের বিদূষী কন্যা দীপ্তির প্রতি। তা আরও বেগবান হয়েছে জমিদার এবং প্রতিপক্ষ নলিনাক্ষের প্রতি গৌরীর একটু বেশী মাত্রায় উৎসাহে। ধুরন্ধর রাজনীতিবিদ মতিলাল রণদাপ্রসাদের এই কক্ষত্যাগ নীরবে মেনে নেবার মত লোক নন। তাঁরই কূটনৈতিক চালে রণদাপ্রসাদের পতন—কাউন্সিলের সদস্য থেকে তার শ্রমিকে প্রত্যাবর্তন, দীপ্তির প্রত্যাখ্যান এবং নকল পিতার সেবায় তার আত্মনিয়োগ। ততদিনে গৌরীও বুঝে গিয়েছে নলিনাক্ষ অপেক্ষা কর্মঠ যুবক রণদাপ্রসাদ বাস্তব জগতে অনেক বেশী নির্ভরশীল।

রাজগঞ্জ আয়রণ ফ্যাক্টরী এই নাটকের প্রধান রঙ্গভূমি। এই ফ্যাক্টরীকে ঘিরেই রণদাপ্রসাদের উত্থান-পতন, শ্রমিক অসন্তোষ, মালিক-শ্রমিক সংঘাত, মতিলাল-সূর্যকান্তের রাজনৈতিক চরিতার্থতা সিদ্ধির লড়াই। স্যার চিরঞ্জীবের স্ত্রী ইন্দুলেখা, কারিগরী দক্ষতা অর্জনে প্রবাসী স্বামীর অবর্তমানে ফ্যাক্টরীর কর্ণধার। আধুনিক প্রযুক্তি ও উন্নত যন্ত্র বিদ্যার সংযোজনে ফ্যাক্টরীর উন্নতিসাধন তাঁর লক্ষ্য এবং এই নিয়ে মালিক-শ্রমিক সংঘাতের সূচনা। শ্রমিক ছাঁটাই-এর আশু সম্ভাবনায় ত্রস্ত শ্রমিককূল রণদাপ্রসাদকে সামনে রেখে সংঘর্ষের জন্যে প্রস্তুত। এই শ্রমিক অসন্তোষকে কাজে লাগিয়ে রাজনৈতিক

ফায়দা লুটতে চেয়েছেন মতিলাল এবং সূর্যকান্ত। সম্ভাব্য শ্রমিক বিক্ষোভ রুখতে ইন্দুলেখা মালিকপক্ষের স্বভাবসিদ্ধ কৌশলে ব্যবহার করতে চেয়েছেন রণদাপ্রসাদকে; প্রথমে ইঞ্জিনীয়ারের পোস্ট এবং পরে কারখানার সিকি ভাগের অংশীদারের প্রলোভনে প্রলুব্ধ করেত চেয়েছেন তাকে। কিন্তু কূট কৌশলী মতিলালের পাকা-মাথার কাছে ইন্দুলেখার সমস্ত পরিকল্পনা ব্যর্থ হয়ে গেছে। শেষ পর্যন্ত রণদাপ্রসাদের পদস্খলন ও মতিলালের সঙ্গে বিরোধে কোনক্রমে নিষ্কৃতি পেয়েছেন তিনি।

পূর্বেই উল্লেখ করেছি, রণদাপ্রসাদ নাটক হিসাবে নানান অসঙ্গতিতে পরিপূর্ণ। ঘটনার পর ঘটনা এই নাটকের আখ্যান ভাগকে দুর্বল করে রস সম্ভোগে ব্যাঘাত ঘটিয়েছে। রণদাপ্রসাদের জন্ম বৃত্তান্ত ও অতীত ইতিহাস নিয়ে নাট্যকার অকারণ চমক সৃষ্টির প্রলোভন দমন করতে পারেননি। তৎকালীন ভারতবর্ষের সুযোগসন্ধানী রাজনীতির চরিত্র অঙ্কন করতে গিয়েও নাট্যকার শেষরক্ষা করতে পারেননি। তবে নাটকের সংলাপ সুখপাঠ্য।

॥ পি ডাবলিউ ডি ॥

অত্যন্ত সাধারণ মানের নাটকও কেবলমাত্র অভিনয় উৎকর্ষের জোরে কতখানি জনপ্রিয়তা অর্জন করতে পারে, জলধর চট্টোপাধ্যায়ের 'পি ডাবলিউ ডি' নাটকটি তার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। ১৯৪০ র ১লা অক্টোবর শুভ মহালয়া তিথিতে 'নাট্যভারতীতে' প্রথম মঞ্চস্থ হয়ে 'পি ডাবলিউ ডি' বছরের শেষে ২৬শে ডিসেম্বর মহা সমারোহে তার সুবর্ণ জয়ন্তী উদযাপন করে। জনপ্রিয় নট দুর্গাদাস বন্দ্যোপাধ্যায়ের আন্তরিক প্রযত্নে 'নাট্যভারতীর' সফলতম প্রয়াসগুলির অন্যতম স্থান অধিকার করে নাটকটি। তারই স্বীকৃতি স্বরূপ কৃতজ্ঞ নাট্যকার পরবর্তীকালে গ্রন্থাকারে প্রকাশের সময় নাটকটি তাঁরই নামে উৎসর্গ করেন। 'পি ডাবলিউ ডি' র প্রভূত মঞ্চ সাফল্যের পশ্চাতে 'নাট্যভারতীর' অপর দুই সুদক্ষ অভিনেতা রতীন বন্দ্যোপাধ্যায় এবং সন্তোষ সিংহের অবদানও কম নয়। দৃশ্যপটের যাদুকর নানুবাবুর (মনীন্দ্রনাথ দাস) চমৎকার দৃশ্য পরিকল্পনাও দর্শক আকর্ষণে সম্মোহনী শক্তিরূপে কাজ করেছিল।

প্রথম অভিনয় রজনীতে উল্লেখযোগ্য চরিত্রে অভিনয় করে যাঁরা 'পি ডাবলিউ ডি' কে জনপ্রিয়তার শীর্ষ পৌঁছে দিতে সক্ষম হয়েছেন, তাঁদের মধ্যে আছেন : সৌমেন—রতীন বন্দ্যোপাধ্যায়, সনৎ -সন্তোষ সিংহ, রায়বাহাদুর—নির্মলেন্দু লাহিড়ী, বিরূপাক্ষ—তুলসী চক্রবর্তী সেন সাহেব তথা পরিচালক—দুর্গাদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্যামলী—রাণীবালা এবং অঞ্জলির ভূমিকায় সুহাসিনী দেবী। তরুণ সুরশিল্পী উমাপতি শীল সুর সংযোজনায় বিশেষ নৈপুণ্যের পরিচয় দিয়েছেন।

পঞ্চ অঙ্ক সমন্বিত নাটকের সনাতন বিধি বিধান নাট্যকার এখানে গ্রহণ করেননি; দুটি অঙ্কে সর্বমোট দশটি দৃশ্যে নাটকের আখ্যানভাগ পরিকল্পিত হয়েছে। 'পি-ডাবলিউ-ডি' নাটকের আখ্যান ভাগে কোন বৈচিত্র্য নেই—সামগ্রিক বক্তব্য পরিস্ফুটনে ঘটনাগত পারম্পর্যের বড়ই অসঙ্গতি; চরিত্রগুলির ক্রিয়াকলাপও অসংলগ্ন, ধারাবাহিক মনস্তাত্ত্বিক বিশ্লেষণের মধ্যে দিয়ে তাদের বিকাশ ঘটেনি।

'সেবিকা সঙ্ঘের' প্রতিষ্ঠাতা এবং সেক্রেটারি বিলাত ফেরৎ সুদর্শন যুবক সৌমেন। বঙ্গদেশে নারী জাগরণের দুর্জয় সংকল্প নিয়ে তার আত্মপ্রকাশ: আর্তের সেবা সেই সংকল্প সিদ্ধির অনন্য পন্থারূপে তার কাছে প্রতিভাত। শ্যামলী, অঞ্জলি, মালতী, মাধবীর মত গুটি কয়েক কাঁচা বয়সী সেবিকাদের নিয়ে তার সঙ্ঘের সেবাধর্মের জম-জমাট কাজ কারবার। এদের কেউ বা স্বামীসঙ্গ বিচ্ছিন্না, কেউ বা বালবিধাবা, কেউ বা সামাজিক জীবনে কোন না কোনভাবে নিরাপত্তাহীন। দেওয়াল ক্যালেণ্ডারে Florence Nightingle - এর সুদৃশ্য ছবিতে সঙ্ঘের আদর্শ ও কর্মপন্থাকে তাত্ত্বিক ব্যঞ্জনা দানের সচেতন অভিপ্রায় দৃশ্যমান। বিবাহ সৌমেনের কাছে একটা Convention, ভালবাসা একটা Weakness ছাড়া আর কিছু নয়। অতএব এ সকলের উর্দ্ধে নিজেকে পরিচ্ছন্নভাবে প্রতিষ্ঠিত করতে তার চেষ্টার পরিসীমা নেই। কিন্তু সৌমেনের আর্তসেবা আত্মসেবার নামান্তর মাত্র। রায়বাহাদুরের ন' লক্ষ পঁচাত্তর হাজার টাকা আত্মসাৎ করার তীব্র আকাঙ্ক্ষায় তার সামগ্রিক কর্মপন্থা নির্ধারিত তার মোক্ষলাভের যাবতীয় দ্বন্দ্ব জটিলতা ঐ লালসার অগ্নিগর্ভে নিমজ্জিত। আত্মবন্ধু সনৎকে বিষপ্রয়োগে হত্যার পরিকল্পনা, অনুরক্ত অঞ্জলিকে খুনের দায়ে ফাঁসির রজ্জুর দিকে ঠেলে দেবার কূট কৌশল, রায়বাহাদুরের অনুগ্রহ ভাজন শ্যামলীর প্রতি প্রেম নিবেদন এর কোনটাই বিচ্ছিন্ন ঘটনা নয়, একটি গূঢ় পরিকল্পনার এক একটি পদক্ষেপ। নারী জাগরণ বা আর্তসেবার পোষাকী আবরণটুকু না থাকলে চলে না বলেই আছে, আছে আত্মগোপনের নিরাপদ আশ্রয়ের জন্যে। সঙ্ঘের নারীদের প্রতি মাঝে মাঝেই অসতর্ক মন্তব্যে সৌমেন তার এই আশ্রয়টুকুও বিস্মৃত হয়েছে এটাই তার দুর্ভাগ্য। দুর্বৃত্তায়নেরও একটা Plan of work একটা বিচার সিদ্ধ পরিকল্পনা থাকে, সেখানে ভুল হলে কার্যসিদ্ধি অসম্ভব সৌমেন সেখানেই চূড়ান্তভাবে ব্যর্থ।

সনৎ সৌমেনের বন্ধু, বিলাত ফেরৎ এবং পিতার সঙ্গে মতান্তর হেতু বর্তমানে সন্ন্যাসী। পিতৃ বিরাগ থেকে তার সংসার বিরাগের উৎপত্তি বলে তার গেরুয়া রঙটাই কাঁচা, তাতে ত্যাগ-তিতিক্ষার পাক ধরেনি। রজক সন্তানের যৎসামান্য চেষ্টায় সে রঙ অনায়াসে ধৌত হয়ে যায়। সংযম নামক উদ্বায়ু পদার্থটি যৌবনবতী নারী শ্যামলীর যুগল ভ্রু-র ইঙ্গিত মাত্রে সনতের জীবন থেকে উবে যেতে বিলম্ব হয় না। মাত্র পনেরো দিনের সান্নিধ্যে এসে একটি কুমারী নারীর দুর্বলতার সুযোগে তার সঙ্গে সহবাসে তার প্রবৃত্তি ভাল মন্দ বিচারের অপেক্ষা রাখে না এবং পরিশেষে সেই পাপ কর্মজনিত ফলশ্রুতির সমস্ত দায় ওই নারীটির স্কন্ধে অর্পণ করে সে তার ব্যর্থ তাত্ত্বিক উপলব্ধিতে প্রত্যাবর্তন করে। সনৎ type চরিত্র একালের জীবন যুদ্ধে সংগ্রাম বিমুখতার লজ্জা গোপনে সন্ন্যাসীর ভেকধারী অতিমাত্রায় পার্থিব সুখ ভোগ সন্ধানী পুরুষ।

'পি ডাবলিউ-ডি' নাটকে একেবারেই অপ্রয়োজনীয় অবাঞ্ছিত চরিত্র Public Works Department সংক্ষেপে পি-ডাবলিউ ডি সেন সাহেব চরিত্রটি। মূল নাট্য কাহিনীর সঙ্গে এই চরিত্রটির প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ কোন সম্পর্কই নেই। নাটকের শিরোনামে এই চরিত্রটির উপস্থিতি যথেষ্ট বিভ্রান্তিকর। এ হেন একটি চরিত্রের প্রতি নাট্যকারের এতখানি

গুরুত্ব আরোপের যুক্তি নির্ভর কোন ব্যাখ্যা মেলে না। এ নাটকের নামকরণ তাই পুরোপুরি ব্যর্থই বলতে হবে। সেন সাহেব সদাসর্বদা আকণ্ঠ মদ্যপানে নিমজ্জিত, পথ-চলতি অসতর্ক মানুষের পকেট থেকে সযত্নে মানিব্যাগ বা কলম তুলে নিতে তার জুড়ি নেই, মাত্র দশটা টাকার বিনিময়ে তিনি খুনীর হাতে মারাত্মক বিষ পটাসিয়াম সায়ানাইড সংগ্রহ করে তুলে দেন। জগতের কোন ভাল-মন্দই যেন তাকে বিচলিত করতে পারে না; অথচ সমস্ত কিছুর উর্দ্ধেও তিনি নন। এইখানেই শেক্সপীয়রের 'ফুল' বা 'জ্যাকস' চরিত্রের সঙ্গে সেন সাহেবের মৌলিক পার্থক্য। জগৎ এবং জীবন সম্পর্কে তার দৃষ্টিভঙ্গি শুধু অস্পষ্ট নয়—গোলমেলে; আর তাই তার আচার-আচরণ কিম্বা চরিত্রনীতি আগাগোড়া অসঙ্গতিতে পরিপূর্ণ।

এই নাটকে নারী চরিত্রগুলি অতিমাত্রায় দীন, আত্মমর্যাদাহীন। মনুষ্যত্ববোধের বিন্দুমাত্র লক্ষণও এদের মধ্যে খুঁজে পাওয়া যায় না। যাদের কাছে তারা সর্বাপেক্ষা উপেক্ষিত, তাদের কাছেই এদের আত্মনিবেদনের অতি ব্যাকুলতা রীতিমত হাস্যকর। ফলে নারী জাগরণের যে তাত্ত্বিক বক্তব্য সৌমেনের মুখে পৌনঃপুনিক উচ্চারিত, সে কাজে এদের যোগ্যতা কিম্বা ভূমিকা সংশয়ের সৃষ্টি করে। যুগ সন্ধিক্ষণের প্রেক্ষাপটে রচিত বাংলা নাটকে নারী চরিত্রের এই দীনতা কাম্য নয়। সৌমেনের প্রতি অঞ্জলির তীব্র অনুরাগের কোন সদুত্তর মেলে না। ঠিক তেমনি গজেন্দ্রর প্রতি পরিত্যক্তা স্ত্রী মালতীর কিম্বা দ্বিজবরের প্রতি পরিত্যক্তা মাধবীর একনিষ্ঠ পতিভক্তির পশ্চাতে যুক্তিগ্রাহ্য কোন ব্যাখ্যা মেলে না। কেবলমাত্র রায়বাহাদুরের প্রতি অনুকম্পাবশতঃ বিবাহের পূর্বেই সনতের সন্তান ধারনে শ্যামলীর চরম আত্মতৃপ্তি ঔচিত্যবোধের কাছে পীড়াদায়ক। কেননা প্রচলিত সংস্কারের গণ্ডী অতিক্রমের মানসিক দৃঢ়তা শ্যামলী চরিত্রে সম্পূর্ণ অনুপস্থিত।

প্রভূত জনপ্রিয় এই নাটকে বিস্তর ত্রুটি বিচ্যুতি। এ নাটকে কান্নার বড় বেশি বাড়াবাড়ি। অঞ্জলির মৃত্যুও অতি নাটকীয়তা দোষে দুষ্ট। শুধুমাত্র মায়ের ছবির সঙ্গে মুখাবয়বের সাদৃশ্য হেতু রায়বাহাদুরের শ্যামলী নির্ভরতা বাস্তব বুদ্ধির পরিচয় দেয়না। পুত্র সনতের সঙ্গে তার বিবাদের কারণটিও আমাদের অজ্ঞাত। সভ্যতার সংকট নিয়ে ছিটে ফোঁটা মন্তব্য আছে হয়ত, কিন্তু চরিত্র নির্মাণে বা আখ্যানভাগে তার কোন প্রতিফলন পড়েনি। বরং তুলসী চক্রবর্তীর সরস অভিনয়ের গুণে বিরূপাক্ষের সংলাপ অনেকটা উপভোগ্য হতে পেরেছে।

॥ ঘূর্ণি ॥

গৌর সী রচিত প্রথম নাটক 'ঘূর্ণি' ১৯৩৯ র এপ্রিলে 'রঙমহলে' অভিনীত হবার কথা ছিল কিন্তু এই সামাজিক নাটকটি সেইসময় মঞ্চস্থ হয়নি। মঞ্চোপস্থাপনা সম্পর্কে নাট্যকারের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার অভাবে নাট্য আঙ্গিকে কৌশলগত ত্রুটি, অভিনয়ে অসুবিধার সৃষ্টি করায় 'রঙমহল' কর্তৃপক্ষ তখনকার মত নাটকটি স্থগিত রাখতে বাধ্য হন। ১৯৪০-র জুলাই মাসে 'রঙমহলের' তৎকালীন ম্যানেজার ও প্রযোজক প্রভাত সিংহের নির্দেশে

নাট্যকার ছায়া চিত্রোপযোগী 'ঘূর্ণি' কে মঞ্চোপযোগী করে তুলতে সচেষ্ট হন।[১১] জুলাই থেকে ডিসেম্বর পর্যন্ত দীর্ঘ কয়েক মাস যাবৎ এই সংশোধন ও পরিবর্ধন কাজে তাঁকে বিশেষভাবে সাহায্য করেন 'রঙমহলের' অন্যতম জনপ্রিয় অভিনেতা নরেশ চন্দ্র মিত্র। পরিশেষে ১৯৪০-র ১৪ই ডিসেম্বর পরিমার্জিত 'ঘূর্ণি' দর্শকের দরবারে আনুষ্ঠানিক ভাবে আত্মপ্রকাশ করে। নাটকটির পরিচালনা ও নির্দেশনার দায়িত্বে ছিলেন নটসূর্য অহীন্দ্র চৌধুরী এবং দৃশ্যপট নির্মাণ করেছিলেন প্রখ্যাত নানুবাবু। প্রভাকরের ভূমিকায় অহীন্দ্র চৌধুরী, সাগরের চরিত্রে ভূমেন রায় রণু সর্দারের ভূমিকায় রবীন্দ্রমোহন রায়, বিনায়কের ভূমিকায় সিধু গাঙ্গুলী, মেঘার চরিত্রে নবাগত শম্ভু মিত্র এবং মন্দিরা ভারতী, সন্ধ্যা ও তুলসীর ভূমিকায় যথাক্রমে ঊষা দেবী, শান্তি গুপ্তা, বেলারাণী ও পদ্মাবতী অনবদ্য অভিনয় নৈপুণ্যের পরিচয় দেন।

'ঘূর্ণি' এক জটিল জীবন চর্যার রূপালেখ্য। এ নাটক বাঙালীর চিরাচরিত সুখ-দুঃখ মথিত সহজ সরল জীবনের উপলব্ধি সঞ্জাত নয় জীবনের রন্ধ্রে রন্ধ্রে ক্ষয়িষ্ণু, আদর্শবোধের সঙ্গে মানবিকতার সংঘাতে গড়ে ওঠা এক নিটোল কাহিনী। নাটকের সমস্যা দ্বিবিধ—একদিকে সাগর, তুলসী এবং মেঘাকে ঘিরে রণু সর্দারের গোপন আস্তানায় কালো মেঘ ঘনিয়ে উঠেছে; অন্যদিকে বিনায়ক, ভারতী ও সাগরকে কেন্দ্র করে প্রভাকর-মন্দিরার পারিবারিক জীবন একটা ভাঙ্গনের মুখে এসে পড়েছে। উভয় সমস্যার অনিবার্য যোগসূত্র অবশ্যই সাগর। জন্মলগ্নে পরিত্যক্ত প্রভাকর মন্দিরার বিবাহ পূর্ববর্তী সন্তান সাগর রণু সর্দারের পৌত্ররূপে প্রতিপালিত হয়ে পরিণত হয়েছে দুর্ধর্ষ ডাকাতে। পুলিশ তার মাথার দাম ঘোষণা করেছে পনেরো হাজার টাকা। কিন্তু সাগরের চরিত্রে তার লোমহর্ষক ক্রিয়াকলাপের কোন প্রত্যক্ষ পরিচয় পাই না; আফিম চোরাই, কিডন্যাপ, লুঠতরাজ প্রভৃতিতে সিদ্ধহস্ত রণু সর্দারের দলে সাগর অনেকটাই বেমানান। তবু দলের সঙ্কট প্রধানত সাগরের বিরুদ্ধে মেঘার প্রতিদ্বন্দ্বিতাকে নিয়ে তীব্র আকার ধারণ করেছে। সে সঙ্কটে সরাসরি সংঘর্ষে অবতীর্ণ রণু সর্দার এবং মেঘা। মেঘার দাবী তুলসীর ওপর, দলের ভবিষ্যৎ নেতৃত্বের ওপর—দুর্বলের নেতৃত্ব স্বীকার করা তার পক্ষে সম্ভব নয়। অথচ সর্দার তার উত্তরাধিকারী নির্বাচন করেছেন সাগরকে—তুলসীর বরমাল্যও সাগরের কণ্ঠলগ্ন হবার প্রত্যাশায় উন্মুখ। পৌরুষের এ হেন অবমাননা মেঘার প্রতিহিংসা বৃত্তিকে নিষ্ঠুর আক্রোশে প্রজ্জ্বলিত করে তুলেছে। মেঘার নিষ্ঠুর আক্রোশের হাত থেকে সাগরের পরিত্রাণের কোন সম্ভাবনা ছিল না—যদি না সর্দারের তীক্ষ্ণ দৃষ্টি আর তুলসীর উপস্থিত বুদ্ধি ও

---

[১১] ভূমিকায় নাট্যকার বলেছেন-"রঙমহলের কর্তৃপক্ষের বিভিন্ন মত অনুযায়ী গত জুলাই মাস হইতে ১৪ই ডিসেম্বর পর্যন্ত আমাকে নানাভাবে নাটকটি সাজাইতে হয়। আমার ছায়াচিত্রোপযোগী ঘূর্ণি-কে মঞ্চোপযোগী করিতে যদি কিছু ত্রুটি বা নাটকীয় চরিত্র বিশ্লেষণের ..... তার ঘটনার অচ্ছেদ্য সমসূত্রতার (Continuity) নাটকীয় চরিত্রের পরিপূর্ণ মর্যাদা দানে কৃপণতা প্রকাশ পায় তাহার জন্য নাট্যকার দায়ী নহে।"

সুচতুর কৌশল তার সহায় হত। দলের এই সঙ্কট, এই বিপর্যয় রণু, সর্দারের অন্তর্জগতেও বিচিত্র আলোড়ন তুলেছে। নসীবপুরের গোপন আস্তানায় ডাকাতের বাহ্য আবরণ ভেদ করে বৃদ্ধ রণুর স্নেহ-কোমল পিতামহের অন্তর্ভেদী বাৎসল্য তৃষ্ণা করুণ মধুর রসে উজ্জ্বল; সদা পলায়ন-প্রয়াসী পৌত্রতুল্য সাগরের প্রতি তার দুর্দমনীয় মমত্ববোধ গভীর হৃদয় ব্যথায় অভিসিঞ্চিত। সেই বেদনার পাদপীঠে তুলসীরও উত্তরণ স্নেহময়ী প্রেমময়ী নায়িকায়।

নব্য ইহবাদী জীবন দর্শনে দীক্ষিত প্রভাকরের জীবনবোধ স্বতন্ত্র। স্ত্রীকে ছলনা করে এক ঝড় জলের রাত্রে তিনি সদ্য ভূমিষ্ঠ সন্তানকে তুলে দিয়ে এসেছেন রণু সর্দারের হাতে। যে সন্তান কোন এক অসতর্ক মুহূর্তের গ্লানিকে অঙ্গীকার করে পৃথিবীতে ভূমিষ্ঠ হয়েছে, জীবনের বহু প্রত্যাশিত মর্যাদা ও সম্ভ্রমের বিনিময়ে প্রভাকর তাকে স্বীকার করে নিতে পারেন না। সে প্রশ্ন প্রভাকরের কাছে অবান্তর। পাপ পুণ্যের সনাতন মূল্যবোধে আস্থাহীন উচ্চাভিলাষী মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়ের মানুষ অজ্ঞাতসারে সেদিন নিজের বিরুদ্ধেই যেন বিদ্রোহ ঘোষণা করে বসেছিল, কিন্তু নৈতিক বিভ্রান্তির এই প্রবণতা দ্রুত তার মানসিক বিপর্যয়কেও সুনিশ্চিত করে তুলছিল। প্রভাকর সেই মানসিক বিপর্যয়ে বিপর্যস্ত নতুন দিনের চেতনালব্ধ মানুষ। পাপকে নির্মূল করা যখন সাধ্যের বাইরে, যখন তাকে কৌশলে গোপন করা ছাড়া আর কোন পথ রইল না, তখন থেকেই প্রভাকরের অপরাধবোধ অলক্ষ্যে তাকে পীড়িত করেছে। স্ত্রী মন্দিরার বদ্ধ উন্মাদ অবস্থা, সন্তানকে ফিরিয়ে আনবার জন্যে পুনঃপুনঃ কাতরোক্তি, পরিশেষে কন্যা ভারতীর প্রেমাস্পদ রূপে সাগরের অকস্মাৎ প্রত্যাবর্তন, প্রভাকরের অপরাধ বোধকে তাঁর নিজের কাছেই ধ্রুব সত্য করে তুলেছে। আর তাই প্রভাকরকে ঘুমের মধ্যে সেই তীব্র মানসিক দংশনের তাড়নায় নিজের আত্মার কাছে, বিবেকবোধের কাছে নিঃসঙ্কোচ স্বীকারোক্তি দিতে হয়েছে—ফ্রয়েডী মনস্তত্ত্বের ভাষায় আমরা যাকে বলি-Somnambulism। তবু মন্দিরার প্রত্যাশা, তাঁদের পরিত্যক্ত সন্তান একদিন উজ্জ্বল চন্দ্রালোকিত রাত্রে পিতার হাত ধরে নিশ্চয় ফিরে আসবে। চন্দ্রালোকিত রাত্রি আর কিছুই নয়, একটা প্রতীক—ক্লেদলিপ্ত জীবনের গভীর অমানিশা থেকে সুস্থ স্বাভাবিক জীবনের নির্মল আলোয় প্রত্যাবর্তন! মন্দিরার অবচেতন মনে এই দুরন্ত আশা এতই ক্রীয়াশীল যে ধ্রুপদী সংগীতের মত এ কেবল তার জীবনচক্রকে চেতন থেকে অচেতনের ঘূর্ণিপাকে আবর্তিত করেছে।

প্রভাকর-মন্দিরার পারিবারিক জীবনের ঘূর্ণিচক্রের আর একটি বলয় ভারতী। ভারতী আধুনিক, ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবোধের উদগ্রতা তার জীবনচক্রের অদৃশ্য কীলক। সেই স্বাতন্ত্র্যবোধই তাকে পরিবারের গণ্ডী থেকে বিচ্ছিন্ন করে আত্ম-নির্ভরতা অর্জনে প্রেরণা জুগিয়েছে। পাশ্চাত্ত্য শিক্ষার জ্ঞানাঞ্জন তার দৃষ্টিকে করেছে বহুদূর প্রসারিত। তাই মার্জিত বিনায়ক নয়, দুর্ধর্ষ ডাকাত সাগরের মধ্যে বিদ্যা ও পৌরুষের শক্তিকে আবিষ্কার করা তার পক্ষে সম্ভব হয়েছে। কিন্তু ফেরারি ডাকাত সাগরের চটজলদি উচ্চশিক্ষিত অশোক পাকড়াশীতে রূপান্তর আমাদের ঔচিত্যবোধকে পীড়িত করে তোলে। ভারতীর

সঙ্গে তার কলেজ জীবনে পূর্ব পরিচয়ের সংবাদটিও সম্পূর্ণ প্রত্যাশার বাইরে। সাগর চরিত্রের পূর্বাপর সঙ্গতি রক্ষায় নাট্যকার ব্যর্থই হয়েছেন বলতে হবে। সে যাই হোক, অবশেষে মন্দিরার প্রত্যাশাকে সত্য করে তাঁর হারিয়ে যাওয়া সন্তান ফিরে আসে; কিন্তু এ ফেরা তো ফেরা নয়– জীবনের কুরুক্ষেত্রে এ যে চরম বিপর্যয়। তাঁরই কন্যার পাণীগ্রহণে তাঁরই সন্তানের উৎসুক আগ্রহে প্রভাকরের অন্তরাত্মা তীব্র ব্যথায় ক্রন্দন করে ওঠে। কে ভেবেছিল জীবনের সমস্ত সতর্ক হিসাব এমনি করে একদিন গরমিল হয়ে যাবে? কে ভেবেছিল একদিন ভাই এর হাত ধরে বোন এসে বিবাহের প্রস্তাব নিয়ে সামনে দাঁড়াবে? তবু যখন তাই হল, তখন গোপনে সংরক্ষিত নীল খামে জন্মসূত্রের কলঙ্কিত ইতিহাস হঠাৎই প্রকাশিত হয়ে সাগরকে জানিয়ে দিল তার সত্য পরিচয়। আর হতবুদ্ধি প্রভাকরকে সমস্ত সংশয় থেকে মুক্তি দিয়ে গেল সাগর নিজেই।

॥ পরিণীতা ॥

প্রবল অর্থনৈতিক প্রতিকূলতায় 'নাট্যনিকেতন' মঞ্চে ১৯৪০ এ মাত্র দুটি নাটক মঞ্চস্থ হয। প্রথমটি অক্টোবরে এবং দ্বিতীয়টি ডিসেম্বরে। যোগেশচন্দ্র চৌধুরীর সামাজিক নাটক 'পরিণীতা' অভিনীত হয় ১৯৪০ র ২৪শে ডিসেম্বর তারিখে। 'নাট্যনিকেতনের' তখন শেষ অবস্থা, তার ওপর নাটক হিসাবেও 'পরিণীতা' খুব উচ্চাঙ্গের নয় –কাজেই কর্তৃপক্ষের এই প্রয়াস প্রযত্ন কার্যত ব্যর্থই হয়ে পড়ে।[১০] অথচ সেকাল একালের খ্যাতনামা অভিনেতৃবর্গ এই নাটকের অভিনয়ে অংশ গ্রহণ করেছিলেন। প্রথম অভিনয় রজনীর চরিত্রলিপি এখানে পেশ করা যাচ্ছে : শ্রীপতি যোগেশচন্দ্র চৌধুরী; রমানাথ--শৈলেন চৌধুরী; খগেন—ছবি বিশ্বাস; নগেন- জহর গাঙ্গুলী; জীবন–নরেন চক্রবর্তী; ব্রজেন- সুধাংশু মিত্র; বিশু- কৃষ্ণ সেন; সারদেশ্বরী- নীহারবালা; চন্দ্রা– রাধারাণী; ললিতা-- ছায়া দেবী; সুখী কোহিনূরবালা এবং বরদা –সুবাসিনী। নাট্যনির্দেশক ছিলেন স্বনামধন্য সতু সেন; সুরারোপ করেন সুরেশ চন্দ্র চৌধুরী এবং মঞ্চ পরিকল্পনায় ছিলেন সত্যেন রায় চৌধুরী ও ভানু ভট্টাচার্য।

তরুণের আত্মপ্রতিষ্ঠা বর্তমান নাটকের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য বলে নাট্যকার জানিয়েছেন। এক প্রজন্মের সঙ্গে পরবর্তী প্রজন্মের আদর্শ ও নীতিগত বিরোধে সংঘাতের সূত্রপাত এবং শেষ পর্যন্ত নতুন প্রজন্মের প্রতিষ্ঠা অর্জন, বর্তমান নাটকের মূল উপজীব্য বিষয় বলে স্বয়ং নাট্যকারের অভিমত। খগেন, নগেন, চন্দ্র এবং ললিতা এখানে আধুনিক যুগের প্রতিনিধি; রমানাথ, শ্রীপতি কিম্বা সারদেশ্বরীর অনুসৃত জীবনচর্যার বিরুদ্ধে এদের আত্মপ্রতিষ্ঠার লড়াই। কিন্তু এই দ্বন্দ্ব ঠিকমত দানা বেঁধে ওঠেনি। ক্ষয়িষ্ণু জমিদার

---

[১০] অবশ্য 'নাট্যনিকেতন' 4th April 1941 Amrita Bazar Patrika-য সগর্বে ঘোষণা করে—"Parinita is a drama which one ought not to miss' তবে কর্তৃপক্ষের এই ঘোষণায় দর্শক কতখানি সাড়া দিয়েছিল তা বলা শক্ত।

শ্রীপতি এবং উঠতি ব্যবসায়ী রমানাথের শক্তির তীব্র প্রতিযোগিতায় তরুণের আত্মপ্রতিষ্ঠার সংকল্প অনেকটাই চাপা পড়ে গেছে।

শ্রীপতি বিগত ঐশ্বর্য ক্ষয়িষ্ণু জমিদার। মনোহরপুরের একদা দোর্দণ্ড প্রতাপ জমিদার বংশের শেষ প্রতিনিধি শ্রীপতির জমিদারীর আয়ের উৎস কমতে কমতে একেবারে তলানিতে এসে ঠেকেছে; প্রাসাদোপম পৈত্রিক ভিটেয় চারদেওয়ালের সীমাবদ্ধতায় তার জমিদারী সত্তা আবর্তিত। রমানাথের সঙ্গে ব্যক্তিত্ব অথবা ক্ষমতার প্রতিদ্বন্দ্বিতায় শ্রীপতি নিতান্ত অসহায়। অবাধ্য প্রজা রমানাথের আর্থিক সচ্ছলতা, আত্মপ্রতিষ্ঠা যে তাকেও বহুদূর অতিক্রম করে গেছে—এ ঔদ্ধত্য তিনি ক্ষমা করতে পারেন না, অথচ এ হেন আত্মপীড়নের প্রতিকারের উপায়ও তার সম্পূর্ণ অজানা। এই আত্মপীড়াই তাকে রমানাথের বিরুদ্ধে প্রতিদ্বন্দ্বিতায় ঠেলে দিয়েছে। অস্ত্রহীন যোদ্ধার মতই তিনি প্রবল পরাক্রমশালী প্রতিপক্ষের বিরুদ্ধে সংগ্রামে অবতীর্ণ এবং পরিশেষে বিধ্বস্ত। জমিদার তন্ত্রের অনিবার্য অপসারণের উপল তটভূমিতে আধুনিক বণিকতন্ত্রের সদর্প আত্মপ্রতিষ্ঠার অলঙ্ঘ্য সত্যকে প্রতিরোধ করার ক্ষমতা শ্রীপতির ছিল না; অথচ তাকে সহজ ভাবে স্বীকার করে নেবার মত মানসিক প্রস্তুতিও তার ছিল না; কেননা কর্তৃত্বের অধিকার বিস্মরণ—অর্থে, বিত্তে, প্রতিপত্তিতে, উচ্চতার অভিমান বিস্মরণ মানব প্রকৃতিরই বিরোধী। তা যতটা মর্মান্তিক, ঠিক ততটাই যন্ত্রণাদায়ক। আর জমিদার তন্ত্রের পরিকাঠামোয় সহনশীলতার এই শিক্ষা ছিল একেবারেই অজ্ঞাত। শ্রীপতি তার ব্যতিক্রম নন।

রমানাথ অতিমাত্রায় প্রতিহিংসা পরায়ণ—তার আক্রমণের একমাত্র লক্ষ্য শ্রীপতির আভিজাত্যের অহংকার। এই অহংকার চূর্ণ করার জন্যই তার যত কিছু আয়োজন। শ্রীপতির নত মস্তকের ওপরে সে প্রোথিত করতে চেয়েছে তার বহু কাঙ্ক্ষিত বিজয়পতাকা। তাই রমানাথের প্রতিষ্ঠা অর্জনের সমস্ত কর্ম-প্রচেষ্টা প্রকারান্তরে কেন্দ্রীভূত হয়েছে অন্ধ শ্রীপতি বিদ্বেষে। কেননা শুধুমাত্র অর্জন নয়—প্রতিপক্ষের বিসর্জনটুকুও তার কাম্য; ইপ্সিত লক্ষ্যে পদস্থাপন নিশ্চয় গর্বের, আর তা যদি আসে উন্নত শির পদানত করে, তবে তদপেক্ষা তৃপ্তির বোধ করি আর কিছু নেই। আদিম যুগ থেকে সাম্রাজ্য বিস্তারের মর্মমূলে মানব প্রকৃতির এই সুপ্ত বাসনাই গোপনে সক্রিয় ভূমিকা পালন করে এসেছে। নইলে আজ পর্যন্ত কোন সাম্রাজ্যই জনহিতার্থে বিস্তৃত হয়নি। রমানাথ জ্ঞাতে হোক, অজ্ঞাতে হোক, প্রবৃত্তির এই দূর্দমনীয় তাড়নার দ্বারা তাড়িত। ধনবান জমিদার শ্রীপতির আশ্রয় ও অনুকম্পা একদা তাকে অনুগৃহীতের মত গ্রহণ করতে হয়েছিল; এই অনুগ্রহ, অনুকম্পাকে সে অর্থবানের দাম্ভিক অভিব্যক্তি বলেই মনে করে। তার সমুচিত দণ্ডদানের কষ্টার্জিত সুযোগ সে হাতছাড়া করতে নারাজ।

শ্রীপতি জায়া অভিজাত জমিদার-গৃহিনী সারদেশ্বরী শ্রীপতি ও রমানাথের সংঘর্ষের মধ্যবিন্দুতে অবতীর্ণ হয়ে পরিস্থিতিকে অনাবশ্যক জটিল করে তুলেছেন। কূট কৌশলী জীবনের সহায়তায় রমানাথের পুত্রবধূ ললিতার অজ্ঞাত অতীতে মিথ্যা কলঙ্কের কালি লেপন করে, সারদেশ্বরী রমানাথের অবাধ্যতার শাস্তি বিধানে এগিয়ে এসেছেন। রমানাথকে

জব্দ করার এ হেন নিলর্জ্জ রুচিহীন, নীচ প্রচেষ্টা নিঃসন্দেহে সারদেশ্বরীর চরিত্রেই কলঙ্কিত করেছে। এই জঘন্য প্রবৃত্তি তার আভিজাত্যের অহংকার, বংশ মর্যাদা, শিক্ষা দীক্ষার দাবীকে একেবারে নস্যাৎ করে দিয়ে, তাকে দাঁড় করিয়েছে নিম্নশ্রেণীর বিকারগ্রস্থ, কুরুচিপূর্ণ মানুষের শ্রেণীতে। কুৎসা রটনা আর অপপ্রচার, মনস্তত্ত্বের ভাষায় বিকারগ্রস্ত মানসিকতার লক্ষণ -সারদেশ্বরীকে এই অভিযোগ থেকে অব্যাহতি দেওয়া যায় না।

আবার সারদেশ্বরী ও জীবনের যৌথ উদ্যোগে ললিতার বিরুদ্ধে রটিত কুৎসার বিষয়টিও অস্পষ্ট—এ হেন অপপ্রচারে ললিতার প্রতিবাদহীন অতি-ভীতি ও অতি-শঙ্কার তো কোন কারণ দেখি না। রমানাথের মত ব্যক্তিত্ব এইরকম একটি ভোঁতা অস্ত্রে এতখানি কাবু হলেন কেন, তাও বোঝা মুশকিল। বিশেষত জীবনের চরিত্র-প্রকৃতি এদের কারুরই অজ্ঞাত নয় এবং এই রটনার ব্যাপারে তার অত্যুৎসাহ কোন ভাবেই গোপন থাকেনি। কিন্তু ললিতা বা রমানাথের দিক থেকে তার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ তীব্রতর হয়ে উঠল না; ঘটনার কাছে এদের অসহায় আত্মসমর্পণ অবশ্যই নাট্যকৌশলগত ত্রুটি। বরং গোঁয়ার গোবিন্দ অপদার্থ খগেনের ঘটনার আকস্মিকতায় স্ত্রী পরিত্যাগের হঠাৎ সংকল্প তার চরিত্রের সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ। সমবেদনা, সহমর্মিতা, যেটুকু দেখা গেছে তা কেবল নগেনের মধ্যে; তবে বাক সর্বস্ব বাচাল নগেনের স্বভাবগুণে তার এই মহত্ব কিঞ্চিৎ যেন লঘু হয়ে পড়েছে।

নাটকের শেষ পর্বটি বড় বেশি ত্রুটিপূর্ণ। নগেনের সঙ্গে মেয়ে চন্দ্রার মেলামেশায় তীব্র আপত্তি সত্ত্বেও শ্রীপতি এবং সারদেশ্বরী, গৃহত্যাগী নগেনের হাতে চন্দ্রাকে সমর্পণ করতে ঠিক কি কারণে উৎসাহিত হয়ে উঠলেন তা বোঝা গেল না। যে মুদি রমানাথকে স্বপংক্তিতে বসতে দিতে তারা চিরকালই নারাজ, যে ঘরের বধূরূপে মেয়েকে তারা কল্পনাও করতে পারতেন না—কোন মায়ামন্ত্রে তারা হৃদয়ের এই দৈন্য থেকে মুক্ত হলেন, তার সূত্র নির্ধারণ দুরূহ। আরও বিস্ময়কর, শত্রুকন্যা ললিতাকে সারদেশ্বরীর আপন কন্যা রূপে স্নেহপূর্ণ স্বীকৃতি। ললিতার প্রতি সারদেশ্বরীর এতখানি অনুকম্পা কোন মতেই বিশ্বাসযোগ্য হয়ে ওঠেনি। কাহিনী বিশ্লেষণে নাটকের অনুরূপ নামকরণের স্বপক্ষেও কোন যুক্তি খুঁজে পাওয়া যায় না।

॥ কুহকিনী ॥

বিধায়ক ভট্টচার্যের নতুন স্বাদের সামাজিক নাটক 'কুহকিনী', 'মিনার্ভা' থিয়েটারে প্রথম আত্মপ্রকাশ করে ১৯৪১-র ২২শে ফেব্রুয়ারী। ১৯৪০-এ গঠিত 'মিনার্ভা লিমিটেড কোম্পানী' চরম আর্থিক দুরবস্থা কাটিয়ে উঠতে পরবর্তী বছরগুলিতে সামাজিক সমস্যা মূলক নাটক অভিনয়ের দিকেই বিশেষভাবে নজর দেয়। এই রকম পরিস্থিতিতে অভিনীত সামাজিক নাটকগুলির মধ্যে 'কুহকিনী' বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য এবং কোম্পানীর সফল প্রচেষ্টাগুলির মধ্যে এটি অগ্রগণ্য। প্রথম অভিনয় রজনীতে কোম্পানীর প্রথিতযশা অভিনেতৃবর্গের অনেকেই অংশ গ্রহণ করেছিলেন। যথা ঃ—জয়ন্তকুমার—শরৎচন্দ্র

চট্টোপাধ্যায়; সুন্দর শিবকালী চট্টোপাধ্যায়; বিপ্রদেব– সুশীল ঘোষ; সোমদেব –প্রফুল্ল দাস; অজয় কুমার গোপাল চট্টোপাধ্যায়; কুশল কুমার– সন্তোষ বন্দ্যোপাধ্যায়; দেবতোষ - মিষ্টার রোজারিও (এ্যাঃ); সোমেন পরেশ চন্দ্র চট্টোপাধ্যায়; বরুণ--অমৃতলাল রায়; নীলমাধব জীবন মুখোপাধ্যায়; বজ্রসেন--দুর্গাদাস সান্যাল; ঘোষক- তুলসী পাল; প্রতিহারি অজয় দাস; রাণী রত্না শেফালিকা (পুতুল); শীলা--হরিমতী; সুমিত্রা অপর্ণা দাস; রেবা -রেণুকা; মাধবী- গীতাদেবী এবং সৈন্যগণ, পৌরজন ও নর্তকীগণ।

'কুহকিনী' ভিন্নতর আঙ্গিকে রচিত সামাজিক নাটক। এই নাটকে সমস্যার লীলাভূমি প্রকৃতপক্ষে প্রবৃত্তি তাড়িত মানুষের মনোজগৎ। বহিরঙ্গ আখ্যানের মধ্যে দিয়ে মানব মনের দ্বন্দ্ব বিক্ষুব্দ পটভূমির চিত্র উদঘাটিত হয়েছে এই নাটকে। 'কুহকিনী' নিছক আখ্যান সর্বস্ব নাটক নয়, বরং একে বলা যেতে পারে মনস্তত্ত্বমূলক নাটক। রূপের মোহ মানুষের মনুষ্যত্ববোধকে আচ্ছন্ন করে ফেলে। দুর্গম প্রবৃত্তির তাড়নায় রূপতৃষ্ণ মানুষ কামনার অলঙ্ঘ্য চক্রব্যূহে অসহায় অভিমন্যুর মতই অনুপ্রবেশ করে; কিন্তু সেখান থেকে নির্গমনের পথ তারা অজানা। জয়ন্তকুমার, কুশল, সোমেন, দেবতোষ কিম্বা বরুণ জ্ঞানে হোক অজ্ঞানে হোক মদিরামত্তের ন্যায় কুহকিনী রাণী রত্নার ব্যূহ মধ্যে প্রবেশ করেছিল। রূপের মোহ তাদের দৃষ্টিকে করেছিল অন্ধ, নির্গমনেব পথকে করেছিল দুর্গম, সদিচ্ছাকে করেছিল বিভ্রান্ত আত্ম প্রত্যয়কে করেছিল পরাহত। এ হেন অবস্থায় তাদের জন্যে স্থান নির্দিষ্ট ছিল কেবল রত্নার পশুশালায়। এ পশুশালা তো অন্য কিছু নয় দুর্জ্ঞেয় রহস্যে ঘেরা মানব হৃদয়ের গভীরে বিচার বুদ্ধিহীন, হতচকিত, মনুষ্য নামধারী জীবের বিচরণ ভূমি। সেখান থেকে প্রত্যাবর্তন প্রায় অসম্ভব; কেননা রূপাসক্তির পর্বত প্রমাণ প্রতিরোধ অতিক্রমের ক্ষমতা সীমিত শক্তি মনুষ্যের আয়ত্বের বাইরে। কেবল শাশ্বত প্রেম চেতনায় উত্তীর্ণ বিরল শক্তিধর পুরুষই তাকে অতিক্রম করতে পারে। আর সেই শক্তিমানের সংস্পর্শে কুহকিনী নারীর কুহক জালও জাগতিক কল্যাণবোধে উজ্জীবিত হয়ে ওঠে। জয়ন্তকুমার এই শক্তির অধিকারী বলেই কুহক রাজ্যের গোপন নির্গমন পথটিকে শেষ পর্যন্ত খুঁজে পেয়েছে। কুহকিনী নারী রত্নাও তার নারী প্রকৃতিগত কুহক মন্ত্রের চপল লীলা বিলাস থেকে মুক্ত হয়ে কাঙ্ক্ষিত শক্তির কাছে আত্মসমর্পণে প্রস্তুত হয়ে উঠেছে। কিন্তু কুশল, সোমেন, দেবতোষ কিম্বা বরুণ নারীর বাঞ্ছিত শক্তি পরীক্ষায় কাঙ্ক্ষিত নির্ভরতা প্রদর্শনে অসমর্থ- অতএব মুক্তির পথ অনাবিষ্কৃতই থেকে গেছে তাদের কাছে।

নারী মাত্রই কুহকিনী—কুহক-বিদ্যা তার মজ্জাগত; তারই চেতনার গভীরে অনাদিকালের বিপ্রদেব লোক সম্মোহনী কুহক বিদ্যার অনুশীলনে সদা নিমগ্ন। তার জীবন-সাধনার পর্বে পর্বে এই কুহকবৃত্তি, ঐন্দ্রজালিক মায়া বিস্তার করে পৌরুষের শক্তি পরীক্ষায় নিজেকে সদা ব্যাপৃত রাখে। ব্যর্থকাম পৌরুষের অসহায় আর্তনাদ তার চিত্তকে তৃপ্ত করে। এই বৃত্তির তাড়নায় তাড়িত অন্তর-বিপ্রের ক্রীড়ানক মাত্র রত্না কিম্বা শীলা তাদেব অনিবার্য ক্রিয়ায় রত। কিন্তু নারী কেবল পৌরুষ হরণ নয়, বলিষ্ঠ পৌরুষের আশ্রয়ও

প্রত্যাশা করে। তার প্রকৃতির মধ্যেই আত্মনিবেদনের এক সুপ্ত বাসনা উন্মুখ আগ্রহে সদা অপেক্ষমান! বিজয় গৌরবের বাহ্যিক আড়ম্বরে তার চিত্ত পরিপূর্ণতা খুঁজে পায়না. বিজিতের বিনম্র মর্যাদায় সে আসীন হতে চায়। কুহকিনী রত্না জয়ন্তকুমারের পূর্বে পৌরুষের এমন অপরাজেয় শক্তিকে প্রত্যক্ষ করেনি; ঘৃণা আর উপেক্ষার এমন বজ্র কঠিন প্রত্যাঘাতও তার অপ্রাপ্ত ছিল। বিপ্রদেবের অঙ্গুলি হেলনে এতকাল সে মিথ্যারাণীর আসন অলঙ্কৃত করে এসেছে। কিন্তু জয়ন্তকুমারের সংস্পর্শে ভ্রান্ত ঐশ্বর্যের মোহমুক্ত রত্না; তাই বিপ্রদেবের রক্তচক্ষুকে উপেক্ষা করে অজয় কুমার ও মন্ত্রীকে তার মুক্তি প্রদান, জয়ন্তকুমারকে নির্ভর করে তার নব জীবনের যাত্রা শুরু।

বিপ্রদেব নারীর চেতনার গভীরে কুহক বিদ্যার আদি গুরু। নারীর অন্তর রাজ্যে এই গুপ্ত বিদ্যার অনুশীলন প্রবহমান কাল ধরে ক্রিয়াশীল তাই তিনি অজর, অমর, অক্ষয়। কেবলমাত্র নির্মোহ প্রেমের দুর্জয় আঘাতেই বিপ্রদেবের অভ্রভেদী প্রতিরোধ ভেঙ্গে পড়তে পারে, অন্যথায় নয়। রত্নাকে মধ্যমণি করে তিনি প্রেমহীন সাম্রাজ্যের অধীশ্বর হয়ে বসে ছিলেন। তাঁর প্রচারিত তন্ত্রে প্রেম হৃদয় দৌর্বল্য মাত্র, অতএব পরিত্যাজ্য। জয়ন্তকুমারের আবির্ভাবে তাঁরই ভাবশিষ্য রত্নার মনোজগতে দেখা দিয়েছে প্লাবন - শঙ্কিত হয়ে উঠেছেন বিপ্রদেব। সেই শঙ্কারই বহিঃপ্রকাশ তাঁর কঠোর নির্মমতায়। এতকাল ধরে যে গুপ্ত বিদ্যার অনুশীলনে এখানকার প্রতিটি নারীকে তিনি সযত্নে গড়ে তুলেছিলেন, চূড়ান্ত পরীক্ষার মুহূর্তে তা যে এভাবে এত সহজে ভেঙ্গে পড়বে তা তিনি কল্পনাও করেননি। অধীত শক্তির এই অন্তঃসারশূন্যতা ভেতরে ভেতরে বিচলিত করে তুলেছে বিপ্রদেবকে। বিপ্রদেব বুঝতে পেরেছিলেন তাঁর তন্ত্রের মধ্যেই আছে অপূর্ণতা; বিধি নিষেধের নিরেট আবরণে, শত অনুশীলনেও তাকে সত্য করে তোলা যায়নি। জয়ন্তকে মুক্তি দিয়ে আপোস রফার তাই তাঁর অন্তিম প্রচেষ্টা। বিপ্রদেবের মধ্যেও আছে দ্বিধা- -যে লক্ষ্যকে সামনে রেখে তাঁর সমুদয় কর্ম প্রবাহ পরিকল্পিত, সেই লক্ষ্য স্বয়ং তাঁরই কাছে সন্দেহের উর্ধে নয়; নচেৎ রত্নাকে চরম দণ্ড দিতে গিয়ে তাঁর চিত্ত বিভ্রান্ত হবে কেন?

রবীন্দ্রনাথের বিসর্জন নাটকের রঘুপতি চরিত্রটির সঙ্গে বিপ্রদেবের চরিত্রগত কিছু সাদৃশ্য আছে। রঘুপতি অর্থহীন অন্ধসংস্কার এবং মিথ্যা ধর্মবোধের উপাসক— অনুগত জয়সিংহকে তিনি সেই মন্ত্রেই দীক্ষিত করে তুলেছিলেন। পরিশেষে জয়সিংহের আত্মবলিদানে ভ্রান্ত ধর্মবোধ এবং অন্ধ সংস্কারের মোহ থেকে তিনি মুক্তি লাভ করেছেন। আর বিপ্রদেব প্রেমহীন পাশববৃত্তির উপাসক--তাঁর সাম্রাজ্যে প্রেম নামক চিত্ত-দুর্বলতার কোন স্থান নেই, বরং তা দণ্ডনীয় অপরাধ। রত্না, শীলা প্রমুখ নারীর হৃদয় মন্দির তাঁর শক্তির লীলাক্ষেত্র। প্রেমের দুর্বলতাকে কাটিয়ে উঠতে সেখানে তাঁর শক্তিপূজার আয়োজন। কিন্তু জগতের অকল্যাণ চিন্তায় এবং আত্ম অহংকারের নিমিত্ত তাঁর এই আয়োজন বলে মহাশক্তির কৃপালাভে তিনি ব্যর্থ। মহাকালীর হাত থেকে খড়্গের পতন বিপ্রদেবের চরম-পরিণতির ইঙ্গিত বহন করছে। শেষ পর্যন্ত প্রেমের শক্তির কাছে বিপ্রদেব পরাজিত— তাঁর মৃত্যুতে কুহক-মুক্ত মানুষের পশুত্ব থেকে মুক্তিলাভ।

॥ ভারতবর্ষ ॥

'নাট্যনিকেতনের' শেষ পর্বে অভিনীত নাটকগুলির মধ্যে শচীন্দ্রনাথ সেনগুপ্তের যুগচেতনার 'বার্তাবহ' নাটক ভারতবর্ষ নরেশচন্দ্র মিত্রের পরিচালনায় এবং সুধীর চন্দ্র গুহের প্রযোজনায় ১৯৪১ র ৯ই এপ্রিল আত্মপ্রকাশ করে। সামাজিক নাটক হিসাবে 'ভারতবর্ষ' নিঃসন্দেহে শচীন্দ্রনাথ সেনগুপ্তের প্রথম শ্রেণীর নাটকগুলির মধ্যে অন্যতম।[১৪] নাটকটি সে সময়ে যথেষ্ট সমাদৃত হয়েছিল। কিন্তু 'নাট্যনিকেতনের' তখন এমনই অচলাবস্থা যে, এমন একটা উৎকৃষ্ট নাটক হাতে পেয়েও তারা আভ্যন্তরীণ সঙ্কট কাটিয়ে উঠতে পারেনি। 'ভারতবর্ষ' মঞ্চায়নে বলিষ্ঠ অভিনেতা অভিনেত্রীরও অভাব ঘটেনি। প্রথম অভিনয়ের চরিত্রলিপির দিকে দৃষ্টি দিলে তা সহজেই বোঝা যায় যেমন ঃ ভারতচন্দ্র নরেশচন্দ্র মিত্র; সুবোধ ছবি বিশ্বাস; বিনয় শৈলেন চৌধুরী; পরেশ রবি রায়; ব্যানার্জী জিতেন গাঙ্গুলী; রায় সূর্য সেন; মলিনা ছায়া দেবী; বিজলী রাধারাণী; অমিয়া উষারাণী; লতিকা বীণাপাণি; সুরেশ চৌধুরী সংগীত ও সুরে এবং সত্যেন রায় চৌধুরী দৃশ্যপট নির্মাণে ভারপ্রাপ্ত ছিলেন; নৃত্য পরিকল্পনায় ছিলেন নীহারবালা।

স্বাধীনতাই মানুষের জীবনের শ্রেষ্ঠ সম্পদ; ব্যক্তি, সমাজ, জাতি বা দেশ যে কোন ক্ষেত্রেই আজকের যুগের মূল কথা Freedom first Freedom last Freedom always' কিন্তু মুশকিল হচ্ছে এই যে, স্বাধীনতা কথাটির অর্থ সকলের কাছে স্পষ্ট নয় এবং তদপেক্ষাও নির্মম সত্য, স্বাধীনতা প্রত্যাশী আমরা সবাই অপরের স্বাধীনতা হরণে বিন্দুমাত্র কুণ্ঠিত নই। অবস্থাপন্ন গৃহস্থ ভারতচন্দ্রের পারিবারিক জীবনকে কেন্দ্র করে এই মৌলিক তত্ত্ব নির্ভর নাটকটি রচিত হয়েছে। ব্যক্তি স্বাধীনতা বনাম সামাজিক সম্পর্ক এখানে সঙ্কটের মুখোমুখি হয়ে সংঘর্ষে লিপ্ত। দেশাত্মবোধের ছিটেফোঁটাও এ নাটকে নেই। বরং যুদ্ধ এবং তজ্জনিত উদ্ভূত পরিস্থিতিতে গড়ে ওঠা নবযুগের জীবনবোধের প্রেরণায়, ব্যক্তির সঙ্গে তার সমাজ পরিবারের সম্পর্কের নব মূল্যায়ন অনুশীলিত এই নাটকে।

পুত্র গর্বে গর্বিত ভারতচন্দ্র বিপন্ন মানুষের মুক্তিদাতার আসনে প্রতিষ্ঠিত করে রেখেছেন একমাত্র পুত্র সুবোধকে। প্রবাসী সন্তানের সাফল্যের সম্ভাবনায় নিশ্চিত তার পিতৃ হৃদয় বিশ্বজয়ী পুত্রের গৌরবময় স্বদেশ প্রত্যাবর্তনের স্বপ্নে বিভোর। সুবোধ তো শুধু তার গর্ব নয় সে যে সমগ্র ভারতবাসীর গর্ব, মানব জাতির গর্ব মৃত্যুময় পৃথিবীর মানুষ তারই প্রদত্ত অমরত্বের বর লাভে উন্মুখ প্রতীক্ষারত। এই নিশ্চিত প্রত্যয় প্রতিধ্বনিত ভারতচন্দ্রের অহংকারে *"I have given my very best to those who are fighting for freedom and democracy."* পুত্রবধূ মলিনার প্রতি তার নির্ভরতা, পক্ষপাতিত্বের উৎস প্রবাসী সন্তান সুবোধ; মলিনাকে উপলক্ষ করে ভারতচন্দ্রের সন্তান বাৎসল্য সুবোধের প্রতি ধাবিত।

---

[১৪] কোন কোন নাট্য সমালোচক এই নাটকটিকে দেশাত্মবোধক নাটক হিসাবে গণ্য করেছেন ('বাংলা নাট্য সাহিত্যের ইতিহাস', ২য় খণ্ড, পৃঃ ৪৮৭ আশুতোষ ভট্টাচার্য)। কিন্তু 'ভারতবর্ষ' দেশাত্মবোধক নয়, সামাজিক নাটক। এ বিষয়ে কোন প্রকার সন্দেহের অবকাশ মাত্র নেই।

আর এই নিয়েই কন্যা অমিয়ার সঙ্গে তার বিরোধ বিরোধ প্রিয় বন্ধু পরেশের সঙ্গে। স্বাধীনতা বা গণতন্ত্র রক্ষার ব্রতে তার প্রবাস জীবনের দুঃখ বরণ নয় জনৈকা আইভি হিল নামক বিদেশীনি মহিলার উষ্ণ সান্নিধ্যই যে তার যথার্থ হেতু. পরেশের এই স্পষ্টবাদ তাকে ক্রুদ্ধ করে তোলে সেই সঙ্গে আশঙ্কিতও। মোহভঙ্গ ভারতচন্দ্র একদিন সত্যিই প্রত্যক্ষ করে ক্র্যাচে ভর দিয়ে আহত পরাজিত পুত্রের গৃহপ্রবেশ। অপ্রত্যাশিত ঘটনার কঠিন বাস্তবতা চুরমার করে দেয় ভারতচন্দ্রের স্বাধীনতা এবং গণতন্ত্র প্রীতি। তার বহিঃপ্রকাশ ঘটে মলিনার প্রতি অকারণ দুর্ব্যহারে। এমনকি আইভি হিলের বিকল্প নারী রূপে বিজলী বাঈএর প্রতি সুবোধের লালসা. মলিনার অক্ষমতা রূপেই প্রতিপন্ন হয়ে ওঠে তার চোখে। বিপথগামী স্বামীকে রূপবতী স্ত্রীর গৃহ বন্ধনে বন্দী করতে ব্যর্থতার সনাতন অভিযোগে অভিযুক্ত হতে হয় মলিনাকে। পুত্র স্নেহে অন্ধ ভারতচন্দ্র. দুর্যোধনের জনক ধৃতরাষ্ট্রের আধুনিক সংস্করণ। সুবোধের অধঃপতন ভারতচন্দ্রেরই অন্ধ প্রশ্রয়জাত। স্বাধীনতা কিম্বা গণতান্ত্রিক অধিকার সম্বন্ধে ভারতচন্দ্রের বোধও ব্যক্তি বিশেষে ভিন্ন. আপেক্ষিক। পুত্র সুবোধের মতই কন্যার স্বৈরাচারে তিনি নীরব; অথচ পুত্রবধূর সংযমে তার সতর্ক দৃষ্টি. জামাতা বিনয় পুরোপুরি অনিচ্ছায় তার গৃহপালিত ঘর জামাই তাতে তিনি পরম নিশ্চিন্ত।

সুবোধের কর্ম জগৎ নিয়ে সংশয়েব কোন হেতু নেই মানবতার স্বার্থে সে প্রবাসে explosive নিয়ে গবেষণারত। যুদ্ধ নামক মরণযজ্ঞে বলি প্রদত্ত অসহায় মানুষের মুক্তির স্বপ্ন নিয়ে সে বিদেশে পাড়ি জমিয়েছিল। কিন্তু প্রাচ্য সমাজধর্মে আজন্ম লালিত সুবোধ সে দেশে নারী স্বাধীনতার দৌলতে বহু নারীব সঙ্গ লাভে উদ্ভ্রান্ত এবং পরিশেষে আদর্শভ্রষ্ট। তাব বিশ্বমানব মুক্তিব রঙিন স্বপ্ন জনৈকা আইভি হিলের পদপ্রান্তে এসে কর্পূরের মত উবে গিয়ে আত্মমুক্তির তীব্র বাসনায় পর্যবসিত। এই মুক্তি খুব একটা অসম্ভব ছিল না মলিনাও সেখানে কোন বড় বাধা নয় বাধ সাধলো কেবল বিস্ফোরণে তার অঙ্গ বিকৃতি। তাই আহত, ক্ষত বিক্ষত শরীরে তার স্বদেশে প্রত্যাবর্তন। দেশে সে ফিরলো বটে. কিন্তু মন পড়ে বইল সে দেশে। তাব অসংযত বিকৃত চিত্ত স্বাধীনতা অর্থে স্বেচ্ছাচারিতাকে বুঝেছিল. তাই আইভ হিলের বিকল্প খুঁজে পেল বিজলীর মধ্যে। যে পুরুষ নিজ স্ত্রী ছাড়া কেবল অন্য নারীতে মহত্ত্বেব সন্ধান পায়. তাকে মানসিক রোগী হিসাবেই গণ্য করতে হবে; তার মুখে নারী স্বাধীনতার কথাটা যতটা অবিশ্বাস্য, ততটাই বেমানান। মলিনা ঠিকই বুঝেছিল নারীকে সম্মান দেখাতে যারা বড় বেশি ব্যস্ত. অসম্মান করতেও তাদের বেশি সময় লাগে না। সুবোধ তাদেরই একজন।

ভারতচন্দ্র সুবোধের মত কন্যা অমিয়ার প্রতিও স্নেহে অন্ধ। ভারতচন্দ্রের অন্ধ প্রশ্রয়ে গড়ে ওঠা তার জীবনবোধে সংযমের কোন বালাই নেই। ভারতীয় ঐতিহ্য, শিক্ষা, সংস্কৃতি, এ সবের বিরুদ্ধেই তার বিদ্রোহ; তার বিরুদ্ধাচবণকেই সে নারী স্বাধীনতা, নারী প্রগতি বলে ভাবতে অভ্যস্থ। সংস্কারকে ভাঙ্গতে তার স্বামীসহ পিতৃগৃহে অবস্থান। উপরি বিপুল অর্থ সম্পত্তি এককভাবে সুবোধকে ছেড়ে দিতে সে রাজী নয়-- তাতে ভ্রাতৃজায়া

মলিনার সঙ্গে প্রতিযোগিতায় ওকে অনেক পিছিয়ে পড়তে হয়। অর্থই যে পরমার্থের মূল একালের নব্য ভাবাদর্শে বিশ্বাসী অমিয়া তা নিশ্চিত রূপে জানে। বিনয় তার স্বামী, শ্বশুরের ঘর-জামাই, মদ্যম অপদার্থ--তার ওপরে নির্ভর করা অপেক্ষা পিতার প্রতি আস্থাশীল থাকাই শ্রেয়। যে গাছ ছায়া দিতে সক্ষম তার নীচে আশ্রয় নেওয়াই তো বুদ্ধিমানের কাজ। বিনয়ের প্রতি অনাস্থা এবং মলিনার প্রতি অকারণ ঈর্ষা তার মস্তিষ্কে উভয়কে জড়িয়ে অবৈধ সম্পর্কের কল্পনা, তাকে উন্মাদ করে তোলে। যে মানুষ ভেতরে ভেতরে অত্যন্ত অক্ষম, নিজেকে বড় করতে গিয়ে অপরকে ছোট না করলে তার উপায় থাকে না। নিঃসন্দেহে বিনয় ঘর জামাই, মদ্যপ, কর্মহীন। কিন্তু তার এ অবস্থার জন্যে তাকে দায়ী করা চলে না। ধনী পিতার বিলাস বাহুল্য ছেড়ে বিনয়ের জয়রামবাটীর সাদামাটা ঘরে অমিয়া স্থিতু হতে চায়নি। পিতার উৎসাহে এবং নিজের অন্যায় জেদে সে বিনয়কে শ্বশুরের অন্নে প্রতিপালিত হতে বাধ্য করেছে। অবশেষে মি ব্যানার্জীর কুপ্রস্তাবে আধুনিকতার মোহভঙ্গ অমিয়া তার ভ্রান্ত জীবন দর্শন থেকে মুক্তির পথ খুঁজে পেয়েছে--তাকে সহায়তা করেছে বিজলীর সান্নিধ্য।

এই নাটকে প্রতিবাদী চরিত্র মলিনা, পরেশ এবং বিজলী। মলিনা সুবোধের স্ত্রী—স্বামী, শ্বশুর ও সংসারের প্রতি কর্তব্য পরায়ণ। স্বামীর অধঃপতনে মর্মাহত মলিনার বিপথগামী স্বামীকে ফেরাতে চেষ্টার অন্ত নেই। নিজের জন্যে কোন কিছুই দাবী করেনি সে; শুধু সুবোধকে তার সেবাধর্মের ব্রতে পুনরায় সংস্থাপনের জন্যে তাকে ভারতচন্দ্র, বিজলী, অমিয়া, এমন কি সুবোধের বিরুদ্ধে নিরলস সংগ্রাম চালিয়ে যেতে হয়েছে। সংসার তার প্রচেষ্টার মূল্য দেয়নি। বরং অন্যায় অপবাদে তার প্রচেষ্টাকে খাটো করতে চেয়েছে স্বার্থপর সংসার। তার বিরুদ্ধে প্রতিবাদে সোচ্চার মলিনা। মূল্যবোধহীন এই সংসার থেকে মুক্তির পথ সে খুঁজে পেয়েছিল বিশ্ব মানবের সেবায় উদ্বুদ্ধ হয়ে কিন্তু অন্তিম মুহূর্তে অসুস্থ শ্বশুরের ব্যাকুল আহ্বানে সে আবার ফিরে আসে সংসারের টানে—নিশ্চিত প্রত্যয়ে উপলব্ধি করে এইতো তার সেবার মহাতীর্থ। তার প্রত্যাবর্তন অনুপ্রাণিত করে সুবোধকেও।

সর্বাপেক্ষা আকর্ষণীয় চরিত্র বিজলী। বিজলী পেশায় বাঈজি। ভারতচন্দ্রের পরিবারের সঙ্গে তার সম্পর্ক ঘনিষ্ঠ। এই পরিবারের সুখ-দুঃখের সঙ্গে জড়িয়ে গেছে তার ভাগ্য। সংসারের বিচারে পতিতা এই নারীর সব থেকে বড় দুঃখ তার যৌবন, অর্থ, বিত্তের প্রত্যাশী সবাই কিন্তু তার হৃদয়ের কোন মূল্য নেই তাদের কাছে। চিত্তদানের ভান করে যারা তার সান্নিধ্য কামনা করে, তাদের বিত্ত গ্রহণে তাই সে তৎপর। তবু স্বাধীনতার মূল্য তার মত করে আর কেউ বোধ হয় উপলব্ধি করেনি। ভারতচন্দ্রের আত্মপক্ষ সমর্থনের ব্যর্থ চেষ্টাকে বিজলী তার যুক্তির আঘাতে ছিন্ন ভিন্ন করে দিয়েছে। বাক সর্বস্ব এই জাতি স্বাধীনতার মূল্য হৃদয় দিয়ে অনুভব করতে পারেনি—নইলে নারীর প্রতি তার এত ঔদাসীন্য কেন? কেনই বা তার কন্যা ও পুত্রবধূর প্রতি আচরণে বৈষম্য? জাতীয় জীবনে পরাধীনতার কারণ হিসাবে সে চিহ্নিত করেছে এই দীনতার লজ্জাকে। মনের দিক থেকে

সমস্ত তুচ্ছ সংস্কার মুক্ত বলেই বিজলী কাল ভৈরবের আহ্বান শুনতে পেয়েছে। মহাকালের মহাযজ্ঞে অংশ নিতে তাই সে তার সমস্ত সম্পত্তি আর্তের সেবায় দান করে নির্দ্বিধায় বেড়িয়ে পড়তে পেরেছে। বিজলীর মত ভারতচন্দ্রের পক্ষপাতমূলক আচরণের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়িয়েছে তার অভিন্ন-হৃদয় বন্ধু পরেশ। পরেশের বন্ধুপ্রীতি তুলনাহীন, তার শুভাকাঙ্ক্ষা প্রশ্নাতীত।

॥ রক্তের ডাক ॥

রীতিমত সাড়া জাগানো নাটক বিধায়ক ভট্টাচার্যের 'রক্তের ডাক'। কি কাহিনী বিন্যাসে, কি অভিনয় নৈপুণ্যে সমকালীন বাংলা নাটকের ধারায় 'রক্তের ডাক' সাফল্যের চরমতম সীমায় সগর্বে প্রতিষ্ঠিত হতে পেরেছিল। ১৯৪১ র ১২ই জুলাই 'রঙমহল' থিয়েটারে আত্মপ্রকাশ করে, নিরবচ্ছিন্ন ভাবে পরিপূর্ণ প্রেক্ষাগৃহে দীর্ঘ রজনী অতিবাহিত করে এই নাটকটি। নাট্যরসিক দর্শকের কাছে এই নাটকের আবেদনের গভীরতা বোঝা যায় নিম্নোক্ত মন্তব্যে ঃ

"We have very much appreciated and enjoyed, the other day, Bidhayak's new social Drama 'Rakter Dak' on board the Rungmahal Theatre The diama has been a grand success having in it the elements of appreciation for the mass and the class."[১৫]

প্রখ্যাত অভিনেতা এবং পরিচালক দুর্গাদাস বন্দ্যোপাধ্যায়ের পরিচালনায়, যামিনী মিত্রের প্রযোজনায় এবং মনীন্দ্রনাথ দাসের মঞ্চকলার নৈপুণ্যে 'রক্তের ডাক' এই বিশিষ্টতা অর্জনে সমর্থ হয়। নিছক স্তাবকতা নয়, সত্যের খাতিরেই বলতে পারি ঃ

"As regards the direction of the drama, Durgadas Banerjee has left nothing to comment upon the technique new, the sets and dresses uptodate and modern."[১৬]

প্রসঙ্গত, আলোচ্য নাটকের প্রথম অভিনয় রজনীর শিল্পীবৃন্দের তালিকাটি এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন। যথা ঃ--শরৎ--কৃষ্ণধন মুখোপাধ্যায়; গণেশ--আশু বোস; শুভেশ--দুর্গাদাস বন্দ্যোপাধ্যায়; পিণাকী- শান্তি ভট্টাচার্য; অমিয়--নীতিশ মুখোপাধ্যায়; অবনী—জহর গাঙ্গুলী; বিকাশ—সলিল বন্দ্যোপাধ্যায়; হরিয়া--মনোরঞ্জন ভট্টাচার্য; পরাণ--গোপাল মুখোপাধ্যায়; অনাথ--জিতেন গাঙ্গুলী; গিরিধারী--বিপিন বসু; রাম সিং--নেপাল বসু; চাকর—যতীন দে; বেয়ারা—বীরেন দাস; বুলু (শতাব্দী)--সরযূবালা (পরে শান্তি গুপ্তা); বিরজা—গিরিবালা; বিনোদবালা--পদ্মাবতী; মিসেস মজুমদার—হরিমতি; নমিতা—শেফালিকা; রমা—রেণুকা রায়; রেবা লীনা দেবী; এছাড়া রূপলেখা ব্যানার্জী, বেলা, প্রতিভা, সহদেব গাঙ্গুলী এবং আরও অনেকে। নেপথ্য বিধানে যাঁরা উল্লেখযোগ্য তাঁরা হলেন—গীত রচনায় শৈলেন রায়, সুর সংযোজনায় তুলসী লাহিড়ী এবং আবহ

---

[১৫] 'The Amrita Bazar Patrika', 20th July, 1941

[১৬] 'The Amrita Bazar Patrika', 20th July, 1941

সঙ্গীতে অমিয় ভট্টাচার্য। দুর্দান্ত অভিনয়ের গুণে 'রক্তে ডাক' একটানা চল্লিশ রাত্রিরও বেশি অভিনীত হয়ে বিরল প্রায় দৃষ্টান্ত স্থাপন করে। এই নাটকের চমৎকার অভিনয় প্রসঙ্গে 'অমৃত বাজার পত্রিকা' র বিশ্লেষণ ধর্মী মন্তব্যের অংশ বিশেষ এখানে উদ্ধার করা যেতে পারে: পত্রিকার মতে : "Durgadas and Saraju, the hero and heroine of the drama have played their respective roles very creditably Monoranjan Babu in the role of Haria, a servant, was unique ----Nitish Mukherjee, Sm Sephalika, Harimati and Renuka Roy did their parts well "[১৭]

সংবাদপত্রের এই সব মন্তব্য থেকে যে কথাটা বের হয়ে আসে তা হল, একদিকে যুগোপযোগী কথাবস্তু এবং অন্যদিকে বলিষ্ঠ টিম ওয়ার্ক এই নাটকের সাফল্যের প্রধান হেতু।

'রক্তের ডাক' যুগ সন্ধিক্ষণের বার্তাবহ নাটক। যুক্তিহীন সংস্কারবদ্ধ অতীতচারিতা থেকে মুক্তির অন্বেষণে, নব্যতন্ত্রের ইহবাদ সর্বস্ব জীবন দর্শনে উপনীত দিশাহারা মানবযাত্রীর বেদনাতুর বাস্তব আলেখ্য নাট্যকার রচনা করেছেন। অতীত ঐতিহ্যের অন্ধ অনুশাসন, আধুনিক শিক্ষালব্ধ যুক্তিবাদের প্রবল ধাক্কায় এখানে ভেঙ্গে পড়েছে। যে সনাতন আদর্শের প্রশস্তি রচনায় আমরা অভ্যস্ত, তার রন্ধ্রে রন্ধ্রে বাসা বেঁধে থাকা হীনমন্যতা, অপপ্রচার, অকারণ সন্দেহ, কুৎসা রটনা, নারী চরিত্রে শ্রদ্ধাহীনতার মত অজস্র উৎকট ব্যাধি পল্লী নির্ভর সামাজিক জীবনে অবক্ষয়ের ইতিবৃত্ত রচনা করেছে ধীরে ধীরে, মন্থর গতিতে। তার হাত থেকে নিষ্কৃতির তাগিদ ছিল ছিলনা বিকল্পের ধারনা। উপায়হীনতার কারণেই তা নীরবে অনুসৃত হয়ে এসেছে। যুগক্রান্তি পর্বের নব্যতন্ত্রের মহামন্ত্রে দীক্ষিত মানুষ এতকালের অনাবিষ্কৃত বিকল্পের সন্ধান পেয়েছে। তাই সামাজিক অনুশাসনের রক্তচক্ষুকে অনায়াসে উপেক্ষা করে সে ঘর ছেড়ে পথে নামতে দ্বিধা করেনি। কিন্তু এই পথের শেষ তার অজানা, লক্ষ্য অনিশ্চিত- অনিশ্চয়তার যন্ত্রণাই তখন সত্য। এ যেন এক সংস্কারের দাসত্ব শৃঙ্খল থেকে আর এক গৌরবোজ্জ্বল দাসত্বের কাছে নিদারুণ আত্মসমর্পণ! চমৎকার লিখেছে অমৃতবাজার পত্রিকা :

"The subject matter and the theme of the drama is no doubt interesting having a back-ground of the old and wornot society of oppression and tyranny in contrast to the frivolity and evils of modern society with its ultimate beneful effects "[১৮]

বুলু পল্লী সমাজের ঐতিহ্যগত সংস্কারের অন্তঃসারশূন্যতাকে নির্মমভাবে প্রত্যক্ষ করেছিল তার ব্যক্তি জীবনে। বর্ণ কৌলীন্যের অর্থহীন অনুশাসন তার নির্মল শৈশবের, তার আত্মনিবেদিত কুমারীকালের প্রেমকে প্রতিহত করেছে। শুভেশকে আশ্রয় করে অঙ্কুরিত তার বাল্য প্রণয় যে স্বপ্নসৌধ নিরন্তর রচনা করে চলেছিল, বর্ণ বৈষম্যের

---

[১৭] 'The Amrita Bazar Patrika', 20th July, 1941

[১৮] 'The Amrita Bazar Patrika', 20th July, 1941

অজুহাতে সমাজ তাকে ছাড়পত্র দেয়নি। পরিবর্তে রুচিহীন, শিক্ষা-দীক্ষাহীন, নৈতিকতার বালাই বর্জিত শরতের সঙ্গে তার গাঁটছড়া বাঁধা হয়ে গেল পাকাপাকি ভাবে। শাশুড়ী-ননদের নির্যাতন, অপদার্থ স্বামীর নিত্য গঞ্জনাকে নীরবে সহ্য করেও বুলুর মত শিক্ষিতা নারী সংস্কারের গণ্ডী অতিক্রম করতে চায়নি। অবশেষে শুভেশ তার কাছে নিয়ে এল মুক্তির বার্তা। সীতা অতিক্রম করেছিল লক্ষ্মণের নিষেধের গণ্ডী—দশাননের বিস্তৃতিতে পরিব্যাপ্ত হয়েছিল সে; বুলু সামাজিক অনুশাসনের সীমানাকে অতিক্রম করে শতাব্দীর বিস্তৃতিতে মুক্তি পেতে চাইল। গ্রাম্য মেয়ে বুলুর শতাব্দীতে পরিণতির পশ্চাতে এই মুক্তি আকাঙ্ক্ষাই প্রবল। এমন কি সে শুভেশকেও অতিক্রম করতে নিজেকে প্রস্তুত করে তুলল। ইহবাদ সর্বস্ব সমাজ-দর্শনের অর্থকৌলীন্যের মন্ত্রে সে তখন দীক্ষিতা, ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্যবাদের মোহাঞ্জন তার দৃষ্টিতে।

বুলু কি তবে অন্তরে অন্তরে দ্বিধাগ্রস্ত? নইলে শুভেশের সঙ্গে তার মেরুকরণ হল না কেন? তার কারণ, নারীর কাছে প্রার্থিত পুরুষের বহুনারী গমন ক্ষমার অযোগ্য অপরাধ; প্রেমাস্পদকে সে পাঁচজনের সঙ্গে ভাগ করে নিতে পারে না -তার প্রকৃতিই তাকে বাধা দেয়। সুভেশ তার প্রথম যৌবনের ব্যর্থ প্রেমের দংশনের জ্বালায় নগরকেন্দ্রিক ভোগবাদের আবর্তে আকণ্ঠ নিমজ্জিত থেকে আত্মহননের পথ খুঁজছিল। ব্যভিচারের শতধারায় স্নাত তার ক্লান্ত চিত্তে বুলুর জন্যে আগ্রহ থাকলেও আত্মশুদ্ধির প্রস্তুতি ছিল না। প্রেমের এই বঞ্চনা বুলুর দৃষ্টি এড়াতে পারেনি। বুলুর ব্যর্থ বিবাহিত জীবনের সংস্কার এক্ষেত্রে কোন বাধা নয়; তা যদি হত, তবে শুভেশের হাত ধরে সে নগর কলকাতার পথে পা বাড়াতে পারত না।

শরৎ, বিরজা কিম্বা বিনির শক্তি অপেক্ষাকৃত দুর্বল। সামাজিক সংস্কারের মূর্তিমান বিগ্রহ গণেশের নির্দেশ অমান্য করবার শক্তি তাদের নেই। কিম্বা বৃহত্তর সমাজে আত্মপ্রতিষ্ঠার মত উপকরণেরও অভাব তাদের। বুলুর সঙ্গে তুলনায় তারা যে নিতান্তই উপেক্ষণীয়, এ সত্য তাদের অনেক বেশি করে জানা। তাই বধূ নির্যাতন, কুৎসা রটনা আর উৎকট গ্রাম্যতার মধ্যেই তারা আত্মগোপনে সচেষ্ট। জগতে যার কিছুই দেবার নেই, পরনিন্দা-পরচর্চার মধ্যেই সে জীবনের আস্বাদন খুঁজে পেতে চায়। তাদের এই করুণ অবস্থা থেকে নির্গমনের পথ করে দিয়েছিল দারিদ্র। তাই সর্বস্ব খুইয়ে বহু আলোচিতা গৃহবধূ বুলুর কাছেই তারা আশ্রয়ের সন্ধানে ছুটে গেছে।

এই নাটকে অপ্রধান চরিত্রগুলি নাটকের মূল ভাবটিকে অক্ষুণ্ন রাখতেই রঙ্গমঞ্চে উপস্থিত। এ সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা নিষ্প্রয়োজন। নাটকের সংলাপ যথেষ্ট সাবলীল। সংগীত মোটামুটিভাবে ঘটনা ও কাহিনী বিন্যাসের পরিপূরক।

॥ প্লাবন ॥

কথাসাহিত্যের প্রতিষ্ঠিত লেখক মনোজ বসুর 'প্লাবন' ১৯৪১-র ২৪শে জুলাই 'নাট্যভারতী' রঙ্গমঞ্চে রতীন বন্দ্যোপাধ্যায় এবং সন্তোষ সিংহের যৌথ পরিচালনায়

প্রথম মঞ্চস্থ হয়। তবে প্রকৃত অর্থে নাটকটি সুষ্ঠুভাবে পরিচালনার কৃতিত্ব নটসূর্য অহীন্দ্র চৌধুরীর। কিন্তু প্রচার বিমুখ এই মানুষটি প্রচারপত্রে পরিচালক হিসাবে তাঁর নাম ছাপাবার অনুমতি দেননি বলে তা উল্লিখিত হয়নি।[১৯] মনোজ বসুর প্রথম নাটক এই 'প্লাবন' মঞ্চায়নের পশ্চাতে একটি ছোট ইতিহাস আছে। 'প্লাবন' রচনা শেষ করে নাট্যকার 'বন্ধু', যশোদানারায়ণ (নাকি নন্দন?) ঘোষ এবং নলিনী কুমার বসুকে তা পড়ে শোনান। এঁদের উদ্যোগে নটসূর্য অহীন্দ্র চৌধুরীর বাড়িতে নাটকটি আবার পাঠের বন্দোবস্ত হয়। সেখানে নটসূর্য, 'প্লাবন' 'নাট্যভারতীতে' অভিনয়ের জন্য অনুমোদন করেন এবং অক্লান্ত পরিশ্রম করে অভিনয়ের পূর্ব প্রস্তুতি সম্পূর্ণ করেন। তাঁকে সর্বতোভাবে সাহায্য করেন রতীন বন্দ্যোপাধ্যায় এবং সন্তোষ সিংহ। মঞ্চ প্রকরণে মঞ্চের জাদুকর মনীন্দ্রনাথ দাসের চমকপ্রদ কলা কৌশল এই নাটককে আরো প্রাণবন্ত করে তোলে।[২০] 'প্লাবন' নাটকের প্রথম অভিনয় রজনীতে যাঁরা অংশ গ্রহণ করেছিলেন তাঁরা হলেন ঃ নীলাম্বর অহীন্দ্র চৌধুরী; কমলেশ রতীন বন্দ্যোপাধ্যায়; ব্রজলাল সন্তোষ সিংহ; শেখর নাথ - মিহির ভট্টাচার্য; ত্রিলোচন শ্রীকুমার মিত্র; বল্লভ বিজয় কার্তিক দাস; উৎপল তারা ভট্টাচার্য; ইনসপেক্টর জ্যোৎকুমার মুখোপাধ্যায়, মহেশ যতীন দাস; হলধর - তুলসী চক্রবর্তী; সনাতন অমলেন্দু সরকার; নিমাই সত্য সরকার; সাব ইন্সপেক্টর শচীন সরকার; পুরোহিত উমা দাস; মিঃ গোঁসাই সন্তোষ দাস; নিশারাণী রাণীবালা; সবিতা (ছোট) শান্তি; সবিতা (বড়) সাবিত্রী; সারদা রাজলক্ষ্মী (বড়); চাঁপা বিজলী; কুমুদিনী জ্যোতি; নৃত্যকালী রাজলক্ষ্মী (পচি); মঞ্জুলা দুনিয়াবালা; কিটি মিত্তির যূথিকা; এছাড়া বটকৃষ্ণ দে, গোপীনাথ দে, গিরীন ঘোষ, শান্তি দাস, গোপাল নন্দী, নির্মলা, বীণা, স্নেহলতা, মহামায়া, রেণু, সত্য এবং আশা। নেপথ্য বিধানে ছিলেন ঃ প্রযোজক রঘুনাথ মল্লিক; সঙ্গীত পরিচালক উমাপতি শীল; নৃত্য পরিচালক--মহারাজা বসু; এবং প্রচার সচিব বিজয় মুখোপাধ্যায়।

'প্লাবন' গুণীজন সমাদৃত ও বহু আলোচিত নাটক। সমকালীন বাংলা নাটকের ধারায় তা সসম্মানে গৌরবের আসনে সুপ্রতিষ্ঠিত। কাল ভৈরবের সর্বনাশা প্লাবনে প্লাবিত, প্রবহমান জীবনের তটভূমির ভাঙ্গা গড়ার ইতিবৃত্ত এই নাটক। ভৈরব এখানে নদী মাত্র নয় একটা প্রতীক সে মহাকাল; তার প্লাবনে জীবনের তটভূমি প্লাবিত হয়ে যায়– সেই রুদ্র তাণ্ডবে জীবনের একদিক ভাঙ্গে, অন্যদিক গড়ে। ভাঙ্গে আর গড়ে ক্ষেত খামার, ঘর গৃহস্থালি - ভাঙ্গে আর গড়ে মানুষের আশা আকাঙ্ক্ষা, প্রাপ্তি অপ্রাপ্তি - ভাঙ্গে আর গড়ে যুগব্যাপি প্রবহমান ভাব চৈতন্যের প্রতিটি ক্ষেত্র! প্লাবন নিশ্চিত করে প্রবহমান যুগের ধ্বংসস্তূপের ওপরে নতুন যুগের সৌধ নির্মাণের সম্ভাবনা। 'প্লাবন' নাটককে যুগসন্ধিক্ষণের এই প্রেক্ষাপটের ওপরেই বিচার করতে হবে। যুদ্ধকালীন ক্রান্তিলগ্নে

---

[১৯] ভূমিকা দ্রষ্টব্য।

[২০] ভূমিকায় নাট্যকারের স্বীকারোক্তি দ্রষ্টব্য।

অতিক্রান্ত যুগের মৌলতার অনিবার্য ভাঙ্গন এবং সেই উর্বর ভূমিতে নবাগত যুগের প্রাণ প্রতিষ্ঠার ব্যঞ্জনা বর্তমান নাটকে মূর্ত হয়ে উঠেছে। প্লাবন তো শুধু ভাঙ্গে না, সে যে ভবিষ্যতের জন্যে ভূমিকে উর্বরতাও দান করে—সেটাই প্রকৃতির নিয়ম। এই নিয়মের—অলঙ্ঘ্য নিয়মের অনুবর্তন ঘটেছে এই নাটকে।

নিশারাণী ওরফে মনোরমা জালিয়াত রাঘব ঘোষের স্ত্রী। ভৈরবের প্লাবনে একদিন সে বিচ্ছিন্ন হয়ে এসে পড়ে সদ্য বিপত্নীক শেখরনাথের জীবনের উপান্তে। মৃত্যু ঘটে জালিয়াত নারী মনোরমার, জন্ম নেয় সবিতার জননী নিশারাণী। শেখরনাথের ঔদার্যে নিশারাণী কৃতজ্ঞ। কিন্তু শেখরনাথের প্রতি সে অনুরক্ত নয়। মাতৃহারা সবিতাকে উপলক্ষ করে সন্তান-সুখ বঞ্চিতা এই নারীর গভীর সন্তান বাৎসল্য তাকে শেখরনাথের আশ্রয়ে থাকতে প্ররোচিত করেছে। নইলে শেখরনাথকে সে ভালোবাসেনি। বিরামবাড়িতে হারিয়ে যাওয়া স্বামীর জন্যে তার ব্যাকুল প্রতীক্ষা। কিন্তু শেখরনাথের কাছে এই প্রতীক্ষা অর্থহীন; তার অর্থ, আভিজাত্য, লোভ আর লালসাকে নিশারাণীর অবজ্ঞা ভরা উপেক্ষা সে বরদাস্ত করতে পারেনা—প্রবল আক্রোশে ঝাঁপিয়ে পড়ে নিশারাণীর ওপর। 'মন... দেহ যাই হোক' তার চাই। সেই মুহূর্তে অজ্ঞাত আততায়ীর গুলিতে লুটিয়ে পড়ে তার প্রাণহীন দেহ। আর নিশারাণী দীর্ঘ পনেরো বছর পরে আর এক প্লাবনে নীলাম্বরের মধ্যে আবিষ্কার করে তার হারিয়ে যাওয়া স্বামী রাঘব ঘোষকে। এ সেই রাঘব ঘোষ, প্লাবনের বেগে যে তার পূর্ব-নির্মোক মুক্ত আজকের নীলাম্বর রায়। এই প্রত্যাবর্তন নীলাম্বর কিম্বা নিশারাণীর জন্যে নয়; নীলাম্বরের আশ্রয়ে লালিত কমলেশ, নিশারাণীর স্নেহচ্ছায়ায় সবিতা—এখন কমলেশ এবং সবিতাকে স্থান করে দিয়ে তাদের বিদায় নেবার লগ্ন সমাগত। তাই প্লাবনের বেগে ভেসে যেতে হল নীলাম্বর নিশারাণীকে। পনেরো বছর আগে এমনি করেই একদিন বিদায় নেবার সময় এসেছিল শেখরনাথের। আর আসন্ন ভবিষ্যতের যান্ত্রিক সভ্যতার পাদপীঠে পুনর্বাসন লাভ করল উত্তরকালের কাণ্ডারী কমলেশ-সবিতা।

এক প্লাবনে অপসারণ মনোরমা, রাঘব ঘোষ এবং শেখরনাথের আর এক প্লাবনে নীলাম্বর নিশারাণীর। সেদিন নির্মিত হচ্ছিল সবিতার ভবিষ্যৎ, আর এখন কমলেশের সান্নিধ্যে তার পূর্ণতাপ্রাপ্তি। এইভাবে অতীত থেকে বর্তমানে এবং বর্তমান থেকে ভবিষ্যতের দিকে যাত্রা শুরু কালরূপ ভৈরবের ভাঙ্গা গড়ার মধ্যে দিয়ে।

শেখরনাথ জমিদারী ব্যবস্থার রক্ষক, ধারক এবং বাহক। নিশারাণী কিছু পরিমাণে তারই উত্তরসূরী। ব্রজলাল এবং ত্রিলোচন সেই ব্যবস্থার উপরি ফলভোগী অন্ধ সমর্থক। কাজেই জমিদারতন্ত্রের সংস্কার কিম্বা পরিবর্তন তাদের কাম্য নয়। 'বিরামবাড়ি' সেই ক্ষয়িষ্ণু আদর্শের প্রতীক রূপে বিরাজমান। বিপন্ন প্রজার আর্তনাদ ব্যর্থ প্রার্থনায় তার দেওয়ালে প্রতিধ্বনিত হয়ে ফিরে যায়। এর অভ্যন্তরে কামনার অনল দগ্ধ করে শেখরনাথকে। নিশারাণী তার অন্যায্য পাওনাকে দখলে রাখতে আপ্রাণ চেষ্টা করে। শুধু মুক্তির পথ খোঁজে মুক্তি পিপাসু সবিতা। 'বিরামবাড়ি' এক স্থবির জড়বৎ সমাজ-ব্যবস্থার চিহ্নকে অঙ্গীকৃত করে দাঁড়িয়ে আছে। এই অলস অতীতচারিতার রুদ্ধ দরজায়

প্রগতির বাণী প্রতিহত হয়ে ফিরে যায়। কমলেশ সেই অর্গল মুক্ত করার সাধনায় বীরাচারী সাধক। গণ জাগরণের মন্ত্র তার কণ্ঠে। আত্মসর্বস্ব জমিদারতন্ত্রের ধ্বংস সাধনে, সে বহুকালাবধি বঞ্চিত বিপন্ন মানুষের মুক্তির লক্ষ্যে কৃত সংকল্প। যে জমিদারতন্ত্র এতকাল ভিক্ষালব্ধ ধনে ক্ষুধার্ত মানুষকে কোনক্রমে উদরপূর্তিতে উৎফুল্ল হতে শিখিয়েছে, যে সমাজ কাঠামো সহস্র যন্ত্রণাতেও কৃপণ দাতার কণামাত্র দানের বিনিময়ে আমরণ স্তুতি প্রশস্তিকেই জীবনের শ্রেষ্ঠ ধর্ম বলে ভাবতে শিখিয়েছে, কমলেশ তার জন্যে বহন করে এনেছে কাল ভৈরবের ভয়ঙ্কর বার্তা। বিংশ শতাব্দীর গণচেতনার দুরন্ত প্লাবনে 'বিরামবাড়ি' র গৌরবময় ভাঙ্গন এইভাবে অনিবার্য হয়ে উঠেছে। প্রজার দানে সমৃদ্ধ বিরামবাড়ি' র এখন ঋণ শোধের পালা।

'প্লাবন' নাটকে প্রতিটি গান অতীব তাৎপর্যপূর্ণ। সংগীত এই নাটকে নিছক মনোরঞ্জনের জন্যে ব্যবহৃত হয়নি। বিশেষ বিশেষ নাটকীয় মুহূর্তে পরিবেশ ও পরিস্থিতির ব্যঞ্জনায় সংগীতের এমন চমৎকার ব্যবহার সে কালের খুব কম নাটকেই দেখা গেছে। সেদিক থেকে 'প্লাবন' নাটকের একটা বাড়তি আকর্ষণ আছে। এই নাটকের অন্যতম আকর্ষণ এর চমৎকার গতিময় সংলাপ।

তবে চূড়ান্ত মঞ্চ সফল হলেও 'প্লাবন' নাটক হিসাবে ত্রুটিমুক্ত নয়। নাটকীয় ত্রি ঐক্যের বিধি বিধান এখানে নাট্যকার অনুসরণ করেননি। ভৈরবের প্লাবন 'ছায়াছবি' তে প্রদর্শন (পনেরো বৎসর পরে) টেকনিকের দিক থেকে নতুনত্ব হলেও তা অপরিহার্য নয়।[১১] শেখরনাথের মৃত্যু হল অজ্ঞাত আততায়ীর গুলিতে। কিন্তু তার মৃত্যু রহস্য সঠিকভাবে উন্মোচিত হয়নি। জালিয়াত রাঘব ঘোষের নীলাম্বর রায়ের ছদ্ম পরিচয়ে প্রজানুরঞ্জনে ব্যাপৃত হওয়াটাও ঔচিত্যবোধের কাছে যথেষ্ট বিভ্রান্তিকর। তার চরিত্র পরিবর্তনের সংগত কারণটি দর্শকের কাছে অনাবিষ্কৃত থেকে গেছে। কার্য কারণ সূত্রের ওপর নির্ভর করেই তা বিন্যস্ত হওয়া উচিত ছিল।

॥ মায়ের দাবী ॥

১৯৪১ এ 'রঙমহলে' অভিনীত দ্বিতীয় নাটক তুলসী লাহিড়ির 'মায়ের দাবী'। নেপথ্য সংগঠনে বিতর্কিত পরিস্থিতির মধ্যে ১৯৪১ র ১৪ই আগস্ট 'মায়ের দাবী' র 'রঙমহল' মঞ্চে আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন ঘটে। বেশ কিছুকাল যাবৎ 'রঙমহল' মঞ্চে নাটকটি নিয়মিত অভিনীত হয়ে দর্শকের রসতৃষ্ণা নিবারণ করেছিল। অর্থাৎ সমকালীন নাট্যাভিনয়ের ইতিহাসে 'মায়ের দাবী' যথোচিত মর্যাদার সঙ্গে প্রতিষ্ঠার দাবী রাখে এবং এই দাবী নিতান্ত অমূলক নয়। দুর্গাদাস বন্দ্যোপাধ্যায়ের সুচারু পরিচালনা এবং মনীন্দ্র নাথ দাসের (নানুবাবু) মঞ্চ নির্মাণ কৌশল এই সাফল্যের প্রধান কারণ। চরিত্র চিত্রণে

---

[১১] ভূমিকায় নাট্যকার নিজেও তা পরোক্ষে স্বীকার করেছেন। কলকাতার বাইরে মফঃস্বলে এই ভোজবাজি দেখানো অসুবিধাজনক বিবেচনা করে তিনি সবিনয়ে এ প্রত্যাখ্যানের পরামর্শ দিয়েছেন।

'রঙমহলের' বলিষ্ঠ অভিনেতৃবর্গ এই নাটকে অংশ গ্রহণ করেছিলেন। অভিনেতৃ তালিকাটি নিম্নরূপ : বিকাশ—দুর্গাদাস বন্দ্যোপাধ্যায়; অশোক—জহর গাঙ্গুলী; বিমল—নীতিশ মুখোপাধ্যায়; বুলাকী—তুলসী লাহিড়ী; ডাক্তার—সলিল বন্দ্যোপাধ্যায়; মহারাজ—সমর ঘোষ; সরকারী উকিল—জিতেন গাঙ্গুলী; জুনিয়র উকিল—দেবীতোষ চক্রবর্তী; জজ—ডি. রোজারিও; পেস্কার—আকতার; বেয়ারা—সত্য মুখোপাধ্যায়; চাপরাশী—বীরেন দাস; লছমন—দেবীতোষ চৌধুরী; মিঃ লাল—বলাই বন্দ্যোপাধ্যায়; মিঃ রাজন—বিধান রায় চৌধুরী; কনস্টেবল—নেপাল বসু; আরদালী—কৃষ্ণচন্দ্র মুখোপাধ্যায়; করুণা—শান্তি গুপ্তা; সরমা—অঞ্জলি রায়; নার্স—বেলারাণী; বাঈজী—হরিমতি; ত্রিপুরা—গিরিবালা; সুলেখা—রেণুকা রায়; বিন্দি—লীলা দেবী; সারদা—প্রতিভা; এছাড়া আরও অনেকে। সুর সংযোজনায় ছিলেন অমিয় ভট্টাচার্য।

ছায়াপটে 'Madam X' দেখে অনুপ্রাণিত হয়ে নাট্যকার নাটকটি রচনা করেন। ইংরেজি কাহিনীর ভাবানুসরণে রচিত এই আখ্যান ছায়াচিত্রে 'রিক্তা' নামে প্রভূত জনপ্রিয়তা অর্জন করেছিল। মঞ্চোপস্থাপনার উপযোগী 'রিক্তা' ই কিঞ্চিৎ পরিমার্জিত রূপে 'মায়ের দাবী' নামে নাট্য রসিক দর্শক সমাজে সুপরিচিত।

নবোদ্ভূত ধনতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থার যূপকাষ্ঠে সামাজিক ও পারিবারিক জীবনাদর্শের অপমৃত্যু—তার বঞ্চনা, তুলসী লাহিড়ীর প্রত্যেকটি নাটকে জীবন্ত হয়ে উঠেছে। দ্রুত অপসৃত প্রাচীন মূল্যবোধের শূন্যস্থানে নতুন দিনের ভাবাদর্শ সামাজিক ও পারিবারিক জীবনের ভাবগ্রন্থি ছিন্ন করে তাকে নিদারুণ সঙ্কটের মুখে দাঁড় করিয়েছিল। এই অবক্ষয়ের প্রামাণ্য দলিল রচনা করেছেন তুলসী লাহিড়ী। কিন্তু পরিমিত শিল্প রচনার গুণে তাঁর কোন নাটকই নিছক প্রচারধর্মী হয়ে ওঠেনি সম্ভবত 'মায়ের দাবী' থেকে তার যাত্রা শুরু এবং 'ছেঁড়া তাঁর', 'দুঃখীর ইমাম' এ তা আরও সংহত পরিণত।

'মায়ের দাবী' এই অবক্ষয়ের নাটক—পরিবর্তিত সমাজ প্রেক্ষাপটে বিভ্রান্ত মানুষের অনিকেত জীবন-পরিক্রমার বাস্তব আলেখ্য। বিকাশ ও করুণার দাম্পত্য জীবনে অর্থ, বিত্ত, প্রতিপত্তি এবং সামাজিক প্রতিষ্ঠা-এর কোন কিছুরই অভাব ছিল না। কিন্তু প্রয়োজনের তুলনায় প্রাচুর্যের এই সীমাহীন ঊর্ধগতি স্বামী-স্ত্রী উভয়ের স্বাভাবিক সম্পর্কের পথ রুদ্ধ করে দিয়েছিল। বিকাশের কাছে উপার্জনই জীবনের লক্ষ্য—তার চেতনার গভীরে এই লক্ষ্যে পৌঁছাবার আকাঙ্ক্ষা অতি প্রবল। তার বাইরে কোন কিছুতেই তার আগ্রহ নেই, প্রয়োজনও নেই। স্ত্রী করুণার প্রতি বিকাশের দায়িত্ব-কর্তব্য কিম্বা প্রেম-প্রীতিও কেবল ওই একটি মাত্র মূল্যের নিরিখে বিচার্য। ধনতন্ত্রের ক্রমাগত পেষণে তার হৃদয় ধর্মের সুকুমার বৃত্তি সমূহ যেন নিষ্পেষিত। করুণা এ হেন যান্ত্রিকতায় তৃপ্ত ছিল না। প্রাচুর্যের অহংকারে অপরের মনে ঈর্ষা সঞ্চারকেই সে ধ্রুব সত্য বলে বিশ্বাস করেনি। করুণা নারী এবং আধুনিক চেতনা সম্পন্ন নারী—বিকাশের কাছে তার প্রত্যাশা সান্নিধ্য, সাহচর্য আর সমবেদনার। অর্থাকাঙ্ক্ষায় বহির্মুখী বিকাশ করুণার রুদ্ধ হৃদয়ের ভাষা শুনবার অবকাশ পায়নি। করুণার অভিযোগ বিকাশের এই ব্যর্থতার বিরুদ্ধে।

তবু করুণা এই যান্ত্রিকতার সঙ্গে এতকাল আপোস করে চলেছিল। কেননা সে নারী— একাধারে প্রেয়সী এবং জননী; সন্তান-বাৎসল্যের গভীরতর তৃপ্তি তার প্রেয়সী সত্ত্বার ক্ষোভ, এবং বেদনাকে অনেকাংশে আবৃত করে রেখেছিল। তাই ঘর ছাড়বার প্রয়োজন করুণা অনুভব করেনি। কিন্তু পূর্ব প্রণয়ী অশোকের অকস্মাৎ আগমনকে কেন্দ্র করে বিকাশের অন্যায় সন্দেহ, কু ইঙ্গিত, অমার্জিত ভাষা প্রয়োগ, সর্বোপরি দুর্ব্যবহার তাকে অনিশ্চিত অনিকেত যাত্রায় প্ররোচিত করেছে। বিকাশ ও করুণার দাম্পত্য সম্পর্ক কোন একটা উপলক্ষে ভেঙে পড়বার জন্যে তৈরি ছিল—অশোকের উপস্থিত সেই উপলক্ষ।

অশোককে ঘিরেই বিকাশের সংশয়। এই সংশয়ের প্রধান কারণ, হৃদয়ধর্মে অশোক বিকাশের তুলনায় অগ্রগামী। অন্তত দীর্ঘ অদর্শনেও সে করুণার মনের আশ্রয়টুকু হারায়নি। যে আশ্রয় বিকাশ কেবল নিজের বলেই দাবী করতে অভ্যস্থ, অর্থ-সম্পদের বিনিময়ে যা তার করায়ত্ত বলে সে সম্পূর্ণ নিশ্চিত ছিল তা এভাবে বেদখল হতে দেখে বিকাশ বিচলিত হয়ে পড়েছে। শুধু তাই নয়, অশোকের কাছে তার এই নিদারুণ পরাজয় নিঃশব্দে মেনে নেওয়া বিকাশের প্রকৃতি বিরুদ্ধ। তাই করুণার প্রতি চরম দণ্ড বিধানে সে তার স্বামীত্বের অধিকার পৌরুষের অধিকার প্রতিষ্ঠা করতে ব্যস্ত হয়ে পড়েছে। আর ভ্রাতৃজায়া সম্পর্কে সরমার ভ্রান্ত বিচার বিশ্লেষণ, তিক্ত পরিস্থিতিকে আরও জটিল করে তুলেছে। এই অবস্থায় অশোকের প্রত্যাবর্তন, বিকাশের মনে সমস্ত সংশয়ের অবসান ঘটিয়েছে। অন্যদিকে করুণার কোন সংবাদ না পেয়ে তার বিভ্রান্ত চিত্ত অশোকের ওপরেই নির্ভর করতে চেয়েছে। বিকাশ অস্থির-চিত্ত, সমস্যা সমাধানে নিশ্চেষ্ট, সিদ্ধান্ত গ্রহণে অবিবেচক- এই ত্রুটির পথ ধরেই তার জীবনে নেমে এসেছে চরম ট্র্যাজেডি।

করুণা স্বাধীনচেতা নারী- কেবলমাত্র আত্ম মর্যাদার প্রশ্নে সে নিরাপদ, সচ্ছল স্বামীগৃহ পর্যন্ত ত্যাগ করে চলে এসেছে। সন্তানের প্রতি মমতাও তাকে সংকল্প থেকে বিচ্যুত করতে পারে না। কাশীতে ত্রিপুরাসুন্দরীর এঁদো বাসায় পদস্খলনের প্রভূত সম্ভাবনার মধ্যেও অনাহার ক্লিষ্ট, মর্যাদাসম্পন্ন এই নারী সমস্ত প্রলোভনকে অনায়াসে জয় করেছে। কিন্তু সুচতুর, শঠ, কূটকৌশলী বুলাকীর নিখুঁত ভাবে সাজানো ফাঁদে পা না দিয়ে তার উপায় ছিল না। যে অন্ধকার জগতের অলি গলিতে বুলাকীর বিচরণ—করুণার দুর্ভাগ্য, সে জগতের সঙ্গে তার পূর্ব পরিচয়ের কোন অভিজ্ঞতা ছিল না। করুণার মত অনভিজ্ঞা নারীকে বশ করতে তাই বুলাকীকে অধিক পরিশ্রম করতে হয়নি। বুলাকীর প্রকৃত পরিচয় করুণার কাছে প্রকাশ হয়ে গিয়েছিল সুখপুরের মহারাজাকে ব্ল্যাকমেলের ঘটনায়। তবে তখন বুলাকীর সতর্ক প্রহরা এড়িয়ে তার গ্রাস থেকে মুক্ত হওয়া করুণার পক্ষে সম্ভব ছিল না। এই পর্যন্ত করুণা চরিত্রে কোন অসঙ্গতি নেই। কিন্তু করুণার পক্ষে বুলাকীকে পিস্তলের গুলিতে খুন করাটা নাট্যবিচারে অতি নাটকীয়—মেলো-ড্রামাটিক। বুলাকীর চাপের কাছে নতি স্বীকার করার মত মেয়ে সে যেমন নয়, তেমনি স্বামী-পুত্রের কাছে তার আত্মগোপনের ইতিহাস প্রকাশ হবার সম্ভাবনায় এতখানি বিচলিত হওয়াটাও

তার চরিত্রের সঙ্গে বেমানান। আরও বে মানান, সম্পূর্ণ অপরিচিতা জননী করুণাকে আদালতে নির্দোষ প্রমাণে বিমলের চেষ্টা। তার সওয়ালে যুক্তি অপেক্ষা আবেগেরই আধিক্য।

॥ কঙ্কাবতীর ঘাট ॥

মহেন্দ্র গুপ্তের প্রথম সামাজিক নাটক 'কঙ্কাবতীর ঘাট' ১৯৪১ র ২৫শে সেপ্টেম্বর 'নাট্যভারতীতে' মঞ্চস্থ হয়ে অভূতপূর্ব সাফল্য অর্জন করে। ঐতিহাসিক এবং পৌরাণিক নাটকে মহেন্দ্র গুপ্তের নাম বাংলা নাট্য জগতে সুপরিচিত। প্রথম সামাজিক নাটক রচনা করেও তিনি সেই খ্যাতি রাখতে পেরেছেন, এটাই গৌরবের কথা। পূর্ণ প্রেক্ষাগৃহে 'কঙ্কাবতীর ঘাট' তার হীরক জয়ন্তী উদ্‌যাপন করে পরের বছর ১লা ফেব্রুয়ারী তারিখে। সফল অভিনেতৃবর্গকে উৎসাহ দেবার জন্যে বিবিধ পুরস্কারে সম্মানিত করা হয় ঐ অনুষ্ঠানে। সামগ্রিক পরিস্থিতি যখন নাটকের অগ্রগতিকে নানাভাবে ব্যাহতই করছিল, তখন কোন একটি নাট্যশালার এই সহৃদয় প্রচেষ্টা অবশ্যই প্রশংসার যোগ্য। নটসূর্য অহীন্দ্র চৌধুরীর পরিচালনায় 'কঙ্কাবতীর ঘাট' প্রথম আত্মপ্রকাশ করে। উল্লেখযোগ্য চরিত্রে যাঁরা অভিনয় করেছিলেন তাঁদের মধ্যে আছেন : মি মুখার্জী অহীন্দ্র চৌধুরী, প্রবীর রতীন বন্দ্যোপাধ্যায়, লালমোহন সন্তোষ সিংহ, নন্দুয়া বিজয় কার্তিক দাস, বংশী কুমার মিত্র, গোবর্দ্ধন সন্তোষ দাস, সতীশ তারা ভট্টাচার্য, যদুপতি তুলসী চক্রবর্তী, খোকা শান্তিলতা, শিলা রাণীবালা, চামেলী সুহাসিনী, মৃণাল সাবিত্রি দেবী এবং ওহারুর ভূমিকায় যূথিকা। 'কঙ্কাবতীর ঘাট' বহুল প্রশংসিত নাটক। নাটকটির অভিনয় সম্পর্কে মন্তব্য করতে গিয়ে তৎকালীন একটি সংবাদপত্র লিখেছে :

"Ahindra Choudhury in the role of Mr Mukherjee was almost a true representation of the Character, while Ranibala and Ratin Banerjee as Shiela and Prabir acquitted themselves with credit Sontosh Sinha, Kumar Mitter and Suhashini were also upto the mark, in their respective roles."[১১]

'কঙ্কাবতীর ঘাট' নাটকের মুখ্য আকর্ষণ এর চমকপ্রদ আখ্যানভাগ। স্খলিত জীবনচর্যার নিপুণ বিন্যাসে 'কঙ্কাবতীর ঘাট' সমকালীন সামাজিক নাটকের ধারায় বিরল দৃষ্টান্ত নাটক। আত্মভোলা শিল্পীর অসংযমের পথ বেয়ে এ নাটকে নেমে এসেছে চূড়ান্ত ট্র্যাজেডি। মহৎ স্রষ্টার নির্মোহ চিত্তে সুপ্ত কামনার অনল সহসা প্রকটিত হয়ে তার শিল্পী সত্তাকে করেছে ভস্মীভূত। এই পদস্খলনের সূত্র ধরে চামেলী বিবির ব্যাভিচারের উর্ণাতন্তু শতপাকে বেষ্টন করেছে মি মুখার্জীর সমগ্র অস্তিত্বকে। সেই অদৃশ্য গ্রন্থি থেকে নিজেকে মুক্ত করার কোন পথ তার জানা ছিল না। সতী কঙ্কাবতীর সতীত্ব নিষ্ঠা, ত্যাগ ও আত্মোৎসর্গের অম্লান মহিমা তার ভোগক্লান্ত চিত্তকে হয়ত অলক্ষ্যে থেকে বিচলিত করেছে কিন্তু চরিত্রের

---

[১১] 'The Amrita Bazar Patrika', 4th February, 1942

যে দৃঢ়তা মানুষকে অজস্র প্রতিকূলতাকে জয় করতে প্ররোচিত করে, মি মুখার্জীর মধ্যে তার একান্ত অভাব ছিল। আর তাই চামেলী বিবির কর্দমাক্ত পঙ্কিলতার আবর্তে আকণ্ঠ নিমজ্জিত দুর্বলচিত্ত মি মুখার্জীর সম্ভাবনাময় জীবনে নেমে এসেছে শোচনীয় ট্র্যাজেডি। এ সম্পর্কে অভিমত প্রকাশ করতে গিয়ে অমৃত বাজার পত্রিকা লিখেছে :

"The story which develops under tragic circumstances, has an irresistible appeal both to men and women."[১৫]

চামেলী বিবি নিপুণ খেলোয়ার যৌবনের মদিরায় আসক্ত দুরন্ত ঘোড়াকে বশ করবার কলা কৌশল তার মজ্জাগত। এইটিই তার মূলধন। দেহ পসারিণী এই নারীর কাছে মাতৃত্বের গৌরব নেহাৎই অকিঞ্চিৎকর; অর্থ, যশ এবং ঐশ্বর্যের তীব্র আকাঙ্ক্ষা, মূল্যবোধ বিসর্জিত এই নারীকে ব্যাভিচার লিপ্সার পথে ঠেলে দিয়েছে। এই আকাঙ্ক্ষা এতই তীব্র যে একমাত্র গর্ভজাত সন্তানকে পরিত্যাগ করতেও তার অন্তরাত্মা বিচলিত হয়নি। বংশী পুরুষ বলেই তাকে তার কোন প্রয়োজন ছিল ন। প্রয়োজন ছিল কঙ্কাবতীর কন্যা উমাকে অর্থবান পুরুষ শিকারে দক্ষ করে তুলে ব্যক্তিগত ভবিষ্যৎ সুনিশ্চিত করা। সেই পরিকল্পনা অনুসারে চামেলী বিবির বংশীকে পরিত্যাগ, উমাকে হরণ এবং আপন সন্তান শিলারূপে তাকে মি মুখার্জীর বুকে পুনরায় প্রত্যর্পণ। চামেলী বিবি সমকালীন সমাজ প্রেক্ষাপটে হৃদয় ধর্মের জটিল আবর্তে বিপর্যস্ত এক নারী। পুরুষ শাসিত এই সমাজে পুরুষ নির্ধারিত নারীর নিয়ন্ত্রিত গতিবিধির বিরুদ্ধে তার চরম উন্নাসিকতা অহঙ্কারী পুরুষকে যৌবনের মদিরায় উন্মত্ত করে তাকে পদানত করে রাখার মধ্যে তার একমাত্র তৃপ্তি। তার এই প্রতিশোধ স্পৃহা এতই তীব্র যে, তথাকথিত আত্ম সংযম, সতীত্ব কিম্বা সন্তান বাৎসল্য এ সবই তার কাছে নিতান্তই অর্থহীন। চামেলী জানে, পুরুষ যতই শ্রদ্ধাভাজন হোক না কেন, অন্তরে অন্তরে সে অনেকাংশে দ্বিচারী - সোনার পাথর বাটির মতই আদর্শ নিষ্ঠ ঘরণী এবং শৃঙ্গারকলায় পারদর্শিনী, এ দুই ই তার কাম্য। যুদ্ধ জয়ের মত নারী হরণকেও তাই শাস্ত্রবাক্যে আপ্তবাক্যে পৌরুষের বিরল কৃতিত্ব বলে গণ্য করা হয়েছে। একটি মাত্র ফুৎকারে, ভ্রুভঙ্গির একটি মাত্র ইঙ্গিতে তার প্রবৃত্তি তাড়িত নগ্ন চেহারা সভ্যতার আপাত খোলস ছিঁড়ে বেড়িয়ে আসতে পারে। মহাঋষি বিশ্বামিত্রেরও পদস্খলন ঘটেছিল। এই অভ্রান্ত অস্ত্রেই চামেলী বিবি বশীভূত করেছে মননশীল শিল্পী মি মুখার্জীকে। বিগত যৌবনা দেহ পসারিণী এই নারীর দক্ষ ছলনার কাছে মি মুখার্জী ক্রীড়নক মাত্র।

প্রবীর ও শিলা এ নাটকে মুক্তির অগ্রদূত। এই মুক্তি পদস্খলন থেকে পদোন্নতির— হৃদয় ধর্মের স্বকীয়তায় উত্তরণের। গৌতম পত্নী অহল্যার অজ্ঞাত অনাচারই তপঃক্লিষ্ট মুনির অভিশাপের রূপ ধরে তাকে প্রস্তরমূর্তি দান করেছিন— কেননা তা সংসার-নির্মলতার পরিপন্থি। চামেলীর নিরবচ্ছিন্ন ব্যাভিচার এবং মি মুখার্জীর পদস্খলন কঙ্কাবতী কন্যা

---

[১৫] 'The Amrita Bazar Patrika' 4th February 1942

উমাকেও পরিণত করেছিল পাষাণ শিলায়। আর শাপভ্রষ্ট অহল্যা যেমন রামচন্দ্রের কল্যাণ পদস্পর্শে নবজীবন লাভ করে ধন্য হয়ে উঠেছিল তেমনি প্রবীরের প্রেমের মন্ত্রের সংস্পর্শে উমা চামেলী সৃষ্ট পাষাণ শিলার রুক্ষ আবরণ ভেদ করে পত্রে পুষ্পে বিকশিত হয়ে উঠেছে। কিন্তু উমা প্রবীরের প্রেয়সী মাত্র নয় সে যে কঙ্কাবতীর কন্যা: কঙ্কাবতীর জীবনদর্শন তার ভাগ্যচক্রের অদৃশ্য নিয়ন্ত্রাশক্তি রূপে তাকে চালিত করেছে। যে সমাজ বিপর্যয়ের প্রেক্ষাপটে কঙ্কাবতী কিম্বা উমার আবির্ভাব, তা সেই সনাতন আদর্শকে ধারন বহনে অক্ষম। তাই মৃণালকে স্থান করে দিয়ে উমাকেও কঙ্কাবতীর অনুসরণে কালরূপ জাহ্নবীর প্রবহমান ধারায় আত্মবিসর্জনের পথ খুঁজে নিতে হয়েছে।

'কঙ্কাবতী' এ নাটকে নেপথ্য চরিত্র মাত্র নয় নাট্য কাহিনীর কেন্দ্রবিন্দু এক পরিত্যক্ত সমাজ বাতাবরণের উপাদানে নির্মিত। আধুনিক জীবনরঙ্গে সে নিতান্তই অবাঞ্ছিত তাই নাটকের নেপথ্যভাগে তার অবস্থান। সমকালীন সমাজ বিগত দিনের সনাতন আদর্শে আস্থাহীন বলেই কালরূপ জাহ্নবীর প্রবহমান স্রোত তাকে ভাসিয়ে নিয়ে যায়। উপায়হীন মানুষের বেদনার্ত হৃদয়ের তটভূমি শুধু স্মৃতির ভার বহন করে চলে কিছুকাল। আর দিনের অবসানে রাত্রির আগমনেব মত সেই শূন্যস্থান পূরণে দ্রুত এগিয়ে আসে ভ্রষ্টনীড় চামেলীর মত নারী। কঙ্কাবতী ও চামেলীব একত্র সহাবস্থান যে সম্ভব নয়। ইতিহাসের অনিবার্য নিয়মে বর্তমানকে স্থান করে দিযে অতীতকে সরে দাঁড়াতে হয়। কঙ্কাবতী অতীত ইতিহাসের অপসৃত ঐতিহ্য চামেলী নতুন দিনের বেদমন্ত্রে দীক্ষিত। একজন কল্যাণবোধের মহিমায় সমুজ্জ্বল, অন্যজন আধুনিক জীবন জটিলতায় সমৃদ্ধ এ দুই মেরুর মধ্যে বিস্তর ব্যবধান।

চামেলী যে সমাজ মানসের প্রতিনিধি সেখানে মানব হৃদয়ের সুকোমল বৃত্তি সমূহ হৃদয় দৌর্বল্য রূপে প্রতিভাত- অতএব পরিত্যাজ্য। এ নাটকে কেবলমাত্র উমা পাষাণ শিলায় রূপান্তর লাভ করেনি; এক স্থবির জড়বৎ সমাজ দর্শনকে অঙ্গীকার করে চামেলী, নন্দুয়া, বংশী, ওহারু সকলেই অন্তরে অন্তরে পাষাণ। কল্যাণের পাদস্পর্শ লাভে বঞ্চিত বলে পাষাণত্ব থেকে এদের মুক্তি ঘটেনি। তবে নন্দুয়ার চরিত্র চিত্রণে যথেষ্ট ত্রুটি আছে। যে নন্দুয়া চামেলী বিবিকে খুশি করতে শিলার জন্যে নিত্য নতুন খদ্দের সন্ধান করে নিয়ে আসে, হঠাৎ তার শুভ বুদ্ধির উদয় হল কি ভাবে তার সঙ্গত কারণ খুঁজে পাওয়া শক্ত। নাটকের সংলাপ খুবই চমৎকার। সাবলীল সংলাপের গুণে নাটকটি দর্শকের কাছে হৃদয়গ্রাহী হয়ে উঠেছে। দ্বিতীয় অঙ্কের দ্বিতীয় দৃশ্যে তরুণ কবি সতীশ এবং 'মুষল মুদ্গার' পত্রিকার সম্পাদক যদুপতির প্রসঙ্গটি tragic relief সৃষ্টিতে এক কথায় চমৎকার।

॥ তুমি আর আমি ॥

১৯৪২-র জানুয়ারীতে 'রঙমহল' থেকে বিদায় নেবার পূর্বে যামিনী মিত্রের প্রযোজনায় অভিনীত শেষ নাটক বিধায়ক ভট্টাচার্যের 'তুমি আর আমি'। এই লঘু নাট্যটি 'রঙমহলে' অভিনীত হয় ১৯৪১ র ৩রা ডিসেম্বর। প্রখ্যাত নৃত্যশিল্পী ও বন্ধু সমর ঘোষের অনুরোধে

মধ্য সপ্তাহের এই লঘুনাট্যটি নাট্যকার রচনা করেন। এটি নাট্যকারের মৌলিক রচনা নয়—এর কাহিনী সমর ঘোষের মুখ থেকে শুনে তিনি তাকে নাটকে রূপ দেন। দুর্গাদাস বন্দ্যোপাধ্যায়ের পরিচালনায় এই নাটকের প্রথম অভিনয় রজনীতে অংশগ্রহণকারী শিল্পীরা হলেন : প্রমথ এবং চন্ডকৌশিক—দুর্গাদাস বন্দ্যোপাধ্যায়; শতদল এবং অরূপ—নিতীশ মুখোপাধ্যায়; কিটি এবং অলকানন্দা—অরুণা দাস; ডলি—রেণুকা রায়; মিলি—পদ্মাবতী; রিণা—অঞ্জলি রায়; আন্টি গিরিবালা; বিজয়—কৃষ্ণধন মুখোপাধ্যায়; এছাড়া সমর ঘোষ, সত্য মুখোপাধ্যায়, জীবেন গঙ্গাপাধ্যায়, শান্তি ভট্টাচার্য, শৈলেন বসু, রাম বন্দ্যোপাধ্যায়, স্নেহ বন্দ্যোপাধ্যায়, রেখা দত্ত, আশা, বীণা প্রমুখ অন্যান্য চরিত্রে অংশগ্রহণ করেন। এই নাটকের অন্তর্ভুক্ত সংগীত রচনা করেছেন শৈলেন রায় এবং সুর সংযোজনা করেছেন নিতাই মতিলাল; নৃত্যে জনৈক 'শ্যামসুন্দর' এবং দৃশ্যপটের নির্মাতা মনীন্দ্র নাথ দাস।

'তুমি আর আমি' লঘুনাট্য খুব উন্নতমানের নাট্যকীর্তি নয়। এর আখ্যানভাগ যথেষ্ট দুর্বল এবং চরিত্রগুলিও অবাস্তব ভাবাতিশয্যে লালিত। মঞ্চাভিনয়েও এই লঘুনাট্যটি খুব একটা রেখাপাত করতে পারেনি। সমকালীন সংবাদপত্রের পাতা থেকে তার সাক্ষ্য দেওয়া যায় :

"Rungmahal is entertaining the Calcuttaa public with Bidhayak Bhattacharya's Tumi-Ar-Ami, a clean delightful drama full of humorous, well balanced dialogues, melodious songs and beautiful dances with a galaxy of stars ..."[২৮] অর্থাৎ নাট্যশৈলীগত দিক থেকেও বটে, আবার মঞ্চাভিনয়ের দিক থেকেও বটে এই লঘুনাট্যটি সমকালীন বাংলা নাটকের ধারায় বিশেষ কোন কৃতিত্ব অর্জন করতে পারেনি। 'তুমি আর আমি' নিছক সস্তা হাসির নাটক; দর্শককে একটু মজা, একটু আনন্দ দেবার জন্যেই রচিত।

'আগে', 'মাঝে' ও 'শেষে' এই তিনটি পর্বে নাটকের কাহিনী বিন্যস্ত হয়েছে। প্রথম পর্বে সূচনা, দ্বিতীয় পর্বে তার বিন্যাস এবং তৃতীয় পর্বে তার পরিণতি দেখানো হয়েছে। কিন্তু এই তিনটি পর্বের সংযোগ সূত্র নিতান্তই ক্ষীণ। বিভিন্ন ঘটনা পরস্পর থেকে বিচ্ছিন্ন। চরিত্রগুলিতে নাটকীয় দ্বন্দ্বের লেশমাত্র নেই। নাট্যকার স্বয়ং এই ত্রুটি স্বীকার করে নিয়েছেন।[২৯] এমনকি নাট্যকারের দাবী মত প্রতিটি স্বতন্ত্র দৃশ্যের রস সৃষ্টির সক্ষমতা নিয়েও নিঃসংশয় হওয়া মুশকিল। জীবনের অসংগতি থেকেই হাস্যের উদ্ভব। সেই অসংগতি যদি স্পষ্ট হয়ে ধরা না পড়ে, তাহলে হাসিও কৃত্রিম হয়ে পড়ে। এখানে সেই ঘাটতি সমালোচকের দৃষ্টি এড়ায়না।

আন্টির কড়া তত্ত্বাবধানে কোন এক লেডিজ হোস্টেলে কিটি, মিলি, রিণার মত যুবতী মেয়েদের দিন কাটে। লেডিজ হোস্টেলের কঠোর নিয়ম কানুন মেনে তাদের চলতে

---

২৮ 'The Amrita Bazar Patrika', 5th December, 1941

২৯ 'ভূমিকা'-য় নাট্যকার বলেছেন—"এর গল্পের মধ্যে যেটুকু অবাস্তবতা ও চরিত্র চিত্রণে যেটুকু অতিরঞ্জন আছে সেটুকু এই বলে স্নেহের চোখে দেখতে হবে—যে হাসির নাটকে সেটুকু না থাকলে চলে না। জোরালো গল্পের অভাব অনেকেই হয়ত এই নাটকে অনুভব করবেন।"

হয়। হোস্টেল সুপারিন্টেন্ডেন্ট আন্টির সতর্ক দৃষ্টি এড়িয়ে এতটুকু বেচাল হবার উপায় নেই। হোস্টেলের রুটিন বাঁধা জীবনে তারা হাঁপিয়ে ওঠে। বিখ্যাত নৃত্যশিল্পী তরুণ সমীর বোসের সঙ্গে এদের পরিচয় বেশ ঘনিষ্ট। তাদের প্রিয় সমীরদার সঙ্গে হৈ চৈ হুল্লোর করতে এরা খুবই আগ্রহী। কিন্তু আন্টির হুকুমে পুরুষ বন্ধুর সঙ্গে হোস্টেলের ঘরে নাচ-গান-হুল্লোর পুরোপুরি নিষিদ্ধ। এই সব তরুণী ভক্তবৃন্দের প্রতি তাদের সমীরদার উৎসাহও কিঞ্চিৎ বেশী-- ভক্তবৃন্দের গভীর অনুরাগের মূল লক্ষ্য যে নৃত্যকলা অপেক্ষা নৃত্যশিল্পী স্বয়ং, এটুকু তিনি বেশ বোঝেন। আর বোঝেন বলে নৃত্যকলার উপসর্গটুকু বাদ দিয়ে হোস্টেলের নিভৃত বাগানে সঙ্গিনীদের সঙ্গে মাঝে মাঝে বায়ু সেবনে তিনি প্রফুল্ল বোধ করেন। এই অবস্থায় একদিন নিতান্ত উপদ্রব আন্টি গেলেন বোনঝির বাড়িতে নেমন্তন্ন খেতে, ফিরবেন পরদিন। এক রাত্রির মুক্তি-আনন্দে মেয়েরা সবাই উচ্ছ্বসিত হয়ে ওঠে। হায়রে এই রাত্রে যদি তাদের সমীরদাকে পাওয়া যেত। অনঙ্গদেব বোধ হয় এদের দুঃখ মর্মে উপলব্ধি করেছিলেন। জানা গেল তাদের সমীরদা হোস্টেলের বাগানে মজুত-- বায়ুসেবনে এসে সময় বিস্মৃত তিনি, রাত্রি ন'টায় দারোয়ান কর্তৃক ফটক বন্ধ করে দেওয়ায় সে রাত্রের মত হোস্টেলে বন্দী। অতএব বাঞ্ছিত বন্দীর পরিচর্যায় ব্যস্ত হয়ে উঠল মেয়েরা। কিন্তু এত রাত্রে সাক্ষাৎ যমদূত দারোয়ানের দৃষ্টি এড়িয়ে বাইরে থেকে উপযুক্ত আহারের বন্দোবস্ত করা যায় কি করে? অগতির গতি ওড়িয়া ঠাকুরকে কাঞ্চন মূল্য এবং বহু প্রশস্তিতে সহজেই সম্মত করা গেল। খানা পিনা তখনো বাকী, হুল্লোর সবে জমে উঠেছে---এমন সময় কপাল দোষে নিছক মশার ভয়ে বোনঝির বাড়ি থেকে আন্টির অপ্রত্যাশিত প্রত্যাবর্তনে সকলের প্রাণান্তকর অবস্থা!

রিণার কৌশলে আন্টির তোপের মুখে পড়তে হল না সমীরকে; তাঁর প্রশ্নের উত্তরে সকলে জানালো পশ্চিমের নৃত্য পটিয়সী এক বান্ধবীর হঠাৎ আগমনে তারা একটু বেশি মাত্রায় উচ্ছ্বাস প্রকাশ করে ফেলছে। আন্টি কিছুটা শান্ত হয়ে বান্ধবীর সঙ্গে আলাপ করতে চাইলে কিটি কৌশলে আন্টির চশমাটি ভেঙ্গে ফেলে-- চশমা ছাড়া তিনি ভাল দেখতে পান না। সমীরকে শাড়ি পড়িয়ে ঘোমটা দিয়ে বোবা সাজিয়ে আন্টি সমীপে হাজির করা হল। চেহারা দেখে আন্টি বুঝলেন পশ্চিমের মেয়ে বলে একটু লম্বা এবং স্বাস্থ্যবতী—তবে লজ্জাশীলা বলে মাথায় ঘোমটা রাখে। সন্তুষ্ট আন্টি এবার সমস্যায় পড়লেন, মেয়েদের এক চিল্তে খাটে অত বড় লম্বা-চওড়া মেয়েতো দৈর্ঘে প্রস্থে আঁটিবে না। অতএব তাঁর নির্দেশে তাঁরই পাশে শোবার ব্যবস্থা হল নারীরূপী সমীরের। আন্টি আবার অন্ধকার ঘরে শুতে পারেন না। শুতে গিয়ে শাড়ির ফাঁক দিয়ে প্যান্ট বেরিয়ে পড়ে সমীরের—ভাগ্যিস আন্টি দেখতে পাননি। আন্টির স্নেহাধিক্যে এক সময় পুরুষালি গলায় ভেউ ভেউ করে কেঁদে ওঠে সমীর। থিসিস রচনারতা আন্টি অনুমান করেন পশ্চিমের কান্নাতো, তাই একটু পৌরুষের ছোঁয়া আছে। অবশেষে আত্মরক্ষায় অসমর্থ সমীর শাড়ি ফেলে দিয়ে দৌড়ে পালিয়ে প্রাণ বাঁচায়।

আন্টিকে দয়াশীলা বলতে হবে মেয়েদের তিনি ক্ষমা করেছেন। শতদল সেনের বাড়িতে থিয়েটারের রিহার্স্যালে মেয়েদের সঙ্গে আন্টিও উপস্থিত। বিজয়, কেতন, মলয়, ন্যান্সি, প্রমত্ত চক্রবর্তী এবং তার তৃতীয় পক্ষের স্ত্রী ডলি সকলকে নিয়ে আসর জম-জমাট। প্রমত্ত তার তৃতীয় পক্ষটিকে নিয়ে শশব্যস্ত- পাছে তাঁর অনুপস্থিতে কাঁচা বয়সের তৃতীয় পক্ষটি অন্য কারুর হাতে গিয়ে পড়ে, এই ভয়ে বৃদ্ধ বয়সে হাঁপানী রোগ নিয়ে তিনি 'এক ফালি' পার্ট করতে এসেছেন। আন্টি আবার মেয়েদের আচার আচরণে সদা সতর্ক। 'বর্বরের মত' হাসতে দেখে মিলিকে তিনি শিখিয়ে দিতে চেষ্টা করেন কি করে স্কেল মেপে ৪০° এ্যাঙ্গেলে সভ্য হাসি হাসতে হয়। এমন সময় হোস্টেল অথরিটির চিঠি এসে পৌঁছায় আন্টির ঘর থেকে রাত্রে একজন পুরুষকে পালাতে দেখা যাওয়ায় কেন তাকে পদচ্যুত করা হবে না, আন্টিকে তার কারণ দর্শাতে বলা হয়েছে। আন্টি বিপদে পড়েন, মেয়েরা উপায় খোঁজে। শতদল উপায় বাতলে দেয়। শতদলের পরামর্শে কর্তৃপক্ষকে আন্টি লিখিতভাবে জানান যে, ঐ পুরুষটির সঙ্গে তাঁর বিবাহ স্থির হয়ে আছে। তাতে আন্টির মান বাঁচল ঠিকই, কিন্তু দেখা দিল আইনগত সমস্যা: আন্টি ও সমীরের বিবাহ না হলে মিথ্যাচারের দায়ে আইনের কবলে পড়তে হয়। অতএব শতদলের সিদ্ধান্তে উভয়কে বিবাহ করতেই হবে। কারুর আপত্তি টেকে না।

নাটকের অভিনয় রাত্রে গ্রীনরুমে শতদল, আন্টি ও সমীরের মালা বদলের ব্যবস্থা করে। মাল্যদানের মুহূর্তটি নিভৃত করার জন্যে সকলেই সরে যায়। কেউ কারুর দিকে না তাকিয়ে মালা দিতে উদ্যত হয়; এমন সময় প্রমত্ত মাঝখানে এসে গলা বাড়াতেই দুটি মালা গিয়ে পড়ে তারই গলায়। ডলি কেঁদে ওঠে অর্থবান স্বামীটি হাতছাড়া হবার ভয়ে। প্রমত্ত ভয় পেয়ে ডলিকে নিয়ে প্রস্থান করে এবং নাটকের সমাপ্তি ঘটে।

॥ হাউস ফুল ॥

জলধর চট্টোপাধ্যায়ের সামাজিক নাটক 'হাউস ফুল' ১৯৪১ র ১৩ই ডিসেম্বর 'মিনার্ভা' থিয়েটারে প্রথম অভিনীত হয় কালিপ্রসাদ ঘোষের পরিচালনায়। 'হাউস ফুল' দর্শক সমাদৃত নাটক, 'মিনার্ভা লিমিটেড কোম্পানীর' অন্যতম সফল প্রচেষ্টা। এই নাটকের অভিনয় নিয়ে নাট্যকার এবং পরিচালকের মত বিরোধ রীতিমত বিতর্কে রূপ নেয়। ফলে এই নাটকটি খুব বেশি দিন মঞ্চস্থ হতে পারেনি এবং এই নাটকের পূর্ণাঙ্গ চরিত্রলিপি তৎকালীন প্রচলিত রীতি অনুসারে নাট্যকার গ্রন্থ মধ্যে অনাবশ্যক বোধে সংযুক্ত করেননি। 'মিনার্ভার' কুশলী অভিনেতৃবর্গ এই নাটকে অংশগ্রহণ করেছিলেন। মনোরঞ্জন ভট্টাচার্য, রঞ্জিৎ রায়, অমল ব্যানার্জী, মৃণাল ঘোষ, শিবকালী চট্টোপাধ্যায়, সুশীল রায়, ভানু চট্টোপাধ্যায়, মিহির মুখোপাধ্যায়, বিজয় নারায়ণ মুখোপাধ্যায়, কেষ্ট দাস, অপর্ণা দাস, উমা মুখার্জী, লাবণ্য দাস, নীরোদাসুন্দরী এবং রেণুকা বিভিন্ন চরিত্রে অংশগ্রহণ করেন। নাটকে সুর সংযোজনা করেন রঞ্জিৎ রায়, নৃত্য পরিকল্পনায় ছিলেন রতন সেন এবং দৃশ্যপট নির্মাণ করেন মি. মহম্মদ জান।

'হাউসফুল' যে ভাবে রচিত হয়েছিল, ঠিক সেইভাবে অভিনীত হয়নি। পরিচালক মশাই নাটকটিকে কাটছাঁট করে নাট্য-বিষয়-বিরোধী কয়েকটি স্বরচিত সংগীত সংযুক্ত করেন। পরিচালকের এই অবাঞ্ছিত হস্তক্ষেপ নাট্যকার সমর্থন করতে পারেননি। কিন্তু তাঁর আপত্তিকে বিন্দুমাত্র মূল্য না দিয়ে পরিচালক মশাই তাঁর সিদ্ধান্তে অটুট থাকেন।[২৬] ফলে উভয়ের বাদানুবাদ ক্রমে ব্যক্তিগত আক্রমণের পর্যায়ে পৌছায়। কালিবাবুকে নিবৃত্ত করতে না পেরে নাট্যকার গ্রন্থাকারে 'হাউস ফুল' প্রকাশ করেন। মুদ্রিত নাটকের শেষে কালিবাবু রচিত সংগীতগুলি পৃথকভাবে নাট্যকার তুলে দিয়েছেন। নাটকের ভাববস্তুর সঙ্গে সেগুলির অসঙ্গতি পাঠকের কাছে স্পষ্ট করে তোলাই তাঁর উদ্দেশ্য। কালিবাবু নাকি ব্যঙ্গ করে নাট্যকারকে বলেছিলেন—"মিনার্ভায় যে গান প্রয়োজন তাহা আমি (অর্থাৎ নাট্যকার) লিখিতে পারিনা-কালিবাবুই পারেন।"[২৭] এ হেন মন্তব্যে খুব সুরুচির পরিচয় নেই এবং তাকে নিঃশব্দে হজম করাও শক্ত। এইভাবে নাট্যকার-পরিচালকের অভিযোগ পাল্টা-অভিযোগের মধ্যে দিয়ে 'হাউস ফুল' কিছুকাল 'মিনার্ভা'-য় অভিনীত হয়। তবে নাট্য বিচারের ক্ষেত্রে মুদ্রিত নাটকটি ধরেই আমাদর অগ্রসর হতে হবে—কেননা পরিচালক কর্তৃক সংশোধিত রূপটি আজ আর দেখবার কোন উপায় নেই।

A passion for doing something great—মনোবিজ্ঞানের ভাষায় যাকে বলা হয় 'Megalomania'- জলধর চট্টোপাধ্যায়ের প্রহসনধর্মী 'হাউস ফুল' নাটকে এই passion তাড়িত বহু মানুষের প্রতিযোগিতার দ্বন্দ্বে সামাজিক অবক্ষয়ের চিত্র অঙ্কিত। প্রগতিবাদের উৎকট আতিশয্যে দীক্ষিত 'প্রগতি থিয়েটারের' উর্বর অঙ্গন এই নাটকের প্রধান ক্রীড়াভূমি। থিয়েটারের মালিক মাধব, পরিচালক বাণীকণ্ঠ, নাট্যকার 'নবরুচি' প্রণেতা স্বনামধন্য ঘনশ্যাম। সমাজের ভণ্ডামীর মুখোশ খুলে দিতে 'নবরুচি'-কে হাতিয়ার করে 'প্রগতি থিয়েটারের' ময়দানে এরা নেমে পড়েছেন। অভিনেতৃবর্গকে সম ভাবনায় ভাবিত করে তুলতে এই ত্রয়ীর প্রচেষ্টার অন্ত নেই। বিশেষ করে অভিনেত্রীদের প্রতি এদের আগ্রহ

---

[২৬] 'ভূমিকা'-য় নাট্যকার ক্ষোভের সঙ্গে লিখেছেন—"স্বরচিত কয়েকখানি গান ঢুকাইবার আগ্রহে পরিচালক শ্রীযুক্ত কালিপ্রসাদ ঘোষ বি.এস.সি মহাশয় নাটকখানিকে সংক্ষিপ্ত করিয়া নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে অভিনয় সম্পূর্ণ করিয়াছেন। ... কালিবাবুকে আমি বিনীত ভাবে অনুরোধ জানাইতেছি— ভবিষ্যতে তিনি যেন কোন নাট্যকারের নাটকে লেখনীসম্পাত না করেন। নাট্য রচনা ও নাট্য পরিচালনার মধ্যে যে ব্যবধান আছে, তাহা রক্ষা করিয়া চলিলে তাঁহার প্রতিষ্ঠা ও গৌরব অক্ষুণ্ণ থাকিবে। দর্শকগণও সঙ্গতিপূর্ণ সুস্থ নাটক দেখিয়া তৃপ্তিলাভ করিবেন। কালিবাবুর অপূর্ব গানগুলির ভাব ও ভাষার মধ্যে মনোনিবেশ করিলে মনে হয় তিনি আমার 'হাউস ফুল' নাটকখানি—না বুঝিয়াই পরিচালনা করিয়া ফেলিয়াছেন—ইহাকে দুর্ভাগ্য ছাড়া আর কি বলিব।"

[২৭] নাটকের শেষে পৃথকভাবে কালিবাবু রচিত সংগীতগুলির সঙ্গে তাঁর মন্তব্যটিও নাট্যকার উদ্ধৃত করেছেন। প্রসঙ্গত উল্লেখ করা যেতে পারে যে, এ হেন অবমাননাকর মন্তব্যের উত্তরে নাট্যকার একটি সংগীত রচনা করে দিলে কালিবাবু নাকি সন্তুষ্টচিত্তে সেটি গ্রহণ করেন।" ... প্রতিদিনের পরিপূর্ণ প্রেক্ষাগার এ সন্দেহ মোচন করেছে। সাধারণে নাটককে গ্রহণ করেছেন। সেই আমার পুরস্কার।" ... নাট্যকার কৃত ভূমিকা দ্রষ্টব্য।

কিঞ্চিৎ অধিক। ঘনশ্যামের নবরুচি তাদের মত ও আদর্শের আকর বিশেষ। 'নবরুচির' আক্রমণের প্রধান লক্ষ্য নারী ও পুরুষের, স্বামী ও স্ত্রীর পূর্বরাগ বর্জিত সনাতন বিবাহ ব্যবস্থা। 'নবরুচি' এবং তৎপশ্চাতে তার কর্মকর্তাগণ, সেই সঙ্গে অভিনেতৃবর্গ সেই অসার ব্যবস্থাকে ভাঙ্গতে সংকল্পবদ্ধ তবে শুধু নাটমঞ্চে নয়, ব্যক্তিগত জীবনেও তার অনুশীলনের মহৎ ব্রতে উদ্বুদ্ধ প্রাণ এরা। আর জীবন নাট্যের রঙ্গভূমিতে শ্রেষ্ঠত্বের দাবীতে এরা একে অপরের তীব্র প্রতিদ্বন্দ্বী।

বিরিঞ্চি ডাক্তারের পুত্র মদন বিলেত থেকে কেমিস্ট্রির পরিবর্তে ড্রামাটিক আর্ট স্বীকরণ করে স্বদেশে প্রত্যাবর্তন করেছে। বিলিতি কায়দায় মদন মি ম্যাডানে রূপান্তরিত। কুহু তার নায়িকা রঙ্গমঞ্চেও বটে, জীবন নাট্যেও বটে। স্ত্রী কেকা তার কাছে নিতান্তই অপ্রাসঙ্গিক। গৃহকোণের চৌহদ্দির মধ্যে স্ত্রীর প্রতিবাদহীন অবস্থান মি ম্যাডানের কাম্য। তার সমাজ পরিবর্তনের লক্ষ্যে নির্ভরযোগ্য সহচরী কেকা নয় কুহু। মঞ্চে বা মঞ্চের বাইরে কুহুর সঙ্গে পূর্বরাগের অনুশীলনে ম্যাডান সিদ্ধহস্ত। পূর্বরাগ থেকে অনুরাগ পর্ব পার হয়ে মিলন পর্যন্ত গড়াতে খুব একটা অসুবিধা হত না, যদি না ডাক্তার বিরিঞ্চি সম্পত্তি থেকে পুত্রকে বঞ্চিত করতেন। কুহুর অভিভাবিকা মাসী আবার প্রণামী ছাড়া শুষ্ক পূর্বরাগকে মোটেই আমল দেন না। কেকার প্রতি বিদ্বেষ এবং মাসীর উপেক্ষা ও তীরস্কারে ম্যাডানের সমাজ সংস্কারের ইচ্ছা বোতলবন্দ রঙীন পানীয়ের মধ্যে মুক্তি খুঁজে পায়।

ম্যাডানের অন্যায় আদেশ মানতে কেকা রাজি নয়। বাণীকণ্ঠের উৎসাহে কেকা ম্যাডানকে জব্দ করতে থিয়েটারে নামতে মনস্থ করেছে। বাণীকণ্ঠের পূর্বরাগ জমে উঠেছে কেকাকে নিয়ে। পরিচালক বাণীকণ্ঠ এবং ম্যাডান পত্নী কেকার ব্যাপারটি ম্যাডান কুহুর প্রতিরূপ। কবে কোন ছেলেবেলায় পাশের বাড়িতে থাকার সুবাদে কিশোরী কেকার প্রতি তার অঙ্কুরিত পূর্বরাগ নায়িকার প্রত্যাখ্যানে সরাসরি বিরহের দশম দশায় সমাধি লাভ করে। বর্তমানে অনুকূল পরিস্থিতিতে তাকে আবার 'নবরুচির' দৌলতে ঝালিয়ে নেবার সুযোগ পেয়ে পরিচালকমশাই কৃতার্থ বোধ করেছেন। বিবাহ নামক বন্দীদশার তুচ্ছ বন্ধন ছিন্ন করে বাস্তব জীবনেও কেকা তার গৃহ প্রাঙ্গণ আলোকিত করে তুলবে-- এই দুরাশায় বুক বেঁধেছে বাণীকণ্ঠ। তবে এ যাত্রাতে সে বিফল।

সব থেকে করুণ অবস্থা নাট্যকার ঘনশ্যামের। তার লেখা চোখাচোখা ডায়ালগ শানিয়ে তার দুপাশে দুটি পুরুষ যখন দুটি নারীর হৃদয় জয় করতে কৃত সংকল্প, তখন তার সামনে কোন নায়িকা ছিল না। একদিক দিয়ে সে মহৎ- বর্তমানে বিরিঞ্চি ডাক্তারের পেশেন্ট, কুমারী কাকলীর অবৈধ সন্তানের পিতৃত্বকে সে স্বীকার করে নিয়েছিল। কিন্তু সে বিবাহে পূর্বরাগ অনুপস্থিতই ছিল। এই অবস্থায় কাকা শ্রীযুক্ত বিচক্ষণ ভ্রাতৃকন্যা হাসিকান্নাকে ভর্তি করে গেলেন 'প্রগতি থিয়েটারে'। উন্মুখ নাট্যকার হাসিকান্নার দুর্বোধ্য হৃদয়ে পূর্বরাগের সঞ্চারে মন সংযোগ ঘটালো নিবিড় ভাবে। বারংবার ব্যর্থ হয়ে তাকে এক সময় হাসিকান্নার মনোচিকিৎসার কথাও ভাবতে হয়েছে বিরিঞ্চি ডাক্তারের অধীনে।

বিরিঞ্চি ডাক্তারের মেন্টাল হসপিটালে বিচিত্র রোগীর সমাহার। তদপেক্ষাও বিচিত্র তাঁর চিকিৎসা পদ্ধতি। একটু বেচাল দেখলেই রোগীদের তিনি প্রহারের বন্দোবস্ত করেন। যৌবনকালে কুহুর মাসী মিসেস বোসের প্রতি তাঁর বিশেষ উৎসাহ ছিল। কিন্তু বর্ণ কৌলীন্যের অজুহাতে বিবাহ পর্যন্ত তা অগ্রসর হতে পারেনি। হয়ত এই কারণেই বিরিঞ্চি বিবাহ পূর্ববর্তী প্রণয়ে আস্থাহীন। স্বামী অবাধ্য হলে স্ত্রীর দ্বিতীয় বিবাহ তিনি সমর্থন করেন - তবে তা সনাতন পদ্ধতি অনুসারে। নচেৎ সমাজ ধ্বংস হবে। সমাজ অনোনুমদিত প্রণয় তাঁর কাছে গ্রহণযোগ্য নয়। অথচ তিনি প্রাচীনপন্থী নন, বরং তুলনায় অন্য সকলের থেকে অনেক বেশি প্রগতিবাদী। কেকার থিয়েটারে অভিনয় তিনি সানন্দে সমর্থন করেন পুত্রকে ব্যভিচারের শাস্তি দিতে কুণ্ঠিত হন না। তিনি বিশ্বাস করেন যারা স্বাধীনভাবে মেয়েদের সঙ্গে মেলামেশার সুযোগ থেকে বঞ্চিত তারাই নারী স্বাধীনতার বিপক্ষে। এই গোঁড়ামী থেকে মুক্ত হওয়া সমাজের স্বার্থেই মঙ্গল। এই একটি মাত্র চরিত্রই এ নাটকে ব্যতিক্রমী।

নানা দিকের টানা পোড়েনে অবশেষে কুহু, কেকা, ম্যাডান, ঘনশ্যাম, বিরিঞ্চির জীবনে সমস্যার মেঘ ঘনীভূত হয়ে উঠেছে। থিয়েটার চালাতে ঘনশ্যামের দরকার টাকা; কুহু মনে করে মানুষের সেন্টিমেন্টেরও একটা মার্কেট ভ্যালু আছে। অতএব ম্যাডান ও কেকার মিলন ঘটাতে পঁচিশ হাজার টাকার বিনিময়ে তারা বোম্বাই পাড়ি দিতে প্রস্তুত। এইভাবে লাভ লোকসানের নিখুঁত হিসাবে সব সমস্যার সমাধান হয়. মিলন ঘটে অনুতপ্ত ম্যাডান ও কেকার। এইখানেই নাটকের সমাপ্তি।

॥ জীবন পথে ॥

বিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়ের সামাজিক নাটক 'জীবন পথে' 'রঙমহল' থিয়েটারে প্রথম পাদপ্রদীপের আলোয় আত্মপ্রকাশ করে ১৯৪২ র ১২ই ফেব্রুয়ারী। প্রধানত সামাজিক নাটক উপস্থাপনা করে 'রঙমহল' সেকালের রঙ্গমঞ্চের ইতিহাসে স্বাতন্ত্র্য অর্জন করেছিল। 'রঙমহল' কর্তৃপক্ষের এই আধুনিক দৃষ্টিভঙ্গির পরিচায়ক রূপে ৪২ এ উল্লেখযোগ্য নাট্যাভিনয়ের তালিকায় বর্তমান নাটকের অন্তর্ভুক্তি। ঐ বছরে 'রঙমহলের' সার্থক প্রযোজনাগুলির অন্যতম 'জীবন পথে' নাটক এবং এ ব্যাপারে প্রযোজক শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের কৃতিত্ব সর্বাধিক। স্বনামধন্য প্রভাত সিংহের সুচারু পরিচালনায় এবং মনীন্দ্র নাথ দাসের (নানুবাবু) মঞ্চ পরিকল্পনায় 'রঙমহলের' বিশিষ্ট অভিনেতৃবর্গ এই নাটকে অংশগ্রহণ করেন। বিভিন্ন চরিত্রে যাঁরা রূপদান করেন ঃ অশোক—শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়; চিরঞ্জীব—ভূপেন রায়; পশুপতি—কুঞ্জ সেন; নকুড়—অমূল্য হালদার; রাখাল রবি রায়; অঘোর—প্রফুল্ল দাস; নিশীথ—জহর রায়; মহামায়া—আঙ্গুরবালা; সাবিত্রী পদ্মাবতী; মায়া—শেফালিকা; সরস্বতী—বেলারাণী; কাত্যায়নী—রাণীবালা; যশোদা—রেবাদেবী। অপ্রধান চরিত্রে অংশগ্রহণ করেন ঃ মৃগেন—দেবী চক্রবর্তী; বরেণ—ললিত সিংহ; পুরোহিত—রাধাচরণ ভট্টাচার্য; ভৃত্য—দেবীতোষ রায়চৌধুরী; এবং নলিনী ও

বৈষ্ণবীর দ্বৈত ভূমিকায় শিবরাণী। গীতিকার ছিলেন শৈলেন রায়, আবহ রচনা করেন ধীরেন দাস এবং নৃত্যশিল্পী ছিলেন ব্রজবল্লভ পাল।

জীবন পথের পর্বে পর্বে বিচিত্র ঘটনার সংঘটন মানুষের জীবন প্রবাহকে পরিপূর্ণতা দান করে; সুখ দুঃখ, আনন্দ বেদনার মহামন্থনে উত্থিত অমৃতের স্পর্শ লাভে আমাদের খণ্ডিত মানব সত্তা অখণ্ডের উপলব্ধিতে উদ্ভাসিত হয়ে ওঠে। এই তাত্ত্বিক ভিত্তির ওপরে বর্তমান নাটকের কাঠামো গড়ে উঠেছে। মহাযুদ্ধকালীন বিপর্যস্ত সমাজ প্রেক্ষাপটে গড়ে ওঠা নেতিবাদী জীবন দর্শনের মর্মমূলে এ হেন প্রত্যাশাও বাসা বেঁধে ছিল। কেননা পরিস্থিতির সেই দুর্দমনীয় তাড়না থেকে মুক্তির পথ তখন অন্বেষিত হচ্ছিল। এই ক্যানভাসে সংস্থাপন করেই বর্তমান নাটকের রস বিশ্লেষণে অগ্রসর হতে হবে।

ইয়ার বন্ধু পরিবেষ্টিত উচ্ছৃঙ্খল প্রভূত ঐশ্বর্যশালী জমিদার অশোকের বিবাহ একরূপ নির্দিষ্ট ছিল তারই গৃহে আশ্রিতা বন্ধু চিরঞ্জীবের ভগিনী সাবিত্রীর সঙ্গে। অশোক সেই সম্ভাবনাকে নানা অজুহাতে কেবল বিলম্বিত করেছে। স্থির সিদ্ধান্ত গ্রহণে তার ইচ্ছাকৃত বিলম্ব, স্বামীহারা জননী এবং অনুরক্ত সাবিত্রীর উৎকণ্ঠাকেই বহুগুণ বাড়িয়ে দিয়েছে। এমতাবস্থায় ঘটনাচক্রে বিপন্ন প্রজা সদ্য বিধবা সরস্বতীর একমাত্র কন্যা মায়ার সঙ্গে তার সাক্ষাৎ, আসক্তি এবং তাকে লাভ করার বাসনা তীব্র হয়ে ওঠে। অশোকের দোদুল্যমান চিত্তের এই আকর্ষণ নিশ্চয়ই নিষ্কলুস প্রেম নয় এ তার জৈবিক প্রবৃত্তিজাত মোহমাত্র। দীর্ঘ প্রতীক্ষান্তে অশোকের এমন নির্মমতা বাসবসজ্জিকা নায়িকা সাবিত্রীর আত্মমর্যাদায় আঘাত করেছে। তাই তার সংসর্গ পরিত্যাগ অনিবার্য হয়ে ওঠে সাবিত্রীর দিক থেকে। বিপথগামী ভ্রাতা চিরঞ্জীবের সান্নিধ্যও ত্যাগ করে সে। সাবিত্রীর কাশী গমন অশোককে বিচলিত করে ঠিকই; কিন্তু তার মূলে আছে আশ্রিতা নারীর ক্ষমাহীন উপেক্ষার যন্ত্রণা। তাই তা তার চিত্তশুদ্ধির উপকরণ হতে পারেনি-- যদিও সেই প্রত্যাশাই ছিল সাবিত্রীর। নারী প্রয়োজনে সর্বস্ব ত্যাগ করতে পারে কিন্তু হৃদয়-বল্লভকে অপরের সঙ্গে বণ্টন করে নিতে সে প্রস্তুত নয়। বলা বাহুল্য নারী হৃদয়ের এই চিরন্তন সত্য উপলব্ধির মত চারিত্রিক সংযম বা শিক্ষা অশোকের ছিল না। তাই মোহমুক্তি ঘটেনি তার। যে কোন মূল্যে মায়াকে করায়ত্ত করবার দুর্বার মোহে সে কূট চক্রান্ত করে মায়াকে বিপর্যস্ত করে তোলে, যাতে সে আত্ম সমর্পণে বাধ্য হয়। মায়ার একান্ত-নির্ভর প্রেমিক নিশীথের বিরুদ্ধে অপপ্রচার সেই নির্লজ্জতারই বহিঃপ্রকাশ। ঘটনাচক্র তাকে সাহায্য করেছে, গোমস্তা নকুড়ের কূট কৌশল তাকে সহায়তা করেছে। সাফল্য যখন প্রায় তার নাগালের মধ্যে—যখন ঈপ্সিত লক্ষ্যে পদার্পণ প্রায় নিশ্চিত, প্রবৃত্তির বেগ অনেকাংশে স্তিমিত-- যুদ্ধজয়ী সম্রাটের মত অশোক তার প্রার্থিত সম্পদের দিকে ফিরে দেখবার অবসর পেয়েছে। এতদিন হৃদয়াবেগের উন্মাদনার প্রবল ঘূর্ণাবর্তে পড়ে বাঞ্ছিতের হৃদয়ের দিকে ফিরে তাকাবার অবকাশ তার হয়নি। যখন হল, সে দেখল—মায়ার অন্তর্জগৎ জুড়ে ঐকান্তিক আত্মনিবেদনের যে নির্মল প্রবাহ নিয়ত নিশীথের উদ্দেশ্য প্রবাহিত হয়ে চলেছে, কোন মূল্যেই তা তার পদপ্রান্তে এসে পৌঁছাবে না। এই প্রত্যয় তাকে আরও

নির্মমভাবে দেখিয়ে দিল, অনুরূপ যে পূজার আবাহন একদিন তার দোর গোড়ার স্বতস্ফূর্তভাবে শুরু হয়েছিল ভ্রান্তিবশতঃ তার মঙ্গলঘট সে নিজেই চূর্ণ করে এসেছে। এই বেদনাদায়ক উপলব্ধি তাকে আত্ম সংশোধনের পথ করে দিয়েছে। অতি নীচ অপদার্থের কাছেও যদি জগতের কোন প্রান্তের ভক্তিনম্র পূজা এসে আপনিই পৌছায়, তবে তার চিত্তবৃত্তির সংশোধন না হয়ে উপায় থাকে না। অর্থ, আভিজাত্য আর ক্ষমতার তীব্র অহংকার জীবনপথে অশোকের প্রতিটি পদক্ষেপকে এতকাল শৃঙ্খলিত করে এসেছে আজ সে শৃঙ্খল মুক্তঃ ভ্রাতৃত্ববোধ আর বন্ধুত্বের প্রসন্ন আলোয় উদ্ভাসিত জীবন পথের স্বচ্ছন্দ পথিক।

সাবিত্রী এ কালের মর্যাদাবোধ সম্পন্না নারী। অশোকের প্রতি আনুগত্যে তার কোথাও কোন ফাঁক ছিল না। ধ্যানমগ্না পার্বতীর মতই সে দীর্ঘ প্রতীক্ষার অবসরে নিজেকে তিলে তিলে প্রস্তুত করে তুলেছিল। এমন কি অশোকের মদ্যপান, অমিতাচার এও তার আত্মনিবেদনের পথে কোন প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করেনি। পৌরুষের অঙ্গ বলেই হয়ত সে এ সবকে গণ্য করেছিল, ক্ষমাও করেছিল। কিন্তু দ্বিতীয় নারীর প্রতি অশোকের বল্গাহীন আসক্তি তার মর্যাদাবোধের কাছে অসহনীয় হয়ে উঠে তাকে প্রতিবাদীর ভূমিকায় দাঁড় করিয়েছে। এ পর্যন্ত সাবিত্রী চরিত্রে কোন জটিলতা নেই। কিন্তু অঘোর হালদারকে সে জেনেশুনে বিবাহ করতে সম্মত হল কেন? সে কি কেবলমাত্র অশোকের ওপরে অভিমান বশতঃ? নিশ্চয় নয়। অশোক তাকে প্রতারণা করেছিল, অঘোর হালদার প্রতারণা করেনি- প্রতারকের গলায় মালা দেওয়া সাবিত্রীর পক্ষে সম্ভব ছিল না। আর অঘোর অপেক্ষা সৎপাত্র তার অভিভাবক সন্ধান করতে পারেনি, সে দায় সাবিত্রীর নয়। কন্টকাকীর্ণ জীবনপথে এই তো তার অভিসার ভগিনীর অধিকারে জমিদার বাড়িতে পুনঃপ্রবেশটুকু উপসংহার মাত্র।

মায়ার সঙ্কট আরও বেশি। একদিকে অঘোর হালদার এবং অন্যদিকে জমিদার অশোক চৌধুরীর লুব্ধ দৃষ্টির হাত থেকে রক্ষাকর্তারূপে সে নির্ভর করেছিল নিশীথের ওপর। জননী সরস্বতীও পরিত্রাতার ভূমিকায় দেখেছিলেন নিশীথকে। কিন্তু প্রবল দুই প্রতিপক্ষের তুলনায় নিশীথের শক্তি ছিল নেহাৎই কম। বিশেষ করে জমিদার গোমস্তার কূট-চক্রান্তের কাছে সে নিতান্তই হীনবল। উপরন্তু ভাগ্য তার প্রতিকূল। এ হেন অবস্থায় আকস্মিক ভাবে মায়ার জীবন থেকে ছিটকে সরে গেল সে। সাবিত্রীর পানিগ্রহণ করে প্রতিযোগিতা থেকে সরে দাঁড়ালেন অঘোর হালদার। বিপন্ন সরস্বতী এবং আরও বিপন্ন মায়া পরিত্রাতারূপে অশোক চৌধুরীকেই স্বীকার করে নিতে প্রস্তুত হল। ইতিমধ্যে দৃষ্টি হারিয়ে নিশীথের প্রত্যাবর্তন, অশোকের বোধদয়, কক্ষচ্যুত দুই প্রেমিক প্রেমিকার জীবনপথকে একই অভিমুখে ধাবিত করল।

॥ সুপ্রিয়ার কীর্তি ॥

১৯৪২ এ 'মিনার্ভা' থিয়েটারে অভিনীত প্রথম নাটক শচীন্দ্রনাথ সেনগুপ্তের 'সুপ্রিয়ার কীর্তি'। এই সামাজিক নাটকটি বছরের শুরুতে ১৯৪২-র ২৬শে ফেব্রুয়ারী প্রথম অভিনীত

হয়। এই পর্বে 'মিনার্ভায়' অভিনীত সামাজিক নাটকের মধ্যে 'সুপ্রিয়ার কীর্তি' অন্যতম। 'স্বামী-স্ত্রীর' পর এই প্রথম শচীন্দ্রনাথ সেনগুপ্তের কোন নাটক পরিচালনা করেন দুর্গাদাস বন্দ্যোপাধ্যায়। মোট চারটি সংগীতের মধ্যে প্রথম দুটি প্রণব রায়ের এবং শেষ দুটি ঝুমুর বিশারদ নিত্যানন্দ দাসের রচনা। সুর দিয়েছেন সুরশিল্পী রঞ্জিৎ রায় এবং পট নির্মাণ করেন মি মহম্মদ জান। 'সুপ্রিয়ার কীর্তি' নাটকের প্রথম অভিনয় রজনীর অভিনেতৃ তালিকাটি নিম্নরূপ : নীলাম্বর দুর্গাদাস বন্দ্যোপাধ্যায়: শ্বেতাম্বর অমল বন্দ্যোপাধ্যায়: দয়াল শিবকালী চট্টোপাধ্যায়: প্রেমেন সুশীল রায়: ডিরেক্টর— অরুণ চট্টোপাধ্যায়: অনুপম ভানু চট্টোপাধ্যায়: অদ্বৈত রঞ্জিৎ রায় (পরে শান্তি ভট্টাচার্য): মনোহর মিহির মুখোপাধ্যায়: রমেন বিজয় নারায়ণ মুখোপাধ্যায়: ডিটেকটিভ কৃষ্ণ দাস: বাড়িওয়ালা সন্তোষ শীল: পিয়ন অমূল্য মিত্র: ভৃত্য অমৃত রায়: বয় সুবোধ চৌধুরী: সুপ্রিয়া শান্তি গুপ্তা: কল্যাণী রাজলক্ষ্মী (বড়): শ্যামা উমা মুখার্জী: ভবানী ও যদুমনি নীরদাসুন্দরী: ইভা রেণুকা: আইভি দুর্গা এবং সঙ্গিনীর ভূমিকায় বীণা।

দেবতুল্য তারক রায়ের পুত্র নীলাম্বর অসংযত যৌবনাবেগের তাড়নায় ব্যভিচারের পথে পা বাড়িয়েছিল। পদস্খলন জনিত কোন আত্মগ্লানি তার নেই, বরং আত্মকৃত পাপকর্মকে সযত্নে স্ত্রী কন্যা সমাজের কাছে গোপন রেখে সামাজিক সম্মান রক্ষায় সে অতি তৎপর। নীলাম্বর এ কালের ভোগবাদী জীবন দর্শনের সঞ্জীবনী মন্ত্রে দীক্ষালব্ধ মানুষ। পাপ পুণ্যের বিচারবোধের মানদণ্ড তার স্বতন্ত্র। যে কোন মূল্যে আত্মসুখ অর্জনই তার জীবন নীতির মূল কথা পন্থা নিয়ে বিচার বিশ্লেষণের অবকাশ তার নেই, প্রয়োজনও নেই। আপ্তবাক্যের অনুশাসনে জীবনান্তে অনন্ত স্বর্গলাভের অপ্রমাণিত কাল্পনিক সুখের সম্ভাবনায় ইহজীবনে ইন্দ্রিয় দমনের নীতিতে তার আস্থা নেই। পাপ পুণ্যের ধারনাটাইতো আপেক্ষিক যুগ পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে তারও পরিবর্তন ঘটে- পরিবর্তন কাম্য। ইন্দিয়াসক্তি মানব চরিত্রের পক্ষে অপরিহার্য: বংশ মর্যাদা কিম্বা শিক্ষা অশিক্ষায় সেখানে কোন তারতম্য নেই। তারতম্য শুধু তার বাহ্যিক প্রকাশে। বংশগতি বা পারিবারিক শিক্ষা সংস্কৃতির ঐতিহ্যের প্রশ্নটিও নিতান্ত অবান্তর। কেননা ঐতিহ্যের ধারনাই এ কালের মানুষের বিচারে ভ্রান্ত। পরিবেশ পরিস্থিতি এবং ব্যক্তি মানুষের মনোগত অভিপ্রায় তার চরিত্রকে নিয়ন্ত্রণ করে। কিন্তু সমগ্র সমাজ নীলাম্বরের সমভাবে ভাবিত নয়: আপ্তবাক্যকে এক কথায় নস্যাৎ করে দিতে সমাজ পারেনা। তাই সমাজের কাছে সামাজিক বিচারে পাপকর্মকে গোপন রাখাই শ্রেয় মনে করেছে নীলাম্বর। স্ত্রী কল্যাণীর ঘৃণায়, লজ্জায় গৃহত্যাগ নীলাম্বরকে সেই সুযোগ করে দিয়েছে। যে সমাজ বিধানকে, সনাতন বিশ্বাসকে মূল্য দিয়ে কল্যাণীর সংসার ত্যাগ, সেই সমাজের চোখে কল্যাণীকে নিন্দনীয় করে তুলতে নীলাম্বরের চেষ্টার ত্রুটি নেই। কল্যাণী তার কাছে মৃত কন্যা শ্যামার কাছেও তাকে মৃত বলে প্রচার করেছে। কল্যাণীর প্রত্যাবর্তন তার পক্ষে বিপজ্জনক, অতএব তার স্মৃতিচিহ্নটুকুও নিশ্চিহ্ন করে ফেলা তার দিক থেকে আবশ্যক। কিন্তু স্মৃতি লোপ কি সত্যিই সম্ভব? অপপ্রচারে নিজের মেয়েকে, সমাজকে হয়ত ভুল বোঝানো যায়—নির্মম

সত্যকে নিজের কাছে নীলাম্বর মিথ্যা করে তুলবে কি উপায়ে? তাই নিঃসঙ্গতায়, নির্জনতায়, আলোহীনতায় কল্যাণীর প্রত্যাবর্তন আশঙ্কা তাকে শঙ্কিত করে তোলে; স্ত্রীর প্রসঙ্গ মাত্রই সে ক্রুদ্ধ হয়ে ওঠে। ক্রোধের উদ্ভব তো আত্মপক্ষ সমর্থনে যুক্তির অভাব থেকে।

নীলাম্বরের দুশ্চিন্তা তার নিজেকে নিয়ে যেমন, কন্যা শ্যামাকে নিয়েও তেমনি। পারিবারিক জীবনে শ্যামা তার একমাত্র অবলম্বন। সমাজের কাছে ধরা পড়বার ভয় অপেক্ষা শ্যামার কাছে ধরা পড়বার লজ্জা তার অধিক। বাপ হয়ে মেয়ের কাছে কৃতকর্মের জন্যে জবাবদিহি সে করতে পারেনা। শ্যামাকে দূরে পাঠাতে তাই তার মন শঙ্কিত হয়ে ওঠে। সুপ্রিয়ার কাছে নীলাম্বর ধরা পড়ে গিয়েছিল, নইলে সুপ্রিয়ার সঙ্গে মেয়েকে কলকাতায় সে পাঠাত না। তাছাড়া কল্যাণীর হঠাৎ আগমনে সুপ্রিয়ার আশ্রয় ছাড়া শ্যামাকে আড়াল করবার আর কোন নির্ভরযোগ্য আশ্রয় সে খুঁজে পায়নি। বিবাহ বা দাম্পত্য জীবন সম্পর্কে শ্যামার নিঃস্পৃহতা নীলাম্বরের দুশ্চিন্তার অন্যতম কারণ। তার গুপ্ত কাহিনী প্রকাশ হয়ে পড়লে সামাজিকতার ভয়ে অনুপমের পক্ষে পিছিয়ে যাওয়া অসম্ভব নয়। তদুপরি অনুপম শিক্ষিত হলেও রক্তমাংসের মানুষ তারই মত পুরুষ মানুষ দুর্বল মুহূর্তে তার শিক্ষা সংস্কারের নির্মোক ভেদ করে পাশব প্রবৃত্তির বহিঃপ্রকাশের সম্ভাবনা সে উড়িয়ে দিতে পারে না। কল্যাণীর মত শ্যামাও কি সেদিন সংসারের প্রতি বীতশ্রদ্ধ হয়ে পড়বে না?

দুই সহোদরা ভগ্নী আইভি ইভাকে নিয়ে দুর্ভাবনায় পীড়িত সুপ্রিয়া। অপদার্থ স্বামী শ্বেতাম্বরের ওপরে সে মোটেই নির্ভর করতে পারেনা তার না আছে বিচক্ষণতা, না আছে অর্থবল। প্রথম পর্বে সুপ্রিয়ার বেশ ভরসা ছিল ভগিনীদ্বয়ের বঙ্কিম গ্রীবা এবং যুগল ভ্রূভঙ্গির ওপরে। সেই ভরসায় সে অদ্বৈত, রমেন, প্রেমেন মনোহর এই বন্ধু চতুষ্টয়কে গৃহপ্রবেশে অবাধ ছাড়পত্র দিয়েছিল। দুর্ভাগ্য সুপ্রিয়ার, তদপেক্ষাও বেশি তার ভগিনীদ্বয়ের এ যাবৎ একটি শিকারকেও ধরাশায়ী করা যায়নি করা যে যাবে এমন আশু সম্ভাবনাও দেখা যাচ্ছিল না। অতএব বিকল্প পথ খুঁজতে হয়েছে সুপ্রিয়াকে। নীলাম্বরের গুপ্ত কথা সে জেনেছে, শ্যামার প্রণয়ভিক্ষু উচ্চশিক্ষিত তরতাজা যুবক অনুপমের সংবাদও তার অজানা নয়। গাঁয়ের ছেলেকে কাবু করা যে অপেক্ষাকৃত সহজ, এমন ধারনা করাও নগর জীবনাচারী সুপ্রিয়ার পক্ষে খুবই সম্ভব। তাই শ্যামাকে নিয়ে আসার চমৎকার পরিকল্পনা। শ্যামার আগমন মানেই অনুপমের আগমন সম্ভাবনা— আর সেই সঙ্গে উপরি হিসাবে কিছু অর্থাগম। তাতে বাড়িওয়ালার হাত থেকে নিষ্কৃতির অতিরিক্ত উপায়টিও হাতে এসে পড়ে। কিন্তু সুপ্রিয়ার হিসাবে যথেষ্ট গরমিল ছিল। অনুপম শ্যামার অপাঙ্গ হানায় পূর্বেই ধরাশায়ী। তার কল্পলোকের একমাত্র নায়িকা শ্যামা। আইভি ইভার সাধ্য কি তাকে স্থানচ্যুত করে?

সুপ্রিয়ার ভুল ভাঙ্গতে অধিক বিলম্ব হয়নি। অনুপমকে সে ভাবে এগিয়ে আসতে দেখা গেল না। অন্যদিকে তারই অনুগৃহীত বন্ধু চতুষ্টয় এই চঞ্চল গ্রাম্য বালিকাটিকে নিয়ে অতি মাত্রায় ব্যস্ত হয় উঠল। লাভের আশা তো গেলই, তার ওপরে লোকসানের

বহর যোল আনার ওপরে আঠারো আনা। অতএব যাদুমনির সাহায্যে শ্যামাকে গোপনে পাচার করে যৎকিঞ্চিৎ অর্থলাভের প্রচেষ্টা সুপ্রিয়ার। সুপ্রিয়ার সাফল্য একরকম নিশ্চিত ছিল। কিন্তু অনুপম এবং রাণীমা রূপে কল্যাণীর তৎপরতায় সুপ্রিয়ার সকল কীর্তি প্রকাশ হয়ে পড়ল। তবু অভয়ানন্দের ভাবশিষ্যা কল্যাণী ওরফে রাণীমা নির্মোহ দৃষ্টিতে বুঝেছিল সুপ্রিয়ার অপকীর্তির পশ্চাতে কোন গুঢ় অভিসন্ধি ছিল না। সংসারের দুর্বিপাকে অসহায়া এই নারী পরিত্রাণের পথ খুঁজতে গিয়ে এত বড় বিপর্যয়কে ডেকে এনেছে। নীলাম্বরের জঘন্য অপরাধের তুলনায় এ অপরাধ নগন্য। তাই মায়ের অধিকারে শ্যামাকে অনুপমের হস্তে সমপর্ণের গৌরবময় অধিকার দিয়ে গেল তাকে। আর সিনেমার হিরোদের সম্পর্কে অলীক কল্পনার মোহমুক্ত শ্যামাও ভালভাবেই বুঝতে পেরেছিল জীবনযুদ্ধে সিনেমার হিরোদের থেকে অনুপমের ওপরে নির্ভর করাই সব দিক থেকে শ্রেয়। কল্যাণীও সন্তান বাৎসল্যের মোহময় আকর্ষণ থেকে দুর্ভাবনা মুক্ত চিত্তে অভয়ানন্দের আশ্রমে ফিরে যাবার পথ খুঁজে পেল।

নাটকের পরিণতিতে নীলাম্বর তার অপরাধ স্বীকার করে নিয়ে 'মায়ায় মজে' পরিত্রাণের পথ খুঁজে পেয়েছে। কিন্তু প্রথম রচনাকালে নাটকের পরিণতি অন্যরূপ ছিল। সেখানে নীলাম্বর আত্মগ্লানিতে শেষ পর্যন্ত আত্মহত্যা করে। প্রথম তিনরাত্রি নাটকটি সেইভাবেই অভিনীত হয়েছিল। নীলাম্বরের আত্মহত্যা দর্শকদের মধ্যে বিরূপ প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করে। সেকালের দর্শক আত্মহত্যার ঘটনাটিকে মেনে নিতে পারেননি। ফলে তিনরাত্রি অভিনয়ের পর নাট্য পরিণতির বর্তমান পরিবর্তন করেন নাট্যকার। তবে নীলাম্বরের আত্মহত্যাকেই যুক্তিসম্মত এবং শিল্প সম্মত বলে রায় দিয়েছেন নাট্যকার। ভূমিকায় তিনি স্পষ্ট ভাষায় তাঁর অভিমত ব্যক্ত করেছেন।[২৮]

॥ দুই পুরুষ ॥

প্রথিতযশা ঔপন্যাসিক তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রথম মৌলিক নাটক[২৯] 'দুই পুরুষ' 'নাট্যভারতী' রঙ্গমঞ্চে ১৯৪২ র ২৮শে মে প্রথম মঞ্চস্থ হয়। তৎপূর্বে 'পিতা-পুত্র' নামে নাটকটি 'শনিবারের চিঠিতে' ধারাবাহিক ভাবে প্রকাশিত হতে থাকে এবং গ্রন্থাকারে ওই নামেই তা মুদ্রণের কাজও শুরু হয়ে যায়। এই সময় 'নাট্যভারতী'

---

[২৮] "আমি প্রথমে নাটকখানি বিয়োগান্ত করেছিলাম। আমার বিশ্বাস নীলাম্বর মেয়ের কাছে যেমন মিথ্যা কথা বলতে পারে না, তেমন মেয়ের প্রশ্নের জবাবে নিজের অতীত ব্যভিচারের কথা স্বীকার করে মেয়ের চোখে ছোট হয়ে বেঁচে থাকতেও পারে না। আমি তাই তাকে দিয়ে আত্মহত্যাই করিয়েছিলাম। কিন্তু দর্শকদের সকলে নীলাম্বরের আত্মহত্যা পছন্দ করতেন না, হয়ত ভাবতেন ওটা অমানুষিক ব্যাপার। তাঁদের প্রীতি দেবার জন্যে নীলাম্বরকে মায়ায় মজিয়ে আমি বাঁচিয়ে রেখেছি। সখের জন্যে যাঁরা অভিনয় করবেন তাঁরা নীলাম্বরকে দিয়ে আত্মহত্যা করালেই আমি খুশি হব।" নাট্যকার।

[২৯] তারাশঙ্করের প্রথম নাটক 'কালিন্দী' ঐ নামীয় উপন্যাসের নাট্যরূপ। নাটক হিসাবে 'দুই পুরুষ' তাঁর প্রথম রচনা। সেই হিসাবে 'দুই পুরুষ' কে তাঁর প্রথম নাটক বলা চলে।

কর্তৃপক্ষ নাটকটি অভিনয়ের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। তখন 'পিতা-পুত্র' নামটি পরিত্যক্ত হয়ে সর্ব সম্মত সিদ্ধান্তে 'দুই পুরুষ' নামে নাটকটি 'নাট্যভারতীতে' আত্মপ্রকাশ করে। বর্তমানে ওই নামেই তা পরিচিত। শ্রীযুক্ত নরেশচন্দ্র মিত্র এবং শ্রীযুক্ত সতু সেনের যৌথ পরিচালনাধীনে 'দুই পুরুষ' প্রথম অভিনীত হয়ে দর্শক মহলে বিপুল আলোড়ন সৃষ্টি করে। সে আলোচনার পূর্বে এই নাটকের প্রথম অভিনয়ের অভিনেতৃ তালিকাটি এখানে পেশ করা জরুরী। যথা ঃ নুটবিহারী—ছবি বিশ্বাস; শিবনারায়ণ—যোগেশ চৌধুরী; দেবনারায়ণ—কালী সরকার; সুশোভন—জহর গাঙ্গুলী; মহাভারত—রবি রায়; ভগবান—শান্তি চক্রবর্তী; অরুণ—ফিরোজাবালা; কমলাপদ—তুলসী চক্রবর্তী; বরুণ—মিহির ভট্টাচার্য; গোপীনাথ—নরেশচন্দ্র মিত্র; চাপরাশী—আকাশচন্দ্র দে; কালী বাগদী—শান্তি দাশগুপ্ত; মোড়ল—কুমার মিত্র; রাজেন—বিজয়কার্তিক দাস; বিপিন—বিপিন বসু; পুলিশ—সুধীর গুপ্ত; ইনস্‌পেক্টর—দ্বিজেন ঘোষ; জজ—ভোলানাথ শীল; বিমলা—শ্রীমতী প্রভা; সাতু—রাজলক্ষ্মী; কল্যাণী—অঞ্জলি রায়; শ্যামা—শান্তিলতা ও ছায়া দেবী; মমতা—গীতা ও পূর্ণিমা দেবী; জমিদার গৃহিণী—রেণুবালা; এছাড়া জগবন্ধু চক্রবর্তী, বেচু দত্ত, গিরিন ঘোষ, উমাপদ দাস, সলিল বন্দ্যোপাধ্যায় ও সুশীল রায়, গোপীনাথ দে, মোহনলাল যাগ্লিস, বিশ্বনাথ কুণ্ডু, গোপাল নন্দী, প্রভাস বস্, মনোরঞ্জন ভট্টাচার্য, হরিমতি, প্রতিভাবালা, বন্দনা, নির্মলা, মহামায়া, সন্ধ্যারাণী, বীণাপাণি, সত্যবালা, আশালতা, প্রমুখ। নেপথ্য বিধানে ছিলেন ঃ প্রযোজক—শিশির মল্লিক; সুর—দুর্গা সেন; নৃত্য পরিকল্পনা—হেমেন্দ্র কুমার রায়; এবং ব্যবস্থাপক—বিজয়কৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়।

'দুই পুরুষ' 'নাট্যভারতী' র সফলতম প্রচেষ্টাগুলির অন্যতম। সমকালীন নাট্য রসিক দর্শকের কাছে এই নাটক একটা স্বতন্ত্র ভাবাবেগ সৃষ্টি করেছিল। এর আবেদন নাট্যজগতে নতুন দিগন্তের উন্মোচক বলেই সেদিন গণ্য হয়েছিল। সমকালের বিচারে ঃ

'Dui Purush', is keyed upto a high level of an incisively stirring social drama—with its story-fabric masterfully woven, its characters tacitly living and human, and its entire trend revealing thoughts which are broadbased on the deep study of a modern social conflict. The whole thing intensely alive, will find its response into the heart-string of the audience. Plays like 'Dui Purush' can hold up a new tradition of our stage, reflecting new life and appeal."[৫০]

সমাজ বিবর্তনের প্রেক্ষাপটে আধুনিক জীবন দর্শনের চেতনায় উদ্বুদ্ধ মানব-মনে আদর্শ ও মূল্যবোধের বিপর্যয়, তার জটিল মানসিক ক্রিয়া প্রতিক্রিয়ার দ্বন্দ্ব নাট্যকার স্পষ্ট ও প্রত্যক্ষ করে তুলতে চেয়েছেন এই নাটকে; এইখানেই এই নাটকের বিপুল জনপ্রিয়তার উৎস লুকিয়ে আছে।[৫১]

---

৫০ 'The Amrita Bazar Patrika', 15th June, 1942

৫১ "...the play presents itself as a perfect specimen of a neat drama, masterfully woven by a magic hand, neatly executed with finished touches of productional finesse, and re-created by a nicely co-ordinated band of artists."- The Amrita Bazar Patrika, 28th June, 1942

আদর্শনিষ্ঠ দেশ-সেবক নটবিহারীর লোককল্যাণে আত্মোৎসর্গের ব্রত, তাকে লক্ষ্মীর বরপুত্র জমিদার শিবনারায়ণের বিরুদ্ধে সংঘর্ষে লিপ্ত করেছে। কেননা জমিদারের পীড়ন ও অত্যাচারের হাত থেকে বিপন্ন প্রজাকে রক্ষা করাই নুটুর জীবনাদর্শ। এই সংঘর্ষের অনল অনিবার্যভাবে নুটুর পারিবারিক জীবনকেও বহুভাবে দগ্ধ করেছে। দরিদ্র, বিপন্ন মানুষের জন্যে তার ন্যায় বিচারের প্রার্থনা শোচনীয় ব্যর্থতায় হাহাকার করে উঠেছে। বিচার ব্যবস্থা তো প্রহসন মাত্র তা ধনবানের স্বার্থ সুরক্ষায় তৎপর, অর্থহীন বিপন্নকে রক্ষার কোন দায় তার নেই। ধনবান জমিদারের বিরুদ্ধে নুটুর অভিযোগ সেখানে প্রমাণিত হতে পারে না। অথচ এই সংগ্রামে নুটুকে জিততেই হবে - এ তার মর্যাদার লড়াই, তার আদর্শ ও নীতি প্রতিষ্ঠার লড়াই। তার জন্যে যে কোন মূল্য দিতে সে প্রস্তুত। অদম্য মনোবলে নুটু অবশেষে তা অর্জন করে জমিদার শিবনারায়ণকে পরাভব স্বীকার করতে হয় তার কাছে। এই বিজয় গৌরব, সামান্য মোক্তার থেকে উকিলে পরিণত নুটুর সম্মুখে উন্মোচিত করে দেয় অর্থ, প্রতিপত্তি, খ্যাতি আর আত্মপ্রতিষ্ঠার সহস্র প্রলোভন। শুধুমাত্র আদর্শের তাগিদে সেখান থেকে প্রত্যাবর্তন তখন তার পক্ষে অসম্ভব। তারই আদর্শে অনুপ্রাণিত বিমলা, কল্যাণী, মহাভারত, অরুণ কিম্বা শ্যামার সেই আদর্শের আত্মিক নির্ভরতার আশ্রয়টুকু নিঃশেষ করে দিতে নুটু বদ্ধ পরিকর। নটবিহারীকে অবলম্বন করে বৃহত্তর সমাজ পরিবর্তনের ইঙ্গিত দিতে চেয়েছেন নাট্যকার। কিন্তু তা নাটকীয় ঘাত প্রতিঘাতের মধ্যে দিয়ে সার্থক ভাবে রূপায়িত হতে পারেনি। পিতা পুত্রের সংঘাতও ঠিকমত দানা বেঁধে উঠতে পারেনি। কাজেই জনপ্রিয় হলেও 'দুই পুরুষ' নাটক হিসাবে খুব পরিণত রচনা নয় একথা সত্যের খাতিরে স্বীকার না করে উপায় নেই।

'দুই পুরুষ' ঔপন্যাসিকের কলমে লেখা নাটক, এই নাটকে উপন্যাসের বিস্তৃতি আছে, তত্ত্ব আছে, জীবনদর্শন আছে কিন্তু নাটকীয় উৎকর্ষ [illegible] নেই। এ যেন নাট্যকাকারে লিখিত উপন্যাস। উপন্যাস ও নাটকের যে শিল্প কৌশলগত পার্থক্য আছে, নাট্যকার তা অক্ষুন্ন রাখতে পারেননি। এই কারণে এর ভাববস্তু ঐতিহাসিক দিক থেকে নির্মম সত্য হলেও নাটকীয়তা সৃষ্টিতে ব্যর্থ হয়েছে।

নাটকের অন্যতম বৈশিষ্ট্য ব্যক্তি চরিত্রের দ্বন্দ্বময় অভিব্যক্তি- অর্থাৎ নাটককে শুধু কাহিনী নির্ভর হলে চলে না, বিভিন্ন চরিত্রের দ্বন্দ্ব সংঘাতের মধ্যে দিয়ে নাট্যকাহিনী পরিণতি লাভ করে। এই নাটকে একমাত্র নটবিহারী ছাড়া অপর কোন চরিত্রেই আমরা তার বিশেষ আভাস পাইনা। মহাভারতের প্রতি জমিদারের বঞ্চনাকে উপলক্ষ করে নুটু জমিদারের বিরুদ্ধে সংঘর্ষে লিপ্ত। তার অনুসৃত আদর্শকে সে এই বিরোধের সঙ্গে গ্রথিত করে নিতে পেরেছে। তার উত্থান থেকে পতনের মধ্যে অস্পষ্ট হলেও মনোজগতের ভাঙ্গা গড়ার একটা ইতিবৃত্ত আছে। বিমলা স্বামীর আদর্শে শ্রদ্ধাশীলা—অর্থের প্রতি তার লালসা না থাকতে পারে কিন্তু অর্থের প্রয়োজন সে অস্বীকার করতে পারে না। সামাজিক মর্যাদাহানীর যন্ত্রণাও সে বোঝে। অথচ প্রবৃত্তির এই টানা পোড়েনেও সে যেন অনেকটাই নি[illegible] নুটুর প্রাক্তন প্রেয়সী। অকাল-বৈধব্যে আশ্রয়হীনা এই নারী নুটুরই

শরণাগত। নটুর লোক কল্যাণের আদর্শে দীক্ষা গ্রহণ করে অনুগত ভগিনীর মত সে সাধন-মার্গে প্রতিষ্ঠা লাভ করে ব্যক্তি জীবনের চাওয়া-পাওয়াকে অবিশ্বাস্য ভাবে উপেক্ষা করেছে। বিমলার পক্ষেও তাকে সহজ ভাবে গ্রহণ করা যথেষ্ট শক্ত। জমিদার শিবনারায়ণের প্রবল প্রতিপক্ষ নটুবিহারীর ঘরে নাতনীর বিবাহের পরিকল্পনা যতটা আকস্মিক ততটাই তার চরিত্রের সঙ্গে অসঙ্গতিপূর্ণ তুলনামূলক ভাবে মহাভারত এবং সুশোভনের চরিত্র অনেক বেশি জীবন্ত। নটুর ওপর অগাধ বিশ্বাস এবং শ্রদ্ধায় মহাভারত জমিদারের বিরুদ্ধাচারী। কোনপ্রকার দমন-পীড়নই তাকে টলাতে পারেনি। সেই নটুর নিজ আদর্শ বিস্মরণে মহাভারতের বিশাল হৃদয়ের ক্ষোভ এবং বেদনা সহানুভূতির উদ্রেক করে। সুশোভনের জীবন ট্র্যাজেডীও যথেষ্ট সমবেদনার সঙ্গে অঙ্কিত হয়েছে।

নাটকের সংলাপ বুদ্ধিদীপ্ত এবং চমৎকার। কিন্তু চরিত্রোপযোগী সংলাপ সব ক্ষেত্রে হয়নি। এই নাটকে সব চরিত্রের ভাষাই একরকম। শিক্ষিত এবং অশিক্ষিত জনের ভাষায় খুব একটা পার্থক্য নেই। একে নাটকের ত্রুটি হিসাবেই গণ্য করতে হবে এবং এই ত্রুটি সচেতন পাঠকের দৃষ্টি এড়ায়না। তবে স্থূলরুচী শিবনারায়ণের সংলাপে তার চরিত্রের প্রতিফলন ঘটেছে সুন্দরভাবে।

এই নাটকে বেশ কয়েকটি সংগীত বিভিন্ন সিচুয়েশনে নাট্যকার সংযোজন করেছেন। সংগীত রচনায় এবং তার সুচারু প্রয়োগে তারাশঙ্কর সিদ্ধহস্ত। এই নাটকেও তার কোন ব্যতিক্রম ঘটেনি। সংগীত এই নাটকের নিঃসন্দেহে একটা বাড়তি আকর্ষণ।

॥ ডাক্তার ॥

১৯৪০ এ 'মিনার্ভা লিমিটেড কোম্পানী' গঠনের পর থেকে সেখানে মোটামুটি ভাবে সামাজিক নাটকেরই প্রাধান্য লক্ষ্য করা যায়। প্রবল প্রতিকূল অর্থনৈতিক অবস্থার মধ্যে সেখানে অভিনীত হতে থাকে প্রধানত নতুন স্বাদের সামাজিক নাটকগুলি। গৌতম সেনের 'ডাক্তার' তন্মধ্যে অন্যতম। ক্ষুদ্র পরিসরের নাটক 'ডাক্তার' 'মিনার্ভা' থিয়েটারে ১৯৪২ র ৬ই জুন প্রথম আত্মপ্রকাশ করে। মাত্র পাঁচটি দৃশ্যে নাট্যকাহিনী বিধৃত হয়েছে। নাটকের আঙ্গিক নিয়ে নানারকম পরীক্ষা নিরীক্ষা এ নাটকেও লক্ষ্যণীয় হয়ে উঠেছে। তবে নাটকটি দর্শক সমাজে বিশেষ সাড়া জাগাতে পারেনি এবং 'মিনার্ভার' তৎকালীন অর্থ সঙ্কট মোচনেও তেমন সহায়ক হতে পারেনি। তার অন্যতম কারণ, অভিনয়ে উৎকর্ষতা থাকলেও নাট্য কাহিনীতে নাট্যকার নতুনত্বের সন্ধান দিতে পারেননি। সাধারণ মানের নাটক হিসাবেই এটিকে গণ্য করতে হবে।

শ্রীযুক্ত দুর্গাদাস বন্দ্যোপাধ্যায়ের পরিচালনায় 'মিনার্ভা' মঞ্চে নাটকটি প্রথম মঞ্চস্থ হয়। প্রথম অভিনয় রজনীতে উল্লেখযোগ্য চরিত্রে রূপদান করেন : শেখরনাথ—দুর্গাদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, সোমনাথ—ভূমেন রায়, ডাক্তার—অমল বন্দ্যোপাধ্যায়, মি. মুখার্জী—শিবকালী চ্যাটার্জী, রজত—দেবী চক্রবর্তী, বিজন—মিহির মুখোপাধ্যায়, বোম্রমিন—শান্তি ভট্টাচার্য, ইব্রাহিম—চণ্ডী অধিকারী, অশ্রুমতি—শান্তি গুপ্তা, বিন্দুবাসিনী—রাজলক্ষ্মী (বড়), মিসেস

মুখার্জী লাবণ্য দাস, কুন্তলা উমা মুখার্জী, উত্তরা—প্রকৃতি ঘোষ এবং মণিমালার ভূমিকায় নীরোদা সুন্দরী দেবী। মঞ্চশিল্পী ছিলেন মি মহম্মদ জান এবং সুরারোপ করেছিলেন শ্রীযুক্ত নিত্যানন্দ দাস।

যুগের প্রতিনিধিত্ব করবার মত উপকরণ অঙ্গীকৃত করে 'ডাক্তার' নাটকের কাহিনী ভাগ নির্মিত হয়নি। অনেকটা ইংরেজি ক্রাইমের ধাঁচে নাটকটি রচিত। স্যার প্রতাপ নারায়ণের বংশ মহিমার গর্বে গর্বিত দৃষ্টিহীন শেখরনাথের জীবন নাট্যের রঙ্গভূমিতে দুষ্ট গ্রহের মত অবতীর্ণ ডাক্তার গজপতি ওরফে ডা জি চ্যাটার্জী। দৃষ্টিশক্তি রহিত শেখরনাথের কাছে গজপতির আবির্ভাব দ্বৈত সত্তায়। অথচ শেখরনাথের কাছে তার এই কৌশল সম্পূর্ণ অজ্ঞাত। গজপতির কাছে বহু ঋণে ঋণী শেখরনাথ। সে ঋণ পরিশোধের ক্ষমতা তার নেই। শেখরনাথের এই অক্ষমতা গজপতির কার্যসিদ্ধির প্রধান উপায় স্বরূপ। ঋণ পরিশোধ হওয়া নয় না হওয়াটাই তার কাম্য। গজপতির লক্ষ্য অর্থের প্রতি যতটা, তদপেক্ষা অনেক বেশি শেখরনাথের বিদুষী কন্যা অশ্রুর 'তণু দেহ' র প্রতি। সে কথা উচ্চকণ্ঠে ঘোষণা করতেও তার প্রবৃত্তি বাধা দেয় না। এই তীব্র লালসা চরিতার্থ করণের নিমিত্ত তার ভাল মানুষ ডাক্তারের ভূমিকায় আত্মপ্রকাশ। গজপতির ভূমিকায় সে শেখরনাথকে পীড়ন করে, রূঢ় ভাষায় তার প্রাপ্য দাবী করে, শেখরনাথের ওপরে তীব্র মানসিক চাপ সৃষ্টি করে রাখে, আবার পর মুহূর্তেই ডাক্তারের ছদ্মবেশে শেখরের দিকে সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দেয় গভীর সহানুভূতিতে। অশ্রুকে লাভের পথ সুগম করতে ডাক্তারের ছদ্মনামে শেখরনাথের অনুকম্পা অর্জনে তার এই অদ্ভুত প্রচেষ্টা, তার নিজেরই সমাধি রচনার পথ প্রশস্ত করেছে। কিন্তু পরিশীলিত জীবন বোধের পশ্চাতে উচ্চ আদর্শের যে শক্তি চূড়ান্ত পতনের মধ্যেও মানুষকে ট্র্যাজিক মহিমায় মহিমান্বিত করে তোলে, গজপতি ওরফে ডাক্তারের জীবন নীতি তার সম্পূর্ণ বিপরীত বলে ট্র্যাজিক চরিত্রের পর্যায়ে এ চরিত্রটি উন্নীত হতে পারেনি। প্রেমের অতীন্দ্রিয় অনুভূতি একালের জীবন জটিলতায় কাম্য নয় সত্য—কিন্তু অশ্রু কিম্বা উত্তরা, ডাক্তার গজপতির নিলর্জ্জ কামনার বহ্ন্যুৎসবে কেবল শারীর মূল্যে নির্বাচিত দুই নারী! তার পশ্চাতে হৃদয়-ঘটিত কোন হেতু নেই।

গজপতির বিপরীতে শেখরনাথের জীবনের অতীত জুড়েও আছে শৃঙ্খলাহীন নাগরবৃত্তির উন্মত্ততা। তার বল্গাহীন জীবন চর্যার সূত্র ধরে জন্ম নিয়েছে তার অবৈধ সন্তান সোমনাথ। এতদিন তার কৈফিয়ৎ দেবার সময় আসেনি; সময় এসেছে তখন, যখন স্বয়ং সোমনাথ পিতার কাছে এসে জানতে চেয়েছে তার যথার্থ পরিচয়। ডাক্তার গজপতির সময়োচিত অঙ্গুলি হেলনে, বংশ মর্যাদার প্রশ্নে পিতা ও পুত্র সংঘাতের মুখোমুখি উপস্থিত। অথচ আধুনিক মনন-সঞ্জাত শেখরনাথকে পাপ বোধ পীড়িত করেনা—তার নীরবতা অতীতকে গোপন করবার ব্যর্থ প্রচেষ্টা সন্তানের কাছে তার অপরাধকে সত্য করে তোলে। শেখরের ভগিনী বিন্দুবাসিনীর অন্তিম প্রচেষ্টাও শেষ পর্যন্ত বিফলে যায়। উপসংহারটুকু টেনে দেন স্বয়ং ডাক্তার—সোমনাথের কাছে শেখরনাথের অতীত ইতিহাস অনাবৃত করে দিয়ে।

কিন্তু হিসাবে একটু ভুল ছিল গজপতির। নিজের জড়ানো জালে অবশেষে সে নিজেও জড়িয়ে পড়ে: ছয়টি ক্রাইমের দায়ে পুলিশের হাতে গ্রেপ্তার বরণ করতে হয় তাকে। তবু এত ঘটনার পরেও ডাক্তার ও গজপতির অভিন্ন সত্তা শেখরনাথের কাছে কেমন করে যে অজ্ঞাত থেকে গেল, সেইটিই আশ্চর্যের কথা।

ইংরেজি মিশ্রিত বাংলা ভাষা এবং পাশ্চাত্ত্য প্রভাব পুষ্ট নব্যতন্ত্রের প্রতি সরাসরি কটাক্ষ আছে এ নাটকে। রমেন বোস বা বোস রমেন ইংরেজী কায়দায় হয়ে উঠেছেন বোস্রামিন: ইংরেজ, ব্রাহ্ম, হিন্দু, মুসলমানের শোভন সমন্বয় ইব্রাহিম। বেলেল্লাপনার চূড়ান্ত নিদর্শন মিসেস মুখার্জীর সঙ্গে রজতের অবৈধ প্রণয় দৃশ্যে নব্য কালচারের প্রতি নাট্যকারের ইঙ্গিতটি সুস্পষ্ট। জীবনের অসঙ্গতিকে নাটকের বিষয় করে তোলা যেতে পারে সত্য কিন্তু তার পশ্চাতে নাট্যকারের নির্মোহ দৃষ্টির অভাব ঘটলে তা কখনই শোভন শিল্পরূপের মর্যাদা দাবী করতে পারে না। এই খানেই এ নাটকের ব্যর্থতা।

প্রফেসরের কন্যা কুন্তলা ও সোমনাথের রোমান্টিক প্রণয় দৃশ্য আমাদের প্রতি মুহূর্তে রবীন্দ্রনাথের 'শেষের কবিতা' র অমিত লাবণ্যের কথা স্মরণ করিয়ে দেয়। রবীন্দ্রনাথ অমিত লাবণ্যের প্রেমকে রোমান্সধর্মীতার চূড়ান্ত পর্যায়ে পৌঁছে দিয়েছেন। সে প্রেম সূক্ষ্ম অশরীরী ভাবের পক্ষ সঞ্চালন করে মর্ত্যভূমের কঠিন শিলাতটে স্বর্গীয় সুধা আনয়ন করে। এ নাটকে সোমনাথের প্রণয়ী কুন্তলা যুদ্ধ, দুর্ভিক্ষ, মহামারী পীড়িত অনিশ্চিত সামাজিক জীবনের বাস্তব অভিজ্ঞতালব্ধ আধুনিকা নারী। অর্থহীন রোমান্টিক কল্পনা বিলাস তার আসন্ন দাম্পত্য ভাবনায় কিছুমাত্র রেখাপাত করতে পারে না। সোমনাথের ভবিষ্যৎ সংসার যাত্রা নিয়ে অতি মাত্রায় স্বপ্নবিলাস কুন্তলার নিরেট বাস্তবতা বোধের কাছে নিতান্তই মূল্যহীন।

॥ চিরন্তনী ॥

বিধায়ক ভট্টাচার্যের সামাজিক নাটক 'চিরন্তনী' 'মিনার্ভা' থিয়েটারে ১৯৪২ র ১৫ই জুলাই প্রথম মঞ্চস্থ হয়। প্রখ্যাত নট ও নাট্য পরিচালক শ্রীযুক্ত দুর্গাদাস বন্দ্যোপাধ্যায় নাটকটি পরিচালনা করেন। 'মিনার্ভা' থিয়েটারে অভিনীত এই পর্বের সামাজিক নাটকগুলির মধ্যে 'চিরন্তনী' অন্যতম। নাটকটি সেকালের দর্শক সমাজে যথেষ্ট জনপ্রিয়তা অর্জন করেছিল। 'চিরন্তনী' র প্রথম অভিনয় রজনীতে 'মিনার্ভা' র বিশিষ্ট অভিনেতৃবর্গ অংশ গ্রহণ করেছিলেন। নাটকটির রস বিচারের পূর্বে অভিনেতৃ তালিকাটি এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে ঃ হরিহর – অমল বন্দ্যোপাধ্যায়; সোমেন – ভূমেন রায়; শিশির – দেবী চক্রবর্তী; ডাক্তার নাগ ওরফে বাসুকী – দুর্গাদাস বন্দ্যোপাধ্যায়; রাজেন – শান্তি ভট্টাচার্য; নিধিরাম – যুগল দত্ত; পরেশ – আদল চট্টোপাধ্যায়; দারোয়ান – সন্তোষ শীল; শিবেন – পশুপতি সামন্ত; কালী – নরেন চক্রবর্তী; সাবজজ – শিবকালী চট্টোপাধ্যায়; বিলোল বটব্যাল – মিহির মুখোপাধ্যায়; কেয়া – শান্তি গুপ্তা; শিখা – রাজলক্ষ্মী (বড়); হেনা – রেণুকা; লীলা – লাবণ্য দাস; মীনা – প্রকৃতি ঘোষ; বেবী – বীণা; মিস চ্যাটার্জী – নীরদা সুন্দরী; এবং

রবীন ভট্টাচার্য, অমৃত রায়, ললিত ঘোষ, কানাই বন্দ্যোপাধ্যায়, জ্যোতি গুপ্ত, কমলা, ইন্দু, প্রভা ও পরী। নাটকে সুর সংযোজনা করেন অনিল বাগচি এবং মঞ্চশিল্পী ছিলেন মি মহম্মদ জান।

'চিরন্তনী' অভিনয় সাফল্য অর্জন করলেও সমকালীন সমাজ জীবনের কোন গূঢ়তর সমস্যা এই নাটকে প্রতিফলিত হয়নি। অর্থাৎ নাট্যকারের সমাজ সচেতনতার সাক্ষ্য বহন করছে না এই নাটক। জমিদার তন্ত্রের অবক্ষয় এবং তজ্জনিত আমাদের পারিবারিক ও সামাজিক জীবনে ঘনীভূত সমস্যার ওপর ভিত্তি করে বর্তমান নাটকের পরিকাঠামো গ'ড়ে উঠেছে। সেই সমস্যাও ঠিকমত দানা বেঁধে ওঠেনি বা তার সমাধানের কোন প্রকার ইঙ্গিতও এখানে পাওয়া যায় না। যুদ্ধকালীন জীবন সঙ্কটের সঙ্গে এই নাটকের প্রত্যক্ষ যোগাযোগ যৎসামান্যই। বিধায়ক ভট্টাচার্যের অন্যান্য সামাজিক নাটকগুলিতে সমকালীন সমাজের বহুবিধ সমস্যা যে ভাবে গভীর মননশীলতার সঙ্গে অঙ্কিত হয়েছে, এই নাটকে সমাজ অনুসন্ধিৎসার সেই বিশ্লেষণী দৃষ্টিভঙ্গি অনেকটাই অনুপস্থিত।

হরিহর চৌধুরী দেবীপুরের প্রবীণ জমিদার। পিতৃপুরুষের লোভ, মোহ আর লাম্পট্যের কলুষিত রক্তধারা তাঁর ধমনীতে প্রবাহিত উত্তরাধিকার সূত্রে সেই ঐতিহ্যকে তিনি বহন করে চলেছেন। পূর্বপুরুষের অর্জিত উপার্জিত বিত্ত সম্পত্তির মত লাম্পট্যের এই উত্তরাধিকারও তাঁর কাছে নিতান্ত স্বাভাবিক: এ নিয়ে তাঁর বিন্দুমাত্র সংশয় নেই। বরং সাধারণের সঙ্গে আত্মপৃথকীকরণে এও তাঁর অন্যতম মানদণ্ড। এইরূপ নৈতিকতায় বিশ্বাসী হরিহর চৌধুরী যৌবনের প্রারম্ভে ডা নাগের বাকদত্তা মীনাকে প্রলুব্ধ করে বিপথে চালিত করেন। হরিহরের অর্থ, আভিজাত্য আর বিলাসিতার মোহে মীনা সহজেই প্ররোচিত হয়। লম্পট পুরুষের একটা সহজাত অতিরিক্ত মনোহরণকারী শক্তি থাকে, যার সাহায্যে তারা বাঞ্ছিত নারীর কাছে নিজেকে সর্বাপেক্ষা নির্ভরযোগ্য করে তুলতে সক্ষম, নইলে তার লাম্পট্যই অর্থহীন হয়ে পড়ে। নারীর পক্ষে নির্ভরতার এই মোহময় আকর্ষণ উপেক্ষা করা যথেষ্ট শক্ত। প্রবঞ্চনার শত দৃষ্টান্তও তাকে ঠেকাতে পারে না। জগতে প্রেমের নামে প্রতারণার মূলে এই সত্যটিই নিহিত আছে; মীনাও প্রতারিত হয়েছে। জমিদার হরিহর চৌধুরীর বিলাসকলার উপান্তে এসে সে উপলব্ধি করেছে তার জীবনের মর্মান্তিক পরিণতি। পরিত্রাণের কোন পথই সেদিন খুঁজে পায়নি সে। ব্যর্থ প্রেমের ফলশ্রুতি গর্ভজাত শিশু কন্যাটিকে ডাক্তার নাগের হাতে তুলে দিয়ে তাকে চির বিদায় নিতে হয়েছে। ভাগ্যের নিদারুণ পরিহাসে সেদিনের সেই শিশুকন্যা কেয়ার যৌবনের মদিরায় প্রবলভাবে আসক্ত হরিহরের কনিষ্ঠ পুত্র সোমেন। তাকে প্রতিহত করার শক্তি বা সামর্থ ছিলনা হরিহরের। কেননা সোমেন যে তারই উত্তরসূরী। হরিহরের রক্তধারায় পূর্বপুরুষের যে পাপ আর ব্যভিচারের স্রোত প্রবহমান, সোমেনের রক্তও যে তারই দ্বারা সংক্রামিত। নিরাময়ের উপায় অন্বেষণে বিভ্রান্ত হরিহরকে শেষ পর্যন্ত তাই ছুটে যেতে হয়েছে ডা নাগের কাছে।

এই নাটকের সর্বাপেক্ষা জটিল চরিত্র নিঃসন্দেহে ডা নাগ ওরফে বাসুকী। কুৎসিৎ দর্শন বাসুকী, ডাক্তার নাগের 'বিকৃত মনের কুৎসিত প্রকাশ' এ ছাড়া তার কোন পৃথক অস্তিত্ব নেই। প্রথম যৌবনে বাকদত্তা মীনাকে ঘিরে তার রচিত স্বপ্নসৌধ ভেঙ্গে চুরমার হয়ে গেছে হরিহরের লাম্পট্যের কৌশলে। সেই যন্ত্রণা, ব্যর্থতা আর প্রতিহিংসার জ্বলন্ত আগুন তার চিত্তে বাসুকীর রূপ ধরে প্রতিপক্ষকে দংশনের অপেক্ষায় অধীর। জমিদার হরিহর চৌধুরী তার প্রতিশোধ লিপ্সার একমাত্র লক্ষ্য। হরিহরের অবৈধ সন্তান কেয়াকে দিয়ে সে সেই লক্ষ্যভেদে কৃতসংকল্প। তারই নিমিত্ত তার মিস চ্যাটার্জীর তত্ত্বধানে আশ্রম প্রতিষ্ঠা এবং হরিহরের সঙ্গে বন্ধুত্ব স্থাপন। অন্যদিকে ডাক্তার নাগ আর্তের সেবায় নিয়োজিত প্রাণ। আর্তজনের সেবার ব্যাকুলতা তার চরিত্রে বিদ্যমান। তার মানব সেবার আর্তি দুর্বল মুহূর্তে চিত্তস্থিত বাসুকীর অপসারণও কামনা করে নিজেকে ফিরিয়ে আনতে চায় স্থিতাবস্থায়। ডা নাগের চরিত্রে প্রবৃত্তির এইরূপ দ্বন্দ্ব চরিত্রটিকে আকর্ষণীয় করেছে। কিন্তু এই চরিত্রটিতে পূর্বাপর সঙ্গতির অভাব সমালোচকের দৃষ্টি এড়ায় না। তার চিকিৎসা বিদ্যায় সাফল্যের বিশেষ পরিচয় আমরা পাই না। সুদর্শন ডা নাগের খণ্ডিত পদ খোলবাজিয়ে বাসুকীর ছদ্মবেশ ধারনে বিশ্বাসযোগ্যতার অভাব আছে, পলাতকা নায়িকা মীনার অবৈধ সন্তানের রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্ব গ্রহণও একটু বিসদৃশ ঠেকে।

ডাক্তার নাগের প্রতিষ্ঠিত আশ্রমের সদস্যা কেয়া, হেনা, বেবীর মত মেয়েরা। ডাক্তার নাগের নির্দেশে মিস চ্যাটার্জীর কঠোর তত্ত্বাবধানে তাদের আশ্রম জীবন পরিচালিত হয়ে থাকে। বিনা অনুমতিতে তাদের আশ্রমের বাইরে যাবার অধিকার নেই, কোন পুরুষের সঙ্গে সাক্ষাৎ তাদের সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ, প্রেম সেখানে অমার্জনীয় অপরাধ। আশ্রম জীবনের কঠোর অনুশাসন না হয় বোঝা গেল; কিন্তু তার লক্ষ্য বা উদ্দেশ্য কি? ডাক্তার নাগ এদের ঠিক কোন প্রয়োজনে ব্যবহার করতে চান তা স্পষ্ট নয়। মাঝে মাঝে মোটা অঙ্কের টাকার বিনিময়ে আশ্রমের মেয়েদের তিনি মুজরো করতে পাঠান। তার বাসুকী সত্তা সতর্ক প্রহরায় নিযুক্ত থাকে। এইরূপ যৎসামান্য অর্থোপার্জন ছাড়া আশ্রম প্রতিষ্ঠার আর কোন উদ্দেশ্য আছে বলেতো মনে হয় না। তাতে আশ্রমের দৈনন্দিন খরচ সঙ্কুলান হওয়াটাই শক্ত। এ হেন লোকসানের ব্যবসায় ডাক্তার নাগের আগ্রহ নির্বুদ্ধিতার পরিচয় বহন করে। তিনি আর যাই হোন, অন্তত নির্বোধ নন। কেয়ার ক্ষেত্রে তার উদ্দেশ্য বুঝতে অসুবিধা হয় না। মীনার শেষ অনুরোধ এবং ব্যক্তিগত আক্রোশ চরিতার্থ করতে তিনি হরিহরের বিষফলকে তারই ধ্বংসের কাজে ব্যবহারের জন্যে সযত্নে তাকে প্রতিপালন করেছেন। কিন্তু আশ্রমের অন্য মেয়েদের সম্পর্কে তার নির্দিষ্ট কোন পরিকল্পনা নেই। কেয়া, হেনা, বেবী কিম্বা হরিহরের পুত্রবধূ শিখা, লীলা - এরা সকলেই ব্যক্তিগত জীবনে নানাভাবে বঞ্চনার শিকার; সামাজিক কিম্বা পারিবারিক ক্ষেত্রে তাদের নারীত্বের মর্যাদা কোন না কোন ভাবে ক্ষুণ্ণ। অথচ কেবল কেয়া এবং শিখা ছাড়া আর কারুর মধ্যেই প্রতিকূলতাকে জয় করবার, নিষ্ঠুর বিরুদ্ধতাকে লঙ্ঘন করবার শক্তি বা সাহস লক্ষ্যণীয় হয়ে ওঠেনি। এরা যেন ভাগ্যের হাতের ক্রীড়নক মাত্র, বিদ্রোহী কেবল কেয়া এবং আংশিক ভাবে শিখা।

নাটকের অন্তিম দৃশ্যে হরিহর এবং ডা. নাগের পরপর আত্মহত্যা, নাটকীয় ত্রুটি হিসাবেই বিবেচিত হবে। এই ধরনের মেলোড্রামাটিক পরিণতি নাট্যকাহিনীর পক্ষেও অনুকূল নয়. হরিহর কিম্বা ডাক্তার নাগের চরিত্রের সঙ্গেও অসামঞ্জস্যপূর্ণ। আত্মহত্যার প্রবণতা এক ধরনের মানসিক ব্যাধি। তাৎক্ষণিক প্রতিক্রিয়ায় এই ধরনের সিদ্ধান্ত গ্রহণ সম্ভব নয়। ডাক্তার নাগ অথবা হরিহরের চরিত্রে এ হেন মানসিক অসুস্থতার লক্ষণ মাত্র নেই। মৃত্যুপথযাত্রী ডা নাগের প্রতি কেয়ার সমবেদনা অযৌক্তিক তো বটেই, রীতিমত অপ্রত্যাশিত ঘটনা। নারীর চিরন্তনী মাতৃমূর্তির জয় ঘোষণার এই হাস্যকর প্রচেষ্টা নাটকের পরিণতিকে যথেষ্ট দুর্বল করেছে।

সমকালীন সমাজ ও তার অপসংস্কৃতির প্রতি নাট্যকার সরাসরি অঙ্গুলী নির্দেশ করেছেন। ক্ষয়িষ্ণু জমিদারতন্ত্রের রুচি ও শিক্ষার ঐতিহ্য বহন করছে চপকীর্তন, মুজরো, মাদকতাপূর্ণ নাচগান। হরিহরের মত স্থূল রুচির জমিদারের সংস্কৃতি চেতনা তাদের অন্তরের সুপ্ত ব্যভিচার বৃত্তির বহিঃপ্রকাশ মাত্র। সেখানে উচ্চাঙ্গের শিল্পকলা নৃত্যগীতের কোন স্থান নেই। এদের প্রবৃত্তিকে মূলধন করে ডাঃ নাগ ওরফে বাসুকীর ব্যবসায়িক সিদ্ধি। এদিক থেকে হরিহর এবং বাসুকী একে অপরের পরিপূরক।

টেকনিক নিয়ে পরীক্ষা নিরীক্ষা বিধায়ক ভট্টাচার্যের নাটকের অন্যতম বৈশিষ্ট্য। নাটকের প্রয়োগ কৌশল, টেকনিক এবং উপস্থাপনা নিয়ে তিনি নানাভাবে পরীক্ষা নিরীক্ষা করেছেন তাঁর একাধিক নাটকে। এই নাটকেও সেই প্রবণতা বিদ্যমান। 'চিরন্তনী' নাটকের দ্বিতীয় অঙ্কের দ্বিতীয় দৃশ্যে এবং তৃতীয় দৃশ্যে ডা. নাগ এবং হরিহরের স্বপ্নদর্শনের মধ্যে দিয়ে তাদের অতীত প্রসঙ্গ দর্শকের সামনে উপস্থাপিত করা হয়েছে। এই কৌশলে নাট্যকাহিনীর পূর্বাপর সম্পর্ক যেমন প্রত্যক্ষ গোচর হয়ে উঠেছে, তেমনি ডা নাগ এবং হরিহরের মনোজগতের ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার বিবর্তনও চমৎকার ব্যঞ্জনা লাভ করেছে।

॥ ভোলা মাস্টার ॥

অত্যন্ত সাধারণ মানের নাটকও যে কেবল মাত্র অভিনয় উৎকর্ষের জোরে কতখানি জনপ্রিয় হতে পারে, তার চমৎকার দৃষ্টান্ত অয়স্কান্ত বক্সীর 'ভোলা মাস্টার' নাটকটি। 'রঙমহল' থিয়েটারে ১৭ই ডিসেম্বর, ১৯৪২ নাটকটি প্রথম আত্মপ্রকাশ করে। রঙমহলের দুই প্রথিতযশা নাট্য ব্যক্তিত্ব রতীন বন্দ্যোপাধ্যায় এবং সন্তোষ সিংহের যৌথ নির্দেশনায় এবং মনীন্দ্র দাসের (নানুবাবু) মঞ্চ তত্ত্বাবধানে 'ভোলা মাস্টার' রঙ্গমঞ্চে তার আর্জি নিয়ে জন সমক্ষে উপস্থিত হয়। একালের কিংবদন্তি অভিনেতা অহীন্দ্র চৌধুরী গ্রাম্য ইস্কুল মাস্টার ভোলানাথের চরিত্রে অবতীর্ণ হয়ে নাটকটিকে আলাদা মাত্রা দান করেন। 'ভোলা মাস্টারের' প্রভূত জনপ্রিয়তার এটি একটি অতিরিক্ত আকর্ষণ। প্রথম অভিনয় রজনীতে অন্যান্য চরিত্রে রূপদান করেন ঃ সমরেন্দ্র—রতীন বন্দ্যোপাধ্যায়; লোকনাথ—সন্তোষ সিংহ; মি চ্যাটার্জী—শরৎ চট্টোপাধ্যায়; সর্বেশ্বর—সন্তোষ দাস; তপেন—ভানু চ্যাটার্জী; অমরনাথ—তারাকুমার ভট্টাচার্য; রাখাল—আশু বসু; নিবারণ—প্রফুল্ল দাস;

বাঁড়ুজ্জে—জীবন চ্যাটার্জী; কেলো—যতীন দাস; কেষ্ট—অমূল্য হালদার; ঝড়ু—গোপাল মুখার্জী; বৈষ্ণব—বিশ্বনাথ সোম; অকিঞ্চন—সনৎ মুখার্জী; কৃপাময়ী—রাণীবালা; ছোট বৌ—সুহাসিনী; বৌ গিন্নী—বেলারাণী; সিন্ধুর মা—আঙ্গুরবালা; রাধারাণী—রমা ব্যানার্জী; উল্কা—বন্দনা; হরিমতী—দুর্গাবালা; এবং আরও অনেকে। নাটকে সুর সংযোগ করেছিলেন তারা কুমার ভট্টাচার্য এবং গীতিকার ছিলেন কবি শৈলেন রায়।

'ভোলা মাস্টার' নাটকের মঞ্চ সাফল্য সম্পর্কে স্বয়ং নাট্যকার সন্দীহান ছিলেন। বলিষ্ঠ অভিনয়ের গুণে শেষ পর্যন্ত অবশ্য নাটকটি উতরে যায়।[৩২] অর্থাৎ এ নাটকের বক্তব্য তথা আখ্যানভোগের দুর্বলতার দায় পরোক্ষে নাট্যকার স্বীকার করে নিয়েছেন। নাটকটির এতখানি সাফল্য বোধ হয় তিনি নিজেও আশা করতে পারেননি। নইলে এরূপ স্বীকারোক্তির প্রয়োজন হত না।

ব্যক্তিগত উচ্চাশার মোহে পাগলাটে, আদর্শবাদী, গ্রাম্য ইস্কুল মাস্টার ভোলানাথের পদস্খলন 'ভোলামাস্টার' নাটকের বিষয়বস্তু। সন্তানকে ভবিষ্যৎ জীবনে প্রতিষ্ঠিত করবার উন্মত্ত বাসনার তাড়নায়, ইস্কুল ফাণ্ডের টাকা আত্মসাৎ করতে তাঁর বাধেনি। যে ইস্কুল তাঁর আত্মত্যাগ, একনিষ্ঠ সেবা ও তপস্যায় ধীরে ধীরে গড়ে উঠেছে, তারই যথাসর্বস্ব হরণ করেছেন তিনি ব্যক্তিগত প্রয়োজনে এবং তা নিঁখুত পরিকল্পনায়। অর্থাৎ ভোলামাস্টারের পদস্খলন তাঁর আদর্শ থেকে বিচ্যুতি, মুহূর্তের উত্তেজনায় বিচার বিভ্রম জনিত কারণে নয়; স্থির মস্তিস্কে পরস্ব হরণের গোটা ব্যাপারটাই তিনি ছকে নিয়েছিলেন। আদর্শের তত্ত্ব প্রচার যতখানি সহজ, শ্রেণীকক্ষে সত্য ভাষণের তৃপ্তি সম্ভোগ যতখানি অনায়াস ব্যক্তি জীবনে তার অনুসরণ তদপেক্ষা অনেক কঠিন। সমাজ পরিবারের নিত্য চাহিদা, অভাব অনটন, নিছক আদর্শের বুলি শুনতে অভ্যস্ত নয়; প্রয়োজন সিদ্ধ হওয়াটাই সেখানে মূল কথা—সিদ্ধিলাভের উপায় বা পন্থা নিতান্তই গৌণ। মানুষের সততার সীমানা এই অলঙ্ঘ্য সূত্রের ওপরে নির্ভরশীল। কাম্য ও প্রাপ্যের স্বাভাবিক সামঞ্জস্য পর্যন্তই সততার অবস্থান—কাম্য যখন প্রাপ্যকে ছাড়িয়ে যায়, সততাকেও তখন পিছু হঠতে হয়। অন্তত মননে চিন্তনে তার অপসারণ চরম আকাঙ্ক্ষিত হয়ে ওঠে—আর অনুকূল পরিবেশ তাকে সম্ভবও করে তোলে। কেননা মানব চরিত্র পুরোপুরি আপেক্ষিক—পারিপার্শ্বিক অবস্থার সঙ্গে তা সম্পর্ক যুক্ত। যেখানে নয়, সেখানে তা ব্যতিক্রমই। ভোলামাস্টার আর যাই হোন, ব্যতিক্রমী মানুষ নন।

ভোলামাস্টারের চরিত্রের মধ্যেই তাঁর বহু উচ্চারিত আদর্শ অনুসরণে ব্যর্থতার বীজ নিহিত আছে। তিনি দরিদ্র; জীবনের এই বঞ্চনা তিনি বেদনার্ত চিত্তে মেনে নিয়েছিলেন—অনোন্যপায় হয়েই মেনে নিয়েছিলেন। সুবিধাজনক অবস্থায় সেখান থেকে সরে না

---

৩২ "প্রতিদিনের পরিপূর্ণ প্রেক্ষাগার এ সন্দেহ মোচন করেছে। সাধারণে নাটককে গ্রহণ করেছেন। সেই আমার পুরস্কার।" —নাট্যকার কৃত ভূমিকা দ্রষ্টব্য।

আসার প্রত্যয় কিম্বা চারিত্রিক দৃঢ়তা ভোলামাস্টারের ছিল না। সামান্য কারণেই তিনি উত্তেজিত হয়ে পড়েন, বিরক্ত হন, ক্রুদ্ধ হন ..মানুষকে ভুল বোঝেন। এ রকম অস্থির চিত্ত মানুষের আদর্শবোধ, নীতিবোধ খুব মজবুত হতে পারে না, প্রলোভনের ঠুনকো আঘাতে তা খুব সহজেই ভেঙে পড়ে। কিন্তু সত্যের জোর মানুষকে সংযত করে— প্রাচুর্যের অভাব তার চিত্তকে পীড়িত করেনা। এমন পীড়ামুক্ত মানুষই যে কোন প্রলোভনকে জয় করতে সক্ষম, নচেৎ নয়। ভোলামাস্টার সামাজিক জীবনে দুঃখ আর দারিদ্রে পীড়িতচিত্ত মানুষ। তাঁর নীতিবোধের অহংকার সেই দীনতা গোপনের বহিরঙ্গ সাজসজ্জা। সংসার মানুষের বাইরেটা ধরেই টানাটানি করে, অন্তরঙ্গের খোঁজ খবরে তার কোন অবকাশ নেই, সদিচ্ছাও নেই। মুখোশের আড়ালে বর্বরও সমাজের পূজা আদায় করে থাকেন বৈকি। সুদর্শনার মতই বাহ্যিক জাঁক জমকে বিভ্রান্ত সমাজ নকল রাজার পায়ে আত্মনিবেদনে অতি মাত্রায় ব্যাকুল। এইখানেই আমাদের জীবন ট্র্যাজেডি। এই ট্র্যাজেডি আরও মর্মান্তিক শিক্ষিতজনের বিকৃত মনের মূল্য নির্ধারণে: দৃষ্টান্ত আর উদ্ধৃতির, শাস্ত্রবাক্য আর ঋষিবাক্যের পৌনঃপুনিক ব্যবহারে তিনি জগতের পূজার সিংহভাগই আদায় করে থাকেন। ভোলামাস্টার এই অতি সুলভ পন্থায় উদ্দেশ্য সিদ্ধিতে চূড়ান্ত ভাবে সফল।

সমরেন্দ্র কৃতি ছাত্র, পিতার দুর্জয় বাসনার তাড়নায় শেষ পর্যন্ত জেলার হাকিমের গৌরবময় আসনে প্রতিষ্ঠিত। দরিদ্র ও উচ্চাভিলাষী পিতার চৌর্যবৃত্তির ভিতের ওপরে তার খ্যাতি ও প্রতিষ্ঠার প্রতিটি সোপান নির্মিত এ কথা অস্বীকার করবার উপায় নেই। স্কুলের বিল্ডিং ফান্ডে তার দশ হাজার টাকা দানও ..এই অগৌরবের হাত থেকে তাকে যেমন অব্যাহতি দিতে পারেনা, তেমনি অপকর্মের অভিযোগ থেকে ভোলামাস্টারকেও মুক্ত করতে পারেনা। অজ্ঞতার কারণে গ্রামবাসীর অনুযোগ না থাকতে পারে, কিন্তু পাঠকের রায় তার বিরুদ্ধেই যাবে। পিতার অপকর্মের সংবাদ সমরের অজ্ঞাত ঠিকই, তবু দারিদ্রের কঠিনতম অবরোধ উত্তরণে সাফল্যের সম্ভাব্য কারণ অনুসন্ধান পারিপার্শ্বিক অবস্থার বিশ্লেষণে সে কিন্তু অনুভব করেনি। এইখানেই চরিত্রটি অপূর্ণ। পাঁচ হাজার টাকা ছিনতাই, পিতার মৃত্যুর সংবাদ ইত্যাদি আকস্মিক দুর্ঘটনার পরেও তার উচ্চশিক্ষার পথ কিভাবে প্রশস্ত হল ..এ প্রশ্ন তার মনে উদিত হওয়া স্বাভাবিক ছিল, না হওয়াটাই অসঙ্গতি।

এরূপ অসঙ্গতি ম্লান করেছে কৃপাময়ী চরিত্রটিকেও। কৃপাময়ী ভারতীয় আদর্শে গভীরভাবে আস্থাশীলা ..আধুনিকতার নামে নারীর এতটুকু বাড়াবাড়ি তিনি বরদাস্ত করতে পারেন না। ভাবী পুত্রবধূ রূপে তিনি প্রথমে নির্বাচিত করলেন রাধাকে, পরে তা বিস্মৃত হয়ে উগ্র আধুনিকা উল্কাকে সমরের উপযুক্ত করে গড়ে নিতে উৎসাহী হয়ে উঠলেন এবং অবশেষে আবার সমব্যথী হয়ে উঠলেন রাধার জন্যে। এই যে রাধা থেকে উল্কা এবং উল্কা থেকে আবার রাধায় প্রত্যাবর্তন, এ কেবল মননশীলতায় অগভীরতার পরিচায়ক এতে উল্কা এবং মি চ্যাটার্জীর নাটকীয় প্রাসঙ্গিকতাও পুরোপুরি নষ্ট হয়েছে। নাটকের

প্রয়োজনে নয়—প্রাচ্য আদর্শের শ্রেষ্ঠত্ব প্রচারের জন্যে উল্কাকে প্রয়োজন ছিল নাট্যকারের। আর এই রকম বেশ কিছু ত্রুটি অঙ্গে ধারন করেও 'ভোলামাস্টার' এক সময় দর্শককে মাতিয়ে রেখেছিল।

॥ পথের ডাক ॥

প্রখ্যাত কথা সাহিত্যিক তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের অনবদ্য সামাজিক নাটক 'পথের ডাক' ১৯৪২-র ২৪শে ডিসেম্বর 'নাট্যভারতী' মঞ্চে প্রথম অভিনীত হয়। অথচ মুদ্রিত গ্রন্থে প্রথম অভিনয় তারিখ ৮ই জানুয়ারী ১৯৪৩ বলে উল্লেখ করা হয়েছে। ফলে প্রথম অভিনয় তারিখটি নিয়ে একটু সংশয়ের অবকাশ থেকে যাচ্ছে। সুশীল কুমার মুখোপাধ্যায়ও মুদ্রিত গ্রন্থের তারিখটিকেই প্রামাণ্য বলে গ্রহণ করেছেন।[৫৫] কিন্তু অমৃত বাজার পত্রিকায় প্রকাশিত বিজ্ঞাপনে ১৯৪২ র ২৪শে আগস্ট, বৃহস্পতিবার সন্ধ্যে ৬-৩০ মিনিটে বড়দিন উপলক্ষে এই নাটকটির শুভ উদ্বোধনের তারিখ একাধিকবার ঘোষিত হয়েছে। অনিবার্য কারণে দিন ক্ষণের পরিবর্তন ঘটে থাকলে সে সম্পর্কিত কোন প্রকার বিজ্ঞপ্তি ও সমসাময়িক সংবাদপত্রে বা অন্য কোথাও আমাদের চোখে পড়েনি। অতএব সঠিক সিদ্ধান্তে আসা মুশকিল। এই সমস্যা শুধু এই নাটকেই নয়, অন্য দু-একটি ক্ষেত্রেও আমরা লক্ষ্য করেছি। সেকালে বেশির ভাগ ক্ষেত্রে হাতে লেখা পাণ্ডুলিপি নিয়ে অভিনয় শুরু হত, পরে কোন এক সময়ে গ্রন্থাকারে তা প্রকাশিত হত। বিলম্বে মুদ্রণের কারণে অসতর্কতা বশতঃ তথ্য বিভ্রাটের সম্ভাবনাকে একেবারে উড়িয়ে দেওয়া যায় না—সে প্রমাণও ক্ষেত্র বিশেষে আমরা পেয়েছি। এক্ষেত্রেও সেইরকম কিছু ঘটে থাকবে বলে আমাদের অনুমান।

নরেশ চন্দ্র মিত্র ও সতু সেনের যৌথ পরিচালনায় এবং শিশির মল্লিকের প্রযোজনায় 'পথের ডাক' 'নাট্যভারতীতে' আত্মপ্রকাশ করে। প্রথম অভিনয় রজনীতে বিভিন্ন চরিত্রে অংশ গ্রহণ করেন ঃ রায় বাহাদুর—নরেশচন্দ্র মিত্র; ডাক্তার চ্যাটার্জী—বিশ্বনাথ ভাদুড়ী; অতুল—মিহির ভট্টাচার্য; নিখিলেশ—জহর গাঙ্গুলী; যতীন—বেচু সিংহ; রমেন—দ্বিজেন ঘোষ; কুড়োরাম—কৃষ্ণধন মুখার্জী; কানাই—কুমার মিত্র; খাজাঞ্চী—বিপিন বসু; ভক্তরাম—রবীন্দ্র মোহন রায়; ডাক্তার—জীতেন গাঙ্গুলী; বিছে—মাস্টার মুকুল; অন্ধ ভিক্ষুক ও রুগী—উমাপদ দাস; বেয়ারা—গোপাল নন্দী; জ্যোতির্ময়ী—প্রভা; সুনন্দা—ছায়া দেবী; রমা—সাবিত্রী দেবী; ইলা—বীণাপাণি; দামিনী—মহামায়া; সখির মা—রাজলক্ষ্মী ; ছাত্রীগণ—প্রতিভা, বীণাদাস; কুলী রমণীগণ—প্রতিভা, মহামায়া, বীণা দাস, বীণাপাণি, গীতা, সত্যবালা, আশালতা, গীতা ঘোষ, শান্তিলতা। গীত রচনা করেন অজয় ভট্টাচার্য, নৃত্য হেমেন্দ্র কুমার রায় এবং সুর সংযোজন করেন দুর্গা সেন।

---

[৫৫] The story of The Calcutta Theatres, Sushil Kr Mukherjee, pp 261

'পথের ডাক' বিশেষ ভাবে Revolving Stage-এ অভিনয় করা উচিত বলে নাট্যকারের অভিমত। আসবাবপত্র দৃশ্যপট প্রভৃতির প্রলোভনও যথা সম্ভব ত্যাগ করতে পরামর্শ দিয়েছেন নাট্যকার। তাতে নাটকের গতি ক্ষুণ্ণ হবে, নাটকীয় 'রঙ্গ ভঙ্গ' হবে। মোটের ওপর কোন অবস্থাতেই নাটকের গতি ব্যাহত করা চলবে না।[৩৮] অর্থাৎ গতানুগতিক পদ্ধতিতে এই নাটকের অভিনয় রসাস্বাদনে ব্যাঘাত সৃষ্টি করবে; নাটকের বিষয়বস্তু পর্যালোচনা করলে নাট্যকারের বক্তব্যের সমর্থনে যুক্তি খুঁজে পাওয়া যাবে।

'পথের ডাক' নাটকের 'পথ' বর্তমান থেকে ভবিষ্যতের পথ- দৈন্যদশা থেকে সমৃদ্ধি লাভের পথ - পরাধীনতার গ্লানি থেকে গৌরবোজ্জ্বল স্বাধীনতার পথ-- বন্ধন থেকে মুক্তির পথ। সর্ব সংস্কার মুক্ত মানুষের কাছেই পথের সেই আহ্বান শ্রুতিগোচর হয়ে ওঠে, অন্যথায় তার আহ্বান উপলব্ধি করা যায় না। বিংশ শতকের তমসাচ্ছন্ন দিনগুলিতে সঙ্কটাপন্ন ভারতবর্ষের মানুষ পথের অন্বেষণে ব্যাপৃত হয়েছিল; বাঁচার তাগিদে এই অন্বেষণ হয়ে পড়েছিল জরুরী। কিন্তু মুক্তির সন্ধানে সমস্ত মানুষের কণ্ঠ সমস্বরে প্রতিধ্বনিত না হয়ে তার সম্ভাবনাকে বিলম্বিত করেছে। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্ত্য ভাব সম্মিলনে ভারতবর্ষের মুক্তির যৌক্তিকতা প্রাজ্ঞ বুদ্ধির বিচারে স্বীকৃত হলেও বাস্তব প্রয়োগে উদ্যোগের অভাবটাই নির্মম ভাবে প্রকট হয়ে উঠেছিল। অন্যদিকে মানুষই কেবল পথের সন্ধান করেনা পথও তার যোগ্য প্রতিনিধি নির্বাচন করে নেয় প্রতিনিধি উঠে আসে আম জনতার মধ্যে থেকে বলিষ্ঠ প্রত্যয়ে। এই নাটকে একই সঙ্গে পথ ও পথের কাণ্ডারীর অন্বেষণ করেছেন নাট্যকার।

বিশ্ববিদ্যালয়ের কৃতী ছাত্র অতুল কর্মঠ, আত্ম বিশ্বাসে ভরপুর যুবক - বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির কৃৎ কৌশলে সমৃদ্ধ। প্রকৃতিকে আয়ত্ত করার সাধনা তার। প্রকৃতির অফুরন্ত ঐশ্বর্য ভাণ্ডার, বিজ্ঞান ক্রীতদাসের মত তার স্বদেশবাসীর-- পৃথিবীর মানুষের পদতলে এনে দেবে- এই লক্ষ্যে সে স্থির-সঙ্কল্প। তার সমস্ত কর্ম প্রচেষ্টার মূলে আছে লোকহিতের এই মহান আদর্শ। অর্থোপার্জন কিম্বা আত্মসুখের নিমিত্ত বিজ্ঞানের সাধনা তার নয়। তা যদি হত তাহলে বিলেত থেকে ডিগ্রি নিয়ে এসে গণ্ডগ্রামে রায় বাহাদুরের কলিয়ারীর কাজের মধ্যে গভীরভাবে মগ্ন থাকা তার পক্ষে সম্ভব হত না। তার বিশ্বাস, তার কাজের সঙ্গে যুক্ত রয়েছে বহু মানুষের ভাগ্য-- তাদের সুখ স্বাচ্ছন্দ্য-- তাদের অন্ন বস্ত্রের সংস্থান— তাদের গতি, শক্তি, জীবন মরণের প্রশ্ন। কর্ম জগতের প্রবল আকর্ষণে স্ত্রী সুনন্দার প্রতিও সে অনেকাংশে উদাসীন। তবু অতুলের জগৎ কল্যাণ চিন্তা বাস্তবিক অর্থে জন-কল্যাণে ব্যাপৃত হতে পারেনি। তার কারণ, পৃথিবীর ধনকুবেরদের কাছে বিজ্ঞান দায়বদ্ধ— তাদের দাক্ষিণ্যের ওপরে বিজ্ঞানের অগ্রগতি নির্ভরশীল। ধনকুবের রায়বাহাদুর বুভুক্ষু মানুষের অসহনীয় ক্ষুধা, লোভ আর লালসাকে মূলধন করে ভোগলিপ্সা চরিতার্থ করণের আয়োজন করেছেন মাত্র। যুগে যুগে বিজ্ঞান কেবল ধনকুবেরদের স্বার্থ রক্ষা করে

---

৩৮ 'সখের নাট্য সম্প্রদায়ের প্রতি কয়েকটি কথা' দ্রষ্টব্য।

এসেছে— রায়বাহাদুর তাদেরই প্রতিনিধি। কুলি ব্যারাকে অস্বাস্থ্যকর পরিবেশে রোগ, শোক, ক্ষুধা আর মৃত্যুর বিনিময়ে রায়বাহাদুরের সুসজ্জিত অট্টালিকায় বিলাসব্যসন প্রস্তুত। এই নির্মম সত্যকে অতুল স্বীকার করতে কুণ্ঠা বোধ করেছে। তাই আপামর জনগণের আস্থা অর্জন করতে পারেনি সে।

ডাক্তার চ্যাটার্জীর ভাবশিষ্য নিখিলেশ বিবেকানন্দের আদর্শে অনুপ্রাণিত। কিন্তু বিবেকানন্দের বাণীর মর্মার্থ উপলব্ধিতে নিখিলেশকে ব্যর্থই বলতে হবে। সন্দেহ নেই, নিখিলেশ এবং রমা আর্তের সেবায় নিয়োজিত প্রাণ। ক্ষুদ্র বিছেকেও চৌর্যবৃত্তি থেকে নিখিলেশ তার কর্মধারায় যুক্ত করতে পেরেছে। তারই উদ্যোগে কুলি ব্যারাকের অস্বাস্থ্যকর পরিবেশ পরিমার্জিত: দূষিত খনিগর্ভে মৃত্যুর মিছিলও থেমে গেছে। কিন্তু শুধুমাত্র সেবা ও আত্মত্যাগের আদর্শ দারিদ্র মুক্তির সহায়ক হতে পারে না। দু মুঠো অন্নের সংস্থান কোথায়? কলিয়ারীর দরজা বন্ধ, প্রাক্তন কৃষক ভক্তরামের দল কাস্তে ছেড়ে গাঁইতি ধরতে শিখেছে, মাঠে ফেরার পথও বন্ধ—নিখিলেশ এই সব কর্মহীন মানুষকে বাঁচার স্বপ্ন দেখাতে পারেনি। তাদের নিষ্ঠুর আঘাতে ভ্রান্তিমুক্ত নিখিলেশ উপলব্ধি করে— 'জীবনই একমাত্র সত্য নয়। সেই জীবনকে যে শক্তি রক্ষা সেই শক্তি জীবনের মতই সত্য। সম্পদের মধ্যেই সেই শক্তির বাস।' বাঁচার অধিকার মানুষকে যে দিতে পারে না, দয়া করার অধিকারও তার নেই। অযাচিত দয়া দাক্ষিণ্য মানুষকে পরমুখাপেক্ষী করে তোলে, তাকে শক্তিহীন করে। জননী জ্যোতির্ময়ীর রূপ ধরে স্বয়ং দেশ জননী যেন সংশয় মুক্ত নিখিলেশের কাছে বহন করে এনেছেন পথের আহ্বান; মানুষের অধিকার রক্ষার দুরন্ত সংগ্রামে সামিল হতে হবে তাকে। সেবা আর কল্যাণ ব্রতের সঙ্গে অধিকার প্রতিষ্ঠার সংগ্রামের সংমিশ্রণে গড়ে উঠবে উত্তর কালের পথ। তবেই না ভারতাত্মার মুক্তি ত্বরান্বিত হবে। অতুল কিম্বা ধনপতি রায়বাহাদুরও সেই কর্মযজ্ঞের সমান অংশীদার. তাদেরকে সমযাত্রী করে নিখিলেশের নবভাবে পথ চলার শুরু। বিজ্ঞান সাধক অতুল যোগাবে ক্ষুধার অন্ন, রায়বাহাদুর তাকে দেবে নিরাপত্তা আর নিখিলেশ ভিক্ষা প্রত্যাশী বঞ্চিত মানুষের বাহুতে যোগাবে অনমনীয় শক্তি। সেদিন কুসংস্কার আর অজ্ঞানতা থেকে মুক্ত সুস্বাস্থ্যের অধিকারী কুলি ব্যারাকের পরিচ্ছন্ন অঙ্গনে শাখায় শাখায় হিল্লোলিত হবে রক্ত পলাশের রক্তিম হাসি।

এই নাটকের শেষ পর্বে ডা. চ্যাটার্জী সুনন্দা আর রায়বাহাদুরের মৃত্যু অতি নাটকীয়তা দোষে দুষ্ট। মৃত্যুর আধিক্য কাহিনীর গতিকে দুর্বলই করেছে। সুনন্দার চরিত্রটি একটু যেন উপেক্ষিত। তুলনায় রমা কিম্বা জ্যোতির্ময়ী অনেক বেশি সাবলীল। গতির স্বার্থে শেষ দুটি দৃশ্য বাদ দিয়ে রায়বাহাদুরের মৃত্যুর সঙ্গে নাটক শেষ করা যেতে পারে বলে নাট্যকার পরামর্শ দিয়েছেন।[২৫] কিন্তু শেষ দুটি দৃশ্য কাহিনীর পক্ষে অপরিহার্য বলেই মনে

---

[২৫] "...রায়বাহাদুরের মৃত্যুর সঙ্গে ইচ্ছা করিলে নাটক শেষ করিতে পারেন। —'সখের নাট্য সম্প্রদায়ের প্রতি কয়েকটি কথা' দ্রষ্টব্য।

হয়। এই দৃশ্য দুটি বাদ দিলে কাহিনী বৃত্ত অসম্পূর্ণ থেকে যায়, নাটকের বক্তব্যও খণ্ডিত হয়ে পড়ে। নাটকের সংলাপ চমৎকার। বিবেকানন্দ এবং রবীন্দ্রনাথের প্রাসঙ্গিক উদ্ধৃতি প্রয়োগে বক্তব্য পরিস্ফুটনে একটা অতিরিক্ত মাত্রা পেয়েছে।

॥ খুনী ॥

অয়স্কান্ত বক্সীর 'খুনী' নাটকটি ইংরেজ ক্রাইমের অনুসরণে ফৌজদারী দণ্ডবিধির একটি প্রহেলিকাময় ধারার ওপরে ভিত্তি করে রচিত। ফৌজদারী দণ্ডবিধির একটি আইনে উল্লেখ আছে "Two or more persons can not be charged as principals with a crime known to have been committed by only one person " অর্থাৎ যে অপরাধ কেবলমাত্র একজন ব্যক্তির দ্বারা সংঘটিত হওয়া সম্ভব বলে তথ্য সাক্ষ্য দিচ্ছে, দুই বা ততোধিক ব্যক্তি তার দায় স্বীকার করে নিলে কাউকেই অভিযুক্ত করা যাবে না।[৩৮] সম্ভবত ইংরেজ সিভিলিয়নদের নানা রকম পাপকর্ম থেকে অব্যাহতি দেবার জন্যে এক সময় এই অদ্ভুত আইনের প্রচলন করা হয়েছিল। এই আইনের ওপরে ভিত্তি করে নাট্যকাহিনী পরিকল্পিত হয়েছে। দুর্গাদাস বন্দ্যোপাধ্যায়ের পরিচালনায় এবং মঞ্চশিল্পী মি মহম্মদ জানের তত্ত্বাবধানে, ১৯৪৩ র ১৭ই এপ্রিল 'রঙমহল' থিয়েটারের 'খুনী' প্রথম মঞ্চস্থ হয়। উল্লেখযোগ্য চরিত্রে রূপদান করেছেন : অমল বন্দ্যোপাধ্যায় (রণেন্দ্র সিনহা), সুনীল মুখোপাধ্যায় (কল্যাণ), গণেশ গোস্বামী (শিবপ্রসাদ), ভূমেন রায় (ছোবহা), বঙ্কিম দত্ত (সত্যেন্দ্র), শান্তিগুপ্তা (সন্ধ্যা), উমা মুখোপাধ্যায় (মন্দা), রেণুকা দেবী (তৃষ্ণা), লাবণ্য দাস (বাসনা), লক্ষ্মীদেবী (ক্ষণিকা) এবং শান্তি দেবী (স্পৃহা)। 'খুনী' দর্শক সমাজে বিশেষ সমাদৃত হয়নি। এটি 'রঙমহলের' প্রযোজনায় একটি ব্যর্থ প্রয়াসই বলতে হবে।

'খুনী' খুব উচ্চমানের নাটক তো নয়ই, নাটকের বক্তব্যও অত্যন্ত দুর্বল। বরং এটিকে বলা যেতে পারে টেকনিক প্রধান নাটক। নাট্য উপস্থাপনায় stunt বা চমক সৃষ্টিতে নাট্যকার যতটা সচেতন ছিলেন কাহিনী গ্রন্থণে এবং চরিত্র চিত্রণে ঠিক ততটাই অসতর্ক বলে মনে হয়। এ নাটকে না আছে সমকালীন সমাজের কোন অংশের প্রতিফলন, না আছে জীবনের কোন গূঢ় তত্ত্বের অবতারণা হাল্কা চালে জীবনের পরিহাস প্রিয়তার স্নিগ্ধ অনুভূতিও এ নয়। নাটকটি দুটি ভাগে বিভক্ত 'পূর্বরঙ্গ' ও 'অন্তরঙ্গ'। 'পূর্বরঙ্গে' একটি খুনের ঘটনা এবং 'অন্তরঙ্গে' তার খুনী নির্ণয়ের প্রচেষ্টা মঞ্চের জটিল কলাকৌশলের মধ্যে দিয়ে বিধৃত হয়েছে।

স্যার শিবপ্রসাদ কল্যাণ ও আব্দুলের সহায়তায় মদ্যপ, ক্রিমিন্যাল জামাতা রণেন্দ্র সিনহাকে চরম শাস্তি দানের পরিকল্পনা করেন। গোপন বৈঠকে রণেন্দ্রকে খুনের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয় স্থির হয় লটারীর মাধ্যমে খুনী নির্ধারণ করা হবে। কৌশলে রনেন্দ্রর ফ্ল্যাটে পরস্পর বিরোধী সূত্র ছড়িয়ে রাখার চমৎকার ব্যবস্থাও করেন তাঁরা- যাতে বিভ্রান্ত পুলিশ তথা আইন তিনজনকেই সন্দেহ করতে বাধ্য হয়। এই অবস্থায় তিন জনেই পৃথক ভাবে খুনের দায় স্বীকার করলে পূর্বোক্ত আইনের ফাঁক দিয়ে তিন জনেই স্বচ্ছন্দে

বেকসুর খালাস পেয়ে যাবেন। সমস্ত পরিকল্পনা যখন চূড়ান্ত. ঠিক সেই সময়ে চতুর্থ কোন ব্যক্তির পিস্তলের গুলিতে খুন হয় রণেন্দ্র। অপ্রত্যাশিত এই ঘটনার জন্যে প্রস্তুত ছিলেন না কেউই—তিনজনেরই প্রশ্ন খুনী কে?– প্রশ্ন দর্শকেরও।

বিশ্ববিদ্যালয়ের কৃতি ছাত্র. স্বাস্থ্যবান. সুদর্শন যুবক রণেন্দ্র সিনহা শ্বশুরের আনুকূল্যে উচ্চ শিক্ষার্থে ইউরোপ গিয়ে মদ্যপ ক্রিমিন্যাল হয়ে দেশে ফিরে আসে। যথেষ্ট আয়াস সাধ্য উচ্চশিক্ষা লাভের কষ্টকর পন্থা রণেন্দ্রকে দীর্ঘদিন আকর্ষণ করতে পারেনি; তৎপরিবর্তে আন্তর্জাতিক নারী পাচার চক্রের লাভ জনক ব্যবসায় হাত পাকিয়ে দেশে প্রত্যাবর্তন করে সে। বিদেশী শিক্ষা তথা কালচারের প্রভাব জনিত রণেন্দ্রর এই চারিত্রিক অবনতি নাট্যকারের বিরূপ মনোভাব হেতু সমস্ত সহানুভূতি থেকে বঞ্চিত। সেই কারণে রণেন্দ্র চরিত্রের বিকাশ ততটা স্পষ্ট হয়ে ওঠেনি। বিদেশ প্রত্যাগত রণেন্দ্র সুন্দরী তরুণীদের সঙ্গে নিখুঁত ভালবাসার অভিনয় করে. বিদেশ ভ্রমণে প্রলুব্ধ করে এবং পরিশেষে নারী ব্যবসায়ীদের হাতে তুলে দেয় তাদের। এ তো গেল রণেন্দ্রর কথা। কিন্তু মন্দা. তৃষ্ণা. বাসনা. ক্ষণিকা. স্পৃহার মত নারীরা তার মধুচক্রের ফাঁদে পা দেয় কিসের টানে? পাশ্চাত্ত্য জগতের বিলাস বহুল জীবন যাত্রার মোহ মধ্যবিত্ত বাঙালীকে যথেষ্ট বিচলিত করে তুলেছিল। তৃষ্ণা. বাসনা. স্পৃহা প্রভৃতি নাম চয়নে সেই স্বপ্নাভিলাসের ইঙ্গিত খুবই স্পষ্ট। অর্থ. আভিজাত্য আর তথাকথিত সামাজিক প্রতিষ্ঠা লাভের দুর্বার আকাঙ্ক্ষা এদের পতঙ্গের মত টেনে আনে রণেন্দ্রর কামনার অনলে। রণেন্দ্রের পূর্ব বিবাহ সেখানে কোন প্রতিবন্ধকই নয়। নারী চায় নিরাপত্তা এটিই তার চিরন্তন মৌলিক প্রত্যাশা পুরষকে সেইখানেই তার প্রাথমিক প্রয়োজন। প্রাচীন কালে নারী স্বয়ম্বর সভায় শ্রেষ্ঠ বীরের গলায় মালা দিয়েছে তার চরিত্র নীতির এই তাড়নায়; আর একালে বলবান. চরিত্রবান নয় শুধুমাত্র অর্থবান পুরুষের হাতে তার নিরাপত্তা সুরক্ষিত বলে এ কালের ভাবনায় অর্থবানের অকুণ্ঠ স্বীকৃতি। অন্য প্রশ্ন সেখানে অবান্তর। আর চৌকশ অভিনেতা রণেন্দ্রর কার্যসিদ্ধির প্রধান মূলধন নারী চরিত্রের এই দুর্বলতা। এমন কি স্ত্রী সন্ধ্যাও তার নারী সুলভ প্রবৃত্তির তাড়নায় রণেন্দ্রর চাতুর্যের কাছে বিভ্রান্ত-বিপর্যস্ত। অতএব এগিয়ে আসতে হয়েছে স্যার শিবপ্রসাদকে। লিফটম্যান আব্দুল এবং কল্যাণ সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিতে দ্বিধা করেনি প্রতিপক্ষ রণেন্দ্রকে উচিত শিক্ষা দেবার উদ্দেশ্যে। এইখানে নাটকের 'পূর্বরঙ্গের' সমাপ্তি।

'অন্তরঙ্গে' প্রতিটি স্বতন্ত্র ঘটনা পৃথক পৃথক ভাবে flash back -এ দর্শকের সামনে তুলে ধরা হয়েছে। একটি সুসজ্জিত ফ্ল্যাট বাড়ির পাশাপাশি তিনটি ফ্ল্যাটের একটি রণেন্দ্রর একটি ছদ্মনামে স্যার শিবপ্রসাদের এবং মাঝেরটি কমনরুম হিসাবে ব্যবহৃত হয়ে থাকে। সকাল দশটায় তৃষ্ণা রণেন্দ্রর ফ্ল্যাটে এসে আবিষ্কার করে আরাম কেদারায় শায়িত গুলিবিদ্ধ রক্তমাখা রণেন্দ্রর মৃতদেহ। তদন্তে এসে গোয়েন্দা পুলিশ খুঁজে পায় পরস্পর বিরোধী কতকগুলো সূত্র। দেখা যায় ফ্ল্যাটের পেছনের দরজা খোলা. চেয়ারে মেঝেতে রক্তের দাগ; পাওয়া যায়— লিফটম্যানের জামার পেতলের বোতাম. রিভলবারের

বুলেট, একটি কার্ড, রক্তমাখা নোট, টাইপরাইটারে কল্যাণ ও রণেন্দ্রর মন্দার মুক্তিপণের চুক্তিপত্র, পায়ের ছাপ, শিবপ্রসাদের ফ্ল্যাটে পাওয়া যায় রিভালবার এবং কার্তুজ কেশ। অপর লিফটম্যান ভীম সিংহের ফিংগার প্রিন্টও সংগ্রহ করা হয় কৌশলে।

পুলিশের প্রথম সন্দেহ গিয়ে পড়ে কল্যাণের ওপরে। পুলিশের কাছে স্বীকারোক্তিতে কল্যাণ জানায়, মন্দাকে নিয়ে বিরোধের সূত্রে সে রণেন্দ্রকে খুন করেছে। flash back-এ খুনের ঘটনা প্রত্যক্ষ করেন দর্শক। কিন্তু তবু সন্দেহ থেকে যায়। কল্যাণের স্বীকারোক্তি সত্য হলে পায়ের ছাপ তার সঙ্গে মেলেনা কেন? সুতরাং সন্দেহের তালিকায় চলে আসেন শিবপ্রসাদ। রিভলবার এবং কার্তুজ কেশ পাওয়া যায় তাঁরই ফ্ল্যাট থেকে, পায়ের ছাপও মিলে যায় সুন্দরভাবে। শিবপ্রসাদ স্বীকার করেন খুন তিনি করেছেন। flash back -এ ফিরে আসে খুনের দৃশ্য। এদিকে রক্তে ভেজা নোটের ফিংগার প্রিন্ট পরীক্ষায় দেখা যায় সেটি নির্ভুল ভাবে আন্দুলের। সেও নির্দ্বিধায় খুনের দায়িত্ব স্বীকার করে এবং যথারীতি এ খুনের দৃশ্যটি ও রঙ্গমঞ্চে উপস্থাপিত হয়। পরস্পর বিরোধী সাক্ষ্য প্রমাণ এবং তিনজনের জবানবন্দীতে পুলিশ যখন রীতিমত বিভ্রান্ত তখন পোস্ট মর্টেমের রিপোর্টে ডা আমেদ আবিষ্কার করেন মৃতের ডান হাতের আঙুলের নখে অন্য কোন ব্যক্তির চামরা আর রক্তের দাগ।

কে এই চতুর্থ ব্যক্তি? রণেন্দ্রর স্ত্রী পুলিশের কাছে এসে জানায়, অন্য কেউ নয়, সে নিজের হাতে তার স্বামীকে খুন করেছে। মৃতের নখের আঁচড়ের হদিশও পাওয়া যায় তার শরীরে। যথা পূর্বং flash back এ ঘটনাটি দেখিয়ে দেন নাট্যকার। কিন্তু একই খুনের চারজন দাবীদার হলে আইন কাউকেই দোষী সাব্যস্ত করতে পারেনা। অতএব সকলেই বেকসুর খালাস পেয়ে যান এবং এখানেই নাটকের সমাপ্তি ঘটে।

ইংরেজি ক্রাইমে আদ্যপান্ত যে রুদ্ধশ্বাস ঘটনাপ্রবাহ আমাদের প্রতি মুহূর্তে সজাগ রাখে, ইংরেজি ক্রাইম অনুসারে রচিত এ নাটকে দৃঢ় পীনদ্ধ ঘটনাধারা অনুপস্থিত। প্রতিটি ঘটনাই এখানে একে অন্যের থেকে বিচ্ছিন্ন--যোগসূত্র নিতান্তই দুর্বল। চরিত্র বিকাশও কোন ভাবে আমাদের আকর্ষণ করেনা। পরস্পর বিরোধী সূত্রে শুধু গোয়েন্দা পুলিশ নয়, আমরাও যথেষ্ট বিভ্রান্ত।

॥ আগুন ॥

বিজন ভট্টাচার্যের ক্ষুদ্র পরিসরের নাটিকা 'আগুন' 'ভারতীয় গণনাট্য সংঘের' প্রযোজনায় ১৯৪৩র ২৩শে মে 'নাট্যভারতী' রঙ্গমঞ্চে প্রথম অভিনীত হয়। এরই সঙ্গে অভিনীত হয় বিনয় ঘোষের 'ল্যাবরেটরি'। নাট্যকার বিজন ভট্টাচার্যের পরিচালনায় 'আগুন' মঞ্চস্থ হয় এবং গণনাট্য কর্মীদের দ্বারা অভিনীত হয়: সাম্রাজ্যবাদের প্ররোচনায় সংঘটিত মহাযুদ্ধের পরিপ্রেক্ষিতে দুর্ভিক্ষ ও মন্বন্তর ক্লিষ্ট গ্রাম বাংলার সকরুণ চিত্র বিজন ভট্টাচার্যের 'আগুন'। এখান থেকেই গণনাট্যের পথ চলার শুরু। 'আগুন' গ্রন্থাকারে এখনো প্রকাশিত

হয়নি: ২৩শে এপ্রিল, ১৯৪৩ 'অরণি' পত্রিকায় এটি প্রথম প্রকাশিত হয় এবং 'বহুরূপী' ৩৩ সংখ্যায় নাটকটি পুনর্মুদ্রিত হয়।

পাঁচটি খণ্ড দৃশ্যে রচিত ক্ষুদ্র নাটিকা 'আগুন'। প্রতিটি দৃশ্যের মধ্যে সংযোগ সূত্র অত্যন্ত ক্ষীণ, নিটোল পরিপূর্ণ কাহিনীর অভাব এখানে সহজেই চোখে পড়বে। এই খণ্ড দৃশ্যগুলির মধ্যে দিয়ে মন্বন্তরের পেষণে সমাজের বিভিন্ন প্রান্তের ক্ষুধাতুর মানুষের হাহাকার, ক্রমে বঞ্চনার বিরুদ্ধে একত্রিত হবার প্রেরণায় অভিব্যক্ত হয়েছে। পরিবেশ ও পরিস্থিতি এখানে সমস্ত বিভেদ ও বৈষম্য ভুলে একটা গণ জাগরণের সম্ভাবনাকে উজ্জ্বল করে তুলেছে।

প্রথম দৃশ্যে নেত্যর বাড়ির চিত্র। অস্পষ্ট অন্ধকারে চালাঘরের সামনে বিস্তৃত রিক্ত অঙ্গন। ঘর গেরস্থালির কোণে কোণে অভাব অনটনের সাক্ষ্য ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে। সরকারী রেশনে দিনান্তে একমুঠো চালের আশা তাদের রাতের ঘুম কেড়ে নিয়েছে। নেত্যর মা সব্জী বিক্রি করে। ভোর না হতেই গভীর মমতায় সে বিবর্ণ সব্জীগুলোকে জলসিঞ্চনে সজীব করে তুলতে সচেষ্ট হয়। সরকারী অনুকম্পায় একমুঠো অন্নে প্রতিপালিত বিবর্ণ জীবনকে সজীব রাখার অকৃত্রিম ব্যঞ্জনা যেন মূর্ত হয়ে উঠেছে এই সাদামাটা ঘটনাটিতে।

দ্বিতীয় দৃশ্যে কৃষাণ আর তার বউ উদ্বিগ্ন আগ্রহে অপেক্ষা করে আছে সকাল সকাল গিয়ে লাইনের 'পেরথমে' দাঁড়াতে হবে। নইলে হয়ত সারাদিন দাঁড়িয়েও মিলবে না একমুঠো চাল, অভুক্ত থাকতে হবে আরও একটা দিন। তবু কৃষাণ স্বপ্ন দেখে কটা দিন, আর মাত্র কটা দিন কষ্ট করতে পারলেই তার দুর্দশার অবসান হবে; মাচায় উঠবে বড় সাধের চৈতালী ফসল। বউকে সে আশার বাণী শোনায়। কৃষাণ বউ তার অভিজ্ঞতায় বুঝেছে এখনই আশান্বিত হবার কোন অর্থ হয় না। তার তীক্ষ্ণ শ্লেষে খান খান হয়ে যায় ভবিষ্যতের সুখ স্বপ্ন। বাস্তবের রূঢ়তার মুখোমুখি হয়ে সে বউকে তাগিদ দেয় কেষ্টর মার সঙ্গে অবিলম্বে রওনা হতে। সে ফিরলে তবে তো রান্না হবে, এক মুঠো অন্ন জুটবে। তার গরুটাও মাঠে যাবার জন্য ব্যস্ত হয়ে ওঠে।

তৃতীয় দৃশ্যে কলের শ্রমিক যতীনের সংসার চিত্র। দূরে কলের ভোঁ বাজতে শুরু করেছে, কাকের কর্কশ ধ্বনি শোনা যাচ্ছে আবছা অন্ধকারে। কাকের কর্কশ ধ্বনির মতই কলের বাঁশির উৎকট আওয়াজ জীবনের সব মাধুর্যকে যেন নিঙরে নিয়েছে নির্মমভাবে। ক্লান্তি শ্রান্তিতে ঘুমন্ত পরিবারের সামনে উন্মুখ সতীশ উবু হয়ে বসে আছে। তার মাথায় গোটা পরিবারের দায়িত্ব, কাজেই এদের মত সে নিশ্চিন্তে ঘুমোতে পারেনা। সে বিরক্ত হয়ে ফুলকিকে ডাকে। গতকাল ফুলকি সারাদিন দাঁড়িয়ে থেকেও এক মুঠো চাল পায়নি। তবু এরা এমন নিশ্চিন্তে কি করে ঘুমোতে পারে সে ভেবে পায় না। কোম্পানী অবশ্য রোজই চাল-ডাল দিচ্ছে, কিন্তু সে ব্যবস্থাও তো খুব জোরদার নয়। তার বারবার ডাকে ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠে স্ত্রী ক্ষিরি। ক্ষিরির পরনের কাপড় শতচ্ছিন্ন, পেটে ভাত নেই। তার এই দূরবস্থার জন্যে সে দায়ী করে অপদার্থ স্বামীকে। প্রতিবেশিনী কেলোর মার স্বাচ্ছন্দ্যের

সঙ্গে তুলনায় নিজের অবস্থার হীনতায় ক্ষোভ গোপন থাকে না তার কণ্ঠে। আর ক্ষিরির ইঙ্গিতে ক্ষিপ্ত যতীন সজোরে লাথি মারে বউকে। অর্ধাহারের অনাহারের যন্ত্রণা তাদের দাম্পত্য মাধুর্যকেও যেন হঠাৎ কখন লুঠ করে নিয়ে গেছে। সতীশের ঈর্ষা হয় সহকর্মী জুড়োনকে দেখে জুড়োন একলা মানুষ, সংসারের গুরুভার তার কাঁধে নেই, অভিযোগের কণ্টক তো তাকে এ ভাবে প্রতিনিয়ত বিদ্ধ করে না। পেটের জ্বালার উপরি মনের জ্বালার দুঃসহ ভার বইতে হয়না তাকে।

চতুর্থ দৃশ্যে কেরানি হরেকৃষ্ণ আব তার স্ত্রী মনোরমার পরিবারের আর একটি চিত্র। হরেকৃষ্ণকে দশটায হাজিবা দিতে হয় অফিসে। চালের লাইনে দাঁড়ানোর মত পর্যাপ্ত সময় তার নেই। লাইনে দাঁড়িযে বেলা বারোটাব আগে চাল পাওয়াব আশা নেই। অফিস থেকে নিয়মিত চাল, ডাল দেবার কথা। দেওযা হচ্ছে ঠিকই, কিন্তু কেবল খাতাকলমে তাব ছিটে ফোটাও হবেকৃষ্ণব মত কেরানি বাবুরা পায়না। এদের বরাদ্দ চাল সস্তাদরে আসে; ম্যানেজার ও তাব মোসাহেববা বেশি দামে তা বাজারে বিক্রি করে অবৈধ উপায়ে মুনাফা অর্জন করে। প্রতিবিধানের কেউ নেই। দুর্নীতির চোরা স্রোত এইভাবে প্রবাহিত হয়ে চলে ঘুণধরা সমাজের মর্মপথ বেয়ে। ব্যস্ত হরেকৃষ্ণ বের হবাব আগে ঠাকুর প্রণাম করতেও ভুলে যায়, জীবনেব বঞ্চনা আজ দৈব নির্ভরতাকে অনাবশ্যক করে তুলেছে। স্ত্রী মনোরমা এখনো ঈশ্বর বিশ্বাসী স্বামীব ভ্রান্তি সংশোধন করে দিতে চেষ্টা করে গভীর প্রত্যয়ে।

পূর্বোক্ত চারটি দৃশ্যের সমবেত মানুষের 'কিউ' পঞ্চম দৃশ্যে রেশনের দোকানের সামনে। হিন্দু, মুসলমান, ওড়িয়া, বাঙালী একাকার হয়ে রেশনের দোকানের দরজার সামনে অধীর আগ্রহে অপেক্ষামান কখন মিলবে মহার্ঘ চাল। দূর দূর থেকে আগত মানুষের দীর্ঘ 'কিউ' নিয়ন্ত্রণ করে আইনের অতন্দ্র প্রহরী সিভিক গার্ড চলে অকারণ নির্যাতন। তার বিপরীতে কুচকুচে কালো, মোটা নাদুস নুদুস, আধখোলা ফতুয়ার ফাঁক দিয়ে দৃশ্যমান বিশাল উদর সম্বলিত দোকানী যেন পরিত্রাতার ভূমিকায় অবতীর্ণ। ক্যাশ বাকসে জ্বলছে ধুনুচি, একপ্রান্তে সিদ্ধিদাতা গণেশের মূর্তি আর তার সম্মুখে ভক্তির ভানে বিনম্র দোকানীর স্মিতহাস্যে নিষ্ঠুর কৌতুক রেখা বিদ্যুতের মত খেলে যায়। সিভিক গার্ডের নির্মম উৎপাতে পরস্পর বিচ্ছিন্ন জনতার 'কিউ' ক্ষুধার তাড়নায় সংঘবদ্ধ রূপ নেয়। সকলে অনুভব করে- 'এখন বাঁচতে হবে। বাঁচতে হলে মিলে মিশে থাকতে হবে, ব্যাস।' উদরের প্রজ্জ্বলিত অগ্নিশিখা রূপান্তর লাভ করে সংঘবদ্ধ লড়াইয়ের জ্বলন্ত আগুনে।

এই নাটকের কোথাও চরম খাদ্যাভাবের কারণ দর্শানোর প্রয়োজন অনুভব করেননি নাট্যকার। সাম্রাজ্যবাদী শক্তির যুদ্ধনীতি সৃষ্ট এই অন্নাভাব। প্রথম চারটি দৃশ্যের পুঞ্জীভূত ক্ষোভ পঞ্চম দৃশ্যে এসে গণ জাগরণের ক্ষেত্র প্রস্তুত করেছে। নীল আলোর গভীরতর ব্যঞ্জনায় তা মূর্ত হয়ে উঠেছে। এই নাটিকায় শিল্প কৌশলগত ত্রুটি হয়ত খুঁজে পাওয়া যেতে পারে; কিন্তু বিজন ভট্টাচার্যের প্রথম এই নাট্যিক প্রয়াসে সেকালের মর্মন্তুদ চিত্র

স্বতস্ফূর্ত ভাবে উঠে এসেছে। সমকালীন দর্শক এই আগুনের আঁচ যেমন অনুভব করেছে তেমনি তার রক্তিম আভায় যুদ্ধ বিধ্বস্ত বাংলাদেশের পটভূমি অভিনব দীপ্তিতে ভাস্বর হয়ে উঠেছে।

॥ ল্যাবরেটরি ॥

বিনয় ঘোষের 'ল্যাবরেটরি', বিজন ভট্টাচার্যের 'আগুন' এর সঙ্গে ১৯৪৩ র ২৩শে মে ভারতীয় গণনাট্য সংঘের প্রযোজনায় 'নাট্যভারতী' তে প্রথম অভিনীত হয়। এ ছাড়া সর্বভারতীয় গণনাট্য সম্মেলনের প্রথম অধিবেশনে ঐ বছরের ২৫শে মে বোম্বাইতে 'দামোদর হলে' গণনাট্য সংঘের বাংলা শাখা কর্তৃক এর অভিনয় হয়। গোবিন্দবাবুর বৈঠকখানায় (রাসবিহারী এভিনিউ) একবার অভিনয়েরও সংবাদ পাওয়া যায়।[৭৭] বৈজ্ঞানিক জীবানন্দের ভূমিকায় অভিনয় করেন শম্ভু মিত্র এবং আগন্তুকের ভূমিকায় বিজন ভট্টাচার্য। এ ছাড়াও নাট্যকার বিনয় ঘোষ, সুধী প্রধান - এঁরাও এই নাটকের অভিনয়ের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন।

'ল্যাবরেটরি' ১৯৪৪ এ 'তিনটি নাটিকা' সঙ্কলনে প্রথম মুদ্রিত হয়ে প্রকাশিত হয়। 'বহুরূপী' ৩৩ সংখ্যায় বিজন ভট্টাচার্যের 'আগুন' এবং মনোরঞ্জন ভট্টাচার্যের 'হোমিওপ্যাথি' নাটকের সঙ্গে এই নাটকটিও পুনর্মুদ্রিত হয়। ফ্রিডারিশ ডোলফ রচিত জার্মান নাটক 'প্রফেসর মামলক' অনুসরণে তিনটি দৃশ্যে রচিত হয়েছে এই ক্ষুদ্র নাটিকটি। তবে বিদেশী নাটকের ভাবানুসরণে রচিত হলেও সমকালীন দেশীয় ভাবধারার অনুকূলে তাকে সংস্থাপিত করেছেন নাট্যকার। ল্যাবরেটরিব নিভৃত কক্ষে নিরলস বিজ্ঞান সাধনায় মগ্ন বৈজ্ঞানিকের সামাজিক দায়বদ্ধতা কতখানি- তারই উত্তরের অনুসন্ধানে রচিত নাটক 'ল্যাবরেটরি'। বিজ্ঞানের সাধনার সঙ্গে সামাজিক কল্যাণবোধের চেতনা সংযুক্ত না হলে, তার উদ্দেশ্যই ব্যর্থ হয়ে পড়ে---শেষ পর্যন্ত এইরূপ সিদ্ধান্তেই পৌঁছাতে চেয়েছেন নাট্যকার। সমাজ বিমুখ এবং সমাজমুখী, দুই ভিন্ন মতাদর্শের দুই প্রজন্মের বিজ্ঞান সাধক এখানে পরস্পর পরস্পরের প্রতিদ্বন্দ্বী; অবশেষে নতুন প্রজন্মের কাছে পরাভব স্বীকার করতে হয়েছে পূর্ববর্তী প্রজন্মকে। বাস্তব অভিজ্ঞতাই এরূপ মেরুকরণের পশ্চাতে সক্রিয়ভাবে কাজ করেছে।

প্রবীণ বিজ্ঞানী জীবানন্দ অবসর জীবনে তাঁর নিজের তৈরি ল্যাবরেটরিতে বিজ্ঞানের সাধনায় মগ্ন থাকেন। তাঁর স্বপ্ন ছিল বড় মাপের বিজ্ঞানী হবেন, কিন্তু হতে পারেননি। তাই অবসর গ্রহণ করার পর নিজস্ব ল্যাবরেটরিতে অনুক্ষণ আপন খেয়ালে ডুবে থাকেন— কখনও বা পুতুল গড়েন। নিজের কাজের মধ্যে তৃপ্তি লাভের ব্যর্থতাই কি তাকে মাঝে মাঝে এ ভাবে উদাসীন করে তোলে? নইলে যে বিজ্ঞানী সমাজ, রাজনীতি, মানব কল্যাণ

---

৭৭ 'পুরনো কথা' তৃপ্তি মিত্র, বহুরূপী, ৩৩ সংখ্যা, পৃঃ ১৮৯।

এ সবের উর্ধে কেবল দুর্লভ জ্ঞানের আস্বাদন তৃষ্ণায় কাতর. তার এই অদ্ভুত খেয়াল কেন? জীবানন্দের পুত্র রণজিৎ তরুণ বিজ্ঞানী. স্ট্যাটিসটিক্যাল ল্যাবরেটরিতে গবেষণারত: কন্যা নন্দিতা ক্যাম্বেল থেকে পাশ করা এক হাসপাতালের লেডি ডাক্তার। উভয়েই বিজ্ঞানের ছাত্র এবং সেবক. কিন্তু মতাদর্শে পিতৃ আদর্শের সম্পূর্ণ বিরোধী। বিজ্ঞানের যা কিছু সাধনা. সে তো মানুষের কল্যাণের জন্যেই মানব কল্যাণ. সমাজ কল্যাণকে বাদ দিয়ে নিছক শুষ্ক জ্ঞানের অনুশীলন তাদের কাম্য নয়। বিজ্ঞানীও সমাজের মানুষ. সমাজের ভাল মন্দ. ন্যায় অন্যায়. জ্বালা যন্ত্রণা সমস্ত কিছুর সঙ্গে তার নাড়ীর যোগ। অতএব সমাজের মঙ্গল চিন্তা বিজ্ঞানীর প্রথম এবং প্রধান কর্তব্য। সাধনা, তপস্যা ইত্যাদি যুক্তিহীন যুক্তির আড়ালে আত্মগোপন প্রচেষ্টা সমাজ বিমুখতারই নামান্তর মাত্র। জীবানন্দ এ মতবাদে বিশ্বাসী নন। অপরের উন্নতি সাধনের পূর্বে আত্মোন্নতিকে তিনি মূল্য দেন। আদর্শগত এই বিরোধ. পিতা পুত্রে বিবাদ এবং বিচ্ছেদের সূচনা করে।

রণজিৎ অনুভব করে যুদ্ধবাজ সাম্প্রদায়িক শক্তির নিষ্ঠুর পেষণে অসংখ্য সাধারণ মানুষের করুণ মুখের অভিব্যক্তি। দুর্ভিক্ষ পীড়িত অসহায় মানুষের নিদারুণ বঞ্চনার যন্ত্রণা তার কর্মজগৎকে বিস্তৃত করে মানুষের মাঝখানে। যে বিজ্ঞান ধন তন্ত্রের কালো হাতে শক্তি জোগায় নিরপরাধ মানুষের অন্ন বস্ত্র হরণে. সেই অন্ধ বিজ্ঞানের আনুগত্যে মানবতার অপমান সে করতে পারেনা। তার সাধনার ক্ষেত্র চার দেওয়ালের মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়. জনতার মাঝখানে বিস্তৃত তার ল্যাবরেটরি। রতন. দেবেন সকলেই সে কর্মের সমান অংশীদার। দীর্ঘ অভ্যাসগত মনগড়া কৌলীন্যে আবদ্ধ জীবানন্দ পুত্রের আদর্শকে মূল্য দিতে কুণ্ঠিত হন. ক্ষুব্ধ যন্ত্রণায় অধীর হয়ে ওঠেন। পিতা ও পুত্রের মধ্যবর্তী সেতুবন্ধ নন্দিতা। সে বোঝাতে চেষ্টা করে. দেশের মানুষ আজ বিপন্ন; দুর্ভিক্ষ. অনাহারে বিপর্যস্ত মানুষকে মুক্তির পথ দেখাতে তরুণ প্রজন্ম আজ তাদের সংগ্রামের সাথী। এ যুগে জন্মালে জীবানন্দও কি পারত তাদের দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে নিতে? আজকের বৈজ্ঞানিক. মানুষের জীবন মরণের সংগ্রামের সৈনিক।

জীবানন্দের ধ্যান ভাঙ্গে ভণ্ড তপস্বীর ভেকধারী মহেশ্বর ভট্টাচার্যের আগমনে। তার শুভ্র বসনের অন্তরাল থেকে রক্তলোলুপ ক্ষুধার্ত পশুর গর্জন স্পষ্ট শুনতে পান জীবানন্দ। গৌতম বুদ্ধ জরা. ব্যাধি. মৃত্যুর বীভৎসতা দর্শনে সন্ন্যাস নিয়েছিলেন; আর গৌরীপুরের বিখ্যাত আয়ুর্বেদ ভবনের আয়ুর্বেদশাস্ত্রী মানুষের দেহ ও মনের ক্ষুধা নিবারণের উপায় অন্বেষণে জীবানন্দের দোরগোড়ায় উপস্থিত। প্রভূত অর্থের বিনিময়ে তার চাই মানুষ মারার মোক্ষম দাওয়াই তৈরির সরল একটি ফর্মূলা। জীবনানন্দের চোখে প্রতিভাত হয়ে ওঠে মুনাফালোভী ধনতন্ত্রের নগ্ন চেহারা। তিনি বুঝতে পারেন— এরা সবাই মার্ডারার্স— সমাজের সব থেকে বড় শত্রু। এদের বিষাক্ত ছোবল থেকে সমাজকে বাঁচার পথই বাতলে দিতে হবে বৈজ্ঞানিককে। বিভ্রান্ত বৈজ্ঞানিকের কাছে আহত পুত্র রণজিতের সংবাদ আসে। শেষ সংশয়টুকুও নিঃশেষ হয়ে যায় মুহূর্তে।

হাসপাতালে রোগীদের আর্তনাদের মাঝে দাঁড়িয়ে জীবানন্দ সমাজকে চিনতে পারেন নতুন রূপে। নির্মম অত্যাচারে ভুখা জনতার সহমর্মীতায় আন্দোলিত হয়ে ওঠে তার হৃদয়। ঘরের পথ আজ অবরুদ্ধ. তাই পথের মাঝে নতুন ঘর গড়তে নতুন প্রজন্মের পথে নামা -আর তাকে অস্বীকার করা চলে না। ল্যাবরেটরিতে ফেরার কথা বললে তখন চমকে ওঠে জীবানন্দ– 'অ্যা! কি বললে! আমার ঘরে! আমার ল্যাবরেটরিতে।' না, আর সেখানে নয়: পশ্চাতে ফেরার দিন শেষ. এখন সম্মুখ পথে যাত্রা করার সময় আগত।

মাত্র তিনটি দৃশ্যের এই ক্ষুদ্র নাটিকাটিতে অত্যন্ত বিশ্বস্ততার সঙ্গে সমসাময়িক ভারতবর্ষের মানুষের দুর্দশার মূলে সাম্রাজ্যবাদের কৌশলী চক্রান্তের মোকাবিলায় সচেতন মানুষকে উদ্বুদ্ধ হতে প্রেরণা জুগিয়েছে। এইখানেই এর ঐতিহাসিক মূল্য।

॥ সানিভিলা ॥

বঙ্গীয় নাট্যশালার ইতিহাসে চরমতম বিপর্যয়ের শুরু ১৯৪২ র পর থেকে। আগষ্ট আন্দোলনের গণ বিক্ষোভ, মেদিনীপুরের ভয়াবহ বন্যা ও সাইক্লোন, পঞ্চাশের মন্বন্তর (১৯৪৩), দুর্ভিক্ষ, মহামারী প্রভৃতি অনভিপ্রেত দুর্বিপাকে কলকাতার জনজীবন তখন সম্পূর্ণ বিপর্যস্ত। নাগরিক জীবনের এই অভিশম্পাত বঙ্গীয় নাট্যশালার বিবর্তনের ধারাতেও অনিবার্যভাবে গভীর ক্ষত চিহ্ন সৃষ্টি করেছিল। এই পর্বের নাট্যাভিনয়ের ইতিবৃত্তে তার নিদর্শন ছড়িয়ে আছে সর্বত্র। প্রখ্যাত সাহিত্য সমালোচক এবং নাট্যকার প্রমথ নাথ বিশীর লঘু নাট্য 'সানিভিলা' বা 'ঘৃতং পিবেৎ' রঙ্গমঞ্চের এই চরম অস্থিরতার পর্বে প্রথম আত্মপ্রকাশ করে; 'রঙমহল' থিয়েটারে ১৯৪৩ র ২৩শে ডিসেম্বর তার প্রথম অভিনয়ের সংবাদ পাওয়া যাচ্ছে। কিন্তু এই নাটকটির প্রথম অভিনয় সংক্রান্ত বিস্তারিত তথ্য সংগ্রহ করা সম্ভব হয়নি। প্রধানত 'জাতীয় গ্রন্থাগার' 'সংবাদপত্র বিভাগে' সংরক্ষিত 'অমৃত বাজার পত্রিকায়' প্রকাশিত বিজ্ঞাপন ও বিজ্ঞপ্তি, সেকালের নাট্যাভিনয়ের প্রামাণ্য তথ্যাদির মূল উৎস। দুর্ভাগ্যের বিষয় ১৯৪৩-র ডিসেম্বর মাসের পত্রিকা সংখ্যাগুলি ব্যবহারের সম্পূর্ণ অযোগ্য হয়ে পড়ায় গ্রন্থাগার কর্তৃপক্ষ সেগুলি আমাকে দেখবার অনুমতি দেননি। ফলে অভিনয় তারিখটি ছাড়া এই নাটকের প্রথম অভিনয়ের কোন তথ্যই পেশ করা যাচ্ছে না।

প্রমথনাথ বিশীর 'সানিভিলা' নাটকের বিষয়বস্তু আধুনিক নগর জীবনাশ্রিত। জীবন-নাট্যের রঙ্গভূমিতে আমরা সকলেই এক একজন অভিনেতা- বিশিষ্ট চরিত্রে নিপুণ ভাবে ক্রিয়াশীল। তথাকথিত এ্যারিস্টোক্র্যাসির লক্ষ্যে দ্রুত ধাবমান এই জীবন্ত কুশীলবের স্বাতন্ত্র্য কেবল আঙ্গিকে, পোষাকী আবরণে- -অন্তরধর্মে অদ্ভুত নির্বিরোধ সাম্য। সেখানে কন্যাদায়গ্রস্ত পিতা, আবেগ-সঞ্চালিত প্রেমিক কিম্বা তাত্ত্বিক উপলব্ধি লব্ধ কমরেডে কোন ভেদ নেই। 'রক্তকরবী' র সোনার খনির শ্রমিকদের ব্যক্তি পরিচয় অনাবশ্যক বোধে মুছে গিয়ে কেবল সংখ্যা-পরিচয়ের পরিসংখ্যানগত অস্তিত্বটুকু বজায় ছিল। এ

কালে দুর্লভ এ্যারিস্টোক্র্যাসির লক্ষ্য অর্জনে ক্রিয়াশীল মানব সত্তা ব্যক্তি পরিচয়ের বাহুল্য বর্জিত বৈচিত্র্যময় মুখোসের অন্তরালে একই মুখের অভিব্যক্তি। কিন্তু জীবন নাট্যের রঙ্গভূমিতে মাঝে মাঝেই আমাদের পার্ট ভুল হয়ে যায় - পোষাকী আবরণের মধ্যে থেকে অসহায় ভাবে প্রকাশ হয়ে পরে আমাদের মানবসত্তার দীনতা। সে অবস্থা যত করুণই হোক না কেন, তা ড্রেসিং রুম থেকে ধার করে আনা সুসজ্জিত পোষাকের গোপন আত্মপ্রবঞ্চনার লজ্জা থেকে মুক্ত।

কন্যাদায়গ্রস্ত পিতা সর্বেশ্বর সিংহ এ্যারিস্টোক্র্যাসির দুর্বার মোহে বালিগঞ্জের সানি পার্কে সুরম্য অট্টালিকা সানিভিলায় জনৈক রায়বাহাদুর রূপে আত্মপ্রকাশ করেছেন। ভাড়া করা এই অট্টালিকায় সেক্রেটারি নগেন্দ্র নাথের সহায়তায় নিজেকে প্রভূত ধনবান এবং সংস্কৃতিবান প্রমাণে তাঁর চেষ্টার ত্রুটি নেই। ধনের সঙ্গে সংস্কৃতির সংমিশ্রণ না হলে এ্যারিস্টোক্র্যাট সমাজে যে ছাড়পত্র মেলে না, এ কথা সর্বেশ্বরের অজানা নয়। একমাত্র কন্যা প্রমীরাকেও সেই ছাঁচে তিনি অবিরাম সযত্নে ঢালাই করে চলেছেন। সর্বেশ্বরের এত প্রযত্নের মৌল উদ্দেশ্য একটি কন্যা প্রমীরাকে রাজৈশ্বর্য সম্পন্ন পরিবারে বিবাহ দিয়ে রাজার শ্বশুর রূপে আত্মতৃপ্তি লাভ। মানুষ তার ব্যক্তি জীবনের অনেক অপূর্ণ অভিলাষ সন্তানের মধ্যে সার্থক দেখতে চায়। ইহজীবনে রাজৈশ্বর্যে সম্ভাবনাহীন সর্বেশ্বর, কন্যা প্রমীরাকে উপায় স্বরূপ ব্যবহার করে বহু আকাঙ্ক্ষিত আভিজাত্যের সোপানে পদ স্থাপন করতে চেয়েছেন। তাঁর এই চেষ্টা এক ধরনের মানসিক বিকৃতি সঞ্জাত যা এ যুগের রন্ধ্রে রন্ধ্রে অন্তঃসলিলা ফল্গু ধারার মত প্রবাহিত। সেই একই প্রবৃত্তির তাড়নায় আত্মীয় বিজয়নারায়ণ সহ মোটর ড্রাইভার ত্রিদিবনারায়ণের মাকড়দ'র যুবরাজের মিথ্যা পরিচয়ে সানিভিলায় প্রমীরার পাণীপ্রার্থীরূপে আবির্ভাব। অথ, আভিজাত্য আর সংস্কৃতির দুর্নিবার আকর্ষণে আত্ম অক্ষম শ্বশুর ও জামাতা পরস্পর পরস্পরের প্রতিদ্বন্দ্বী। অবশেষে লক্ষ্য অর্জনে ব্যর্থকাম সর্বেশ্বর এবং ত্রিদিবনারায়ণ, ইপ্সিত লক্ষ্যের অন্তঃসারশূন্যতার বেদনাঘন আনন্দে উপনীত।

মালবিকা ও নীরজানাথের রহস্যঘন উপকাহিনীটি মূল নাট্যবৃত্তের পরিপূরক রূপে উপস্থাপিত। পাশ্চাত্ত্য প্রভাব জনিত উৎকট ব্যক্তি স্বাধীনতা আমাদের দীর্ঘ ঐতিহ্য মণ্ডিত পারিবারিক ও সামাজিক সম্পর্কগুলিকে অস্বীকার করতে শিখিয়েছে। আধুনিক সংস্কৃতির উপাসক তথাকথিত এ্যারিস্টোক্র্যাটিক সমাজের এও আর একটি দিক। উৎকট ব্যক্তি স্বাতন্ত্র্য বোধের নবতম মন্ত্রে দীক্ষিতা মালবিকা ওরফে মন্দাকিনী বিবাহের অব্যবহিত পরে স্বামী নৃপনাথ ওরফে নীরজানাথকে অস্বীকার করে চলে এসেছিল। একটি পুরুষের অধীনতা গ্রহণে অনিচ্ছুক মালবিকা ক্রমে উপলব্ধি করে, বহু পুরুষের লুব্ধ দৃষ্টির অধীনস্থ নারীর ব্যক্তি স্বাতন্ত্র্যবোধের লজ্জাজনক পরিণতি। কিন্তু পশ্চাৎগমনের পথ তখন বন্ধ। অবশেষে সানিভিলায় প্রমীরার সেক্রেটারি রূপে অবস্থান কালে নীরজার সঙ্গে তার সাক্ষাৎ, প্রণয় এবং সবশেষে বিবাহ। কিন্তু অকস্মাৎ উভয়ের দাম্পত্য সম্পর্কের মাঝখানে অবরোধ সৃষ্টি করে নীরজা বা নৃপনাথের পিতার উইল। চরম

আত্মধিক্কারে উভয়ে যখন মৃত্যুর প্রতীক্ষায়, তখন অতর্কিতে প্রকাশ হয়ে পড়ে মালবিকা ও নীরজার পূর্ব পরিচয়। প্রাক্তন নৃপনাথ ও মন্দাকিনী ভ্রান্ত সংস্কারমুক্ত বর্তমান নীরজা ও মালবিকার মধ্যে দিয়ে নতুন করে জীবনের অর্থ অনুধাবন করেছে। আর মৃত্যুর মুখোমুখি দাঁড়িয়ে এই দুটি নরনারীর ব্যাকুল জীবন তৃষ্ণা প্রমীরা এবং ত্রিদিবের দৃষ্টিকে মোহাঞ্জন মুক্ত করে তাদেরও বাঁচতে শিখিয়েছে। এইখানেই এই উপকাহিনীর নাটকীয় সার্থকতা।

নাট্যকারের শ্লেষ ও ব্যঙ্গের অন্যতম লক্ষ্য এই নাটকে ভারতবর্ষের কমিউনিস্ট আন্দোলন। তৎকালীন আন্তর্জাতিক পরিস্থিতির গতি পরিবর্তনে এদেশে কমিউনিষ্টদের নির্ধারিত নীতি ও আদর্শ জন মানসে গভীর সংশয়ের সৃষ্টি করেছিল। 'ইকনমিক সন্ন্যাসী' কমরেডদের প্রচলিত সংস্কারের বিরুদ্ধে জেহাদ ঘোষণা, নাট্যকারের তীক্ষ্ণ বিদ্রূপের বাণে জর্জরিত। এ নাটকের কমরেড বহিরঙ্গে রক্তরাগে রঞ্জিত, কিন্তু সে রক্তরাগ তার হৃদয়কে কতখানি রঞ্জিত করতে পেরেছে তা বলা শক্ত। জানলা দিয়ে তার গমনাগমন, প্রথা ভঙ্গের হাস্যকর প্রচেষ্টা মাত্র; তথাকথিত সমাজ-বিপ্লব আর যাই হোক কমরেডের উদ্ভূত পন্থায় সম্ভব নয় -প্রত্যাশিতও নয়। কমরেড 'প্রফেশনাল কমিউনিস্ট'; তারও লক্ষ্য সমাজ-বিপ্লব নয়, তার লক্ষ্য প্রমীরা এবং তার বিপুল ঐশ্বর্য। অর্থাৎ স্বাতন্ত্র্য প্রতিষ্ঠার জন্যেই তার কমরেডের বাহ্য আবরণ -- প্রমীরার কাছে নিজেকে নির্ভরযোগ্য রূপে প্রমাণ করে ঐ এ্যারিস্টোক্র্যাট সমাজের ছাড়পত্র আদায় তার একান্ত প্রয়োজন। জগতে যার কিছুই দেখাবার নেই তাকেই ফাঁকা আদর্শের মিথ্যা বুলি আউরে দৃষ্টিনন্দনে সচেষ্ট হতে হয়। যাত্রাদলের রাজা সত্যিকারের রাজা নয় বলেই তার পোষাক পরিচ্ছদ এবং আচার-আচরণে এতটুকু ঘাটতি থাকলে চলে না!

সামাজিক জীবনের বহুবিধ অসঙ্গতির বিরুদ্ধে ব্যঙ্গ, শ্লেষ এবং নির্মম কৌতুক প্রয়োগে প্রমথনাথ বিশী সিদ্ধহস্ত। এ ব্যাপারে তিনি ফরাসী নাট্যকার মলিয়েরের সমগোত্রীয়। এই নাটকে সর্বেশ্বর এবং নগেন্দ্রনাথের উৎসাহে প্রমীরাকে কৃষ্টি প্রয়োগে বহু শিক্ষকের যুগপৎ আক্রমণে ছাত্রীর প্রাণান্তকর অবস্থা; পুত্র-কন্যাকে সর্ববিদ্যায় পারদর্শী করে তুলে সংস্কৃতি সম্পন্ন প্রমাণের এই নির্মম নির্বোধ প্রচেষ্টা তথাকথিত এ্যারিস্টোক্র্যাসির বিশিষ্ট লক্ষণ। সাফল্যের মানদণ্ড সেখানে স্বতন্ত্র--- চূড়ান্ত ব্যর্থতা সেখানে দৃষ্টিকটু নয়, বরং বহুবিদ্যার গুরুভারে চূর্ণিত মস্তক ছাত্রের ক্লান্ত মুখাবয়ব অভিভাবকের পরম তৃপ্তির বস্তু। অন্যদিকে মাসিক পত্রিকার সম্পাদকের অবশ্যম্ভাবী যোগ্যতা এখানে তার দৃষ্টিশক্তির ক্ষীণতা এবং শ্রবণশক্তির স্বল্পতা; মাসিক পত্রিকার দায়িত্ব ও কর্তব্যের প্রতি নাট্যকারের সুস্পষ্ট ইঙ্গিতটি এখানে লক্ষ্যণীয়। পাশ্চাত্ত্য শিক্ষালব্ধ চিকিৎসা ব্যবস্থাকেও নাট্যকার ব্যঙ্গ বিদ্রূপে জেরবার করে তুলেছেন। জীবনদান নয়, জীবনহরণ এই চিকিৎসা বিজ্ঞানের মূলমন্ত্র।

সানিভিলা নাটকের মুখ্য আকর্ষণ এর চমকপ্রদ বুদ্ধিদীপ্ত তির্যক সংলাপ। বাছাই করা নিপুণ শব্দ প্রয়োগে নাট্যকার গভীরতর ব্যঞ্জনা সৃষ্টি করেছেন। এই নাটকের

সংলাপ একই সঙ্গে আমাদের মস্তিষ্ক এবং হৃদয়ের কাছে তার আবেদন ধ্বনিত করে তোলে। অর্থাৎ বুদ্ধি ও মনন নির্ভর এই নাটক।

॥ জবানবন্দী ॥

১৯৪৪ এ নতুন বছরের শুরুতে 'ভারতীয় গণনাট্য সংঘ' 'স্টার' থিয়েটারে মঞ্চস্থ করে মন্বন্তরের পটভূমিকায় রচিত বিজন ভট্টাচার্যের 'জবানবন্দী' নাটক। ১৯৪৪-র ৩রা জানুয়ারী সাধারণ রঙ্গমঞ্চে নাট্যকার বিজন ভট্টাচার্যের পরিচালনায় আত্মপ্রকাশ করে 'জবানবন্দী'। প্রথম অভিনয় রজনীতে বিভিন্ন চরিত্রে অংশগ্রহণকারী শিল্পীরা হলেন ঃ পরাণ মণ্ডল গঙ্গাপদ বসু; বেন্দা বিজন ভট্টাচার্য; পদা সুধী প্রধান; রাইচরণ জলদ চট্টোপাধ্যায়; রমজান শম্ভু মিত্র; বেন্দার মা অনু দাশগুপ্ত; বেন্দার বউ তৃপ্তি মিত্র; হাসি রাণী চক্রবর্তী; মাণিক মণিকা ভট্টাচার্য; এ ছাড়াও ভদ্রলোকদ্বয়, এ-আর পি কর্মচারী প্রভৃতি অপ্রধান চরিত্রে আরও কেউ কেউ। 'জবানবন্দী' প্রথম প্রকাশিত হয় 'অরণি' পত্রিকায়, ২৯শে অক্টোবর ১৯৪৩ এ। পরে এটি 'তিনটি নাটিকায়' গ্রন্থভুক্ত হয়। নেমিচাঁদ জৈন এর হিন্দী অনুবাদ 'অন্তিম অভিলাষ' বহুবার অভিনীত হয়ে বাংলার বাইরে থেকে লক্ষাধিক টাকা সংগ্রহ করে পি আর সি কে তুলে দেয়। নেমিচাঁদ জৈন ও তাঁর স্ত্রী তাতে নিয়মিত অভিনয় করতেন। 'ছায়াপথ' গ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত হয়েছে 'জবানবন্দী'। বহুরূপী ৩৪ সংখ্যাতেও এটি পুনর্মুদ্রিত হয়।

মন্বন্তর পীড়িত পল্লী বাংলার মর্মস্পর্শী আখ্যান 'জবানবন্দী'। মাটির স্তন্যে আজন্ম লালিত কৃষক অনাহার ক্লিষ্ট দিন যাপনের বেদনায় উপনীত হয়ে ছিন্ন করতে উদ্যত তার নাড়ীর যোগ। হৃদয় মথিত কান্না আর মৃত্যুর নির্মম অভিশাপের গহ্বরে নিমজ্জিত কৃষকের দৃষ্টিতে নগর জীবনের গল্প কথার মোহাঞ্জন অদৃশ্য নিয়তির মত তাদের শেকড় ধরে অহরহ টান দেয়। অশ্রুসজল চোখে, বেদনাতুর চিত্তে তারা গৃহত্যাগের প্রস্তুতি সম্পূর্ণ করে। পল্লী জননীর স্নেহের টানকে পায়ে পায়ে মাড়িয়ে অন্ন শুধুই এক মুঠো অন্নের তাড়নায় স্খলিত পদযাত্রায় ভুখা জনতার প্রবাহ পৌঁছে যায় শহরের উন্মুক্ত আকাশের নীচে। পশ্চাতে পড়ে থাকে স্মৃতি আর সম্মুখে নিদারুণ সংশয়। আর্তের ভগবান দেননি শরণের নাম মাত্র মূল্য অতএব নগরবাসী মানুষের দ্বারপ্রান্তে তাদের অন্তিম প্রার্থনা।

দুর্ভিক্ষের করাল স্পর্শে হিন্দু আর মুসলমান সহযাত্রী; একই ছাউনির নীচে পারস্পরিক নির্ভরতায় নব দিগন্তের যাত্রাপথে শ্রেণীহীন গোত্রহীন মানুষের সম অভিসার। মন্বন্তর শিথিল করেছে মাটির বন্ধন, লুপ্ত করেছে বৈষম্যের অন্ধ যবনিকা। ক্ষুধার জ্বালায় জমাট বাঁধা অন্ধকার চোখে নিয়ে লঙ্গরখানার খিচুড়ির মহাভোজে সামিল হতে ছোটে সকলে। বৃদ্ধ পরাণ মণ্ডল ছেঁড়া মাদুর, ছেঁড়া কাঁথা, তেলচিটে খড়ের বালিশ, মেটে পাত্র, কাস্তে, কাটারী পরিব্যাপ্ত সংসারের প্রহরায় নিযুক্ত থেকে আহার্যের প্রতীক্ষায় কাল গোনে। পথ চলতি শহরে মানুষের তীক্ষ্ণ কৌতূহলে আর কৌতুকে বিদ্ধ হয় তার দেহ মন। উদরে নাছোড়বান্দা ক্ষুধার তাড়নায় সসঙ্কোচে প্রসারিত তার ভিক্ষুক বৃত্তিতে অনভ্যস্ত কম্পমান

শিথিল হাতে ঠাট্টার মত এসে পড়ে একখানা টিকিট। পরম নিঃস্পৃহতায় তাকে অনায়াসে ট্যাকে গুঁজে রাখে পরাণ। এরূপ নির্বিকার ঔদাসীন্য অবিবেকি মানুষের নির্লজ্জতাকে চাবুকের মত আঘাত করে--ত্রস্ত পদে সরে যায় তারা। যে মানুষ মুখ থুবরে পড়ে থাকা টাটকা শবের পাশ দিয়ে সহজাত উপেক্ষায় পথ চলে, তাকেও অন্তত মুহূর্তের জন্যে বিচলিত করে তোলে একেবারে অনাড়ম্বর ঘটনার কশাঘাত। "বিজন ভট্টাচার্যের নাটক 'জবানবন্দী'-তে নাটকীয় হবার চেষ্টা নেই-- গান নেই, হাসি নেই, স্মার্ট কথাবার্তা নেই, আছে একেবারে সহজ সম্পন্ন ঘটনা"।[১৮] সামান্য ঘটনাই এ নাটককে অসামান্য করেছে।

কষ্ট কল্পিত উদরপূর্তির উদগ্র বাসনা গড়মিল করে দিয়েছে জীবনের সব হিসাব-নিকাশ। বর্জ্য পদার্থের মতই মনের দেহ থেকে খসে পড়েছে সুকুমার বৃত্তির পেলব আস্তরণ, পারিবারিক বন্ধনের অনিবার্য আকর্ষণ আর সযত্নে লালিত শুচীতার সাবেক সংযম। খিচুড়ি বিজয় সমাপনান্তে ছাউনিতে ফেরা সমাগত বুভুক্ষু মানুষকে ফাঁকি দিয়ে বেন্দার মা গোগ্রাসে গিলে ফেলে তার ভাগের অতিরিক্ত পরিমাণ। আদরের নাতি কিম্বা অথর্ব স্বামীর করুণ মুখ বিস্মরণ ঘটয়না তার। জননীর বিরক্তি উদ্রেককারী মাণিক আকণ্ঠ গিলে ঢলে পড়ে মৃত্যুর কোলে। স্বল্পাহারে ক্রমশঃ স্থিত হয়ে ওঠা শীর্ণদেহ সইতে পারেনা ভোজনের গুরুভার। সকলের বুক চাপরানো আর্তনাদের মধ্যে ঘটনার বিরুদ্ধতায় নির্বিকল্প সমাধিলব্ধ প্রধানের মুখ থেকে প্রত্যাশিত সংবাদের মতই যেন অতি সহজে বের হয়ে আসে ছোট একটি কথা-- 'গেয়ে গেছে'। যাক।' কিন্তু বেন্দার স্ত্রীর পরনে ঝলমল করে ওঠা নতুন কাপড় তার হৃদয় নিঙড়ে টেনে আনে কান্নার প্রবাহ অন্যেরা প্রশ্নের ঝড় তোলে। সম্ভ্রমের মূল্যে ক্রীত লজ্জা রক্ষার, ক্ষুন্নিবৃত্তির মর্মন্তুদ সিদ্ধান্ত মাণিকের মৃত্যুর শোককেও ছাপিয়ে যায়। বেন্দা ভ্রূক্ষেপ করেনা তাকে; অভিজ্ঞতায় সে বুঝেছে শহুরে ভদ্দর লোকের কাছে কান্নার দাম অপেক্ষা তার রক্ত মাংসের দেহটার মূল্য অনেক বেশি।

মৃত্যুপথযাত্রী পরাণ মণ্ডল বুঝতে পারে মনুষ্যত্বহীন, মূল্যবোধহীন এই উদাসীন নগর জীবনের ছত্রছায়ায় গ্রামের কৃষক তার বাঁচার পথ খুঁজে পাবেনা কখনই। চাষীকে ফিরতে হবে তার জন্মভূমির আশ্রয়ে; দুর্ভিক্ষ আর মন্বন্তরের নির্মম আঘাতের বিরুদ্ধে তাকে আরও শক্ত হাতে সংঘবদ্ধ শক্তিতে ধরতে হবে লাঙলের মুঠি। সেখানেই সে খুঁজে পাবে জীবনের রসদ। ক্ষুধায় আর ক্লান্তিতে ফুটপাতে হুমড়ি খেয়ে পরা পরাণ মণ্ডলের মুখপানে চেয়ে বেন্দা কেঁদে ওঠে--'চারিদিকে এত সম্পদ, এত ধনদৌলত অথচ এ পিরিথিমিতে পরাণ মণ্ডলের বেঁচে থাকবার কোন অধিকার সাব্যস্ত হলো না।" কিন্তু এই ব্যর্থতা আর হাহাকারের মধ্যেই 'জবানবন্দীর' সমাপ্তি নয়। পরাণের মৃত্যুকালীন জবানবন্দীর মধ্যে নিহিত আছে ভবিষ্যতের ইঙ্গিত। সোনাধানের স্বপ্নে বিভোর পরাণ মণ্ডলের কণ্ঠে

---

[১৮] 'বাংলা নাট্যকলার নূতন সূচনা'--রঙ্গীন হালদার, পরিচয় শ্রাবণ, ১৩৫১, চতুর্দশ বর্ষ, ১ম সংখ্যা।

গভীর আত্মপ্রত্যয়ে ধ্বনিত হয়েছে অনাগত ভবিষ্যতের শপথ- 'ঘরে ফিরে যা রমজান, তোরা সব ঘরে ফিরে যা। .. আমার সেই মরচে পড়া নাঙ্গল ক'খানা আবার শক্ত করে চেপে ধরগে মাটিতি। খুব শক্ত করে চেপে ধরবি। সোনা বেন্দা, সোনা ফলবে, সোনা ফলবে।' গ্রাম্য সংলাপের সরলতায় পরাণের মর্মোচ্চারিত শপথ বিদ্যুতের মত সঞ্চারিত হয় অন্য সকলের মধ্যে। বলিষ্ঠ মুঠিতে দুর্জয় সঙ্কল্প নিয়ে সংগ্রামী চেতনায় উদ্বুদ্ধ কৃষকের দল প্রত্যাবর্তন করে গ্রামের পথে। এই নাটকের অভিনয় দেখে বিস্মিত সমালোচকের কলম লিখেছিল 'সাধারণ রঙ্গমঞ্চে পেশাদারী নাটকাভিনয়ের সঙ্গে এই নাটকাভিনয়ের পার্থক্য এই যে, ইহার মুখ্য উদ্দেশ্য অর্থোপার্জন নয়; নৃত্য, সঙ্গীত ও অভিনয়ের মধ্য দিয়া গণ জীবনকে রূপ দেওয়াই ইহার আসল লক্ষ্য। কাজেই ইহার বিষয়বস্তু ও পটভূমি সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র এবং এই স্বাতন্ত্র্য সেদিনের অনুষ্ঠানে পূর্ণ রূপেই প্রকাশ পাইয়াছিল। অন্নসমস্যা অবলম্বনে রচিত শ্রীযুক্ত বিজন ভট্টাচার্যের 'জবানবন্দী' নাটিকাখানিই জমিয়াছিল বেশি। রূপসজ্জা বাকভঙ্গী ও অভিনয় দর্শকগণকে মুগ্ধ করে। পল্লীচাষী জীবনের ব্যথা বেদনাকে এমন সাফল্যের সহিত রূপায়িত করা কম কৃতিত্বের কথা নহে।'[৩৮]

'জবানবন্দী' কে কেউ কেউ স্কেচ বা নকশা জাতীয় রচনা বলে মনে করেছেন। কিন্তু একটি মাত্র কৃষক পরিবারকে কেন্দ্র করে দুর্ভিক্ষ ও মন্বন্তরের আঘাতে বিপর্যস্ত গ্রাম্য কৃষকের মর্মান্তিক যন্ত্রণা এবং তা থেকে সংঘবদ্ধ আন্দোলনের সম্ভাবনায় উত্তরণ, বাংলা নাটকে নতুন দিগন্তের সূচনা করেছে। 'জবানবন্দী' র আরও ব্যাপক ও বিস্তৃত রূপই 'নবান্ন'।

॥ হোমিওপ্যাথি ॥

মনোরঞ্জন ভট্টাচার্যের একটি মাত্র দৃশ্যে রচিত একাঙ্ক নাটক 'হোমিওপ্যাথি' ১৯৪৪-র ৩রা জানুয়ারী, বিজন ভট্টাচার্যের 'জবানবন্দী'-র সঙ্গে 'স্টার' থিয়েটারে 'গণনাট্য সংঘের' প্রযোজনায় প্রথম অভিনীত হয়। ঐ বছরেই নাটকটি 'তিনটি নাটিকা' সঙ্কলনের অন্তর্ভুক্ত হয় এবং পরে 'বহুরূপী' ৩৩-সংখ্যায় এটি পুনর্মুদ্রিত হয়। এই নাটকের চরিত্রলিপি পাওয়া যায়নি।

যুদ্ধের ভয়াবহ পরিস্থিতিতে পূর্ববঙ্গের একটি বর্দ্ধিষ্ণু গ্রামে ওলাওঠার ভয়ে হিন্দু ও মুসলমান দুই সম্প্রদায়ের ধর্মাচরণে সাম্প্রদায়িক বিভেদের বহ্নিশিখা, জাপানী বোমারু বিমান হানার পরিপ্রেক্ষিতে ধর্মীয় সংকীর্ণতা মুক্ত চেতনার আলোকে উদ্ভাসিত হয়ে সাম্প্রদায়িক শক্তির বিরুদ্ধে সম্মিলিত প্রতিরোধে অঙ্গীকারবদ্ধ। দুই সম্প্রদায়ের মানুষের ধর্মান্ধতা, কুসংস্কারাচ্ছন্ন অন্ধবিশ্বাস এবং অবৈজ্ঞানিক চিন্তা-চেতনা তাদের অস্তিত্বকে বিপন্ন করে তুলেছিল। এর প্রতিবিধানকল্পে নিবারণ ডাক্তার এবং তার সাগরেদ পাগলা

---

[৩৮] আনন্দবাজার পত্রিকা, ৭ই জানুয়ারী, ১৯৪৪।

জগাই তাদের সীমিত শক্তিতে রঙ্গমঞ্চে অবতীর্ণ। সংকীর্ণচিত্ত মানুষের কাছে তাদের সহৃদয় প্রচেষ্টাও সন্দেহের ঊর্ধে প্রতিষ্ঠিত হতে পারেনি।

গ্রামে অনুপ্রবেশ করে ওলাওঠা ক্রমে মহামারীর আকার ধারণ করেছে। অন্ধ কুসংস্কার আর বৈজ্ঞানিক চেতনার একান্ত অভাব সেই সম্ভাবনার পথকে আরও প্রশস্ত করে তুলেছে। মুক্তমনা নিবারণ ডাক্তার তার হোমিওপ্যাথি ওষুধের যৎসামান্য সম্ভার নিয়ে কেবল অমিত মনোবলে পরিত্রাতার দায়িত্ব স্বেচ্ছায় কাঁধে তুলে নিয়েছেন। ছায়াসঙ্গী পাগলা জগাই তার অনুগামী। মিঞাপাড়ায় লেগেছে মড়ক: হিন্দুপাড়ায় তার অবাঞ্ছিত অনুপ্রবেশ রোধ করতে হিন্দুরা কেত্তন বের করেছে—পরবর্তী শনিবারে আয়োজন হয়েছে বারোহাত কালীপূজোর। মুসলমানেরা সম্মিলিত নামাজ পড়ে পরিত্রাণের আশায়। দুই সম্প্রদায়ের মানুষের ধর্মীয় গোঁড়ামী আর অজ্ঞানতা তাদের নিবারণ ডাক্তার অপেক্ষা নিজ নিজ ধর্মীয় চৌহদ্দীর ওপরে আস্থা ভাজন করে তুলেছে।

নিষ্ঠাবান ব্রাহ্মণ স্মৃতিরত্নের পত্নী কিন্তু ভেদবমিতে আক্রান্ত। তবু তার অন্ধ বিশ্বাস তাঁর বাড়িতে কখনই ওলাওঠা হবে না। তাঁর প্রপিতামহী সহমরণে যাবার সময় ঘোষণা করে গিয়েছিলেন এই অভয় মন্ত্র। সতী নারীর মুখ-নিঃসৃত বাণী যে অভ্রান্ত- নিষ্ঠাবান ব্রাহ্মণ স্মৃতিরত্ন তাকে অবিশ্বাস করেন কি করে? তাছাড়া তিনি ধর্মাচারী ত্রিসন্ধ্যা জপ না করে তিনি জল গ্রহণ করেন না। ওলাওঠার সাধ্য কি নিরাপত্তার এমন দুর্জয় বেষ্টনী ভেদ করে তাঁর গৃহে প্রবেশ করে! নিবারণ ডাক্তার তাঁর বিশ্বাসে আঘাত না করেও তাকে পরামর্শ দেন অন্তত পানীয় জলের ক্ষেত্রে বিশুদ্ধতা রক্ষার। কিন্তু পিতামহ প্রতিষ্ঠিত শিমুলপুকুরের জলকে অবিশুদ্ধ বলে মানতে তিনি রাজী নন। এমনকি সেই পচা ডোবায় গরু বাছুর নামাটাকেও তিনি দোষের বলে মনে করেননা। তাঁর ধারনা গোমাতার অবগাহনে পুকুর অপবিত্র হয় না। স্ত্রীর রোগ মুক্তি না ঘটার পশ্চাতে তাঁর অকাট্য যুক্তি ম্লেচ্ছ জগাই এর স্পর্শদোষে ওষুধের তেজ লোপ। ম্লেচ্ছ যবনের স্পর্শে পাছে ডাক্তারের ওষুধের দ্রব্যগুণ নষ্ট হয়ে যায়. এই আশঙ্কায় ডাক্তারকে পূর্বে তাঁর গৃহে চিকিৎসার বন্দোবস্ত করতে অনুরোধ জানান স্মৃতিরত্ন। সে অনুরোধ রাখা সম্ভব হয় না ডাক্তারের পক্ষে—মুমূর্ষু রোগী তারই পথ চেয়ে আছে. বিলম্ব বিপদের কারণ হতে পারে। অতএব সেখান থেকে ওষুধ নিয়ে তখনকার মত প্রত্যাবর্তন করেন স্মৃতিরত্ন।

এদিকে হিন্দুর কেত্তন এগিয়ে আসে মসজিদের দিকে। অবশ্যম্ভাবী দাঙ্গার আশঙ্কায় আশঙ্কিত ডাক্তার তাদের প্রতিরোধে সচেষ্ট হয়েও ব্যর্থ হন। ধর্মান্ধ হিন্দুদের ঘোলাটে দৃষ্টিতে ডাক্তার প্রতিপন্ন হন ঘৃণ্য ব্যবসায়ীরূপে; মড়ক নিবারণে লোকসানের আশু সম্ভাবনায় কেত্তনের গতিরোধে সচেষ্ট তিনি—এমন কষ্ট কল্পনাই অভ্রান্ত সত্য রূপে প্রতিভাত হয়ে ওঠে এদের চোখে। হিন্দু কাফেরদের সমুচিত দণ্ড দিতে মসজিদের পবিত্রতা রক্ষায় ব্যস্ত হয়ে ওঠে মুসলমান সম্প্রদায়ও। যথাশক্তি হাতিয়ারে সুসজ্জিত দুই বাহিনী যখন শক্তি পরীক্ষায় একে অপরের মুখোমুখি. ঠিক সেই মুহূর্তে বিধাতার নিষ্ঠুর পরিহাসের রূপ ধরে জাপানী বোমার গগন-বিদারী শব্দে যুযুধান দুই প্রতিপক্ষ মিলেমিশে মন্দির-

মসজিদে নিরাপদ আশ্রয়ের সন্ধানে গতিশীল হয়ে ওঠে। তখন 'টিকিতে টুপিতে কোলাকুলি'। জীবন সঙ্কটের সমূহ সম্ভাবনায় দূর হয়ে যায় তুচ্ছ সাম্প্রদায়িকতার বিষবাষ্প। তবু এতকালের পুঞ্জীভূত সংস্কার পুরোপুরি মুছে যায় না মন থেকে। বিপন্মুক্ত প্রাঙ্গণে দাঁড়িয়ে জলসিক্ত স্মৃতিরত্ন ভেবে পান না সনাতন আর্যদেশে ম্লেচ্ছ যবন জাপানের উৎপাতে 'কলি' কেন এখনও জাগেন না। বহু শতাব্দীব্যাপী যে পাপ শিরায় শিরায়, মজ্জায় মজ্জায় বাসা বেঁধে রয়েছে তাকে উৎপাটন করা বোধ হয় অত সহজ ছিল না।

নিবারণ ডাক্তার উল্লসিত হয়ে ওঠে 'দাঙ্গার ওষুধ বোমা! এও তো আমার হোমিওপ্যাথি।' বিপন্ন জনতার হাতে সে তুলে দেয় তাদেরই ফেলে যাওয়া হাতিয়ার। লক্ষিত গ্রামবাসীকে সে জানায় চীনের অনুসরণে এককাট্টা হয়ে দুষমনদের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াতে হবে। কলেরার অতি ক্ষুদ্র জীবানু যেমন একত্রিত হয়ে একটা মানুষকে কাবু করে ফেলে, তেমনি হিন্দু মুসলমান প্রতিটি মানুষ সংঘবদ্ধ হয়ে লড়াই করলে শত্রুকে জব্দ করতে বেগ পেতে হবে না। একেবারে শেষে স্বেচ্ছাসেবক আসে কলেরা ও বোমার হাত থেকে বাঁচার জন্যে সাহায্য করতে। সব শেষে 'হোই হোই হোই জাপান ঐ আইসে বুঝি হামার। টারীতে বারাও গাঁওয়ের গেরিল্ল্যা জয়ান' এই গণসঙ্গীতে নাটকের সমাপ্তি।

'হোমিওপ্যাথি' নাটকের সমালোচনা করতে গিয়ে 'আনন্দবাজার' লেখে 'বিমান হানার পটভূমিতে হিন্দু মুসলমান ঐক্যের ভিত্তিতে রচিত শ্রীযুক্ত মনোরঞ্জন ভট্টাচার্যের নাটিকা হোমিওপ্যাথি প্রচার প্রধান হওয়ায় তেমন জমে নাই; তবে তাহাতে যথেষ্ট হাস্যরস ছিল।'[৮৮] প্রচারধর্মীতার অভিযোগ থেকে 'হোমিওপ্যাথি' কে অব্যাহতি দেওয়া যায় না। নিবারণ ডাক্তার, পাগলা জগাই এবং স্মৃতিরত্ন চরিত্রত্রয় নিজ নিজ স্বকীয়তায় এই ক্ষুদ্র পরিসরেও সমুজ্জ্বল। ধর্মীয় সঙ্কীর্ণতা মুক্তির একটা তাগিদ এই নাটকে আছে। অস্পষ্ট হলেও সংঘবদ্ধ আন্দোলনের প্রস্তুতির প্রাথমিক পূর্বাভাষ স্বীকৃত হয়েছে। তবে নাটকের শেষে স্বেচ্ছাসেবকের হঠাৎ আবির্ভাব মূল কাহিনীর পক্ষে মোটেই অপরিহার্য নয়।

॥ তাইতো ॥

পরপর কয়েকটি সিরিয়াস নাটক অভিনয়ের পর ১৯৪৪ এ 'শ্রীরঙ্গম' লঘুনাট্যের দিকে তার গতি পরিবর্তন করে। ঐ সময় পর পর দুটি লঘু নাট্য 'শ্রীরঙ্গম' মঞ্চে অভিনীত হয়। তন্মধ্যে বিধায়ক ভট্টাচার্যের মধ্য সপ্তাহের নাটক 'তাইতো' ১৯৪৪-র ৩রা ফেব্রুয়ারী প্রথম জনসমক্ষে তার আর্জি নিয়ে উপস্থিত হয়। অভিনয়ে উৎকর্ষতা যতই থাক না কেন, 'তাইতো' বাংলা নাট্য সাহিত্যের ইতিহাসের খুব গভীর ভাবে রেখাপাত করতে পারেনি। 'শ্রীরঙ্গমের' ব্যর্থ প্রয়াসগুলির মধ্যে 'তাইতো' কে অবশ্যই অন্তর্ভুক্ত

---

[৮৮] আনন্দবাজার পত্রিকা, ৭ই জানুয়ারী, ১৯৪৪।

করতে হবে। নাট্যাচার্য শিশির কুমার ভাদুড়ীর সহোদর শ্রীযুক্ত বিশ্বনাথ ভাদুড়ীর অনুরোধে এর আগে নাট্যকার শরৎচন্দ্রের 'বিপ্রদাস' উপন্যাসের নাট্যরূপ দিয়েছিলেন এবং শ্রীযুক্ত ভাদুড়ী মহাশয়ের পরিচালনায় তা মঞ্চস্থ হয়ে বিপুল জনপ্রিয়তা অর্জন করে। সম্ভবত সেই সাফল্যে উৎসাহিত হয়ে তিনি আবার নাট্যকারের দ্বারস্থ হন। তাঁরই অনুরোধে মাত্র কয়েকদিনের মধ্যে বিধায়কবাবু ইচ্ছার বিরুদ্ধে নাটকটি রচনা করে দেন।[৮১] এই নাটকের প্রথম অভিনয় রজনীতে বিভিন্ন চরিত্রে রূপদান করেন : জীবনময়- শৈলেন চৌধুরী, দীননাথ—রঞ্জিত রায়, সমর- -মিহির ভট্টাচার্য, সুহাস কানু বন্দ্যোপাধ্যায়, সুরেশ - বিপিন মুখোপাধ্যায়, ভবশঙ্কর- প্রবোধ দত্ত, মাতাল আদিত্য ঘোষ, বৃদ্ধ দুর্গা সান্যাল, তরুণ -গণেশ শর্মা ও ফাল্গুনী ভট্টাচার্য, পল্লব মাঃ তপন মিত্র, বিরূপাক্ষ বিশ্বনাথ ভাদুড়ী, মল্লিকা মলিনা, বল্লিকা - রেবা, মালবিকা রাজলক্ষ্মী (ছোট), মিসেস ঢোল নিভাননী, নিস্তারিণী আশা, বকুলিকা- তারকবালা, মুখরা নারী সরলা, বসুন্ধরা- মণিকা, চতুর্থ পক্ষের স্ত্রী নমিতা, মাতালের স্ত্রী লাবণ্য এবং আরও অনেকে। নেপথ্য সংগঠনকারীদের মধ্যে পরিচালনায় বিশ্বনাথ ভাদুড়ী, সঙ্গীত পরিচালনায় রঞ্জিত রায় ও সহকারী রতন দাঁ এবং দৃশ্য শিল্পী ছিলেন মহম্মদ জান।

নিছক আনন্দ দানের জন্যে নাটকটি রচিত। ফলে এই নাটকের শিল্পগুণ সম্পর্কে সন্দেহের অবকাশ থেকে যায়। ভূমিকায় নাট্যকার স্পষ্টতই বলেছেন 'মফঃস্বল অথবা কোলকাতার সৌখীন সম্প্রদায় বইখানি অভিনয় করে যদি এই সংকট সঙ্কুল জীবনের কয়েকটি মুহূর্তেও কিছুমাত্র আনন্দের আদান প্রদান করতে পারেন, তাহলে কৃতার্থ হব।' আরও দেখেছি সম্পূর্ণ ইচ্ছার বিরুদ্ধে উপরুদ্ধ হয়ে তাঁকে নাটকটি লিখতে হয়েছে। অর্থাৎ নাট্যকারের সহানুভূতি থেকে বঞ্চিত এই নাটক। ফলে 'তাইতো' কে ব্যর্থ শিল্পকীর্তি এবং অসার্থক মঞ্চ প্রয়োগের অভিযোগ থেকে অব্যাহতি দেওয়া মুশকিল। লঘুনাট্য, লঘু কিন্তু নাট্য নাট্যগুণ বিবর্জিত হাল্কা মেজাজের গল্পকথা লঘুনাট্যের পংক্তিভুক্ত হতে পারেনা। বহুবিধ গুরুতর সমস্যা হাল্কা চালে নাট্যশৈলী গত বিধি-বিধান মেনে উপস্থাপিত হয়ে থাকে লঘুনাট্যে। সেদিক থেকে আমাদের বর্তমান নাটকটিতে যথেষ্ট হতাশ হতে হয়।

সমস্যাটি এখানে বিবাহ সংক্রান্ত। বিবাহযোগ্যা কন্যা এ দেশে যথেষ্ট উদ্বেগের কারণ। রূপ, গুণ এবং আর্থিক সঙ্গতি, বিবাহ ক্ষেত্রে তার যোগ্যতার প্রাথমিক শর্ত। এ তিনের কোন একটির অভাব শুধু লজ্জাজনক নয় রীতিমত দুশ্চিন্তারও বটে। আবার দুর্লভ পাত্রের উদ্ধত অসম্মানজনক পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হতে না পারলে তার কোন যোগ্যতারই মূল্য থাকে না। এই করুণ এবং অলঙ্ঘনীয় অবস্থাটি 'তাইতো' নাটকের কথাবস্তু নির্মাণের

---

[৮১] 'মধ্য সপ্তাহের নাটক আমি লিখবো না, অথচ তিনি লেখাবেনই। কাজেই অত্যন্ত চটে গিয়ে মাত্র কয়েকদিনের মধ্যে এটি লিখে দিয়েছিলাম।' —নাট্যকার 'তাইতো' নাটকের ভূমিকা দ্রষ্টব্য।

প্রধান উপাদান। কিন্তু এমন একটি সার্বজনীন সামাজিক সমস্যাকে উপাদান হিসাবে ব্যবহার করেও নাট্যকার বিশেষ সফল হতে পারেননি কেন সেটিই সর্বাপেক্ষা বিস্ময়ের বিষয়।

জীবনময় ধনী এবং কৃপণ . মল্লিকা ও বল্লিকা তাঁর দুই বিবাহযোগ্যা কন্যা বর্তমান। দুই অনূঢ়া কন্যার বিবাহ সম্পর্কে তাঁর দুশ্চিন্তা নিশ্চয় আছে: কিন্তু কন্যাদায়গ্রস্ত পিতা জীবনময়ের প্রাত্যহিক দিনলিপিতে এই সমস্যার অস্তিত্ব খুঁজে পাওয়া শক্ত। বরং সঞ্চিত অর্থের প্রতি তাঁর অধিক মমত্ব চরিত্রটির বিশ্বাসযোগ্যতা নষ্ট করেছে। অথচ কন্যাদের সম্পর্কে তিনি উদাসীনও নন, সংসারের ভালমন্দে তিনি নিরাসক্তও নন। পুত্র কন্যা অপেক্ষা গৃহভৃত্য দীননাথের প্রতি তাঁর নির্ভরতা অনেক বেশি। দীননাথের সঙ্গে রঙ্গ ব্যঙ্গ এবং পরিহাস মগ্ন এই চরিত্রটির বহুবিধ অসঙ্গতি কোন অজ্ঞাত কারণে লঘুনাট্যের হিউমার সৃষ্টিতে ব্যবহৃত হতে পারেনি। মল্লিকা বল্লিকা জীবনময়ের দুই আধুনিকা তরুণী কন্যা পিতার নিঃস্পৃহতায় বিবাহ ব্যাপারে নিজেরাই সক্রিয়ভাবে উদ্যোগী। পাত্র নির্বাচন থেকে শুরু করে তাদের আদর আপ্যায়ন সব ব্যাপারেই তারা কর্ত্রী স্থানীয়া। জীবনময়ের ভূমিকা সেখানে গৌণ। তবে মল্লিকা এবং বল্লিকা উভয়ের চরিত্রে নারীসুলভ সুকুমার বৃত্তি সমূহের একান্ত অভাব কথায় কথায় তারা রাস্তাঘাটে অপরিচিত যুবকের গালে চড় থাপ্পর মেরে দিতে পারে। সবান্ধব পাত্রের সামনে কোন জিজ্ঞাসার অপেক্ষা না রেখে গড় গড় করে আত্মপরিচয় দিতে বিন্দুমাত্র সঙ্কুচিত হয়না, পাত্রের স্বাভাবিক লজ্জাবোধকে উপহাস করতে তাদের বাধে না। অথচ তারাই কিভাবে তাদের পাণী পার্থীর কাছে হঠাৎ প্রেমময়ী নায়িকায় রূপান্তরিত হলো, বোঝা গেল না। বিশেষতঃ যখন সমর এবং সমীরের সঙ্গে মল্লিকা ও বল্লিকার প্রথম সাক্ষাৎ দু দুটি মোক্ষম থাপ্পর দিয়ে শুরু, তখন একটু অবাক হতে হয় বৈকি।

সেদিক থেকে বরং মাতৃহারা নাতনী পটলবালা ওরফে পটি ওরফে বকুলিকার বিনি পয়সায় বিবাহ নিযে ভবশঙ্কর ও নিস্তারিণীর আশা ও আশঙ্কা একটি মাত্র দৃশ্যে চমৎকার অভিব্যক্ত হয়েছে। আদরের নাতনীকে কোন সুপাত্রের নজরে পড়বার মত করে তৈরি করতে নিস্তারিণীর চেষ্টার অন্ত নেই। সেটুকু হলেই নিস্তারিণী নিস্তার পেয়ে যান।

এই নাটকে বহু চরিত্রের সমাবেশ। মূল কাহিনীর সঙ্গে তাদের সকলের কোন যোগাযোগ নেই—সব কটি চরিত্র নাটকের পক্ষে অপরিহার্যও নয়। পারস্পরিক যোগসূত্রহীন বিচ্ছিন্ন কতকগুলি ঘটনার সূত্রে তাদের অনাবশ্যক উপস্থিতি নাট্য কাহিনীকে দুর্বল করেছে। জীবনময়ের অষ্টম শ্রেণীতে পাঠরত সিনেমা পাগল ডেঁপো বখাটে পুত্র পল্লব এ নাটকে একেবারেই অতিরিক্ত। তেমনি বিরূপাক্ষ, মিসেস ঢোল, মাতাল ও তার স্ত্রী, গাঁটকাটাদ্বয়, চানাচুরওয়ালা, ঘুঘনীওয়ালা প্রভৃতি অপ্রয়োজনীয় চরিত্রের ভিড়ে প্রাসঙ্গিক মুখগুলি অনেকাংশে ঢাকা পড়ে গেছে। হয়ত সেই কারণেই মল্লিকা ও বল্লিকার বিপরীতে

সমীর, সমর কিম্বা সুহাস তাদের সার্বিক আবেদন দর্শকের পাঠকের কাছে পৌঁছে দেবার সুযোগ থেকে বঞ্চিত হয়েছে। মামার সম্পত্তির লোভে সমরের বিধবা বিবাহের আপ্রাণ চেষ্টা এবং পরিশেষে মল্লিকার কৌশলে বিধবা জ্ঞানে তাকে বিবাহ, মোটামুটি উপভোগ্য। তবে ইন্টারভিউ-এর দৃশ্যে নারী চরিত্রগুলির মর্যাদা ক্ষুণ্ণ হয়েছে।

এই নাটকের সংলাপ বেশ সুন্দর। নাটকটির প্রধান আকর্ষণ এর তির্যক কাটা কাটা সংলাপে। হৃদয়গ্রাহী সংলাপের একটা অতিরিক্ত তাৎক্ষণিক আবেদন থাকে। সম্ভবত সেই আবেদন নিয়ে 'তাইতো' তার দর্শককে কিছুকাল আকর্ষণ করতে পেরেছিল।

॥ নবান্ন ॥

বাংলা নাটক ও তার অভিনয়ের ইতিহাসে বৈপ্লবিক পরিবর্তন সূচীত করেছে বিজন ভট্টাচার্যের যুগান্তকারী নাটক 'নবান্ন'। ১৯৪৪ র ২৪শে অক্টোবর 'শ্রীরঙ্গম' মঞ্চে 'ভারতীয় গণনাট্য সংঘের' (আই পি টি এ) প্রযোজনায় 'নবান্ন' নাটকের অভিনয় নিশ্চিত রূপে গতানুগতিক নাট্যধারার অনুসৃতিকে নস্যাৎ করে দিয়েছে। 'আগুন' 'ল্যাবরেটরি', 'হোমিওপ্যাথি', 'জবানবন্দী' থেকে যে পথ পরিক্রমার সূচনা, 'নবান্নে' এসে তার পরিপূর্ণতা প্রাপ্তি। লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যের অন্বেষণে দিশাহারা মানুষের সার্বিক প্রত্যাশা পূরণের অঙ্গীকার নিয়ে 'নবান্ন' নাটকের আত্মপ্রকাশ। 'নবান্ন' নাটকের অভিনয় দেখে 'অমৃতবাজার' পত্রিকা তাই লিখেছিল ঃ

"On Friday evening last we had the occasion to witness a unique performance at the Srirangam Theatre Indian People's Theatre staged its second drama 'Nabanna' on 'The New Harvest Festival' written by the young playwright Bijan Bhattacharyya We came back with the impression that a new stage movement was afoot in Bengal The theme of the drama was the present Bengal famine and its impact on the life of the peasantry Nothing can be more topical and therefore more difficult or artistic treatment, specially in the form of dramatic performance Yet the play gave a complete picture of the dark days which are hardly over as yet "[৪১]

তবে 'নবান্ন' র আবির্ভাব আকস্মিক বা অপ্রত্যাশিত ছিল না। 'নবান্ন'র পটভূমি তৈরি করছিল পূর্ববর্তী নাটক। পেশাদারী রঙ্গমঞ্চের অভিনয় ধারায় সমকালীন জীবনযন্ত্রণা অনুপস্থিত ছিল না শুধু নতুন দিনের নাট্যাদর্শ নির্মাণের কাজ তখনো শেষ হয়নি।

---

[৪১] The Amrita Bazar Patrika, 28th October 1944

গণনাট্য সংঘের প্রেরণায় এবং ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার তাড়নায় বিজন ভট্টাচার্য সেই অসমাপ্ত কাজ সম্পূর্ণ করলেন. শোষিত নিপীড়িত মানুষের মর্মান্তিক আর্তনাদকে নাটকে রূপ দিলেন। নাট্যকারের বিশিষ্ট সমাজ চিন্তার ফলশ্রুতিই নবান্ন নাটক।

বিজন ভট্টাচার্য এবং শম্ভু মিত্রের যৌথ পরিচালনায় নবান্ন প্রথম মঞ্চস্থ হয়। অভিনয়ে ছিলেন ঃ প্রধান সমাদ্দার - বিজন ভট্টাচার্য; দয়াল ও টাউট– শম্ভু মিত্র; কুঞ্জ– সুধী প্রধান; নিরঞ্জন – জলদ চট্টোপাধ্যায়; মাখন – মণিকা ভট্টাচার্য; হারু দত্ত ও বরকত– গঙ্গাপদ বসু; কালীধন ধাড়া – চারুপ্রকাশ ঘোষ; রাজীব – সজল রায় চৌধুরী; পঞ্চাননী– মণিকুন্তলা সেন; রাধিকা – শোভা সেন; বিনোদিনী – তৃপ্তি ভাদুড়ী (মিত্র); খুকীর মা – কল্যাণী কুমার মঙ্গলম; ভিখারিণী – বিভা সেন; বাংলার ম্যাডোনা – ললিতা বিশ্বাস; চন্দর – রঞ্জিত বসু; যুধিষ্ঠির – নীহার দাশগুপ্ত; চাল খরিদ্দার – মনোরঞ্জন বড়াল; বড়কর্তা – চিত্ত হোড়; বৃদ্ধ ভিখারি – গোপাল হালদার; ডোম – শম্ভু হালদার; দারোগা – বিমলেন্দু ঘোষ; ডাক্তার – সমর রায়চৌধুরী; দিগম্বর – অজিত মিত্র; ফকির – সত্যজীবন ভট্টাচার্য; ফটো গ্রাফারদ্বয় – অমল ভট্টাচার্য ও রবীন মজুমদার। উপদেষ্টা ছিলেন মনোরঞ্জন ভট্টাচার্য, আবহ সংগীতে গৌর ঘোষ এবং মঞ্চাধ্যক্ষ চিত্ত ব্যানার্জী। 'নবান্ন' নাটক যেভাবে রচিত হয়েছিল, পুরোপুরি সেইভাবে মঞ্চস্থ হয়নি। ১৯৪৩ এ 'অরণি' পত্রিকায় প্রকাশিত নাটকটিকে মঞ্চস্থ করার সময় অভিনয়ের সুবিধার জন্যে বেশ কিছু পরিবর্তন করা হয়।"[৫]

বহু আলোচনা ও নিন্দা স্তুতি 'নবান্ন' নাটক আলোচনার প্রধান অন্তরায়। জন্মলগ্ন থেকে এই নাটকটি এত ভাবে আলোচিত হয়েছে যে বিভিন্ন মতবাদের দ্বারা প্রভাবিত হবার সম্ভাবনা প্রবল। এই সম্ভাবনা সম্পর্কে যথা সম্ভব সতর্ক থেকেই আমরা 'নবান্ন' নাটকের বিচার বিশ্লেষণে প্রবৃত্ত হব।

সাম্রাজ্যবাদের নির্মম শোষণের বিরুদ্ধে আগস্ট আন্দোলনের গণ অভ্যুত্থানের পটভূমিতে গ্রামের সম্পন্ন কিম্বা সাধারণ গৃহস্থের বেদনা বিধুর অনিকেত যাত্রা এবং সঙ্ঘবদ্ধ শক্তিতে প্রত্যাবর্তনের নাটক 'নবান্ন'। এই যন্ত্রণাকে আরও বহুগুণ বাড়িয়ে দিয়েছে প্রকৃতির নির্মম পরিহাস। ঔপনিবেশিক স্বার্থসন্ধানী শাসকগোষ্ঠীর পক্ষপুটচ্ছায়ায় স্ফীত কলেবর পাইকার, মহাজন, কালোবাজারি, মজুতদারের কৌশলী চক্রান্তে পঞ্চাশের মহামন্বন্তর গ্রাম বাঙলাকে পরিণত করেছে মহাশ্মশানে। অতিক্রান্ত সুকুমার বৃত্তি সমূহের উপান্তে

---

[৫] "নবান্ন' বইটা এখন যে ভাবে ছাপা আছে, সে ভাবে অভিনয় করা হয়নি। অভিনয়ের জন্যে বইটা ব্যাপক এডিট করা হয়েছিল।" শম্ভু মিত্র, বহুরূপী, ৩৪ সংখ্যা।

উপনীত কেবল ক্ষুধা সম্বল বুভুক্ষু মানুষের ঘর আর পথের ব্যবধানটুকুও মুছে দিয়েছে বন্যার তাণ্ডব। সন্তানহারা, স্বজনহারা, অন্নহারা, সম্ভ্রমহারা কঙ্কালসার ভুখা জনতার নগ্ন মিছিল নর্দমা বিধৌত ফ্যানের নির্ভরতায় কিম্বা পশুর সঙ্গে ডাস্টবীনের উচ্ছিষ্ট ভাগ করে নিয়ে মহানগরীর ফুটপাতের ধূলিশয্যায় বিস্মৃত অতীতের স্বপ্নে মুখর। অতি সুলভ মৃত্যুর হাতছানি, সরকারী লঙ্গরখানার লোক দেখানো ত্রাণ ব্যবস্থা, নারী ব্যবসা চক্রের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার পাশাপাশি সোনাধানের স্বপ্নই এদের মধ্যে শেষ পর্যন্ত সঙ্ঘবদ্ধ প্রতিরোধ শক্তির স্ফূরণ ঘটিয়েছে নব্য সমাজ ভাবনার আনন্দে হিল্লোলিত হয়ে তখন তাদের আবার প্রত্যাবর্তন পরিত্যক্ত পল্লীর বিজন প্রান্তরে। 'জবানবন্দী' র পরাণ মণ্ডলের চোখের সোনাধানের দুঃস্বপ্নই প্রধান সমাদ্দারের চোখে প্রতিভাত হয় জবাকুসুম সংকাশং রূপে"[৪৮] নাট্যকারের সমাজতান্ত্রিক বিশ্বাস বোধের দ্যোতনায়। বঞ্চিত ভুখা মানুষের সংঘবদ্ধ শক্তি প্রতিরোধের দুর্জয় সঙ্কল্পে নবান্ন উৎসবে অঙ্গীকারবদ্ধ। এইখানেই 'জবানবন্দী' র তুলনায় 'নবান্ন' আরও পরিণত। শম্ভু মিত্রের জবানীতে 'নবান্ন' 'সত্য সত্যই একটা সামাজিক নাটক। যেখানে গোটা একটা সমাজই হচ্ছে নাট্যকারের উপলব্ধির, চিন্তার ও সমস্যার বিষয়।"[৪৯]

নবান্ন তো নিছক উৎসব মাত্র নয় একটা সংঘবদ্ধ সামাজিক প্রতিরোধের প্রস্তুতি; এই প্রতিরোধ একই সঙ্গে শাসকশ্রেণী এবং তার মদতপুষ্ট অর্থগৃধ্নু, মহাজন মজুতদার কালো বাজারিদের বিলাসমত্ত পৈশাচিকতার বিরুদ্ধে। আমিনপুর থেকে কলকাতা এবং কলকাতা থেকে আবার সেই আমিনপুর এই বৃত্তে গণ প্রতিরোধের প্রস্তুতি সম্পূর্ণ। 'নবান্ন' নাটকের প্রতিটি দৃশ্য আপাতদৃষ্টিতে বিচ্ছিন্ন মনে হলেও প্রতিটি খণ্ড দৃশ্যই একটি পূর্ণাঙ্গ বৃত্তের এক একটি অংশ। কোন একটি বিশেষ দৃশ্যকে আলাদা করে বিচার করতে গেলে ভুল হবে। সাম্রাজ্যবাদের সদম্ভ আস্ফালনের সম্মুখে দাঁড়িয়ে সহযাত্রীদের প্রতি বৃদ্ধা পঞ্চাননীর অগ্রগমনের ব্যাকুল তাড়না, প্রধান সমাদ্দারের 'এট্টু কিছু' করবার গভীর আকুতি সন্তর্পণে ভবিষ্যৎ গণ প্রতিরোধের ব্যঞ্জনায় মূর্ত। মধ্যবর্তী বিলম্ব সোনাধান, মাটি, ঘর গেরস্থালি, সম্ভ্রম এবং ভিক্ষান্নের প্রত্যাশা জনিত মমতা দ্বারা নিয়ন্ত্রিত। এই কষ্টকল্পিত প্রত্যাশার অন্তর্ধানেই নবান্ন উৎসবে ঐক্যবদ্ধ আন্দোলনের সূচনা। দলিত মানুষের নির্মম বঞ্চনার, নিঃশেষে হারানোর হৃদয় নিঙরানো যন্ত্রণাইতো প্রস্তুত করে প্রতিরোধের, বিপ্লবের পটভূমি। শুধুমাত্র 'নিটোল গল্পের অনুসন্ধানে ব্যাপৃত হলে 'নবান্ন'

---

[৪৮] সংস্করণে 'নবান্ন নাটকের' নাট্যকারকৃত ভূমিকা দ্রষ্টব্য।
[৪৯] 'বাংলার নবনাট্য আন্দোলন', প্রসঙ্গঃ নাট্য, পৃঃ ১২৮, শম্ভু মিত্র।

নাটকের মর্মোদ্ধার বিঘ্নিত হবে।"[৮৬] দর্শন চৌধুরী যথার্থই বলেছেন, গতানুগতির নাটকের ধারায় নবান্ন নাটকের বিচার চলেনা।[৮৭]

বিদেশী শাসক আর তার স্তাবকবৃন্দের নির্মম শোষণে গ্রাম বাংলার ভূমিজীবী কৃষকের বিপন্ন অবস্থার মর্মন্তুদ আর্তনাদ বহু পূর্বেই প্রতিধ্বনিত দীনবন্ধু মিত্রের 'নীলদর্পণ' নাটকে। সম প্রেক্ষাপটে 'নবান্ন' নাটকেরও অবস্থান। কিন্তু তোরাপের কণ্ঠ নিঃসৃত প্রতিবাদ, নিরাপত্তা সন্ধানী মধ্যবিত্ত নবীনমাধবের পশ্চাদাপসরণে প্রতিরোধে বাঙ্ময় হয়ে উঠতে পারেনি; প্রধান সমাদ্দারের অন্তরমথিত বেদনা সগোত্রীয় কৃষককূলের হৃদয় নির্যাস থেকে স্বতোৎসারিত বলে ঐক্যবদ্ধ দলিত মানবাত্মার শক্তির স্ফূরণে প্রজ্জ্বলিত হোমশিখা। এই বলিষ্ঠ জীবন দর্শনে 'নীলদর্পণ' কে অতিক্রম করে গেছে 'নবান্ন' 'নীলদর্পণের' যেখানে শেষ 'নবান্নর' সেখানে আরম্ভ; 'নবান্ন' বাংলা নাটকে নতুন প্রেরণা, নতুন উদ্দীপনা নিয়ে এল।

শুধু উজ্জীবিত গণশক্তির উত্থানের বিপরীতে প্রতিক্রিয়াশীলের নিরুত্তাপ ঔদাসীন্য সংঘবদ্ধ প্রতিরোধের গুরুত্বকে বোধ হয় কিছুটা হ্রাস করেছে। নবান্ন উৎসবের মহামিলনে উত্তাপের আঁচটুকু প্রতিপক্ষের কাছে নিতান্তই কি উপেক্ষনীয় ছিল? সোনাধানের স্বপ্ন নিয়ে প্রত্যাগত কৃষকের মন্বন্তর ক্লিষ্ট অকর্ষিত ক্ষেত্রে সোনাধানের উৎসই বা কি? মঞ্চ প্রয়োগের কৃৎকৌশল সম্ভবত এইসব ত্রুটি নিয়ে ভাববার অবকাশ দেয়নি। 'নবান্ন' নাটকের অভিনয় দেখে তাই একজন ইংরেজকেও লিখতে হয়েছিল ঃ

"The history of the greatest of this was unfolded itself before my eyes Agony misery, starvation, corruption moral collapse and death, it was all so vivid What makes it so bitter is that of the foundation of it, all lies in the cruelties of my own people "[৮৮]

॥ বন্দনার বিয়ে ॥

১৯৪৪ র গোড়া থেকে 'শ্রীরঙ্গম' সিরিয়াস নাটকের পরিবর্তে হাল্কা চালের লঘুনাট্য অভিনয়ের দিক মন দেয়। কিন্তু বছরের শুরুতে বিধায়ক ভট্টাচার্যের 'তাইতো' নাটকে

---

[৮৬] নাটক হিসেবে নবান্নকে মোটেই সক্ষম রচনা বলা চলে না। এতে গল্পের অখণ্ডতার চেয়ে ঘটনার ব্যাপ্তি এবং নাটকীয় আবেগের একাগ্রতার চেয়ে বৈচিত্র্যই বেশী লক্ষণীয়। . নাটকের গুরুতর ত্রুটিগুলি অভিনয়ের জন্যে অধিকাংশ ঢাকা পড়েছে। 'নাট্যকলাঃ' নবান্ন হিরণকুমার সান্যাল (পরিচয়, কার্তিক, ১৩৫১; নতুন পরিবেশ, শারদীয় ১৩৮৪, পুনর্মুদ্রিত)।

[৮৭] 'গণনাট্য আন্দোলন' 'গণনাট্যের উদ্দেশ্য', পৃঃ ২৯ দর্শন চৌধুরী।

[৮৮] বিজন ভট্টাচার্যকে লেখা বিল বাটলারের চিঠি।

ব্যর্থতার পর, তাদের দ্বিতীয় প্রচেষ্টা ১৯৪৪ র ২৬শে অক্টোবর মনোরঞ্জন ভট্টাচার্যের 'বন্দনার বিয়ে' আরও শোচনীয় ভাবে সমকালীন দর্শকদের দ্বারা প্রত্যাখ্যাত হয়। এই অসফলতার কারণ অনুসন্ধান খুব দুরূহ নয়। মাত্র দুদিন আগে (২৪-১০-৪৪) ঐ একই 'শ্রীরঙ্গম' মঞ্চে আইপিটিএ র অভিনেতৃবর্গ বিজন ভট্টাচার্যের 'নবান্ন' নাটকে যে বৈপ্লবিক পট পরিবর্তন সূচিত করে গেলেন, তার ধাক্কা সামলে জন সমর্থন আদায় করার মত শক্তি ও সামর্থ মনোরঞ্জনবাবুর এ নাটকে ছিল না। তাই নিদারুণ উপেক্ষা নিয়েই তার স্বল্পকালীন অভিযাত্রা।

নাট্যাচার্য শিশির কুমার 'বন্দনার বিয়ে' নাটকে সক্রিয় অংশ গ্রহণ করেননি। তাঁরই সহোদর বিশ্বনাথ ভাদুড়ীর নেতৃত্বে অভিনয়ে অংশগ্রহণ করেন মনোরঞ্জন ভট্টাচার্য, কালী ব্যানার্জী, মলিনা দেবী, রাজলক্ষ্মী, প্রভাদেবী, বন্দনা এবং 'শ্রীরঙ্গমের' অপরাপর শিল্পীবৃন্দ। নাট্য নির্দেশনায় ছিলেন বিশ্বনাথ ভাদুড়ী, সুর সংযোজনায় রতন দাঁ এবং নৃত্যে রতন সেনগুপ্ত।

'বন্দনার বিয়ে' একান্ত ভাবে জীবন বিমুখ নাটক। যুদ্ধকালীন জীবন বিপর্যয়ের তরঙ্গ বিক্ষুব্ধ পটভূমিতে এ নাটক একেবারেই বে-মানান। সমকালীন জীবনকে স্পর্শ করবার কোন সযত্ন প্রয়াস এখানে নেই। এমনকি বিচিত্র অভিঘাতে মানব মনের দ্বন্দ্ব সংঘাতের গূঢ়তর রহস্য উন্মোচনের প্রচেষ্টাও এখানে অনুপস্থিত। বিবাহ এ নাটকের মুখ্য বিষয় আরও স্পষ্ট ভাষায়, বিবাহের উন্মাদনা। বন্দনা, মাদ্রী, যতীন, হরবিলাস, এরা সকলেই এই উন্মাদনার দ্বারা প্রবল ভাবে তাড়িত। তার অতিরিক্ত এদের জীবনের কোন লক্ষ্য বা উদ্দেশ্য আছে বলে মনে হয় না; অন্তত নাটকীয় ঘাত প্রতিঘাতে তা বিন্যস্ত হয়ে উঠতে পারেনি। আবার নিপুণ ঘটনা বিন্যাসে উপভোগ্য নিটোল কাহিনী রসও এই নাটকে জমে উঠতে পারেনি। বরং অনেক ক্ষেত্রেই রস সম্ভোগের দিক থেকে তা ক্লান্তিকর হয়ে উঠেছে।

বন্দনা নাম্নী আধুনিকা তরুণীর বিবাহকে কেন্দ্র করে বর্তমান নাটকে সমস্যার সূত্রপাত। বিবাহে অতি-উৎসুক বন্দনা, বারংবার পাত্রপক্ষের চুল চেরা যোগ্যতা বিশ্লেষণে পরিত্যক্ত হয়ে যখন রীতিমত হতাশাগ্রস্ত, তখন আকস্মিক এবং অপ্রত্যাশিত ভাবে যতীন তাকেই পছন্দ করে বসে। বন্দনার ভগ্ন হৃদয়ে নতুন করে আশার সঞ্চার হয়। কিন্তু যতীনের অভিভাবক কাকার প্রবল আপত্তি পথরোধ করে দাঁড়ায় উভয়ের সম্ভাব্য মিলনের পথে। যতীনের অভিন্ন হৃদয় বন্ধু, হরবিলাস দৌত্যকার্যে অবতীর্ণ হয়ে অবশেষে অনুরক্ত হয়ে ওঠে বন্দনার প্রতি। নাট্যকার হরবিলাসের নাটকীয় উলম্ফনে সমস্যা আরও ঘনীভূত হয়ে ওঠে এবং যতীন ও হরবিলাসের একের অন্যের জন্যে স্বার্থত্যাগের হাস্যকর প্রতিযোগিতায় বন্দনা কিংকর্তব্য বিমূঢ় হয়ে পড়ে। এ হেন অদ্ভুত পরিস্থিতিতে পীতাম্বর

ওরফে ঠাকুদার সহযোগিতায় ত্রাতার ভূমিকায় অবতীর্ণ হয় মাদ্রী। বান্ধবী বন্দনার সমস্যার সমাধানকল্পে সে সচেষ্ট হয়ে ওঠে হরবিলাসকে আকৃষ্ট করতে. পরহিতে আত্মোৎসর্গের বাসনা তাড়িত করে তাকে। Self sacrifice- এর এত বাড়াবাড়ি অবিশ্বাস্য তো বটেই, চরিত্রগুলিকেও হাস্যকর করে তুলেছে। কে বা আগে প্রাণ, করিবেক দান - এই প্রতিযোগিতা যুদ্ধকালীন জটিল জীবন জিজ্ঞাসায় মানায়না। অবশেষে কন্যাদায়গ্রস্ত অসমর্থ পিতার ইচ্ছায় আধুনিকা বন্দনা দোজবর স্বামীর সন্তান কামনাকে মূল্য দিয়ে নিঃসন্তান সতীনের পাশে তার শেষ আশ্রয় খুঁজে নেয়।

বলা বাহুল্য এ হেন শিথিল নাট্য কাহিনী উৎকৃষ্ট শিল্প সৃষ্টিতে পুরোপুরি ব্যর্থ। অন্যদিকে নাট্যকার এই দুর্বল কাহিনীকে ভিত্তি করে তার বিশিষ্ট মতবাদ প্রতিষ্ঠা করতে একটু বেশি মাত্রায় ব্যস্ত হয়ে পড়েছেন। আর এইখানেই তা শিল্প সম্ভাবনাকে অনেকখানি লঙ্ঘন করে গেছে। বন্দনার জীবনের পরিণতির দিকে তাকালেই এই কথার যৌক্তিকতা খুঁজে পাওয়া যাবে। বন্দনা আধুনিকা তরুণী যতীনের প্রতি সে অনুরক্ত; কেবল মাত্র পুরুষ বলে তার আকর্ষণ কম বেশী হরবিলাসের প্রতিও। অথচ এই দুটি পুরুষের কোন একজনকে অবলম্বন করে তার অঙ্কুরিত প্রেম ভালবাসা বিকশিত হবার সুযোগ পেলনা। পরিবর্তে, সম্পূর্ণ অপরিচিত অধিক বয়স্ক এক ব্যক্তির সন্তান কামনার স্পর্শকাতর ইস্যুকে স্বীকৃতি দিয়ে সপত্নীর সংসারে অনুপ্রবেশে তার মাত্রাতিরিক্ত আগ্রহ যথেষ্ট সংশয়ের সৃষ্টি করেছে। 'পুত্রার্থে ক্রিয়তে ভার্যা' এই সনাতন আপ্ত বাক্যে, একালের সংস্কারমুক্ত যুক্তিবাদী নারী আস্থা হারাতে শুরু করেছিল। তার জীবন দর্শনে নতুন দিনের আলোর জোয়ার এসে লেগেছিল। বন্দনা এই নতুন চেতনায় সমৃদ্ধ নারী সমাজেরই প্রতিনিধি। তার এ হেন অতীতচারিতা নাট্যকারের মতবাদ প্রতিষ্ঠার খাতিরে— সত্যের খাতিরে নয়। নারী প্রগতির বন্ধনহীন অগ্রগমনকে সম্ভবত নাট্যকার মেনে নিতে পারেননি; এ ক্ষেত্রে অনেকটাই তিনি প্রাচীনপন্থী।

এই নাটকে চরিত্রগুলিও অসম্পূর্ণ . জীবনযুদ্ধে সংগ্রাম বিমুখ, কল্পলোকের অধিবাসী। প্রেমের মনস্তাত্ত্বিক বিচার বিশ্লেষণের সংকীর্ণ পরিধির মধ্যে তাদের জীবন চক্র আবর্তিত। তার অতিরিক্ত যা কিছু তা নাট্যকারের বিবৃতির মধ্যেই সীমাবদ্ধ; আখ্যানে তার প্রত্যক্ষ প্রতিফলন দেখতে পাইনা। যতীন বন্দনার প্রেমে উন্মত্তপ্রায় . হিতাহিত জ্ঞানশূন্য; তার এই আসক্তি বিনা প্ররোচনায় কিভাবে এত তীব্র হয়ে উঠল তা বোঝা গেল না। আর তাই তার প্রেমের গভীরতায় সংশয় থেকে যায়। নাট্যকার হরবিলাসের নাট্যকর্মের কোন নিদর্শন সেভাবে আমরা পাইনি। অভিন্ন হৃদয় বন্ধুর প্রার্থিত নারীর প্রতি তার বল্গাহীন প্রণয় তৃষ্ণা নিশ্চয় মহত্ত্বের পরিচয় দেয় না। এই আত্ম-অসংযম খ্যাতনামা নাট্যকারের চরিত্রে একান্তই বেমানান। মাদ্রী কিম্বা তরঙ্গ চরিত্র নাটকের পক্ষে অপরিহার্য নয়—বরং

অতিরিক্ত। এই তালিকায় অন্তর্ভুক্ত করতে পারি হালদার, অতসী, মহেশ প্রভৃতি চরিত্রগুলিকেও। তুলনায় পীতাম্বর ওরফে ঠাকুর্দা ঘটন-অঘটন সংঘটনে অনেকটা সিদ্ধকাম। কিঞ্চিৎ রবীন্দ্র অনুকরণজাত হলেও এই একটি মাত্র চরিত্র তার নিজস্ব স্বকীয়তায় কিছুটা উজ্জ্বল।

'বন্দনার বিয়ে' লঘু নাট্য নয়—দ্বিতীয় মহাযুদ্ধকালীন বাংলা নাটকের গতিপথ নির্ণয়ের যুগে একটি অনুজ্জ্বল প্রচেষ্টা। সমকালের সঙ্গে তাল মিলিয়ে চলতে এ নাটক পশ্চাদাপসারী চলার প্রচেষ্টাতেই তার যেটুকু ঐতিহাসিক মূল্য তার অতিরিক্ত কিছু নেই।

॥ বিংশ শতাব্দী ॥

'রঙমহল' থিয়েটারের দুঃসাহসিক প্রচেষ্টা, তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের অনবদ্য সামাজিক নাটক 'বিংশ শতাব্দী' ১৯৪৪ র ২৫শে ডিসেম্বর, বড়দিনে নটসূর্য অহীন্দ্র চৌধুরীর পরিচালনায় প্রথম আত্মপ্রকাশ করে। পেশাদারী রঙ্গমঞ্চে অভিনয়ের জন্যে এই রকম একটি বিস্ফোরক নাটকের নির্বাচন রীতিমত দুঃসাহসের কাজ। কেননা এই নাটকের আবেদন সমকালীন ভাবপ্রবণ দর্শকের কাছে কতখানি গ্রহণযোগ্য হবে, তা নিয়ে স্বয়ং নাট্যকারের যথেষ্ট সংশয় ছিল।[৪১] তবু শেষ পর্যন্ত 'বিংশ শতাব্দী' অভিনীত হয় এবং মঞ্চ সাফল্য অর্জন করে। 'রঙমহল' থিয়েটারের প্রবল অর্থনৈতিক সঙ্কটের মধ্যেই বেশ কিছুকাল এই নাটকটি নিয়মিত অভিনীত হয়ে দর্শক সমাজের তৃপ্তি বিধান করেছে। প্রথম অভিনয় রজনীতে বিভিন্ন চরিত্রে যাঁরা অভিনয় করেন তাঁরা হলেন : শ্যামাদাস শাস্ত্রী অহীন্দ্র চৌধুরী; হেমন্ত—মিহির ভট্টাচার্য; কৃষ্ণদাস—অমল বন্দ্যোপাধ্যায়; ব্রজবিহারী—সন্তোষ দাস; ডাঃ হিরন্ময় বসু শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়; রামদাস বিজয় কার্তিক দাস; নগেন প্রফুল্ল কুমার দাস; রমেশ—জীবন চট্টোপাধ্যায়; অ্যাটর্নী—প্রবোধ কুমার মুখোপাধ্যায়; কর্মচারী—বিপিন দাস ও বিশ্বনাথ দাস; গোমস্তা—অমূল্য হালদার; রতন—তুলসী চক্রবর্তী; দারোয়ান—গোপাল মুখোপাধ্যায়; পুরোহিত—নবদ্বীপ দাস; বেয়ারা—পুলিন পাল ও কানাই চক্রবর্তী; শৈলজা—রাধারাণী; অণিমা—শান্তি গুপ্তা; করুণা—সুহাসিনী; হৈমবতী—পদ্মাবতী; এছাড়া কীর্তনীয়া ও শ্রোতাগণ। এই নাটকের প্রযোজক ছিলেন শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় এবং মঞ্চশিল্পী বৈদ্যনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়।

---

৪১ ভূমিকায় নাট্যকার বলেছেন—"বিংশ শতাব্দীর মূল বক্তব্য রক্ষণশীলতার বিরোধী এবং এমন বৈজ্ঞানিক বিষয় এসে পড়েছে, যাতে ভাবপ্রবণ দর্শক শ্রেণীর রক্ষণশীল মন গ্রহণ করবে কিনা এ সম্বন্ধে দ্বিধা হওয়া স্বাভাবিক।"

আত্মমগ্ন অতীতচারী অন্তঃসারশূন্য রক্ষণশীলতার বিরুদ্ধে 'বিংশ শতাব্দী' নাটকে দ্বন্দ্বে অবতীর্ণ বৈজ্ঞানিক জড়বাদ সমর্থিত ইহবাদী নব্যতন্ত্র। যুদ্ধকালীন সঙ্কটলগ্নে প্রবলভাবে উত্থাপিত এই দুই সম্পূর্ণ বিপরীত মতবাদের দ্বন্দ্বকে নাট্যকার অবিচলিত সত্যনিষ্ঠা এবং গভীর মননশীলতায় বর্তমান নাটকের কথাবস্তুতে প্রাণবন্ত করে তুলেছেন। রূঢ় বাস্তবের নিদারুণ বঞ্চনায়, ভাব সর্বস্ব জাতীর অবক্ষয়কে ত্বরান্বিত করেছে কষ্টকল্পিত স্বর্গলোকের অমৃত প্রাপ্তির ব্যর্থ প্রত্যাশা। ইহলোকে উপেক্ষা আর দাসত্বই তার সম্বল তাই পরলোকের প্রতি তার অধিক আগ্রহ। আর ঐহিক দীনতার এই লজ্জা গোপনে তার ঐকান্তিক ঈশ্বর নির্ভরতা। ধর্ম নামক মাদকতার অলক্ষ্য সংক্রমণে সংক্রামিত এই জাতীর প্রবহমান ভাব চৈতন্য। যুগে যুগে ধর্মগুরুরা এদেশে আবির্ভূত হয়েছেন -মানুষকে শিখিয়েছেন সহস্র প্রবঞ্চনায় আকুল ভাবে ঈশ্বরের স্মরণ নিতে, দুঃখে বেদনার স্থিতু হতে। তবু তাঁর আসন টলেনি। ধর্ম জীবনের মহিমা নির্মম ভাবে প্রকাশিত আমাদের আজন্ম দারিদ্রে, অনাহার ক্লিষ্ট শরীরে আর বংশ-পরম্পরায় দাসত্বে! ঈশ্বরকে আমরা জানিনা জানার ভান করি মাত্র। দরিদ্রকে নিঃশেষে শোষনের পাপ থেকে মুক্তি প্রত্যাশায় ধনবান, জন্মান্তর, পূর্বজন্মের কর্মফল এবং ঈশ্বরে বিশ্বাসী; দরিদ্র তার ক্ষোভ আর দুঃখ প্রশমনের কর্মবিমুখ আলস্যে ঈশ্বরের ওপর নির্ভরশীল। কেবল ধ্যান জপ আর অটল ঈশ্বর নির্ভরতার জোরে সর্ববিধ সমস্যার আশু সন্তোষজনক সমাধানে আমাদের অসীম আগ্রহ। বৈজ্ঞানিক জড়বাদ এই প্রত্যয়ের ওপরে আঘাত হানতে উদ্যত। গাণিতিক পদ্ধতিতে তার কর্মপন্থা নির্ধারিত -জীবন নাট্যে আবেগ অনুভূতির মূল্যকে সে স্বীকার করতে চায়না। Cell- র মধ্যে ঘুরছে প্রোটোপ্লাজম, তার মধ্যেই স্ফুরিত হচ্ছে জীবনীশক্তি; পৃথিবীর সকল রসের সঙ্গে, গতির সঙ্গে তার অবিচ্ছিন্ন যোগ। অর্থাৎ "Biological science includes everything which deals with the phenomena of living Matter"—এই তত্ত্বের ওপর নির্ভর করে চির অসহিষ্ণু বিজ্ঞান জন্ম মৃত্যুর রহস্য উদ্ঘাটনে লিপ্ত। মানুষ এবং গিনিপিগ তার নির্মম পরীক্ষার উপাদান মাত্র। সেখানে পাপ পুণ্যের কোন প্রশ্ন নেই।

কিন্তু প্রগতির ছদ্মনামে বৈজ্ঞানিক জড়বাদের এ হেন উন্নাসিকতা প্রকারান্তরে আত্ম প্রবঞ্চনারই নামান্তর। তত্ত্ব এবং তথ্যের, ব্যাখ্যা এবং বিশ্লেষণের সীমিত পরিসরে জাগতিক সমস্ত রহস্যের উন্মোচন, তার নিয়ন্ত্রণ অসম্ভব। মৃত্যুর কাছে বিজ্ঞানও নিতান্ত অসহায় "Medicine can cure disease but can not prevent death" তার পরীক্ষাগারে ইচ্ছায় অনিচ্ছায় জীবনহরণের কৌশলই যুগে যুগে আবিষ্কৃত উদ্ভাবিত হয়ে এসেছে তাকে রোধ করা যায়নি। দেবতা গড়তে গিয়ে বিজ্ঞান গড়েছে দানব—ধনতন্ত্রের নিপুণ চক্রান্তে সেই দানব, ধ্বংসের পথ করেছে প্রশস্ত।

শ্যামাদাস জননী শৈলজা রক্ষণশীল সামাজিক পরিমণ্ডলের ঐতিহ্য অনুসারী আদর্শে সংশয়হীন; তার জীবনাবেগ ধর্ম আর ঈশ্বরে অবিচল নিষ্ঠা দ্বারা পরিশীলিত। শৈলজার ঈশ্বর বিশ্বাস এতই অভ্রান্ত যে, তার কোন প্রকার বিরুদ্ধাচরণ কিম্বা সংশয় প্রকাশকেই তিনি পাপ বলে গণ্য করেন। সে পাপের খণ্ডন নেই। সংসারে সকল পাপের খণ্ডন সম্ভব কেবল গোবিন্দজীর প্রসাদে-- কিন্তু গোবিন্দকে অবিশ্বাসের পাপের কোন মার্জনা নেই। শ্যামাদাস কর্মদোষে জগৎ পরিত্রাতারূপী ভগবান গোবিন্দে আস্থাহীন। তাই শৈলজার বিচারে শ্যামাদাস ঘোরতর পাপী--কুলধর্মত্যাগী। কুলধর্মত্যাগী পুত্রকে ক্ষমা করতে তিনি নারাজ অধর্মাচারী নাস্তিক সন্তানের হাতের আগুনও তার কাম্য নয়। বুনো রামদাসের সর্বাপেক্ষা প্রিয় শিষ্য দুর্গাদাস শাস্ত্রীর বংশের সন্তানের এতখানি অধঃপতন জনিত মর্মান্তিক পীড়া শৈলজা, গোবিন্দজীর কৃপা লাভের বিপুল প্রত্যাশায় সইতে পেরেছিলেন। গোবিন্দের কৃপায় জীবন যুদ্ধে জয়লাভের স্বপ্ন দেখেছিলেন তিনি। কিন্তু নিরন্তর ধ্যান, জপ আর ভক্তিতে তার আরাধ্য দেবতা জাগ্রত হলেন না-- শত আহ্বানেও পাপীর শাস্তি বিধানে জীবন্ত হলেন না পরিত্রাতা মধুসূদন। এই নিষ্ঠুর সত্য শৈলজার অটল বিশ্বাসের মর্মমূলে গিয়ে আঘাত করেছিল। সে আঘাত সইবার শক্তি শৈলজার ছিল না।

শ্যামাদাস বৈজ্ঞানিক জড়বাদে বিশ্বাসী। প্রেম, ভালবাসা, আবেগ অনুভূতি তার কাছে Biological Condition ছাড়া আর কিছু নয়। তার জগৎ অতি বাস্তবতার জগৎ-- সেখানে ইহবাদই শেষ কথা, পরকাল ভিত্তিহীন কল্পনা মাত্র। জন্ম মৃত্যুর রহস্য উদ্ঘাটনের অটল সঙ্কল্প নিয়ে তার Bengal Scientific Research-প্রতিষ্ঠার পরিকল্পনা। সে পরিকল্পনা ব্যর্থ হয় ধনতন্ত্রের প্রতিভূ ব্রজ ঘোষালের কূট চক্রান্তে। বৈজ্ঞানিক গবেষণার সাফল্য বা ব্যর্থতা অনেকাংশে নির্ভর করে ধনতন্ত্রের কৃপার ওপরে - এই সত্য উপলব্ধিতে শ্যামাদাসের কিছু বিলম্ব ঘটেছে। ঘোষালের কর্মক্ষেত্র থেকে দূরে, আবিষ্কারের উন্মত্ত নেশায় শ্যামাদাস Mustard gas-র প্রতিষেধক অন্বেষণ করতে গিয়ে আবিষ্কার করে ফেলে আরও মারাত্মক death gas। উদ্ভাবনী শক্তির অভূতপূর্ব সাফল্যে শুভাশুভজ্ঞান বিস্মৃত শ্যামাদাস মানব কল্যাণের হন্তারক রূপেই আত্মপ্রকাশ করে। স্বার্থ সন্ধানী ধনতন্ত্রের নগ্ন হস্ত প্রসারিত হয় সেখানেও। অবশেষে অসতর্ক মুহূর্তে তারই সৃষ্টি তাকেই আঘাত হানে নির্মম ভাবে। মোহ বিদূরিত শ্যামাদাস ক্রমে অনুভব করে, যে প্রেম প্রীতিকে সে নিছক Biological Condition বলে গণ্য করে এসেছে, বিজ্ঞানের শত আবিষ্কার অপেক্ষাও তার পরহিতায় আত্মোৎসর্গের মহিমা অনেক বেশি উজ্জ্বল -- করুণার মমতা এবং করুণার জন্যে অণিমার আত্মবিসর্জন তাকে এই সত্যের মুখোমুখি এনে দাঁড় করিয়েছে।

শৈলজা শ্যামাদাসের, মাতা পুত্রের মধ্যবর্তী ব্যবধান ব্রজবিহারীর প্রতিষ্ঠার পথ সুগম করেছে। ব্রজবিহারী ধনতান্ত্রিক শক্তির প্রতীক। সমকালীন জীবন সঙ্কটে জাতীয় স্তরে

উদ্ভূত জটিল পরিস্থিতি অর্থগৃধ্নু ধনতান্ত্রিক শক্তিকেই পরোক্ষে সহায়তা দান করেছিল। আত্মরক্ষার্থে ব্যর্থ রক্ষণশীল অতীতচারিতা তার গতিরোধ করতে পারেনি: অন্যদিকে প্রাচীন ঐতিহ্যে পুরোপুরি আস্থাহীন নব্যতন্ত্র বিজ্ঞান মনস্কতার অজুহাতে ধ্বংসের সম্ভাবনাকেই নিশ্চিত করে তুলেছিল। এই প্রেক্ষাপটে ধনতন্ত্রের আত্মপ্রকাশ ব্রজবিহারী তার প্রতিনিধি। বিজ্ঞান তার দাসত্ব শৃঙ্খলে আবদ্ধ। সেই শক্তিকে প্রয়োগ করে সে গ'ড়ে তোলে মানুষ মারার কারখানা। তার গোপন আস্তানায় গড়ে ওঠে জীবনদায়ী ওষুধের মজুত ভাণ্ডার। বিত্তহীন ভূমিজীবী কৃষক তার কূট কৌশলে শেষ সম্বলটুকু হারিয়ে পরিণত হয় কারখানার শ্রমিকে কিম্বা ভিক্ষাবৃত্তি অবলম্বন করে ভাগ্যকে দোষারোপ করে। আদর্শ, নীতি এবং বৃত্তির পার্থক্যহেতু যৌথ একান্নবর্তী পরিবারের ভাঙ্গন, তার বিত্ত সম্পত্তির পরিমাণকে ক্রমশ স্ফীতকায় করে তোলে। ধর্ম কিম্বা ঈশ্বরে ব্রজবিহারীর আনুগত্য নেই ধর্মের ভেকধারণ তার স্বার্থসিদ্ধির হাতিয়ার মাত্র।

'বিংশ শতাব্দী' নাটকের অন্যতম আকর্ষণ এর তির্যক, বৈদগ্ধপূর্ণ চমৎকার সংলাপ। চরিত্রোপযোগী সার্থক সংলাপ এই নাটককে বিশিষ্টতা দান করেছে। বক্তব্যের সমর্থনে রবীন্দ্রনাথ প্রমুখের উদ্ধৃতির প্রয়োগে নাট্যকার নিঃসন্দেহে সফল। নাটকের গতি সাবলীল। মোটের ওপর সমকালীন বাংলা নাটকের ধারায় এই নাটকের গুরুত্বকে কোনভাবেই উপেক্ষা করা চলে না।

সপ্তম অধ্যায়

উপন্যাসের নাট্যরূপ

মৌলিক নাটকের পাশাপাশি এ কালের রঙ্গমঞ্চে জনপ্রিয় গল্প উপন্যাসের নাট্যরূপের অভিনয় রঙ্গমঞ্চের ইতিহাসে স্বাদ বৈচিত্র্য এনেছে। অবশ্য বাংলা নাটকে এই প্রচেষ্টা নতুন নয়। দীনবন্ধুর পর থেকে গিরিশচন্দ্রের আবির্ভাবের পূর্ব পর্যন্ত বঙ্কিম উপন্যাসের নাট্যরূপ বঙ্গ রঙ্গমঞ্চে নাট্যরস পিপাসু দর্শকের রসতৃষ্ণা নিবারণ করে এসেছে। শিশির যুগেও এই প্রয়োজন আংশিক সিদ্ধ করেছে শরৎ উপন্যাসের নাট্যরূপ। বঙ্কিমচন্দ্র ও শরৎচন্দ্র উপন্যাসের পটভূমিতে জাতির চিত্তকে গভীর ভাবে নাড়া দিয়েছিলেন। বঙ্গ রঙ্গমঞ্চে তাঁদের অন্তর্ভুক্তি তাই স্বাভাবিক হয়ে পড়েছিল। তদুপরি তৎকালে পুরাণাশ্রিত কাহিনীকে ভিত্তি করে উৎকৃষ্ট নাটক রচিত হলেও, সামাজিক নাটকের বৈচিত্র্যময় ক্ষেত্র তখন পর্যন্ত নির্মিত হয়নি। সামাজিক নাটকের ছদ্মনামে অল্প বিস্তর যে সমস্ত নাটক রচিত বা অভিনীত হয়েছে তার অধিকাংশই মূলত পারিবারিক নাটক; বৃহত্তর সমাজ-সমস্যা অপেক্ষা পারিবারিক গণ্ডীর মধ্যেই তার ঘাত-প্রতিঘাত আন্দোলিত—বৃহত্তর সামাজিক জীবনের প্রতিফলন সেই সমস্ত নাটকে ততটা দেখা যায়নি। সামাজিক নাটকের এই দৈন্য মোচনে উপন্যাসের নাট্যরূপ অপরিহার্য হয়ে পড়েছিল।

কিন্তু দ্বিতীয় মহাযুদ্ধকালীন পরিবর্তিত সমাজ পরিবেশে বাংলা নাটকের গতি-প্রকৃতি দ্রুত পরিবর্তিত হতে শুরু করে। বিশেষতঃ বাংলা সামাজিক নাটকে সুবর্ণ যুগের সূচনা যুদ্ধকালীন সমাজ বিপর্যয়ের অস্থির পটভূমিতে এসে। তাই এই পর্বে নতুন করে উপন্যাসের নাট্যরূপের প্রাসঙ্গিকতা নিয়ে সংশয় দেখা দিতে পারে। আমার পূর্ববর্তী কোন কোন সমালোচক এ ব্যাপারে বিরূপ মন্তব্য করেছেন।[১] তাঁদের মতে মৌলিক নাটকের অপ্রতুলতা হেতু এই পর্বে উপন্যাসের নাট্যরূপ রঙ্গমঞ্চের চাহিদা মেটাতে প্রয়োজন হয়ে পড়েছিল—এবং প্রয়োজনের তাগিদে সৃষ্ট বলে শিল্প হিসাবেও এগুলি উচ্চাঙ্গের নয়। এই অভিমত যথার্থ নয়; যে ভ্রান্ত অভিমতের সৃষ্টি সমালোচকের অসতর্কতায়,

---

[১] 'বাংলা নাটকের ইতিহাস'—ডঃ অজিত কুমার ঘোষ, পৃঃ ৬০২ দ্রষ্টব্য।

তার জন্যে যুগের দাবীকে নস্যাৎ করা চলে না। যুদ্ধকালীন পারিপার্শ্বিক প্রতিকূল পরিবেশেও ভিন্ন স্বাদের প্রথম শ্রেণীর সামাজিক নাটকের রচনা ও অভিনয় ধারা সমবেগে প্রবাহিত ছিল। অন্যদিকে শিল্প বিচারে এ কথা স্বীকার না করে উপায় নেই যে, কালের সীমারেখা ছাড়িয়ে এই সমস্ত নাট্য রূপায়িত উপন্যাস উত্তরকালের দর্শক সমাজকেও আকৃষ্ট করতে সমর্থ হয়েছে এবং তারই অনুসরণে আধুনিক জনপ্রিয় উপন্যাসও নাট্য রূপায়িত হয়ে রঙ্গমঞ্চে প্রবেশাধিকার লাভ করে চলেছে। কাজেই বিরূপ সমালোচনা পরিহার করে উপন্যাসের নাট্য রূপায়ণের পশ্চাতে যথার্থ কারণগুলি অনুসন্ধান করা যেতে পারে।

পূর্বেই উল্লেখ করেছি, যুদ্ধকালীন বিপর্যয়ের চোরাবালিতে কলকাতার পেশাদারী নাট্যশালাগুলি চরম অর্থনৈতিক সঙ্কটের মধ্যে পতিত হয়েছিল। এই সঙ্কট মোচনে মৌলিক নাটকের সমান্তরাল ভাবে উপন্যাসের নাট্যরূপের অভিনয় দিয়ে ব্যবসায়িক সিদ্ধি লাভের একটা প্রচেষ্টা ছিল। কারণ এই শ্রেণীর নাটকাভিনয়ের একটা দর্শকগোষ্ঠী পূর্ব থেকেই তৈরি হয়েছিল। উপন্যাসের নাট্যরূপ যে নিম্নমানের ব্যর্থ শিল্পকীর্তিতে পর্যবসিত হয়নি, দীর্ঘ কয়েক যুগ ধরে তার দর্শক সম্মোহনী ক্ষমতা থেকেই তা প্রমাণিত। আর্থ সামাজিক প্রেক্ষাপটে পেশাদারী নাট্যশালাগুলি কিছু পরিমাণে এই জনপ্রিয়তাকে কাজে লাগাতে চেয়েছিল। দ্বিতীয়তঃ রবীন্দ্র পরবর্তী কালে বাংলা নাটকের পাশাপাশি বাংলা উপন্যাসও বহুধা বিভক্ত পথে প্রবাহিত হয়ে নতুন দিনের জীবন দর্শনকে স্বীকার করে নিয়েছিল। জন জীবনের সঙ্গে অন্তরঙ্গতায় শরৎ উপন্যাসে উন্মোচন ঘটল নতুন দিগন্তের। সমকালীন বাংলা নাটকের সঙ্গে উপন্যাসের এই ভাবগত সৌসাদৃশ্য লক্ষ্যণীয়। জন চেতনার সাক্ষ্যবাহী এই সমস্ত উপন্যাসের নাট্যরূপ তাই সমকালীন নাট্যধারার পরিপূরক রূপেই অনুভূত হয়েছিল। শরৎ উপন্যাসের প্রভূত জনপ্রিয়তার জন্যে তাঁর উপন্যাসগুলিই এ ক্ষেত্রে শীর্ষ স্থানের অধিকারী। তৃতীয়তঃ ইতঃপূর্বে রবীন্দ্রনাথ ও অনুরূপা দেবীর উপন্যাসের নাট্যরূপের প্রভূত সাফল্য এ কালের কোন কোন নাট্যকারকে অনুরূপ শিল্প সৃষ্টিতে অনুপ্রাণিত করেছে।

তবে কাজটি যে দুরূহ তাতে সন্দেহ নেই। উপন্যাসের পরিধি বিস্তৃততর। সেখানে ঘটনার পর ঘটনার বিন্যাসে কাহিনী-রস জমে ওঠে। নির্দিষ্ট সময় সীমার মধ্যে উপসংহার টানার কোন দায় ঔপন্যাসিকের নেই। প্রয়োজনে তিনি যতগুলি খুশি চরিত্রও সৃষ্টি করে নিতে পারেন স্থান কাল সময়ের ঐক্য মেনে চলবার বিধানও তাঁর জন্যে নির্দিষ্ট নেই। ঔপন্যাসিক সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম বিশ্লেষণের দ্বারা পাঠকের সঙ্গে নৈকট্য স্থাপনের সুযোগও পেয়ে থাকেন। কিন্তু নাট্যকার এবংবিধ সুযোগ থেকে বঞ্চিত। নাট্যকার নেপথ্যচারী -মঞ্চের নেপথ্যভাগে তাঁর অবস্থিতি। নির্দিষ্ট সময় সীমার মধ্যে কাহিনী চরিত্র ও ঘটনার সমবায়ে দ্বন্দ্ব-সংঘাতের বিন্যাসে নাট্যরস পরিবেশন তঁর লক্ষ্য। উপন্যাসের নাট্যরূপ দানের

ক্ষেত্রেও এই সাধারণ সত্যটি তিনি অস্বীকার করতে পারেন না। নাটকের প্রয়োজনেই তাঁকে কিছুটা গ্রহণ-বর্জন করতে হয়; অথচ তার মধ্যে দিয়ে সমগ্র বিষয়টি দর্শকের কাছে স্পষ্ট রূপে প্রতিভাত হওয়া চাই। আশার কথা, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের ক্রান্তিলগ্নে কোন কোন নাট্যকার বাংলা নাটকের পথ নির্মিতিতে এই গুরুদায়িত্ব পালনে যথেষ্ট কৃতিত্বের পরিচয় দিয়েছেন।

॥ রত্নদীপ ॥

প্রভাত কুমার মুখোপাধ্যায়ের 'রত্নদীপ' উপন্যাসের নাট্যরূপ, বিধায়ক ভট্টাচার্যের 'রত্নদীপ' 'রঙমহল' থিয়েটারে ১৯৪০-র ২৪শে ডিসেম্বর প্রথম মঞ্চস্থ হয়। এই পর্বে কলকাতার বিভিন্ন রঙ্গমঞ্চে অভিনীত উপন্যাসের নাট্যরূপগুলির মধ্যে 'রত্নদীপ' অন্যতম। প্রথিতযশা নাট্যকার বিধায়ক ভট্টাচার্যের, উপন্যাসকে নাট্যরূপ দানের এটিই প্রথম প্রচেষ্টা। স্বয়ং ঔপন্যাসিকের অনুরোধে নাট্যকার এই কাজে ব্রতী হন। চারটি অঙ্কে বিভক্ত এই নাট্যরূপের সংগীত রচনা করেন অখিল নিয়োগী এবং সুরারোপ করেন ধীরেন দাস; নৃত্য পরিকল্পনায় হেমেন্দ্র কুমার রায় এবং পটভূমিকা অঙ্কন করেন মনীন্দ্রনাথ দাস। প্রথম অভিনয় রজনীতে অংশগ্রহণকারী শিল্পীদের মধ্যে ছিলেন ঃ খগেন্দ্র (সোনার হরিণ) - অহীন্দ্র চৌধুরী; বড়বাবু - আশু ভট্টাচার্য; রাখাল ভট্টাচার্য - ভূমেন রায়; দেওয়ানজী - মনোরঞ্জন ভট্টাচার্য; নিশানাথ—ধীরেন দাস; দারোগা - সিধু গাঙ্গুলী; নীলমণি - হীরালাল চট্টোপাধ্যায়; মুখুজ্যে - শম্ভু মিত্র; রামহরি ভট্টাচার্য - শৈলেন বসু; হরিদাস গোস্বামী— আশু বোস (এ্যাঃ); বিশ্বেশ্বর মিত্র - গোপাল মুখোপাধ্যায়; সুরেশ গাঙ্গুলী - ভানু চট্টোপাধ্যায়; সুবল মুখুজ্যে - গিরিজা সাধু; কনকলতা - শান্তি গুপ্তা; ইন্দুমতী (বৌরাণী) - উষাদেবী; সুরবালা—পদ্মাবতী; হাবার মা - বেলারাণী; সর্বমঙ্গলা - উষারাণী; রাণীমা - লাবণ্য দাস; এবং আরও অনেকে। প্রভাত কুমার সিংহ প্রযোজিত এই নাট্যরূপের নাট্য নির্দেশক ছিলেন নটসূর্য অহীন্দ্র চৌধুরী।

এই নাট্যরূপে মূল কাহিনীকে নাট্যকার যথাসম্ভব অক্ষুণ্ণ রাখতে চেষ্টা করেছেন। ঘটনা, সংলাপ ও চরিত্র মোটামুটি অপরিবর্তিত থেকেছে। নাটকীয় পরিবেশ সৃষ্টি করতে যেটুকু সংশোধন পরিমার্জন জরুরী হয়ে পড়েছে, নাট্যকার সেই সকল ক্ষেত্রে কেবল নিজস্ব কল্পনার ওপরে নির্ভর করেছেন। তাতে মূল কাহিনীর খুব একটা হ্রাস-বৃদ্ধি ঘটেনি; বরং নাটকের দিক থেকে এই পরিমার্জন যথেষ্ট শিল্প সম্মত বলেই মনে হয়। এটুকু নিঃসংশয়ে বলা যেতে পারে যে, এই নাট্যরূপ নির্মাণে বিধায়ক বাবু মুন্সিয়ানার পরিচয় দিয়েছেন।

বাগুলীপাড়া এস্টেটের বৌরাণী ইন্দুমতীর ভাগ্য বিড়ম্বনার করুণ পরিণতি 'রত্নদীপ' নাটকের মূল বিষয় বস্তু। অর্থবান জমিদারপুত্র ভবেন্দ্র তার আট বছরের বালিকা বধূ

ইন্দুমতীকে পরিত্যাগ করে সন্ন্যাস ব্রত নিয়ে নিরুদ্দেশ হয়ে যায়। দীর্ঘ অপেক্ষা এবং অনুসন্ধানের পরেও ভবেন্দ্রের কোন সংবাদ না পাওয়া গেলে শাস্ত্র ও সমাজ বিধান অনুসারে ইন্দুমতীকে বৈধব্য গ্রহণ করতে হয়। কঠোর ব্রত, নিয়ম, আচার, নিষ্ঠার মধ্যে দিয়ে ইন্দুমতী তার নিঃসঙ্গ জীবন অতিবাহিত করে চলে। ইন্দুমতী তার জীবনের বঞ্চনাকে বিনা প্রতিবাদে স্বীকার করে নিয়েছিল। কৈশোরের প্রারম্ভে স্বামীর অদ্ভুত সিদ্ধান্তে তার দাম্পত্য জীবনের স্বপ্নসৌধ তাসের ঘরের মতই অতর্কিতে ধূলিসাৎ হয়ে গেছে। ইতিহাসের সেই বিখ্যাত রাজা ট্যান্টেলাসের মতই অভিশপ্ত জীবন তার। জমিদারির আয় বাৎসরিক একলক্ষ টাকা; প্রাচুর্য, ঐশ্বর্য, আভিজাত্য কোন কিছুরই অভাব নেই তার অথচ কোন কিছুকে ভোগ করবার অধিকার থেকে সে বঞ্চিত। এমনকি এই নিদারুণ বঞ্চনার বিরুদ্ধে তার কোন অভিযোগ পর্যন্ত নেই। তার দুঃখ-বেদনার কথা প্রকাশ করবার কোন প্রয়োজনও সে অনুভব করেনি। বরং হিন্দু নারীর সংস্কার এবং আদর্শ নিষ্ঠাকে অবলম্বন করে সংসারের মরুতীর্থে তার বিনম্র বিচরণ। ইন্দুমতী জন্মান্তরবাদে বিশ্বাসী-- পরজন্মে দাম্পত্য-সুখের ব্যাকুল প্রত্যাশা তাকে এ জন্মে কঠোর ব্রহ্মচর্য পালনে অনুপ্রাণিত করেছে, পদস্খলন ঘটতে দেয়নি। তার স্বপ্নদর্শনে সেই আকৃতি প্রতিফলিত হয়েছে-- বিধবা বিবাহ সংক্রান্ত গ্রন্থ তাই তার কাছে অস্পৃশ্য, অশুচী।

এ হেন ইন্দুমতীকে ভাগ্যের নির্মম পরিহাসে একদিন চরম পরীক্ষার মুখোমুখি হতে হল ভবেন্দ্রের ছদ্মবেশে রাখাল ভট্টাচার্যের আগমনে। রাখালকে ভবেন্দ্র জ্ঞানেই আত্ম নিবেদনে তার অতৃপ্ত হৃদয় ব্যাকুল হয়ে উঠেছিল। কিন্তু সংযত চিত্ত ইন্দুমতীর কাছে আত্মতৃপ্তি অপেক্ষা ধর্মপথে স্বামীকে সহায়তা করা ছিল পরম কর্তব্য। নচেৎ ব্রহ্মচর্যের ভণ্ড আবরণের অন্তরাল থেকে প্রবৃত্তিতাড়িত ভবেন্দ্ররূপী রাখাল ভট্টাচার্যের আত্মপ্রকাশে অধিক বিলম্ব ঘটতনা।[১] ইন্দুমতীর ত্যাগ, তিতিক্ষা এবং আত্মসংযমের সম্মুখে রাখালের কামনা-পীড়িত চিত্তবৃত্তি মাথা উঁচু করে দাঁড়াবার সাহস পায়নি। তাই ফুলশয্যার রাত্রে চরম মুহূর্তে সন্ত্রস্ত রাখালকে সত্য উদ্ঘাটন করে পালিয়ে আসতে হয়েছে। পবিত্রতার সম্মুখে পাপ সর্বদাই নত-মস্তক। মহাপ্রভুর দিব্যভাব মণ্ডিত সৌমমূর্তি দর্শনে জগাই মাধাই তাদের উদ্দেশ্য সাধনে ব্যর্থ মনোরথ। কিন্তু মোহের দ্বারা ইন্দুমতীর বিচারবোধ আচ্ছন্ন ছিল না--নইলে তার সতীত্ব নাশে উদ্যত হয়েও পরিশেষে ব্যর্থ রাখালকে শ্রদ্ধা জানানো তো দূরে থাক, তাকে ক্ষমা করাও তার পক্ষে সম্ভব হত না। মূল উপন্যাসে বৌরাণীর মৃত্যুতে ছিল উপন্যাসের সমাপ্তি। আর এখানে বৌরাণী কৃতজ্ঞ চিত্তে দেবতাজ্ঞানে

---

১ 'বক্তব্য' অংশে নাট্যকার বলেছেন'--"সে যুগের বৌরাণী যদি আজকের কোন মেয়ে হতেন তবে রাখালকে কেঁদে ফিরে যেতে হত না বলেই আমার বিশ্বাস। সেই জন্যেই এই বয়ের মধ্যে আজকের ফ্যাশন দুরস্ত Cosmopolitan মানুষের একটা relief আছে।"

রাখালের পদতলে অবলুণ্ঠিতা। নাটকীয় পরিবেশ সৃষ্টিতে কাহিনীর এই গতি পরিবর্তনে বৌরাণীর চরিত্রটিও উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে।

প্রতিকূল পরিস্থিতি, রাখাল ভট্টাচার্যকে ভবেন্দ্রের মিথ্যা পরিচয়ে বাশুলীপাড়া এস্টেটের রঙ্গভূমিতে টেনে এনেছে; নচেৎ তাকে অর্থলোলুপ কিম্বা প্রতারক বলা যায় না। তার স্ত্রী লীলাবতী যে কারণেই হোক তাকে পরিত্যাগ করে চলে গেছে। কর্তব্যে অবহেলার দায়ে তাকে খঙ্গপুর রেল স্টেশনে টিকিটবাবুর চাকরিটি পর্যন্ত খোয়াতে হয়েছে। অন্ন বস্ত্র বাসস্থান সংস্থানের অন্য কোন উপায় তার ছিল না। এই অবস্থায় মৃত সন্ন্যাসীর সঙ্গে তার চেহারার সাদৃশ্য, বিপুল সম্পত্তির সম্ভাবনা তাকে বাঁচার তাগিদেই প্রতারকের ভূমিকায় অবতীর্ণ হতে প্ররোচিত করেছে। আর বাশুলীপাড়ায় ভবেন্দ্ররূপে স্বীকৃতি তাকে সাহস জুগিয়েছে। তবে বৌরাণীকে নিয়ে প্রথম থেকেই তার সংশয় ছিল, দ্বিধা ছিল মিথ্যা স্বামী সেজে তার চরিত্র হননে রাখালের মনে শঙ্কা ছিল; ব্রহ্মচর্যের আড়ালে আত্মগোপন করে সে নিষ্কৃতির পথ খুঁজেছে। ভবেন্দ্র জননীর বারংবার অনুরোধে ইন্দুমতীর সঙ্গে সাক্ষাৎ তার রূপতৃষ্ণা জাগ্রত করেছে তার সংযমের বাঁধ ধীরে ধীরে ভেঙ্গে পড়েছে। তবু শেষ পর্যন্ত রাখাল চরম পরীক্ষায় উত্তীর্ণ; ইন্দুমতীর সরল বিশ্বাস আর সংস্কারকে সে আঘাত করতে পারেনি। এই না পারার পশ্চাতে বোধ হয় লীলাবতী ওরফে সুরবালার উপস্থিতি অন্তত কিছু পরিমাণে দায়ী। সুরবালার অবস্থা আরও মর্মান্তিক। জমিদারপুত্র লম্পট নবীনের কৌশলে সে সংসার থেকে ছিটকে পড়েছে; সংসারে প্রত্যাবর্তনের পথ তার ছিলনা কিন্তু তাই বলে নবীনের কামনার অনলে সে আত্মসমর্পণ করেনি। আত্মহত্যার পথই সে বেছে নিয়েছিল ঘটনাচক্রে প্রাণ ফিরে পেয়ে বৌরাণীর আশ্রয়ে এসে অনিচ্ছাকৃত পাপের প্রায়শ্চিত করেছে গভীর মর্মযন্ত্রণায় অহরহ দগ্ধ হয়ে।

নাট্যকার যাই বলুন না কেন, খগেন ওরফে সোনার হরিণ চরিত্রটিকে খুব নিরাসক্ত ব্যক্তি বলে বোধ হয় না।[২] বাশুলীপাড়া এস্টেটের দেওয়ানজির প্রদত্ত বিজ্ঞাপনে তার উৎসাহিত হবার পশ্চাতে বিত্তলাভের বাসনা প্রবল। একমাত্র তারই জন্যে মাসিক দুশো টাকা মাইনে এবং কার্যোদ্ধার হলে নগদ কুড়ি হাজার টাকা সহ কলকাতায় একটা ভাল বাড়ির বিনিময়ে কনককে সে বৌরাণীর সহচরীর চাকরিতে কৌশলে নিযুক্ত করেছে। কনক অভিনেত্রী, অভিনয় তার পেশা -এও তার অভিনয়ের অঙ্গ। কিন্তু খগেনের উদ্দেশ্য অত্যন্ত স্পষ্ট-- বৌরাণীকে কনককে দিয়ে বিধবা বিবাহে সম্মত করতে পারলেই বৌরাণীর প্রভূত সম্পত্তির মালিক হয়ে বসতে পারে সে। কনকের মুখে ইন্দুমতীর রূপ-গুণের কথা

---

২ 'সোনার হরিণ Vilain নয়, এক শ্রেণীর লোক আছে, যারা সর্বস্ব খুইয়ে একটুখানি মজা করতে চায়, সোনার হরিণ সেই জাতীয় লোক। ঠিক এই কারণেই সে থিয়েটার খুলেছিল, এই কারণেই বৌরাণীকে পাওয়ার ষড়যন্ত্র- এই কারণেই রাখালের পরিচয় অনুসন্ধান।--'বক্তব্য', নাট্যকার।

শুনে তার প্রতি একটা অন্ধ আকর্ষণ সে অনুভব করেছে: একবার কোন না কোন ছল-ছুতোয় তাকে চোখের দেখা দেখবার জন্যে তার মন ব্যাকুল হয়ে উঠেছে। মাঝখানে হঠাৎ ভবেন্দ্রের পরিচয়ে রাখালের আবির্ভাবে তার পরিকল্পনা ব্যর্থ হবার উপক্রম। তাই সন্দেহ দেখা দেওয়া মাত্রই খগেন তার পরিচয় অনুসন্ধানে সক্রিয় ভাবে লিপ্ত হয়েছে। 'সর্বস্ব খুইয়ে' নিছক 'মজা' করার জন্যে তার এই পণ্ডশ্রম নয়। আর কনক অভিনেত্রী হলেও নারী, সে সুরবালা এবং বৌরাণীর মর্মবেদনা অনুভব করেছিল। উভয়কে এই সঙ্কট থেকে সে রক্ষা করতে চেয়েছে; খগেনকে লেখা তার চিঠিতে সেই আর্তি স্পষ্ট।

অপ্রধান চরিত্রগুলির মধ্যে দেওয়ানজির, প্রভুর প্রতি আনুগত্য এবং হাবার মার কৌতুককর বাকভঙ্গি বেশ উপভোগ্য। বৌরাণীর স্বপ্নদর্শন ফ্রয়েডীয় মনস্তত্ত্বের অনুশীলন জাত। নাটকের সংলাপ গতিশীল।

॥ কালিন্দী ॥

স্বল্পকালের পথ পরিক্রমায় 'নাট্যনিকেতন' যে কয়েকটি চমকপ্রদ নাটক রঙ্গমঞ্চে উপস্থাপনা করে বাংলা নাট্যাভিনয়ের ইতিহাসে স্মরণীয় হয়ে আছে তন্মধ্যে তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের স্বরচিত উপন্যাসের নাট্যরূপ 'কালিন্দী' অন্যতম। ১৯৪১ র ১২ই জুলাই 'কালিন্দী' 'নাট্যনিকেতন' মঞ্চে প্রথম আত্মপ্রকাশ করে অভূতপূর্ব সাড়া ফেলে দিয়েছিল দর্শক মহলে। কিন্তু চূড়ান্ত সফল এই নাটকটি সে সময় মাত্র পঁচিশ রাত্রির বেশি অভিনীত হবার সুযোগ পায়নি। কারণ ১৯৪০-র গোড়া থেকেই 'নাট্যনিকেতনের' দুরবস্থার সূচনা হয়েছিল। তারপর '৪১ র শেষভাগে গিয়ে মামলা মোকদ্দমা সংক্রান্ত কারণে ঐ প্রতিষ্ঠান চিরকালের জন্যে লুপ্ত হয়ে যায়। পরবর্তীকালে 'স্টার' থিয়েটারের নাট্যকার ও পরিচালক শ্রীযুক্ত মহেন্দ্র গুপ্ত 'স্টার' থিয়েটারে নতুন করে 'কালিন্দী' অভিনয়ের বন্দোবস্ত করেন। তবে সে সময় অভিনয়ের প্রয়োজনে নাটকখানি আদ্যোপান্ত সংস্কার করে নেওয়া হয়। আমরা যথা সময়ে সে ইতিহাস আলোচনা করব। এখন 'নাট্যনিকেতনের' তৎকালীন ইতিহাস অনুসন্ধান করা যাক।

'নাট্যনিকেতন' মঞ্চে প্রথম অভিনয় রজনীতে যাঁরা অংশগ্রহণ করেছিলেন তাঁদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলেন : জমিদার রামেশ্বর চক্রবর্তীর ভূমিকায়—শৈলেন চৌধুরী, ইন্দ্র রায়—রবীন্দ্র মোহন রায়, অহীন্দ্র—ভূমেন রায়, অচিন্ত্য—নরেশ চন্দ্র মিত্র, মি. মুখার্জী—শম্ভু মিত্র, সুনীতি—নীহারবালা, উমা—রাধারানী; এ ছাড়াও রবী রায়, ছায়া দেবী এবং উমারাণী অন্য তিনটি ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়েছিলেন। 'নাট্যনিকেতনের' তৎকালীন প্রযোজক সুধীর চন্দ্র গুহের তত্ত্বাবধানে নাটকটি মঞ্চস্থ হয়েছিল। নাট্য পরিচালকের নাম সংবাদপত্রের পাতা ঘেঁটে উদ্ধার করা সম্ভব হয়নি। 'কালিন্দী' উচ্চাঙ্গের অভিনয়ের গুণে বিপুল জন সমর্থন আদায় করেছিল। 'অমৃতবাজার পত্রিকা' এ সম্পর্কে মন্তব্য করতে গিয়ে লিখেছে :

" We can boldly say that the theatre-goers will find something for recreation, realisation and amusement Mr Sudhir Chandra Guha the well-known producer is to be congratulated on the successful production of such a mighty play "[৪]

'নাট্যনিকেতনে' 'কালিন্দীর' অভূতপূর্ব সাফল্য, 'স্টার' কর্তৃপক্ষকে এই নাটকটি সম্পর্কে উৎসাহিত করেছিল। কিন্তু 'নাট্যনিকেতনের' বিলুপ্তির পূর্ব পর্যন্ত নাটকটি 'স্টারে' পুনরভিনয়ের কোন সম্ভাবনা ছিল না। তারও বেশ কিছু পরে 'স্টার' থিয়েটারের নাট্যকার-পরিচালক শ্রীযুক্ত মহেন্দ্র গুপ্তের উৎসাহে নাট্যকার 'স্টারে' 'কালিন্দীর' পুনরভিনয়ে সম্মত হন। সেই সময় নাটকটির ত্রুটি-বিচ্যুতিগুলি আগাগোড়া যথাসম্ভব সংশোধন করে নেওয়া হয়। সংশোধন পরিমার্জনের কাজটি নাট্যকারের ইচ্ছানুসারে সমাধা করেন মহেন্দ্র গুপ্ত মহাশয়; তাকে আরও খানিকটা রদবদল করে নেন স্বয়ং নাট্যকার। এইভাবে বেশ কিছুটা পরিবর্তিত চেহারায় দ্বিতীয় বার রঙ্গমঞ্চে পাদপ্রদীপের আলোয় আত্মপ্রকাশ করে 'কালিন্দী'। পরে গ্রন্থাকারে প্রকাশের সময় শেষবারের জন্যে 'কালিন্দী' র অঙ্গরাগ সম্পন্ন হয়ে বর্তমানে সেটি আমাদের হাতে এসে পৌঁছেছে।[৫] নাট্য সমালোচনায় এই আধুনিক সংস্করণটিকে সামনে রেখেই আমরা অগ্রসর হব।

চমকপ্রদ আখ্যানভাগ 'কালিন্দী' নাটকের অন্যতম প্রধান আকর্ষণ। ভারত ইতিহাসের পটভূমিতে সংস্থাপন করে এই নাটকের অন্তর্নিহিত ভাব চৈতন্যকে অনুধাবন করতে হবে। তদানীন্তন ভারতবর্ষের আর্থ সামাজিক প্রেক্ষাপট পরিবর্তনের ইতিবৃত্তের ওপরে এই নাটকের আখ্যানভাগ নির্মিত হয়েছে। ভারতবর্ষের সমাজ অর্থনীতির মৌলিক অবস্থান মূলতঃ কৃষি নির্ভর। এ দেশে ইংরেজ আগমন এবং দু' দুটি মহাযুদ্ধের কারণে ক্রমান্বয়ে কৃষি নির্ভর আর্থ সামাজিক প্রেক্ষাপট অপসারিত হয়ে নগরকেন্দ্রিক ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থা গড়ে উঠছিল। তার অবশ্যম্ভাবী তাড়নায় জনজীবন তার অভ্যস্ত বাতাবরণ থেকে ক্রমশঃ দূরবর্তী হয়ে পড়ছিল। অর্থাৎ ফিউডালইজমের অপসারণে ক্যাপিটালইজমের শক্ত বুনিয়াদ রচিত হচ্ছিল। পৃথিবীর সব দেশেই ক্যাপিটালইজম যখন প্রথম পদক্ষেপ রাখে তখন তাকে নতজানু হয়েই আসতে হয়— পরে বণিকের মানদণ্ড ক্রমে রূপান্তরিত হয় রাজদণ্ডে। এ দেশেও তার কোন ব্যতিক্রম হয়নি। আরও দুর্ভাগ্যের বিষয়, ফিউডাল সমাজের অন্তর্বিরোধের সূত্রেই ক্যাপিটালইজমের প্রতিষ্ঠা। ক্রমে তার স্বরূপ উন্মোচিত হলে ফিউডাল সমাজের ভেতর থেকেই সম্মিলিত প্রতিরোধ উঠে আসে আত্মরক্ষার তাগিদে। কিন্তু ক্যাপিটালইজম উন্নত যন্ত্রসভ্যতার হাতিয়ারে অনায়াসে পরাস্ত করে

---

৪ The Amrita Bazar Patrika, 18th July 1941

৫ 'কালিন্দী' নাটকের (১৩৮৫ সংস্করণ) নাট্যকার কৃত ভূমিকা দ্রষ্টব্য।

শুনে তার প্রতি একটা অন্ধ আকর্ষণ সে অনুভব করেছে: একবার কোন না কোন ছল-ছুতোয় তাকে চোখের দেখা দেখবার জন্যে তার মন ব্যাকুল হয়ে উঠেছে। মাঝখানে হঠাৎ ভবেন্দ্রের পরিচয়ে রাখালের আবির্ভাবে তার পরিকল্পনা ব্যর্থ হবার উপক্রম। তাই সন্দেহ দেখা দেওয়া মাত্রই খগেন তার পরিচয় অনুসন্ধানে সক্রিয় ভাবে লিপ্ত হয়েছে। 'সর্বস্ব খুইয়ে' নিছক 'মজা' করার জন্যে তার এই পণ্ডশ্রম নয়। আর কনক অভিনেত্রী হলেও নারী. সে সুরবালা এবং বৌরাণীর মর্মবেদনা অনুভব করেছিল। উভয়কে এই সঙ্কট থেকে সে রক্ষা করতে চেয়েছে: খগেনকে লেখা তার চিঠিতে সেই আর্তি স্পষ্ট।

অপ্রধান চরিত্রগুলির মধ্যে দেওয়ানজির. প্রভুর প্রতি আনুগত্য এবং হাবার মার কৌতুকবহ বাকভঙ্গি বেশ উপভোগ্য। বৌরাণীর স্বপ্নদর্শন ফ্রয়েডীয় মনস্তত্ত্বের অনুশীলন জাত। নাটকের সংলাপ গতিশীল।

॥ কালিন্দী ॥

স্বল্পকালের পথ পরিক্রমায় 'নাট্যনিকেতন' যে কয়েকটি চমকপ্রদ নাটক রঙ্গমঞ্চে উপস্থাপনা করে বাংলা নাট্যাভিনয়ের ইতিহাসে স্মরণীয় হয়ে আছে তন্মধ্যে তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের স্বরচিত উপন্যাসের নাট্যরূপ 'কালিন্দী' অন্যতম। ১৯৪১-র ১২ই জুলাই 'কালিন্দী' 'নাট্যনিকেতন' মঞ্চে প্রথম আত্মপ্রকাশ করে অভূতপূর্ব সাড়া ফেলে দিয়েছিল দর্শক মহলে। কিন্তু চূড়ান্ত সফল এই নাটকটি সে সময় মাত্র পঁচিশ রাত্রির বেশি অভিনীত হবার সুযোগ পায়নি। কারণ ১৯৪০ র গোড়া থেকেই 'নাট্যনিকেতনের' দুরবস্থার সূচনা হয়েছিল। তারপর '৪১ র শেষভাগে গিয়ে মামলা মোকদ্দমা সংক্রান্ত কারণে ঐ প্রতিষ্ঠান চিরকালের জন্যে লুপ্ত হয়ে যায়। পরবর্তীকালে 'স্টার' থিয়েটারের নাট্যকার ও পরিচালক শ্রীযুক্ত মহেন্দ্র গুপ্ত 'স্টার' থিয়েটারে নতুন করে 'কালিন্দী' অভিনয়ের বন্দোবস্ত করেন। তবে সে সময় অভিনয়ের প্রয়োজনে নাটকখানি আদ্যোপান্ত সংস্কার করে নেওয়া হয়। আমরা যথা সময়ে সে ইতিহাস আলোচনা করব। এখন 'নাট্যনিকেতনের' তৎকালীন ইতিহাস অনুসন্ধান করা যাক।

'নাট্যনিকেতন' মঞ্চে প্রথম অভিনয় রজনীতে যাঁরা অংশগ্রহণ করেছিলেন তাঁদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলেন : জমিদার রামেশ্বর চক্রবর্তীর ভূমিকায়—শৈলেন চৌধুরী. ইন্দ্র রায়—রবীন্দ্র মোহন রায়. অহীন্দ্র—ভূমেন রায়, অচিন্ত্য—নরেশ চন্দ্র মিত্র, মি. মুখার্জী—শম্ভু মিত্র. সুনীতি- নীহারবালা. উমা- রাধারানী; এ ছাড়াও রবী রায়. ছায়া দেবী এবং উমারাণী অন্য তিনটি ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়েছিলেন। 'নাট্যনিকেতনের' তৎকালীন প্রযোজক সুধীর চন্দ্র গুহের তত্ত্বাবধানে নাটকটি মঞ্চস্থ হয়েছিল। নাট্য পরিচালকের নাম সংবাদপত্রের পাতা ঘেঁটে উদ্ধার করা সম্ভব হয়নি। 'কালিন্দী' উচ্চাঙ্গের অভিনয়ের গুণে বিপুল জন সমর্থন আদায় করেছিল। 'অমৃতবাজার পত্রিকা' এ সম্পর্কে মন্তব্য করতে গিয়ে লিখেছে :

" We can boldly say that the theatre-goers will find something for recreation, realisation and amusement Mr Sudhir Chandra Guha the well-known producer is to be congratulated on the successful production of such a mighty play "[৪]

'নাট্যনিকেতনে' 'কালিন্দীর' অভূতপূর্ব সাফল্য, 'স্টার' কর্তৃপক্ষকে এই নাটকটি সম্পর্কে উৎসাহিত করেছিল। কিন্তু 'নাট্যনিকেতনের' বিলুপ্তির পূর্ব পর্যন্ত নাটকটি 'স্টারে' পুনরভিনয়ের কোন সম্ভাবনা ছিল না। তারও বেশ কিছু পরে 'স্টার' থিয়েটারের নাট্যকার পরিচালক শ্রীযুক্ত মহেন্দ্র গুপ্তের উৎসাহে নাট্যকার 'স্টারে' 'কালিন্দীর' পুনরভিনয়ে সম্মত হন। সেই সময় নাটকটির ত্রুটি-বিচ্যুতিগুলি আগাগোড়া যথাসম্ভব সংশোধন করে নেওয়া হয়। সংশোধন পরিমার্জনের কাজটি নাট্যকারের ইচ্ছানুসারে সমাধা করেন মহেন্দ্র গুপ্ত মহাশয়: তাকে আরও খানিকটা রদবদল করে নেন স্বয়ং নাট্যকার। এইভাবে বেশ কিছুটা পরিবর্তিত চেহারায় দ্বিতীয় বার রঙ্গমঞ্চে পাদপ্রদীপের আলোয় আত্মপ্রকাশ করে 'কালিন্দী'। পরে গ্রন্থাকারে প্রকাশের সময় শেষবারের জন্যে 'কালিন্দী' র অঙ্গরাগ সম্পন্ন হয়ে বর্তমানে সেটি আমাদের হাতে এসে পৌঁছেছে।[৫] নাট্য সমালোচনায় এই আধুনিক সংস্করণটিকে সামনে রেখেই আমরা অগ্রসর হব।

চমকপ্রদ আখ্যানভাগ 'কালিন্দী' নাটকের অন্যতম প্রধান আকর্ষণ। ভারত ইতিহাসের পটভূমিতে সংস্থাপন করে এই নাটকের অন্তর্নিহিত ভাব চৈতন্যকে অনুধাবন করতে হবে। তদানীন্তন ভারতবর্ষের আর্থ-সামাজিক প্রেক্ষাপট পরিবর্তনের ইতিবৃত্তের ওপরে এই নাটকের আখ্যানভাগ নির্মিত হয়েছে। ভারতবর্ষের সমাজ অর্থনীতির মৌলিক অবস্থান মূলতঃ কৃষি নির্ভর। এ দেশে ইংরেজ আগমন এবং দু' দুটি মহাযুদ্ধের কারণে ক্রমান্বয়ে কৃষি নির্ভর আর্থ সামাজিক প্রেক্ষাপট অপসারিত হয়ে নগরকেন্দ্রিক ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থা গড়ে উঠছিল। তার অবশ্যম্ভাবী তাড়নায় জনজীবন তার অভ্যস্ত বাতাবরণ থেকে ক্রমশঃ দূরবর্তী হয়ে পড়ছিল। অর্থাৎ ফিউডালইজমের অপসারণে ক্যাপিটালইজমের শক্ত বুনিয়াদ রচিত হচ্ছিল। পৃথিবীর সব দেশেই ক্যাপিটালইজম যখন প্রথম পদক্ষেপ রাখে তখন তাকে নতজানু হয়েই আসতে হয়. পরে বণিকের মানদণ্ড ক্রমে রূপান্তরিত হয় রাজদণ্ডে। এ দেশেও তার কোন ব্যতিক্রম হয়নি। আরও দুর্ভাগ্যের বিষয়, ফিউডাল সমাজের অন্তর্বিরোধের সূত্রেই ক্যাপিটালইজমের প্রতিষ্ঠা। ক্রমে তার স্বরূপ উন্মোচিত হলে ফিউডাল সমাজের ভেতর থেকেই সম্মিলিত প্রতিরোধ উঠে আসে আত্মরক্ষার তাগিদে। কিন্তু ক্যাপিটালইজম উন্নত যন্ত্রসভ্যতার হাতিয়ারে অনায়াসে পরাস্ত করে

---

৪ The Amrita Bazar Patrika, 18th July, 1941

৫ 'কালিন্দী' নাটকের (১৩৮৫ সংস্করণ) নাট্যকার কৃত ভূমিকা দ্রষ্টব্য।

ফিউডাল ব্যবস্থাকে। ক্যাপিটালইজম বনাম ফিউডালইজমের এই দ্বন্দ্বে বিসর্জন দিতে হয় অনেক তাজা প্রাণ। এই তত্ত্বের ওপরে 'কালিন্দী' নাটকের প্রতিষ্ঠা। এই তত্ত্বই রবীন্দ্রনাথের 'মুক্তধারা' নাটকে একটু ভিন্নভাবে প্রতিষ্ঠা লাভ করেছে।

'কালিন্দী' নাটকে মি মুখার্জী ক্যাপিটালিস্ট সমাজের প্রতিনিধি: কৃষির অনুকূল জমিতে তার যন্ত্রদানবের প্রতিষ্ঠা - কৃষিজীবি সাঁওতাল সমাজ তার কলের শ্রমিকে পরিণত। ইন্দ্র রায় এবং রামেশ্বর চক্রবর্তী ফিউডাল সমাজের প্রতিনিধি। প্রতিদ্বন্দ্বী রামেশ্বরকে জব্দ করতে ইন্দ্র রায় ছাড়পত্র দিয়েছেন মিঃ মুখার্জীকে। রাধারাণীকে কেন্দ্র করে উভয়ের অন্তর্কলহ সুযোগ করে দিয়েছে মিঃ মুখার্জীকে। তার চরম মাশুল গুনতে হয়েছে দুটি পরিবারকে। অহীনের মাতা সুনীতি তার বাস্তব বুদ্ধির নিরিখে এবং অহীন আধুনিক শিক্ষার কল্যাণে বুঝেছিল ক্যাপিটালইজমকে রুখতে হলে ফিউডাল সমাজের মতানৈক্য অবিলম্বে দূর করা প্রয়োজন। বরফ যেমন বাইরের চাপে জমাট বাঁধে তেমনি বিলম্বে হলেও প্রধানত অবস্থার চাপে ইন্দ্র রায় এবং রামেশ্বরও এ সত্য উপলব্ধি করেছেন এক সময়। তাই অহীন ও উমার বিবাহের মধ্যে দিয়ে দীর্ঘ বিরোধের মীমাংসার পথ খুঁজে নিতে হয়েছে তাদের। কিন্তু ততদিনে ক্যাপিটালইজম নিজেকে শক্ত ভিত্তির ওপরে প্রতিষ্ঠা করে ফেলেছে খুব সহজে। তার উদ্ধত হাত কুমারী নারীর লজ্জা হরণ, যৌবন হরণ পর্যন্ত প্রসারিত। এ নাটকে কমল, ডগরু, সারী সকলেই তাদের সরল গ্রাম্যতা নিয়ে যন্ত্রবাদী সভ্যতার সঙ্কটে বিপন্ন হয়ে অবশেষে মুখোমুখি সংঘর্ষের জন্যে প্রস্তুত। রাধারাণীর অন্তর্ধানে একদিন যে বিচ্ছেদের সূচনা হয়েছিল, এই ভাবে তা আবার সঙ্ঘবদ্ধ হয়ে উঠবার প্রয়াস পেয়েছে। রাধারাণীর হারিয়ে যাওয়া কঙ্কন প্রত্যাবর্তনে নাট্যকার তারই ইঙ্গিত দিয়েছেন। এ কঙ্কন অলংকার মাত্র নয়, বিপন্ন অস্তিত্ব মানুষের সংঘবদ্ধ লড়াইয়ে অন্তিম প্রস্তুতির তাত্ত্বিক অভিব্যঞ্জনায় মূর্ত কঙ্কনের প্রত্যাবর্তন।

'কালিন্দী' নাটকের আখ্যানভাগ সম্পর্কে অমৃতবাজার পত্রিকার অভিমত :

"The story is wonderful both in conception and execution Characters are conspicuous, free and living in flesh and blood Situations are mervellous and the fine dialogue and the refine taste of the Author have made the play a charming piece, which we are quite sure will attract both the mass and class audience of Bengal "[৬]

'কালিন্দী' এ নাটকে নিছক নদী মাত্র নয়—রায়হাটের দীর্ঘ ভাঙ্গা গড়ার প্রধান কারিগর সে। নির্বাক কিন্তু জীবন্ত চরিত্র এই কালিন্দী। তারই বুকে এক একটি ঘটনার সূত্রে রায়হাটের চলমান জীবন-চক্রের বারংবার বাঁক পরিবর্তন। রাধারাণীর রহস্যজনক

The Amrita Bazar Patrika, 18th July, 1941

অন্তর্ধান, দুই রায়বাড়ির বিরোধ, মুখার্জীর অভ্যুত্থান, সারীর নারীত্বের অপমান, সাঁওতাল বিদ্রোহের সূচনা, রাধারাণীর হৃত কঙ্কন উদ্ধার, রামেশ্বরের কল্পিত রোগারোগ্য—সমস্ত কিছুরই লীলা-ভূমি ঐ 'কালিন্দীর চর'—সমস্ত কিছুরই নিয়ন্ত্রক তথা সংঘটক ঐ 'কালিন্দী'।

প্রায় প্রতিটি চরিত্রই নিজস্ব স্বকীয়তায় এ নাটকে উজ্জ্বল। নাটকের সংলাপ এক কথায় চমৎকার: বিশেষ করে আঞ্চলিক ভাষা প্রয়োগে, সাঁওতাল সম্প্রদায়ের বাকভঙ্গির গুণে চরিত্রগুলি জীবন্ত হয়ে উঠেছে। নাটকের সংগীত, কাহিনী পরিস্থিতির অনুসারী। তবে হত্যা ও মৃত্যুর একটু যেন আধিক্য চোখে পড়ে। রামেশ্বরের স্ত্রী ও শিশুপুত্রকে হত্যার প্রসঙ্গটি না থাকলেই ভাল হত।

॥ রামের সুমতি ॥

যামিনী মিত্রের পর অভিনেতা শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় যখন 'রঙমহলের' দায়িত্ব গ্রহণ করেন, তখন পরিস্থিতি মোটেই অনুকূল ছিল না। তবু তাঁর সুযোগ্য নেতৃত্বে পরবর্তী বেশ কয়েকটি বছর তিনি 'রঙমহলের' প্রযোজনায় যথেষ্ট গতি সঞ্চার করেন। এই সময় মৌলিক নাটকের পাশাপাশি কিছু পরিমাণে নাট্য রূপায়িত উপন্যাসও 'রঙমহলে' অভিনীত হয়েছে এবং যথেষ্ট সাফল্য লাভ করেছে। তন্মধ্যে দেবনারায়ণ গুপ্তের 'রামের সুমতি' অন্যতম। বাংলা নাট্য জগতে প্রধানত উপন্যাসের নাট্যরূপদানে দেবনারায়ণ গুপ্তের কৃতিত্ব সর্বজন বিদিত। অমর কথাশিল্পী শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের জনপ্রিয় গল্প উপন্যাসগুলিকে তিনি মঞ্চ প্রয়োগে জীবন্ত করে তুলেছেন সন্দেহ নেই। আলোচ্য সময় সীমার মধ্যে তাঁর প্রথম সার্থক প্রয়াস 'রামের সুমতি' 'রঙমহল' মঞ্চে ১৯৪৪ র ২২শে জুন, রথযাত্রার দিন প্রথম আত্মপ্রকাশ করে। আমেরিকা প্রত্যাগত সতু সেনের সুযোগ্য পরিচালনায় 'রামের সুমতি' পূর্ণ প্রেক্ষাগৃহে তার দীর্ঘ রাত্রি অতিবাহিত করে। এই সাফল্যের পশ্চাতে সুরশিল্পী তারা ভট্টাচার্য এবং মঞ্চশিল্পী বৈদ্যনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের অবদানও অনেকখানি। প্রথম অভিনয় রজনীতে উল্লেখযোগ্য চরিত্রে রূপদান করেন : শ্যামলাল—জহর গাঙ্গুলী, রামলাল—বুদ্ধদেব মিশ্র, ডাঃ নীলমণি সরকার—সন্তোষ সিংহ, গোবিন্দ—সনৎ মুখোপাধ্যায়, ভোলা—তুলসী চক্রবর্তী, রাখহরি—সন্তোষ দাস, ভূতো—বিজয় কার্তিক দাস এবং হরিহরের ভূমিকায় স্বনামধন্য হরিধন মুখোপাধ্যায়। স্ত্রী চরিত্রে অবতীর্ণ হয়েছিলেন : নারায়ণী—সুহাসিনী, দিগম্বরী—বেলারাণী, সুরধুনী—রমা ব্যানার্জী এবং নেত্যকালীর ভূমিকায় রাধারাণী দেবী। এ ছাড়াও অপ্রধান চরিত্রে কমল দত্ত, রামকৃষ্ণ সরকার, লক্ষ্মী বন্দ্যোপাধ্যায়, তুলসী পাল, সত্যেন সর্বাধিকারী এবং বিশ্বনাথ সোমের নাম অভিনেতৃ তালিকায় পাওয়া যাচ্ছে।

শরৎচন্দ্রের গল্পে, পুত্রতুল্য দেবর রামলালের প্রতি ভ্রাতৃজায়া নারায়ণীর অকৃত্রিম বাৎসল্য, দিগম্বরীর স্বার্থচিন্তা প্রসূত বিতৃষ্ণার সংঘাতে বিভ্রান্ত—বিপর্যস্ত। এই বিপর্যয়,

সাংসারিক জটিলতায় যখন উভয়ের মধ্যে ক্রমাগত ব্যবধান রচনা করে চলেছে, তখন বৌদির অন্তর মথিত স্নেহের কাছে রামলালের নিঃশর্ত আত্মসমর্পণে কাহিনী-বৃত্ত সম্পূর্ণ হয়েছে। নাটকের প্রয়োজনে নাট্যকার মূল কথাবস্তুর কিঞ্চিৎ পরিবর্তন করে নিয়েছেন এবং তাতে কাহিনী রসে কিছুটা ঘাটতি পড়েছে বলেই মনে হয়। শরৎচন্দ্রের কাহিনীর সেই সাবলীল গতি, সেই চমকপ্রদ আকর্ষণ এ নাটকে অনেকটাই যেন ধীর-মন্থর।[৭] এই মন্থরতার সম্ভাব্য কারণ প্রধানতঃ দুটি দিক দিয়ে বিচার্য: প্রথমতঃ কেন্দ্রীয় চরিত্র রামলালের প্রতি নাট্যকারের সতর্কতার অভাব এবং দ্বিতীয়তঃ সুরধুনি চরিত্রটিকে অকারণ প্রাধান্য দান।

শরৎচন্দ্রের স্নেহ কাঙাল, চঞ্চল প্রকৃতির বালক- রামলাল এ নাটকে তার স্বধর্ম থেকে অনেকখানি বিচ্যুত। এ যেন অনেক পরিণত: বয়ঃভারে ভারাক্রান্ত বিচক্ষণ ব্যক্তির ন্যায় তার দামালপনাও তুলনায় অনেক সংযত। এইখানেই চরিত্রটির সর্বাপেক্ষা বড় অসঙ্গতি। বৌদির জ্বর না সারার জন্যে নীলমণি ডাক্তারকে সে শাসিয়ে আসে কিন্তু সাঁতরাদের শশাগাছ কাটার জন্যে বৌদির স্নেহের শাসনের সম্মুখে তার প্রতিক্রিয়ায় একটু যেন জড়তা, বালক সুলভ চাপল্যের একটু যেন অভাব লক্ষ্যণীয় হয়ে ওঠে: দাদার সঙ্গে একাসনে আহারে তার সঙ্কোচ অথচ নিজে হাতে খাইয়ে দেবার জন্যে সে বৌদির কাছে অবুঝ বায়না করতে পারে না। বড় সাধের অশ্বত্থ গাছটিকে শুধুমাত্র কলহের তাগিদে দিগম্বরীর উৎপাটনের বিরুদ্ধে তার ক্ষোভ দুঃখ, বেদনা অকৃত্রিম আক্রোশে ফেটে পড়তে পারে না: এমনকি দিগম্বরীর পিতৃশ্রাদ্ধের প্রয়োজনে সদ্যমৃত প্রাণাধিক গণেশের অকাল প্রয়াণে তার বুকফাটা আকুতিও এখানে অনুপস্থিত। শরৎচন্দ্রের রামলাল পরিণতি বিচার বোধহীন অবুঝ বালক--কৈশোরের সীমারেখার মধ্যেই তার অবস্থান: আর আধুনিক নাট্যকার সৃষ্ট রামলাল সেই সীমারেখাকে অনেকখানি অতিক্রম করে গেছে।

শরৎচন্দ্রের গল্পে সুরধুনি নিতান্তই গৌণ চরিত্র কিন্তু এ নাটকে সে বয়ঃসন্ধির নায়িকা--নাট্যকারের নিজস্ব সৃষ্টি। সম্ভবত পরিণতির কথা স্মরণে রেখেই নাট্যকার এই চরিত্রটির প্রতি এতখানি গুরুত্ব আরোপ করেছেন। রামলালের দুরন্ত প্রকৃতি এবং জননী দিগম্বরীর তার প্রতি অকারণ বিদ্বেষ সুরধুনির চিত্তে রামলাল সম্পর্কে গোপন সহানুভূতির সঞ্চার করেছে। ক্রমে নিকট সান্নিধ্য হেতু, সহানুভূতি রূপান্তরিত হয়েছে বয়ঃসন্ধির

---

[৭] অনেকে মনে করেন, "দেবনারায়ণ বাবু শরৎচন্দ্রের প্রতি সুগভীর শ্রদ্ধা লইয়াই তাঁহার উপন্যাসগুলি নাটকে রূপায়িত করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। সেজন্য তাঁহার নাট্যরূপগুলির মধ্যে শরৎচন্দ্রের মূল কাহিনী ধারা ও চরিত্ররূপ কোথাও বিন্দুমাত্র ক্ষুণ্ণ হয় নাই" (বাংলা নাটকের ইতিহাস, পৃঃ ৬০৬ – ড অজিত কুমার ঘোষ)। এই অভিমত সর্বাংশে সত্য নয়।

নায়িকার গভীর প্রণয় তৃষ্ণায়। কিন্তু রামলালের পক্ষে নারী হৃদয়ের এই দুর্বোধ্য ভাষার পাঠোদ্ধার কখনই সম্ভব ছিল না। তার স্নেহ বুভুক্ষু চিত্ত বৌদির স্নেহাঞ্চলে এতটাই নিরাপদ এবং পরিতৃপ্ত ছিল যে, তার বাইরে দৃষ্টি দেবার কোন প্রয়োজন তার হয়নি। অথচ তার পক্ষে নাটকের উপান্তে পৌঁছে কেমন করে সুরধুনির কাছে আত্মসমর্পণ সম্ভব হল—তার কোন সদুত্তর পাওয়া শক্ত। রামলালের আত্মসমর্পণ আসলে জননী-সদৃশ বৌদির সুগভীর বাৎসল্যের কাছে। সংসারের জটিল আবর্তে, দিগম্বরীর অবিরাম প্ররোচনায় তার তেরো বছরের সর্বাপেক্ষা নিরাপদ আশ্রয়টি সে যখন হারাতে বসেছিল তখন সেই আশ্রয়টুকু ফিরে পাবার তাগিদেই সে দিগম্বরীর সঙ্গে সহাবস্থানে সম্মত হয়েছে। সংসারের দুর্বিপাকে বিপরীত অবস্থার সঙ্গে সমঝোতাই তার 'সুমতি'। আর এ নাটকে সুরধুনির কাছে তার সলজ্জ আত্মসমর্পণ তার চরিত্র বিন্যাসের মৌল নীতিকেই লঙ্ঘন করেছে। আরও আশ্চর্যের বিষয়, চির বিরুদ্ধ দিগম্বরীর চোখে লেখাপড়া না জানা গোঁয়ার রামলালের সুরধুনির যোগ্য পাত্র রূপে উত্তরণ! স্বার্থমগ্ন বাস্তবতাবোধই তার একমাত্র হেতু।

নারায়ণী অকৃত্রিম বাৎসল্যের প্রতিমূর্তি। রামলালের প্রতি তার অনুকম্পা কর্তব্যের অনুরোধে নয়, তার হৃদয় মথিত সন্তান-বাৎসল্যই তাকে জননীর আসনে প্রতিষ্ঠিত করেছে। তার সংসার যাপনের বাঁধা রাস্তায় জননী দিগম্বরীর আকস্মিক প্রাদুর্ভাব গভীর সংকটের সৃষ্টি করেছে। সংসার নির্বাহের বাঁধা ছকে হঠাৎ উদ্ভূত স্নেহ এবং কর্তব্যের দ্বিধা দ্বন্দ্ব নাট্যকার চমৎকার অঙ্কিত করেছেন এই চরিত্রটিতে। দিগম্বরীর স্বার্থবুদ্ধি সম্পন্ন কূট কৌশলী চরিত্রায়নও নিঃসন্দেহে সার্থক। কলহ পরায়ণা এই নারী একটির পর একটি নিপুণ পদক্ষেপে রামলাল নামক অবাঞ্ছিত কণ্টকটিকে সমূলে উৎপাটনের ব্যবস্থা করেছিলেন। কিন্তু স্বয়ং সুরধুনি যখন তাকে নির্বাচন করে তাঁর সদিচ্ছার পথে অন্তরায় হয়ে দাঁড়ালো তিনিও ততোধিক ক্ষিপ্রতার সঙ্গে তাঁর মত পরিবর্তনে দ্বিধা করলেন না। অপ্রধান চরিত্রগুলিও যথাসম্ভব স্বকীয়তা নিয়ে এ নাটকে বিদ্যমান।

মোট পাঁচটি পর্বে বিভক্ত শরৎচন্দ্রের কাহিনীকে নাট্যকার তিনটি অঙ্কে সর্বমোট বারোটি দৃশ্যে বিন্যস্ত করেছেন। তবে অঙ্ক ও দৃশ্য বিভাজনে পারস্পরিক সঙ্গতির অভাব কোথাও কোথাও স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। একটি দৃশ্যের সঙ্গে পরবর্তী দৃশ্যের নিগূঢ় যোগাযোগের অভাবে অনেক সময়েই কাহিনীর গতি রুদ্ধ হয়ে পড়েছে। উপন্যাস বা বড় গল্পকে নাট্যরূপ দানের ক্ষেত্রে এই সমস্যাটিই সর্বাপেক্ষা বড় বাধা সন্দেহ নেই। তবু মোটের ওপর দেবনারায়ণ গুপ্তের 'রামের সুমতি' তার নিজস্ব প্রকাশ ভঙ্গিতে এবং অভিনেতৃবর্গের দক্ষতায় 'রঙমহলের' প্রেক্ষাপট বেশ কিছুকাল আলোকিত করে রেখেছে। এই নাটকের অন্যতম আকর্ষণ এর সুমধুর সঙ্গীত এবং যথাযোগ্য পরিস্থিতিতে তাদের সংযোজনা। সংলাপের ভাষা শরৎচন্দ্রের অনুসারী হলেও কোথাও কোথাও - বিশেষ করে দিগম্বরী ও রামলালের পরস্পর বাক্য বিনিময় অনেকাংশে গ্রাম্যতা দোষে দুষ্ট।

॥ বিন্দুর ছেলে ॥

দেবনারায়ণ গুপ্তের 'বিন্দুর ছেলে' 'শ্রীরঙ্গম' মঞ্চে তার আনুষ্ঠানিক যাত্রা শুরু করে ১৯৪৪র ২০শে ডিসেম্বর। নাট্যাচার্য শিশির কুমারের প্রধানত একক প্রচেষ্টায় নিতাই ভট্টাচার্যের 'মাইকেল' নাটকে প্রভূত সাফল্যের পর স্বাস্থ্যের কারণে মহাত্মা শিশির কুমার বেশ কিছুদিন নাট্য প্রযোজনায় সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করতে পারেননি। এর পরে ১৯৪৪-এ পরপর দুটি লঘুনাট্যের অভিনয় 'শ্রীরঙ্গম' মঞ্চে বিশেষ সফল হয়নি। অন্যদিকে অল্প কিছুদিন পূর্বে 'রঙমহল' থিয়েটারে দেবনারায়ণ গুপ্তের 'রামের সুমতি' নাট্যরূপের অভিনয় সাফল্য 'শ্রীরঙ্গমের' দৃষ্টি আকর্ষণ করে। তখন স্বভাবতঃই শরৎচন্দ্রের জন সম্মোহনী কাহিনীর প্রতি 'শ্রীরঙ্গম' কর্তৃপক্ষের আগ্রহ সঞ্চারিত হয়। এই পরিস্থিতিতে নাট্যাচার্য শিশিরকুমারের প্রযোজনায় 'শ্রীরঙ্গম' মঞ্চে আত্মপ্রকাশ করে নাট্য রূপায়িত 'বিন্দুর ছেলে'। বহু পরিশ্রমে এবং অধ্যাবসায়ে শরৎচন্দ্রের 'বিন্দুর ছেলে' পাদ প্রদীপের আলোয় আরও উজ্জ্বল হয়ে ওঠে প্রধানত শিশিরকুমার ভাদুড়ীর প্রচেষ্টায়। মঞ্চরচনা ও সুর সংযোগে তাঁকে সাহায্য করেন যথাক্রমে শ্রীপ্রভাত চট্টোপাধ্যায় (বাদলবাবু) এবং রতন দা ও রতন সেনগুপ্ত। প্রথম অভিনয় রজনীতে অংশগ্রহণ করে যাঁরা এই নাটকে স্মরণীয় হয়ে আছেন তাঁদের নামের তালিকা এখানে পেশ করা যেতে পারে ঃ যাদব - মনোরঞ্জন ভট্টাচার্য, মাধব - কালীপদ সরকার (এ্যাঃ), প্রিয়নাথ - প্রবোধ দত্ত (পরে পুরু মল্লিক ও গণেশ শর্মা), অমূল্য (শিশু)--- শ্রীমান সৌরীন্দ্র মুখোপাধ্যায়, অমূল্য (কিশোর) - কুমারী কেতকী, নরেন - বিমল দে, ভৈরব--- মণি শ্রীমাণি, কৈলাস - নকুল দত্ত, মাস্টার--- ভোলা শীল, এবং টহলদার - রতন সেন; স্ত্রী ভূমিকায় ঃ অন্নপূর্ণা---প্রভা, বিন্দু---সাবিত্রী, এলোকেশী - নিভাননী, বিন্দুর মা---নমিতা, বিন্দুর পিসি - লীলাবতী, কদম---গোপালী, বামুনঠাকুরণ - আশা এবং ভিখারিণী - রাধারাণী (রেডিও)।

দেবনারায়ণ গুপ্ত এই নাট্যরূপটিতে তিনটি অঙ্কে সর্বমোট নয়টি দৃশ্যে সমগ্র কাহিনীকে বিন্যস্ত করে নিয়েছেন। তার মধ্যে প্রথম অঙ্কে কোন দৃশ্য বিভাগ নেই, দ্বিতীয় অঙ্কে চারটি এবং তৃতীয় অঙ্কে মোট পাঁচটি দৃশ্যের পরিকল্পনা করা হয়েছে। অঙ্ক ও দৃশ্য বিভাগের এই সুপরিকল্পিত বিন্যাস, ঘটনাধারার বাঁক পরিবর্তনের ইঙ্গিতবাহী। প্রথম অঙ্কের বিস্তার পুত্র নরেন্দ্র সহ এলোকেশির রঙ্গভূমিতে অনুপ্রবেশের পূর্ব পর্যন্ত। নরেন্দ্র ও এলোকেশির হঠাৎ আবির্ভাবে এই যৌথ পরিবারটিতে যে নিদারুণ বিপর্যয়ের সূচনা, দুই জায়ের তীব্র বাদানুবাদ জনিত কারণে বিন্দুর স্বামীসহ নবনির্মিত ভবনে বাসা পরিবর্তনে তার চূড়ান্ত পরিণতি। দ্বিতীয় অঙ্কের সীমারেখা এই পর্যন্তই। তৃতীয় অঙ্কে কাহিনীর গতি নিম্নমুখী---অমূল্যের জন্যে বিন্দুর তীব্র বেদনাবোধ, শারীরিক অসুস্থতা এবং পরিশেষে পিতৃগৃহে আবার সামগ্রিক পুনর্মিলনে কাহিনীবৃত্ত সম্পূর্ণ।

যাদব ও মাধবের যৌথ পরিবারে গৃহকর্ত্রী অন্নপূর্ণা . অন্নপূর্ণার মতই তিনি এই সুখের সংসারটিকে আগলে রেখেছেন। ছোট জা বিন্দুবাসিনীর ক্রোড়ে আপন পুত্র অমূল্যকে সমর্পণ করে তিনি পরম নিশ্চিন্ত। বিন্দুর কারণে অকারণে ক্রোধ, বিরক্তি, ক্ষোভ তিনি ছোট বোনের মতই অনায়াসে ক্ষমা করে দেন। নিজের স্বামী নয়, যাদবের জ্ঞাতি ভ্রাতা মাধবের উপার্জিত অর্থেই যে তাদের গ্রাসাচ্ছেদন চলে . এই দীনতাও তাকে বিন্দুমাত্র পীড়িত করে না। এই দৈন্যবোধ অনুপস্থিত যাদবের মধ্যেও; বরং জগদ্ধাত্রী প্রতিমা বিন্দুকে তিনি স্বয়ং নির্বাচিত করে এনেছেন গৃহবধূরূপে . এই আত্মতৃপ্তির নিত্য রোমন্থনে তার অনুদ্বিগ্ন দিন গুজরান। ভাসুরের প্রতি বিন্দুর ভক্তি অচলা, সেইসঙ্গে নির্ভরতাও। বড় জায়ের সন্তান অমূল্যকে বুকে করে সে তার স্বর্গ রচনা করে নিয়েছিল। তার যাবতীয় ক্ষোভ দুঃখ ক্রোধের একমাত্র উৎসমূল অমূল্যের প্রতি অন্ধ মমতাবশতঃ অমঙ্গল আশঙ্কাকে কেন্দ্র করে। স্নেহ যেখানে যত বেশি সেখানে তা তত বেশি অন্ধ, আর অনুমিত আশঙ্কাও সেখানে প্রবল থেকে প্রবলতর। জগতের কাছে হতে পারে তা অতিরঞ্জিত কিন্তু জননীর স্নেহ সে বিচারের অপেক্ষা রাখেনা। এমন কি অমূল্যর মঙ্গল চিন্তা তার থেকেও যে কেউ বেশি করতে পারে এই নীরেট সত্যটুকুও সে মানতে রাজি নয়। কারণ গর্ভজাত সন্তান না হলেও তার হৃদয় নিঃসারিত পুত্র বাৎসল্যে কোথাও কোন খাদ ছিল না। মান অভিমানে, আদরে অভিযোগে এই পরিবারটি তার দিনযাত্রা অতিবাহিত করছিল নিরুদ্বিগ্নে। হঠাৎ সেখানে পুত্র নরেন্দ্র সহ এলোকেশির আবির্ভাবে ঘনিয়ে উঠেছে সংশয়। এইখানেই নাটকের প্রথম অঙ্কের সমাপ্তি।

অমূল্যর জন্যে বিন্দুবাসিনীর অতি-ব্যস্ততার মধ্যে এই নাটকের সংঘাতের বীজ লুকিয়ে আছে। দ্বিতীয় অঙ্কে পৌছে তা ক্রমশঃ দানা বেঁধে উঠেছে। সন্তান-বঞ্চিতা এই নারী বড় জায়ের সন্তানকে অঙ্গজ জ্ঞান করে সংসারের সমস্ত ঘাত প্রতিঘাত থেকে তাকে আড়াল করে রাখতে চেয়েছিল। তার সদা শঙ্কিত পুত্র ভাবনায় অতর্কিতে আঘাত এসে পড়ল এলোকেশি এবং নরেন্দ্রের আগমনে। নরেন্দ্রের শিক্ষার প্রতি অমনোযোগ, বয়সের তুলনায় জ্যাঠামী, রুচিবোধের অভাব, আচার-আচরণে অকালপক্কতা পাছে অমূল্যকেও সংক্রামিত করে - এই আশঙ্কাতেই বিন্দু নরেন্দ্রর প্রতি বিরূপ। আর এলোকেশির সন্তানের ত্রুটি গোপনের হাস্যকর চেষ্টার বিরুদ্ধে বিন্দু নির্মম-নির্দয়। অথচ প্রতিকারের উপায় তার হাতে ছিল না, ছিল বড়জা র হাতে। কিন্তু সংসারে ভাল ও মন্দের সংমিশ্রণে মানিয়ে চলার সহজাত অভ্যাসে অন্নপূর্ণা সে চেষ্টায় বিরত রইলেন। বিশেষতঃ তিনি শুধু অমূল্যের জননী নন, তদপেক্ষা অধিক সংসারের কর্ত্রী-- শুধু অমূল্যের কথা ভাবলেই তার চলে না, ভাবতে হয় সংসারের সমগ্র ভাবনাটি। উভয়ের ভিন্ন বিচারবোধ থেকে উভয়ের মধ্যে সংঘাত এবং ক্রমে বিচ্ছেদ। এইখানেই নাটকের climax বা চূড়ান্ত মুহূর্ত- আর দ্বিতীয় অঙ্কের সমাপ্তি এই climax-এ এসে।

এরপর কাহিনীর গতি নিম্নমুখী: ত্রিভুজাকৃতি কাহিনীর বিবর্তনে তৃতীয় অঙ্কের সূচনা এই পর্বে এসে। মানুষ যাকে সর্বাধিক ভালোবাসে, সংসারের যে কোন ক্ষেত্র থেকে যে কোন আঘাত এসে পড়লে, সে তার প্রিয়জনের ওপরেই অভিমান করে বসে। কেননা যেখানে জোর, কেবল সেখানেই অভিমান করা চলে। অন্নপূর্ণার বিরুদ্ধে সোচ্চার হতে গিয়ে বিন্দু তার অমূল্যকেই উপেক্ষা করে বসল। অথচ অমূল্যর জন্যে তার ব্যাকুল প্রতীক্ষার অন্ত নেই। তার ওপরে বিন্দু এতকাল আঘাত করতেই অভ্যস্ত ছিল; তার বিরুদ্ধেও যে কখনো প্রতিবাদ তীব্র হয়ে উঠতে পারে, এ বোধই তার তৈরি হয়নি। তাই অন্তর্দাহের নিষ্ফল অভিমানে সে কেবল শত যোজন ব্যবধান রচনা করেছে। অন্নপূর্ণা এতদিন নিঃশব্দে বিন্দুর সব গঞ্জনা সয়ে এসেছেন। কিন্তু আজ যখন বিন্দুর আক্রমণ তাকেও অতিক্রম করে যাদবকে স্পর্শ করে বসল... যখন প্রকারান্তরে যাদবের অক্ষমতার বিরুদ্ধে বিন্দুর বাক্যবাণ শাণিত হয়ে উঠল, তখন অন্নপূর্ণা আর সইতে পারলেন না। তার অনিবার্য ফলশ্রুতি উভয়ের মানসিক পীড়ন, বিন্দুর শারীরিক অবনতি এবং পিতৃগৃহে প্রত্যাবর্তন। পরিশেষে সংসারের বিচারে অপদার্থ যাদব পুনরায় তার বিসর্জিত প্রতিমাকে স্বস্থানে সংস্থাপন করে সাম্য প্রতিষ্ঠা করলেন।

এই নাটকে সংগীতের গুরুত্ব অনেকখানি। দ্বিতীয় অঙ্কের দ্বিতীয় এবং তৃতীয় দৃশ্যে ভিখারিণীর কণ্ঠে দুটি এবং তৃতীয় অঙ্কের পঞ্চম দৃশ্যে টহলদারের কণ্ঠে একটি--মোট এই তিনটি সংগীত এই নাটকে সংযুক্ত হয়েছে। তিনটি সংগীতেই বিন্দুর ভাব জগতের তিনটি অবস্থানকে তাত্ত্বিক ব্যঞ্জনা দানের প্রচেষ্টা আছে। দ্বিতীয় অঙ্কের দ্বিতীয় দৃশ্যে জনৈক ভিখারিণীর কণ্ঠে প্রখ্যাত বৈষ্ণব পদটি যেন স্নেহ ব্যাকুল বিন্দুবাসিনীর মর্মকথা : 'আমার শপতি লাগে' পদটিতে বৈষ্ণব কবি, শিশুকৃষ্ণের গোষ্ঠ যাত্রায় উদ্বিগ্ন জননী যশোদার উৎকণ্ঠাকে শাশ্বত রূপ দিয়েছেন। সংসার গোষ্ঠের বিস্তৃত প্রাঙ্গণে অমূল্যকে ঘিরে জননী বিন্দুরও উৎকণ্ঠার শেষ নেই! জননী যশোদার মতই সংসারের বহু প্রতিকূলতায় বিন্দুও বড় অসহায় --তার স্নেহের নিধিকে ঘিরে তাই তার দুর্ভাবনা প্রতি নিয়ত। দ্বিতীয় অঙ্কের তৃতীয় দৃশ্যে ভিখারিণীর কণ্ঠ নিঃসৃত অপর সংগীতটি স্নেহান্ধ বিন্দুর সম্ভাব্য যন্ত্রণা প্রাপ্তির পূর্ব ঘোষণা। তৃতীয় অঙ্কের পঞ্চম দৃশ্যে আসন্ন প্রভাতের আগমনী গান ধ্বনিত হয়েছে টহলদারের কণ্ঠে। রোগ শয্যায় শায়িত বিন্দুর জীবনেও কালরাত্রির অবসানে নতুন প্রভাত সমাগত দীর্ঘ বিচ্ছেদ বেদনার পথ পরিক্রমা শেষে সে পুনর্মিলনের নবতম আনন্দে উদ্ভাসিত।

এই নাটকে সংলাপ রচনায় নাট্যকার যথেষ্ট মুন্সিয়ানা দেখিয়েছেন। নাটকের সীমিত পরিসরে মূল কাহিনীও কোনভাবে খণ্ডিত হয়নি।

॥ সন্তান ॥

আকাশবাণী কলকাতা কেন্দ্রের প্রাণপুরুষ বাণী কুমারের বৃহদায়তন নাট্য রূপায়িত উপন্যাস 'সন্তান' 'রঙমহল' থিয়েটারে প্রথম অভিনীত হয় ১৯৪৫ র ১৮ই জানুয়ারী। সাহিত্য সম্রাট বঙ্কিমচন্দ্রের প্রেরণাদায়ক উপন্যাস 'আনন্দমঠ' এর নাট্যরূপ 'সন্তান'। 'রঙমহলের' স্বত্বাধিকারী শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের প্রযোজনায় এবং নটসূর্য অহীন্দ্র চৌধুরীর নির্দেশনায় বৃহৎ কলেবর 'সন্তান' রঙ্গমঞ্চে আত্মপ্রকাশ করে। প্রথম অভিনয় রজনীর অংশগ্রহণকারী রূপশিল্পীরা হলেন ঃ সত্যানন্দ--অহীন্দ্র চৌধুরী: জীবানন্দ-- অমল ব্যানার্জী: ভবানন্দ মিহির ভট্টাচার্য: মহেন্দ্র শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়: সদানন্দ মৃণালকান্তি ঘোষ: নবীনানন্দ –শান্তি গুপ্তা: এবং কল্যাণী--সুহাসিনী। সংগীতে সুরারোপ করেন প্রখ্যাত সংগীত শিল্পী শ্রীযুক্ত পঙ্কজ কুমার মল্লিক। পঙ্কজ কুমার মল্লিকের সুরে 'বন্দেমাতরম' গানটি গেয়েছেন মৃণালকান্তি ঘোষ।

স্ফীত কলেবরের মতই দীর্ঘ এই নাটকের মঞ্চাভিনয়ের ইতিবৃত্ত। নাট্যকার বাণীকুমার বন্ধু অশোকনাথ শাস্ত্রী সহ নাট্যাচার্য শিশিরকুমার ভাদুড়ির সঙ্গে 'সন্তান' অভিনয়ের উদ্দেশ্যে সাক্ষাৎ করেন ১৯৪৪র জানুয়ারীতে। নাট্যাচার্য নাটকটি মঞ্চস্থ করতে সেইসময় সম্মত হন। কিন্তু অভিনয়ে সরকারের অনুমতির প্রশ্ন দেখা দেওয়ায় তখনকার মত অভিনয় স্থগিত থাকে। অনেক তদ্বির তদারকির পর ১৯৪৪ র ৪ঠা জুলাই সরকারের অমুমতি পত্র এসে পৌঁছায়। নাট্যকারের সনির্বন্ধ অনুরোধে মহাত্মা শিশিরকুমার 'সন্তান' অভিনয়ে পুনরায় সম্মতি দেন। তবে সেই মুহূর্তে নাটকটি অভিনয়ে কিছু অন্যপ্রকার অসুবিধা দেখা দিলে নাট্যকার অসহিষ্ণু হয়ে নাটকটি ফিরিয়ে আনেন। এরপর ঐ বছরের শেষে নটসূর্য অহীন্দ্র চৌধুরীর কাছে অশোকনাথ শাস্ত্রী 'সন্তান' অভিনয়ের প্রস্তাব রাখেন। অহীন্দ্র চৌধুরী 'রঙমহলের' স্বত্বাধিকারী শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের সঙ্গে আলোচনা করে ১৯৪৪-র ১৩ই ডিসেম্বর প্রথম অভিনয়ের দিন ঘোষণা করেন। শ্রীযুক্ত শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় 'সন্তান' উদ্বোধনে স্বীকৃত হন। নাট্যকারের দুর্ভাগ্য- সে যাত্রাতেও নানা কারণে অভিনয় বন্ধ হয়ে যায়। অবশেষে ১৯৪৫ এর ১৮ই জানুয়ারী শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের ঐকান্তিক চেষ্টায় 'সন্তান' পাদপ্রদীপের আলোয় আত্মপ্রকাশের সুযোগ লাভ করে এবং কিছুকাল 'রঙমহল' থিয়েটারে নিয়মিত অভিনীত হয়।

'সন্তান' রচনার ইতিহাসও কম বিচিত্র নয়। ঋষি বঙ্কিমের 'আনন্দমঠ' উপন্যাস নিয়ে নাটক রচনার চিন্তাটি প্রথম আসে শ্রীযুক্ত অশোকনাথ শাস্ত্রীয় মাথায়। ১৩৫০ এর মন্বন্তরের অভিজ্ঞতায় উপনীত হয়ে তিনি অনুভব করেন ছিয়াত্তরের মন্বন্তরের পটভূমিকায় রচিত 'আনন্দমঠের' প্রাসঙ্গিকতা। তাঁর অনুরোধে বন্ধু বাণীকুমার 'আনন্দমঠের' নাট্যরূপ দানে প্রবৃত্ত হন। তাঁকে সর্বতোভাবে সাহায্য করেন অশোকনাথ শাস্ত্রী। অর্থাৎ এই নাট্যরূপের পশ্চাতে দুটি মস্তিষ্ক সক্রিয়ভাবে কাজ করেছে।

পরাধীন জাতির চিত্তে স্বদেশ প্রীতির বীজমন্ত্র বপনের উদ্দেশ্যে 'সন্তান' নাট্যরূপের পরিকল্পনা। তৎকালীন ভারতবর্ষের সামগ্রিক অধঃপতনের মূলে আত্মশক্তিহীন জাতির দেশানুরাগের একান্ত অভাব সুনির্দিষ্ট ভাবে চিহ্নিত এই নাটকে। বিদেশী রাজশক্তির নিপীড়ন, পঞ্চাশের মন্বন্তরের অভিশাপ, নৈতিক মূল্যবোধের অভাবে জাতীয় চরিত্রের অবনমন প্রভৃতি সঙ্কট থেকে মুক্তির অন্বেষণে জাতির সম্মুখে দৃষ্টান্ত সংস্থাপনের সচেতন তাগিদ থেকে এই রূপকের উদ্ভব। 'আনন্দমঠে' শৃঙ্খলিতা দেশমাতৃকা সাধক সন্ন্যাসীর ভক্তি নম্র চিত্তের পূজাবেদীতে ইষ্টদেবীর মূর্তিতে অভিষিক্ত! এই মূল ভাবটিকে এই নাট্যরূপে যথাসম্ভব অক্ষুণ্ণ রাখবার চেষ্টা আছে। নিছক চিত্ত বিনোদন নয়, গণ মানসে স্বাজাত্যবোধের স্ফূরণে দেশমাতৃকার মুক্তি ত্বরান্বিত হয়ে উঠুক এমন একটা শুভ প্রেরণা আন্তরিক ভাবেই নাট্যকার সঞ্চারিত করতে চেয়েছেন।[১]

মূল কাহিনীর যথাযথ অনুসরণ নাট্যকার করেননি। বরং ব্যক্তিগত অভিরুচি অনুসারে তাকে যুগোপযোগী রূপদানের জন্যে প্রয়োজন মত গ্রহণ-বর্জন করেছেন।[২] উপন্যাসের নাট্যরূপ দানের ক্ষেত্রে তাকে মারাত্মক ত্রুটি রূপে গণ্য করা যায় না। উপন্যাস যখন নাটক হয়ে ওঠে, তখন নাট্যরীতি মেনেই তাকে চলতে হয়। কিন্তু নাটকের সীমিত পরিসরের মধ্যে ভাবগত পরম্পরার বিকাশ অনিবার্য। আর এইখানেই নাট্যকার চূড়ান্ত ভাবে ব্যর্থ। স্বাদেশিকতার বক্তব্য প্রচারে তিনি কোথাও কোথাও অত্যুৎসাহবশতঃ ব্যক্তিগত অভিমত প্রচার করতে দ্বিধা করেননি। উল্টোদিকে কোন কোন প্রসঙ্গকে অনাবশ্যক বোধে পুরোপুরি বাদ দিয়ে গেছেন। তাতে মূল কথাবস্তুর মহিমা যেমন কিছুটা ক্ষুণ্ণ হয়েছে, তেমনি নাট্যরস ঠিকমত দানা বাঁধতে পারেনি। 'সন্তান' কে প্রচারধর্মিতার অভিযোগ থেকে অব্যাহতি দেওয়া যায় না।

'সন্তান' চরিত্র প্রধান নয়—ঘটনা প্রধান নাটক। ঘটনা বিন্যাসের দিকে নাট্যকার অধিক মনোযোগ দিয়েছেন; চরিত্র বিকাশের দিকে ততটা নজর দেননি। চরিত্রগুলি ঘটনা ধারার অনুবর্তী মাত্র। ঘটনা প্রাধান্যে নাটকের আয়তন স্ফীত থেকে স্ফীততর হয়েছে, দর্শকের ক্লান্তির উদ্রেক করেছে। সেইসঙ্গে ব্যাহত হয়েছে চরিত্রগুলির স্বাভাবিক বিকাশ। নাট্যকার যতই দাবী করুন না কেন, তিনি সন্তান চরিত্রের মনস্তত্ত্ব বিকাশের দিকে মনোযোগ দিয়েছেন, আমরা তাকে মেনে নিতে পারছিনা। এই নাটকে চরিত্রগুলির অন্তর্দ্বন্দ্বের

---

[১] ভূমিকায় নাট্যকার বলেছেন—"গণমানস যাহাতে এরূপকের অনুবর্তী হয়—তাহাই আমাদের সঙ্কল্প। বস্তুতঃ জনগণই ইহার চরিত্র, জনগণ সামান্য অনুভব করিলেই সন্তানের মধ্যে নিজেদের খুঁজিয়া পাইবে।"

[২] ভূমিকায় নাট্যকার নিজেই সে কথা স্বীকার করেছেন। তবে তাতে মূল গ্রন্থের ভাব সংগতির এবং নাটকীয়তার হ্রাস না ঘটার দাবীকে মেনে নেওয়া যাচ্ছে না।

আভাস মাত্র নেই। চারিত্রিক দ্বন্দ্ব সংঘাতে ঘটনাধারার যে স্বাভাবিক গতি নাটকে প্রত্যাশিত--সে ব্যাপারে আমাদের নিরাশ হতে হয়। এখানে চরিত্র ঘটনার নিয়ন্ত্রক নয় ঘটনাই চরিত্রের নিয়ন্ত্রক। সত্যানন্দ, জীবানন্দ, ভবানন্দ, মহেন্দ্র বা কল্যাণী যেন কৃত্রিম ভাবে নিজ নিজ ভূমিকা পালন করতে নাটকের পাতায় ভিড় করেছে। তারা যেন ব্যক্তিগত ভাল মন্দ, দুঃখ বেদনা, আশা আকাঙ্ক্ষা রহিত এক একটি অতিমানব - কর্তব্যের তাগিদে রঙ্গমঞ্চে এসে উপস্থিত হয়েছে এবং কর্তব্য সমাপনান্তে নিঃশব্দে বিদায় নিয়েছে। যে আদর্শকে তারা জীবনে গ্রহণ করেছে তার সঙ্গে তাদের মনের যোগই যেন আন্তরিক নয় বরং অনেকটাই কৃত্রিম।

সংস্কৃত অলঙ্কারশাস্ত্র নির্দেশিত পঞ্চাঙ্ক নাটকের রীতি অনুসারে নাট্যকার আখ্যানবস্তুকে বিন্যস্ত করেছেন। এমন কি একে নাটক বলতেও তিনি কুণ্ঠা বোধ করেছেন, বলেছেন 'রূপক'। অর্থাৎ নাট্যকার প্রাচীনপন্থী। আমাদের বিচারে 'সন্তান' মৌলিক রচনা নয়, উপন্যাসের নাট্যরূপ। সংস্কৃত অলঙ্কারশাস্ত্র সম্মত বিধি বিধানকে অধিক গুরুত্ব দেবার কারণে নাটকের কলেবর অকারণ বৃদ্ধি পেয়েছে। ফলে ভাব-সংগতির অভাব উৎকট হয়ে উঠে রস-সম্ভোগের ক্ষেত্রে পীড়াদায়ক হয়ে উঠেছে। অকারণ বিস্তৃতি এই নাট্যরূপের সর্বাপেক্ষা বড় ত্রুটি। মঞ্চ প্রয়োগের ক্ষেত্রেও এটি অন্যতম অন্তরায়।

'সন্তান' নাটকের পূর্ব নাম ছিল বন্দেমাতরম্।[১০] পরে এই নাম পরিবর্তন করে বর্তমান নামকরণ করা হয়েছে। অভিনয়ে সরকারী অনুমতি লাভের জন্যেই একপ্রকার বাধ্য হয়ে উদ্যোক্তারা শিরোনাম পরিবর্তনের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। 'বন্দেমাতরম' শব্দটির সঙ্গে সরকার বাহাদুর যথেষ্ট পরিচিত ছিলেন। ঐ নামের কোন নাটকে তারা যে রাজদ্রোহের গন্ধ খুঁজে পাবেন এটাই স্বাভাবিক। আর সে রকম কোন নাটকের, অভিনয় নিয়ন্ত্রণ আইনের মানদণ্ডে রঙ্গমঞ্চে ছাড়পত্র লাভও সম্ভব ছিল না। তবে এই সংস্কার সাধন নাটকের দিক থেকে লাভজনকই হয়েছে। 'বন্দেমাতরম্' অপেক্ষা 'সন্তান' নামই নাটকের ভাববস্তুর দিক থেকে অধিক সংগতিপূর্ণ। এই নাটকে সন্তানদলের নেতৃত্বে দেশ-মাতৃকার মুক্তি-সাধনের ইতিবৃত্তই বর্ণিত হয়েছে; বন্দেমাতরম সংগীতটি নাটকের অন্তর্ভুক্ত হলেও তার দ্বারা নাটকের সামগ্রিক পরিমণ্ডলকে স্পর্শ করা যায় না। 'সন্তান' মোটেই উচ্চাঙ্গের রচনা নয়, অহীন্দ্র চৌধুরীর বলিষ্ঠ অভিনয় এবং দক্ষ নির্দেশনায় এই ব্যর্থ নাট্যকীর্তি কোন ক্রমে উতরে গেছে।

---

[১০] ভূমিকায় নাট্যকার জানিয়েছেন—"প্রথমে আমরা 'সন্তান' নাটকের নামকরণ করি 'বন্দেমাতরম', তৎপরে নানা কারণে 'সন্তান' নামই সিদ্ধান্ত হয়।"

॥ অনুপমার প্রেম ॥

দেবনারায়ণ গুপ্তের তৃতীয় নাটক 'অনুপমার প্রেম' শরৎচন্দ্রের গল্পের নাট্যরূপ: ১৯৪৫র ২৭শে সেপ্টেম্বর এটি প্রথম মঞ্চস্থ হয় 'রঙমহল' থিয়েটারে। ইতঃপূর্বে একই নাট্যকারের শরৎচন্দ্রের কাহিনীর প্রথম নাট্যরূপ 'রামের সুমতি' 'রঙমহল' থিয়েটারে প্রভূত জনপ্রিয়তা অর্জন করেছিল। সেবার নাট্য পরিচালনার দায়িত্বে ছিলেন সতু সেন। পরের বছর ১৯৪৫ এ 'রঙমহলের' অনুরূপ প্রচেষ্টায় নটসূর্য অহীন্দ্র চৌধুরীর পরিচালনায় আত্মপ্রকাশ করে বর্তমান নাটকটি। 'রঙমহলের' তৎকালীন প্রযোজক শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের নেতৃত্বে মঞ্চশিল্পের ভারপ্রাপ্ত হন বৈদ্যনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়। 'রঙমহলের' সুচারু অভিনেতৃবর্গের ঐকান্তিক প্রচেষ্টায় 'অনুপমার প্রেম' যথেষ্ট জনপ্রিয়তা অর্জন করে। জগবন্ধুর ভূমিকায় অনবদ্য অভিনয়ের সাক্ষ্য রাখেন নটসূর্য অহীন্দ্র চৌধুরী। অন্যান্য ভূমিকায় ছিলেন : চন্দ্র - শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, রাখাল সন্তোষ দাস, ললিত মিহির ভট্টাচার্য, সুরেশ-- ভানু চট্টোপাধ্যায়, বিশ্বম্ভর আশুবোস, সনাতন তুলসী চক্রবর্তী, লালু -- বঙ্কিম দত্ত, যতীন -- সুশীল ঘোষ, ভুলো -- হরিধন মুখোপাধ্যায়, রঘু -- বিজয় দাস, ভোলা - গুপী দে, দারোয়ান বিপিন বোস; স্ত্রী চরিত্রে : অনুর মা - সুহাসিনী, অনুপমা -- রাজলক্ষ্মী (ছোট), চন্দ্রের স্ত্রী পদ্মাবতী, ললিতের মা -- রাধারাণী এবং সুরেশের মা -- রাণীবালা।

নাট্যকার শরৎচন্দ্রের কাহিনীকে আনুপূর্বিক অনুসরণ করেননি। মূল কাহিনী অক্ষুণ্ণ রেখে প্রয়োজন মত সংশোধন, সংযোজন করে নিয়েছেন। নাটকটি 'সূচনা' এবং 'সমাপ্তি' এই দুটি খণ্ডে বিভক্ত। উভয়খণ্ডে সাতটি করে মোট চৌদ্দটি দৃশ্য আছে। তবে 'সূচনা' অংশ একটু দীর্ঘায়ত। 'সূচনা' অংশে অনুপমার বিবাহ পূর্ববর্তী জীবন এবং 'সমাপ্তি' অংশে তার বিবাহোত্তর জীবনের পরিণতির কাহিনী সন্নিবিষ্ট হয়েছে।

অভিজাত ধনবান জগবন্ধু মিত্রের একমাত্র বিদুষী কন্যা অনুপমা। তবে শিক্ষার প্রতি তার অনুরাগ যতটা শিক্ষা সম্পর্কে তার আত্ম-অহংকার তদপেক্ষা অনেক বেশি। সেই অহংকারে সে জগতকে কৃপার দৃষ্টিতে, অনুকম্পার দৃষ্টিতে দেখে। অনুপমার দৃঢ় বিশ্বাস জগতে যত কিছু জ্ঞানের বিষয়, যত কিছু গভীর তত্ত্ব, যত কিছু বিচিত্র রহস্য সমস্তই তার মজ্জাগত এবং এ ব্যাপারে তার সমকক্ষ মনুষ্যকূলে আর কেউ নেই। প্রেমের নিবিড় অনুভূতি সম্যকরূপে উপলব্ধির গভীরতর আনন্দে তার চলন-বলন-মননে পার্থক্য সৃষ্টির প্রয়াস সদা সর্বদা। বলা বাহুল্য সংসারের ছোট মাপের মানুষের কাছে সেটা পাগলামি বলেই ঠেকে এবং ডাক্তারী শাস্ত্রে বহু অন্বেষণেও তার উপযুক্ত দাওয়াই মেলে না। অনুপমা ঐশ্বরিক প্রেমের প্রত্যাশী। বঙ্কিমচন্দ্রের 'দুর্গেশনন্দিনী' উপন্যাসের বীরেন্দ্র সিংহ তার আদর্শ পুরুষ। তার পৌরুষ ও বীরত্বে সে রীতিমত অভিভূত। এ মেয়েকে নিয়ে জনক-জননীর উদ্বেগের অন্ত নেই। বিবাহ নামক স্বর্ণ-শৃঙ্খলে তাকে

আবদ্ধ করতে পারলেই তাদের উদ্বেগ ঘোচে। অথচ সে ক্ষেত্রে প্রধান প্রতিবন্ধক স্বয়ং অনুপমা -বিবাহে তার আপত্তি প্রবল। ভ্রাতৃজায়ার বিস্তর চেষ্টায় অবশেষে জানা গেল বীরেন্দ্র সিংহের মত বীর সুপুরুষ পাত্র ছাড়া সে বিবাহে সম্মত নয়। বীরেন্দ্র সিংহের আধুনিক সংস্করণটির সন্ধানও পাওয়া গেল প্রণয় তৃষ্ণ নায়িকা অনুপমার কাছেই। সে আর কেউ নয়- ঐ গ্রামেরই জনৈক রাখাল মজুমদারের সদ্য বি.এ পাশ একমাত্র পুত্র সুরেশ। জগবন্ধুর স্ত্রীর এই অপ্রত্যাশিত প্রস্তাবে রাখাল মজুমদার সস্ত্রীক অত্যন্ত উল্লসিত। একে অভিজাত পরিবার সেই সঙ্গে কিঞ্চিৎ প্রাপ্তিযোগের ব্যবস্থা অতএব পুত্রের অনিচ্ছা সত্ত্বেও তারা সানন্দে সম্মত হয়ে গেলেন। কিন্তু বি.এ পাশ সুরেশের কাছে বিবাহ অপেক্ষা বিলাত গমন অধিক জরুরি বিবেচিত হওয়ায় বীরেন্দ্র সিংহের নবতম সংস্করণটি বিবাহ রাত্রে বীরত্ব প্রদর্শন পূর্বক নিঃশব্দে কলকাতা পলায়ন করে মান বাঁচালো। এদিকে দুর্লভ বসুর মদ্যপ অশিক্ষিত পুত্র ললিত এতদিন অনুপমার হৃদয় লাভের আশায় বাগানের পাচিলে ঘোরাফেরা করেও শেষ পর্যন্ত আত্মরক্ষার্থে পলায়ন শ্রেষ্ঠ পন্থা বুঝে কোনক্রমে রক্ষা পেল। অবশেষে লগ্নভ্রষ্টার সামাজিক সম্মান রক্ষা করে দোজবর নিঃসন্তান বৃদ্ধ রামদুলাল দত্ত সানন্দে অনুপমার পাণিগ্রহণ করে জগবন্ধুকে সপরিবারে উদ্ধার করলেন। এইখানে নাটকের 'সূচনা' অংশের ইতি. এরপর তার সমাপ্তি অংশ।

অনুপমার বিবাহোত্তর পরিস্থিতি 'সমাপ্তি' অংশের বিষয়বস্তু। পুত্রের অবাধ্যতায় গভীরভাবে মর্মাহত রাখাল মজুমদাব। বিশেষ করে অনুপমার এ হেন দুর্ভাগ্যের প্রত্যক্ষ কারণ যে স্বয়ং তিনি -এই অপরাধবোধ তাকে পীড়িত করে তুলেছে। বিলাত গমনে ভগ্ন মনোরথ পুত্রের প্রত্যাবর্তনে তার মনোযন্ত্রণা তীব্র থেকে তীব্রতর হয়ে উঠেছে। জগবন্ধুর সংসারেও একে একে ঘনিয়ে উঠেছে দুর্ভোগের ছায়া। শ্বশুরগৃহে অবাঞ্ছিত ক্ষয়রোগগ্রস্ত রামদুলাল বেশিদিন সুখ ভোগের সুযোগ পেলেন না .ফলশ্রুতি অনুপমার অকাল বৈধব্য। এই অস্বাভাবিক পরিস্থিতিতে নিদারুণ মানসিক যন্ত্রণায় একে একে গত হয়েছেন জগবন্ধু এবং তার স্ত্রী। সুরেশের পুনর্বিবাহের প্রস্তাবও নাকচ করে দিয়েছিল অনুপমা। অতএব দাদা বৌদির সংসারে গলগ্রহ হয়ে থাকা ছাড়া তার গত্যন্তর ছিল না। এমতাবস্থায় চন্দ্রবাবুর গৃহ পরিচারক ভোলাকে জড়িয়ে তার চরিত্রে কলঙ্ক লেপনের কুৎসিত ইঙ্গিতে শিহরিত হয়ে ওঠে অনুপমা। আত্মহত্যার পথই বেছে নেয় সে। কিন্তু তার জন্যে অপেক্ষা করছিল সম্পূর্ণ অভাবিত স্বতন্ত্র পরিস্থিতি। মৃত্যপথযাত্রী হতভাগ্য অনুপমাকে পুকুরের জল থেকে উদ্ধার করে ঘরে নিয়ে যায় ললিত। অবশ্য প্রেয়সীর অধিকারে নয়--ভাগ্য বঞ্চিতা ভগিনীর অধিকারে। এই অভাবিতপূর্ব মিলনে কাহিনীর সমাপ্তি।

নাটকের এরূপ পরিণতি অনুসৃত গ্রন্থের সম্পূর্ণ বিপরীত। শরৎচন্দ্রের গল্পে অনুপমার আত্মসমর্পণ তার প্রণয় ভিক্ষু অপদার্থ ললিতের কাছে। ললিত এবং অনুপমা -উভয়ের

দিক থেকেই সেটা সঙ্গতিপূর্ণ। ললিত অনুপমাকে প্রেয়সী নারী রূপেই প্রত্যাশা করেছিল, ভগিনীরূপে নয়। তার শিক্ষা এবং সৌজন্যবোধের অভাব, অনুপমার প্রতি নিবেদিত প্রেমকে সামাজিকতার বিচারে ঘৃণ্য করে তুলেছিল ঠিকই কিন্তু তার পশ্চাতে তার হৃদয়ঘটিত ব্যাপারটিকে উপেক্ষা করার কোনো কারণ নেই। তার বিরুদ্ধে যদি কোন আপত্তি ওঠে তবে সে কেবল তার প্রকাশভঙ্গির বিরুদ্ধেই তোলা যেতে পারে মাত্র। আবার প্রেয়সী নারীকে ভগিনীরূপে গ্রহণ করতে যে চারিত্রিক দৃঢ়তা, হৃদয়ের প্রসারতা, বিরল মানসিক ব্যাপ্তি অবশ্যম্ভাবী –ললিতের চরিত্রে আমরা কোথাও তার আভাস মাত্র পাইনা। ললিত প্রেমিক, অত্যন্ত স্থূল অর্থেই প্রেমিক - অপ্রাপ্তি তাকে বিভ্রান্ত করতে পারে, ঔদার্যে প্রতিষ্ঠিত করতে পারে না। অনুপমা সংসারের তিক্ত অভিজ্ঞতায় ক্রমে বুঝে গিয়েছিল বীরেন্দ্র সিংহের অবস্থান গ্রন্থ মধ্যে যতটা সহজ, বাস্তব জীবনে সে তুলনায় নিতান্ত দুর্লভ। তাকে আত্মনিবেদন করে যৌবন-মালঞ্চে কল্প বিহার করা চলে কিন্তু সংসারের শক্ত মাটিতে তার পদচিহ্ন বড় একটা পড়ে না; সেখানে ললিতের মত স্থূল পদার্থই সহজলভ্য, তার অবস্থান ধরা ছোঁয়ার মধ্যেই। অনুপমার এই মোহ-মুক্তি তাকে ললিতের কাছে আত্মসমর্পণে প্রস্তুত করেছে। কিন্তু নাট্যকার কাহিনীর পরিণতিতে অনর্থক পরিবর্তন ঘটিয়ে এই সত্যকে লঙ্ঘন করেছেন। এটিকে নাটকের ত্রুটি হিসাবেই গণ্য করতে হবে।

'অনুপমার প্রেম' নাটকে নাট্যদ্বন্দ্ব বলে প্রায় কিছুই নেই। কতকগুলি ঘটনার সমষ্টিতে একটি নিটোল কাহিনী গড়ে উঠেছে মাত্র। অর্থাৎ বিভিন্ন চরিত্রের সংলাপ ও নাটকীয় দ্বন্দ্বে নাট্যকাহিনী যেভাবে ক্রম পরিণতির দিকে এগিয়ে চলে, এখানে পদে পদে তার অভাব বোধ হয়।

অষ্টম অধ্যায়

জীবনী নাটক

'জীবনী নাটক' কথাটির মধ্যেই একটা স্ববিরোধিতা রয়ে গেছে। সমগ্র জীবন নয়, জীবনের নির্বাচিত মুহূর্ত নিয়ে রচিত হয় নাটক। আর জীবনী সাহিত্য বা চরিত সাহিত্যের উপাদান সমগ্র জীবনের আনুপূর্বিক বিবরণ। কাজেই 'জীবনী-নাটক' অভিধাটির যৌক্তিকতা নিয়ে সংশয় দেখা দিতে পারে। তবু দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধকালে এমন একটি স্বতন্ত্র নাট্য-রীতির উদ্ভব ঘটল, যেখানে একই সঙ্গে নাট্যরস ও চরিত-সাহিত্যের উপাদানের আশ্চর্য সহাবস্থান লক্ষ্য করা যাবে। এ কালের কোন কোন নাট্যকার এই দুরন্ত প্রয়াসে যথেষ্ট কৃতিত্বের সাক্ষ্য রেখেছেন।

মধ্যযুগের চরিত সাহিত্যে মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্যের দিব্যভাব সমন্বিত অলৌকিক জীবনকথাকে কেন্দ্র করে সংস্কৃত ও বাংলায় বিপুল এক সাহিত্যসম্ভার গড়ে উঠেছে। এর কোন কোনটিতে নাটকীয় উপাদানের প্রাচুর্যও লক্ষ্য করা যাবে; নাটকাকারেও কোন কোনটি রচিত হয়েছে। তৎসত্ত্বেও আধুনিক বিচারে আমরা যাকে 'জীবনী নাটক' বলে মনে করি, এগুলি সেই পর্যায়ের অন্তর্ভুক্ত নয়। রঙ্গমঞ্চের প্রয়োজনে দর্শকের নাট্যরস-পিপাসা চরিতার্থ করণের উদ্দেশ্যে চরিত সাহিত্যের উদ্ভব ঘটেনি -বরং মহাপ্রভুর অলৌকিক জীবনকথার স্রোতোধারায় ভক্ত চিত্তকে আপ্লুত করে তোলাই এগুলির উদ্দেশ্য। আবার বাংলা নাটকের আদি পর্ব থেকে ঐতিহাসিক ব্যক্তিত্বের রাজনৈতিক উত্থান-পতনের রোমাঞ্চকর কাহিনী নাট্য বিষয় রূপে গৃহীত হয়ে এসেছে। এই শ্রেণীর নাটক কার্যত ঐতিহাসিক চরিত্রের জীবনকথা নির্ভর। কিন্তু এগুলিকেও কোনভাবে 'জীবনী নাটকের' পর্যায়ভুক্ত করা চলে না। মহেন্দ্র গুপ্তের 'মাইকেল' এবং 'মহারাজা নন্দকুমার' -দুটি নাটকেরই বিষয়বস্তু ব্যক্তি বিশেষের জীবন কাহিনী নির্ভর। তবু প্রথমটি 'জীবনী নাটক' এবং দ্বিতীয়টি 'ঐতিহাসিক নাটক' হিসাবে বিবেচ্য। মনে রাখতে হবে, চরিত সাহিত্যে নাটকীয় উপাদান যতই থাক না কেন, এগুলি মূলত অলৌকিক ভাব সন্নিবিষ্ট -অর্থাৎ আঙ্গিকের দিক থেকে জীবনাশ্রয়ী কিন্তু ভাবের দিক থেকে পুরাণাশ্রয়ী এই শ্রেণীর নাটক। অন্যদিকে ঐতিহাসিক ব্যক্তিত্ব নির্ভর যে নাটক, তা ইতিহাসাশ্রয়ী রোমান্স মাত্র।

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের ক্রান্তি লগ্নে বৈচিত্র্য সন্ধানী বাংলা নাটকের ধারায় 'জীবনী নাটক' সম্পূর্ণ নতুন এবং অভিনব সংযোজন। পূর্ণাঙ্গ জীবনী এগুলি নয় -নাটক হিসাবেই এগুলির মূল্য বিচার্য। অলৌকিক ভাব সমন্বিত কোন দিব্য জীবনের আলেক্ষ্য রচনার পরিবর্তে, সামাজিক মানুষের পার্থিব সুখ দুঃখ মথিত ব্যক্তি জীবনের পরিচয় পাওয়া যাবে এই সমস্ত নাটকে। সেইজন্যে বৃহত্তর অর্থে এই সমস্ত নাটকও সামাজিক নাটকের পংক্তিভুক্ত। এইখানেই মধ্য যুগের চরিত নাটক বা ঐতিহাসিক ব্যক্তিত্ব নির্ভর নাটকের সঙ্গে এদের মৌলিক পার্থক্য। দেশীয় মনীষীদের ঘটনা বহুল কর্মময় জীবনের সুনির্বাচিত মুহূর্তগুলি চয়ন করে একটা সামগ্রিক পরিচয় দানের চেষ্টা আছে এগুলিতে। অনেক সময় নাটকীয় ত্রি ঐক্য হয়ত লঙ্ঘিত হয়েছে; কারণ এখানে সমগ্র জীবনের বিশেষ বিশেষ ঘটনাগুলি নাট্যকারদের চয়ন করে নিতে হয়েছে। কোন মানুষের সমস্ত জীবন একই স্থানে একই কালে একই ঘটনার সূত্রে অতিবাহিত হওয়া সম্ভব নয়–প্রত্যাশিতও নয়। সে রকম ক্ষেত্রে তা নাটকীয় উপাদান হিসাবেও গণ্য হতে পারে না। কাজেই ত্রি-ঐক্যের সাধারণ শর্ত জীবনী নাটকে প্রযোজ্য নয়। অলংকারশাস্ত্র প্রণেতাদের সামনে 'জীবনী নাটকের' দৃষ্টান্ত ছিল না; থাকলে তাঁরা অন্য বিধান দিয়ে যেতেন। যুগের প্রয়োজনে সে বিধান আমাদেরই তৈরি করে নিতে হবে। তাছাড়া অলংকারশাস্ত্রের অনুশাসন পুরোপুরি মেনে নিতে হলে আধুনিক যুগের অনেক প্রথম শ্রেণীর নাটককেই নিষিদ্ধ ঘোষণা করতে হয়। কাজেই এ ব্যাপারে শূচীবায়ু পরিহার করাই বাঞ্ছনীয়। রসিক জনের রস তৃপ্তির কথা স্মরণে রেখে 'জীবনী নাটকে' আমরা কেবল ঘটনাগত ঐক্যের কথা বিচার করে দেখব।

তাছাড়া রঙ্গমঞ্চের সময়-সীমা সীমিত; সেই সীমিত পরিসরে মূল বিষয়টিকে পাঠকের কাছে পৌঁছে দেওয়া চাই। অতএব 'জীবনী নাটকে' সমগ্র জীবনকে প্রতিফলিত করা সম্ভব নয়। চলচ্চিত্রে হয়ত সে সুযোগ আছে–সেখানে জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত ইচ্ছে মত ঘটনার পর ঘটনার বিন্যাস দেখানো সম্ভব। কিন্তু নাটকে এই অসুবিধার কথা মনে রেখে সমগ্র জীবনকে কোন নাট্যকারই তুলে ধরতে চাননি, প্রতিভার ক্ষেত্রগুলিকে অথবা প্রতিভাবানের ব্যক্তিজীবনের পরিধিকে স্পর্শ করতে চেয়েছেন তাঁদের নাটকে। অর্থাৎ জীবনের রেখাচিত্র রচনা নাট্যকারের উদ্দেশ্য। বর্ণ-বহুল চিত্র এবং স্কেচ জাতীয় চিত্রে যে তফাৎ, 'জীবনী' ও 'জীবন নাটকে' সেইটুকু পার্থক্য। কেউ কেউ নাটকীয়তা সৃষ্টিতে কাল্পনিক প্রসঙ্গেরও অবতাড়না করেছেন। বনফুলের 'শ্রীমধুসূদন' নাটকের পঞ্চদশ দৃশ্যে 'ব্রজাঙ্গনা', 'কৃষ্ণকুমারী' এবং 'মেঘনাদবধ কাব্য' একই সঙ্গে কবির মুখে মুখে রচনা ও পণ্ডিতদের দ্বারা লিপিবদ্ধ করানোর ঘটনাটি নাট্যকারের কল্পিত। মধুসূদনের কোন প্রামাণ্য জীবনীতে এ ঘটনার উল্লেখ পাওয়া যায় না। সুখ-পাঠ্য হলেও নাটকটি

তৎকালে অভিনীত হয়নি। সে যাই হোক, এই নাটকগুলিতে স্বদেশ প্রীতির প্রচ্ছন্ন ইঙ্গিতটুকুও সচেতন পাঠক মাত্রই অনুভব করতে পারেন।

॥ কবি কালিদাস ॥

মহাকবি কালিদাসের জীবন কাহিনী অবলম্বনে রচিত 'কবি কালিদাস' জলধর চট্টোপাধ্যায়ের একমাত্র জীবনী নাটক, ১৯৪১-র ২০শে জুলাই 'মিনার্ভা' থিয়েটারে প্রথম মঞ্চস্থ হয়ে প্রভূত সমাদর লাভ করে। তবে নাটকটির রচনাকাল তারও প্রায় পনেরো বছর পূর্বে; 'মিনার্ভা' কর্তৃপক্ষের অত্যন্ত উৎসাহে নাট্যকার, কবি ধীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়ের সহযোগিতায় নাটকটিকে মঞ্চোপযোগী করে নতুন রূপদান করেন। নাটকটি পরিচালনার দায়িত্বও গ্রহণ করেন শ্রীযুক্ত মুখোপাধ্যায় -এ নাটকের কয়েকটি সংগীতও তাঁরই রচনা। মঞ্চাধ্যক্ষ মি জানে আলম কালিদাসের কালটিকে সুন্দর দৃশ্যপটে চমৎকার মঞ্চে নিয়ে আসতে পেরেছেন। এ নাটকের পটভূমি এমন একটি যুগে, যার সম্পর্কে কোন প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ অভিজ্ঞতা এ কালের রঙ্গমঞ্চের থাকা সম্ভব নয়। তবু এই দুরূহ কাজে মঞ্চাধ্যক্ষ মহাশয় যে কৃতিত্বের পরিচয় দিয়েছেন তার জন্যে তাঁকে সাধুবাদ দিতেই হয়। প্রথম অভিনয়ের উল্লেখযোগ্য চরিত্রে রূপদান করছেন : ভোজরাজ ভানু চট্টোপাধ্যায়, বিক্রমার্ক - অমল বন্দ্যোপাধ্যায়, কালিদাস ধীরেন দাস, বিষ্ণুশর্মা -শিবকালী চট্টোপাধ্যায়, গুণমণি -নীরোদাসুন্দরী দেবী, সত্যবতী - অপর্ণা দাস, ভারতী - উমা মুখোপাধ্যায়, ভানুমতী--রেণুকা দেবী এবং মধুছন্দার ভূমিকায় গীতা দেবী।

মহাকবি কালিদাসের কিংবদন্তী নির্ভর জীবন কাহিনী অবলম্বনে 'কবি কালিদাস' নাটকটি রচিত।[১] ইতিহাসের সাক্ষ্য প্রমাণের বিন্দুমাত্র বিরোধিতার সম্ভাবনা যেখানে থাকে না, মানুষের কল্পনা সেখানে স্বভাবতই স্বেচ্ছাচারী হয়ে উঠবার সুযোগ পায়; এই স্বেচ্ছাচারের মোহ এতই প্রবল যে, ঔচিত্যবোধের সীমা লঙ্ঘন করতেও অনেক সময় তার বাধে না-- মানুষ তার শ্রদ্ধার পাত্রটিকে অনায়াসে এক কল্পলোকের অধিবাসী করে তোলে। মহামূর্খ কালিদাস কোন এক অলৌকিক শক্তির অদৃশ্য অঙ্গুলি-সঙ্কেতে শ্রেষ্ঠ মহাকবির আসন লাভ করেছেন দেশীয় মানুষের স্মৃতিতে কালিদাস সেইভাবেই চিত্রিত। সন্ত-মহাপুরুষদের জীবনীতে হয়ত সেই অলৌকিকতার অবকাশ থাকে, কিন্তু কালিদাস তো সন্ত-সাধক নন, কালিদাস অনন্য সাধারণ কবি প্রতিভার অধিকারী। 'কবি কালিদাস'

---

[১] ভূমিকায় নাট্যকার বলেছেন "মহাকবি কালিদাসের জীবন কাহিনীর কোনও সুনির্দিষ্ট ঐতিহাসিক ভিত্তি নাই। কয়েকটি কিম্বদন্তীর ইঙ্গিত লইয়া, অতি স্বাভাবিক ভাবেই নাটকখানিকে জনপ্রিয় করিবার চেষ্টা করিয়াছি।"

নাটকটি রচনা করতে গিয়ে নাট্যকার সেই সাধারণ সত্যটি বিস্মৃত হননি। অর্থাৎ যথার্থ 'জীবনী নাটকের' ধর্মটি নাট্যকার এখানে রক্ষা করতে সক্ষম হয়েছেন। সত্যবতীর ঘৃণা ও উপেক্ষার নিদারুণ যন্ত্রণাই ক্রমে মূর্খ কালিদাসকে মহাকবির পর্যায়ে উন্নীত করেছে। 'কবি কালিদাস' আত্ম স্বরূপ উপলব্ধির অনবদ্য নাটক হৃদয়ের মহত্বে দুর্ভাগ্য পীড়িত বেদনাকে জয় করবার বিরল গৌরবে গৌরবান্বিত।

কালিদাস মূর্খ... মহামূর্খ: সত্যবতীর আভিজাত্যবোধ, 'সুকুমার কাব্যালাপে' অসামান্য দক্ষতা ও তীব্র অহংবুদ্ধির নির্মম কশাঘাতে বিপন্ন-অস্তিত্ব একটি মানুষ। কিন্তু সত্যবতীর অন্তর মথিত নির্মমতার মূল লক্ষ্য কালিদাস নয় বিক্রমার্ক। সত্যবতীর প্রেমে ব্যর্থ মনোরথ বিক্রমার্কের নিপুণ ছলনায়, মূর্খ কালিদাসের কণ্ঠলগ্ন বিদুষী সত্যবতীর বরমাল্য। বিক্রমার্কের এই নিষ্ঠুর পরিহাসের কোন প্রতিকারের উপায় সত্যবতীর হাতে ছিল না বলেই তার অক্ষমতা রূঢ়তার আকারে কালিদাসকে দগ্ধ করতে চেয়েছে। বিষধর সর্প যেমন বিষের ভার বহন করতে না পেরে অনেক সময় নিজের শরীরকে দংশনে দংশনে ক্ষত বিক্ষত করে তোলে, তেমনি সত্যবতীর অপমানিত আত্মার হলাহল বিক্রমার্কের বিকল্প খুঁজে পেয়েছে স্বয়ং কালিদাসকে। তবু সত্যবতী নারী, হৃদয় বলে তারও একটা বস্তু আছে বিদ্যা কিম্বা ঐশ্বর্যের সাধ্য কি সে হৃদয়কে নিরেট পাষাণ করে তোলে? তাই তো তুচ্ছ জ্ঞানে যাকে পদসেবার অধিকার দিতেও অন্তরাত্মা ঘৃণায় মুখ ফিরিয়ে নিয়েছে, তারই অপঘাত মৃত্যুর আশঙ্কায় শঙ্কিত হয়ে উঠেছে সত্যবতীর হৃদয়: বাসব সজ্জিতা নায়িকা দীর্ঘ বিরহে কাল যাপন করেছে সেই মূর্খের প্রতীক্ষায় এবং অবশেষে তারই কাছে অকুণ্ঠ আত্মনিবেদনে জীবনের চরম সার্থকতা খুঁজে পেয়েছে।

কিন্তু কালিদাস কি সত্যিই মূর্খ? মনে তো হয় না। শাস্ত্র-ধর্ম কর্ম গৌরব-খ্যাতি অখ্যাতির দ্বন্দ্বে এমন নিঃস্পৃহ নিরাসক্ত মানুষকে মূর্খ বলি কি করে? সত্যবতীর পদাঘাতে আত্মসমাহিত কবি দুহাত ভরে তাকে আশীর্বাদ করে, তার অভিমানী আত্মা প্রেমের ব্যর্থতায় আত্মহননের পথ বেছে নিতে চায়, গুরুপত্নী ভারতীর মধ্যে বাক্‌দেবীকে প্রত্যক্ষ করে ধ্যানমন্ত্রে করে আবাহন: এ তো মূর্খের লক্ষণ নয়। হৃদয় ধর্মের ঐশ্বর্যে মহিমান্বিত এই কালিদাস নাট্যকারের নিজস্ব সৃষ্টি। প্রথাগত শিক্ষার অপূর্ণতা তাকে যতই সংসারের চোখে অপদার্থ প্রতিপন্ন করেছে, ততই তার অন্তরের সুপ্ত প্রতিভা আপনাতে আপনি বিকশিত হবার জন্যে উন্মুখ হয়ে উঠেছে।

ভানুমতী ও বিক্রমার্কের প্রণয় ব্যাপারটি এ নাটকের একমাত্র ত্রুটি। বিক্রমার্ক শঠ, প্রতারক নির্লজ্জ কামনায় একাধিক নারীর প্রতি তার আসক্তি। এমন কি গুরুপত্নী ভারতীকে কুপ্রস্তাব জানিয়ে চিঠি দিতেও তার প্রবৃত্তিতে বাধে না। এ হেন কামান্ধ বিক্রমার্কের প্রতি ভোজরাজ-কন্যা ভানুমতীর অন্ধ প্রণয় তৃষ্ণার কোন সদুত্তর খুঁজে

পাওয়া শক্ত। বিশেষতঃ ভানুমতী বিদুষী-নারী, রাজকন্যা; আর বিক্রমার্ক আদর্শহীন, ন্যায় নীতি বর্জিত ভাগ্যান্বেষী যুবক মাত্র। কোন মায়ামন্ত্র বলে সে ভানুমতীর হৃদয় জয় করতে সক্ষম হল, তার উৎস সন্ধান নিতান্তই অসম্ভব। বরং গুণমণির ক্ষোভ, অন্যায় সন্দেহ বাতিক এবং ভারতী বিরোধিতার স্বপক্ষে যথেষ্ট যুক্তি আছে। বিগত যৌবনা এই নারী ভ্রাতৃজায়ার সৌভাগ্য-সঞ্চারে মনে মনে ঈর্ষান্বিত। হীনমন্যতার বিশিষ্ট লক্ষণই হচ্ছে অপরের মহত্বে অকারণ সন্দেহ প্রকাশ।

রবীন্দ্রনাথের 'প্রকৃতির পরিশোধ' নাটকের সঙ্গে জলধর চট্টোপাধ্যায়ের 'কবি কালিদাস' নাটকটির এক জায়গায় সাদৃশ্য আছে। 'প্রকৃতির পরিশোধে' সন্ন্যাসী জ্ঞানমার্গের সাধনায় চূড়ান্ত সিদ্ধিলাভের আকাঙ্ক্ষায় বহিঃপ্রকৃতির বৈচিত্র্যময় লীলাকে নিছকই অনুকম্পার দৃষ্টিতে প্রত্যক্ষ করেছে। সত্যের সাধনায় সন্ন্যাসী তার হৃদয়ের অন্ধকার গুহার সংকীর্ণ গণ্ডীতে নিজেকে বদ্ধ করে রেখে সত্যের প্রবেশদ্বারকেই রুদ্ধ করে রেখেছিল। অবশেষে হরিজন বালিকার ক্ষুদ্র দুখানি স্নেহ কোমল হস্ত, তার হৃদয়ের রুদ্ধ দুয়ারের অর্গল মুক্ত করে প্রকৃতিকে আমন্ত্রণ করে এনেছে সেখানে সেই সঙ্গে সন্ন্যাসীর জ্ঞানরুক্ষ স্ববঞ্চিত হৃদয়ে সত্যেরও ঘটেছে অনুপ্রবেশ। সত্যবতীও তার শিক্ষা ও সংস্কৃতির মিথ্যা অহংকারের আড়ালে আত্মগোপন করে বৃহত্তর জগৎ থেকে নিজেকে বিচ্ছিন্ন করে রেখেছিল। এই আত্মপ্রবঞ্চনাকেই সে জীবনের ধ্রুব সত্য জ্ঞান করেছিল। প্রেমের ঠাকুর মুক্তির বার্তা নিয়ে তার হৃদয়ের বদ্ধ দরজায় এসে ঘা দিয়েছে, তার অহংকারী মন ঘৃণা ভরে করেছে প্রত্যাখ্যান। কিন্তু ডাক দিয়ে যে ফিরে গেল, কেমন করে সে যেন তার মনের অনেকটাই সঙ্গে করে নিয়ে গেল; তারই টানে হৃদয় উঠেছে ব্যাকুল হয়ে, তবু অহংকার এসে পথরোধ করে দাঁড়িয়েছে। অবশেষে পায়ে পায়ে মিথ্যার বন্ধন ছিন্ন করে সে খুঁজে পেয়েছে জীবনের পরম সত্যকে।

'কবি কালিদাস' নাটকের মুখ্য আকর্ষণ এক চমৎকার সুললিত কাব্যময় সংলাপ। সংলাপের গুণে এই জীবনী নাটকটি খুবই আকর্ষণীয় হয়ে উঠেছে। তবে সংগীতে রবীন্দ্র-নজরুলের প্রত্যক্ষ প্রভাব আছে।

॥ মাইকেল ॥

যামিনী মিত্রের পর ১৯৪২ র ১লা জানুয়ারী অভিনেতা শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় 'রঙমহল' থিয়েটারের দায়িত্ব ভার গ্রহণ করে নতুন উদ্যমে 'রঙমহলের' হৃত গৌরব পুনরুদ্ধারে আত্মনিয়োগ করেন। এই উদ্যোগের প্রথম সফলতম প্রয়াস মহেন্দ্র গুপ্তের অনবদ্য জীবনী নাটক 'মাইকেল'। মহাকবি মাইকেল মধুসূদনের রোমাঞ্চকর জীবনাশ্রিত এই নাটকটি তার অভিনয় যাত্রা শুরু করে ১৯৪২র ৫ই জুন তারিখে। আত্মপ্রকাশের প্রায়

সঙ্গে সঙ্গেই দর্শক মহলে রীতিমত সাড়া ফেলে দিয়েছিল নাটকটি। তার কিঞ্চিৎ পরিচয় পাওয়া যাবে সমকালীন সংবাদ পত্রের পাতা থেকে। সংবাদ পত্রের অভিমত :

"The stage presentation of the life of the late Michael Madhusudan Datta has been a bold but successful effort on the part of the "Rangmahal Theatre "[১]

নাট্যকারের পরিচালনায় প্রথম অভিনয় রজনীতে বিভিন্ন চরিত্রে রূপদান করেন : মাইকেল মধুসূদন অহীন্দ্র চৌধুরী; রাজনারায়ণ দত্ত—শরৎ চট্টোপাধ্যায়; আর্ডেন—রতীন বন্দ্যোপাধ্যায়; মনোমোহন ঘোষ—প্রভাত সিংহ; গৌরদাস বসাক—সন্তোষ সিংহ; পণ্ডিত মশাই প্রফুল্ল দাস; নন্দদুলাল—অমূল্য হালদার; মাণিক পাট্টাদার—আশু বোস; রমনী মোহন—বেচু সিংহ; হরপ্রসন্ন—গোপাল মুখোপাধ্যায়; নিধিরাম—জীবন চট্টোপাধ্যায়; প্রকাশক—বেচু সিংহ; বিপিন—ভানু চট্টোপাধ্যায়; অশোক—সুনীল মুখোপাধ্যায়; খানসামা—তিনকড়ি চট্টোপাধ্যায়; আলবার্ট-নেপোলিয়ন—রেখা দত্ত; ভৃত্য—গণেশ চৌধুরী; হেনরিয়েটা সোফিয়া—রাণীবালা; রমলা—পদ্মাবতী; জাহ্নবী দেবী—বেলারাণী; টেঁপির মা—আঙ্গুরবালা; নার্স—রাণুদেবী; নমিতা—দুর্গা দেবী এবং মণিকার ভূমিকায় স্নেহ ব্যানার্জী। অনিল বাগচী সুরারোপিত এই নাটকের মঞ্চশিল্পী ছিলেন প্রখ্যাত নানুবাবু (মনীন্দ্রনাথ দাস)। আলোক সম্পাতে খগেন দে, শচীন ভৌমিক, মদন দাস এবং শ্যামাপদ করের কৃতিত্ব এক্ষেত্রে স্মরণযোগ্য। মাইকেলের ভূমিকায় নটসূর্য অহীন্দ্র চৌধুরীর অনবদ্য অভিনয় সেকালের দর্শক বহুকাল মনে রেখেছিল। সে সময় অনেকেই মনে করতেন "There could be no 'Michael' without him "[২]

মহাকবি মাইকেলের জীবনের কেবলমাত্র শেষ পর্ব অবলম্বনে নাটকটি রচিত। কবি মধুসূদন নয় ব্যক্তি মধুসূদনকে পাই এ নাটকে। অর্থবান, প্রতাপশালী রাজনারায়ণ বসুর বিধর্মী পুত্র মধুসূদন বেহিসেবী, বল্গাহীন—অমিতাচারের সোপানে সোপানে অবশেষে জীবন সায়াহ্নে উপনীত এক ক্লান্তপদ সৈনিক। একটি সম্ভাবনাময় প্রতিভা বিভ্রান্ত পদক্ষেপে চূড়ান্ত পতনের দিকে ধাবিত। মধুসূদন ট্র্যাজিক নায়ক—চরিত্র ধর্মে পরিমিতি বোধের অভাব মহাকবির জীবনে ঘনিয়ে তুলেছে মর্মান্তিক ট্র্যাজেডি। সে কবি, সে স্রষ্টা—তার হৃদয়ে সৃষ্টির বিপুল ভাণ্ডার, ঔদার্যের অসীম ব্যাপ্তি। সংসারের ক্রন্দন ধ্বনি সেখানে ব্যর্থ হয়ে ফিরে আসে না; তাকে স্পর্শ করে, সংপৃক্ত করে। গভীর মমতায় সে হৃদয় থেকে নেমে আসে আর্তের বাঞ্ছিত রসদ; সেখানে যে কার্পণ্যের লেশমাত্র নেই। অথচ তারই গৃহকোণে অভুক্ত স্ত্রী-পুত্রের কাতর ক্রন্দন নিয়ত প্রতিধ্বনিত হয়ে ফেরে দেয়ালে

---

[১] The Amrita Bazar Patrika, 11th July, 1942

[২] The Amrita Bazar Patrika, 11th July, 1942

দেয়ালে। পরহিতে আত্মবলিদানের এই বিরল ঔদার্যই মধুসূদনের জীবন ট্র্যাজেডির মূল উৎস। জগৎ-পিতার রাজসভাতেও যে আর্তজনের অশ্রু নিবারণের সাম্যবাদী ব্যবস্থার বিধান নেই–এ সত্য অনুপলব্ধই থেকে গেছে মহাকবির জীবন দর্শনে।

মধুসূদন ধর্মত্যাগী- পিতৃ-পিতামহের সনাতন হিন্দু ধর্ম নির্দ্বিধায় পরিত্যাগ করতে তার বাধেনি। কিন্তু তার ধর্মত্যাগ ধর্মদ্রোহের কারণে নয়: আচার সর্বস্ব রক্ষণশীল হিন্দুধর্মের রুদ্ধদ্বার প্রাঙ্গণে মানবপ্রীতির নির্মল প্রবাহ সঞ্চারে সে তার ধর্মবোধ নির্ধারণ করে নিয়েছিল। মধুকবি বহিরঙ্গে খ্রীষ্টান, অন্তরঙ্গে একান্ত ভাবে হিন্দু. প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের ভাব সম্মিলনে তার জীবনাদর্শ নির্মিত। তবু ধর্মদ্রোহিতার এমনকি দেশদ্রোহিতার অভিযোগ তার বিরুদ্ধে। স্বদেশবাসীর এই নির্মমতায় আত্ম অভিমানী দরদী, মানবতাবাদী কবি। তার অভিমান স্বদেশবাসীর ওপর, জনক জননীর ওপর। সেই অভিমানের তাড়নাতে তার তিলে তিলে আত্মাহুতি। কপোতাক্ষ তীরে সাগরদাঁড়ীর পল্লী প্রকৃতি, বিজয়া দশমীর বাদ্যধ্বনির অন্তিম আকাঙ্ক্ষায় তার জীবনাবসান। মহৎ প্রতিভার সমকালে নিন্দা আর উপেক্ষাই যে একমাত্র প্রাপ্য!

মধু-কবির সমস্ত প্রেরণার উৎস সহধর্মিণী হেনরিয়েটা সোফিয়া। বিদেশিনী এই নারী বিরল প্রতিভাধর স্বামীর সর্বকালের সুখ দুঃখের ছায়া সঙ্গিনী। সংসার অনভিজ্ঞ কল্পলোকের অধিবাসী স্বামীর বিচিত্র খেয়াল চরিতার্থ করতে তার চেষ্টার ত্রুটি নেই। নিত্য অভাব অনটন আর দারিদ্র্যের অভিঘাতেও অবিচল হেনরিয়েটা সদা প্রসন্নময়ী। অভুক্ত সন্তানের বিমর্ষ ব্যথায় তার জননী হৃদয় গোপনে অশ্রু বিসর্জন করে; কিন্তু সন্তানের ক্ষুধার অন্ন জোটাতে ব্যর্থ স্বামীর বিরুদ্ধে তার কোন অভিযোগ পর্যন্ত নেই; বরং গভীর মমতায় এই নারী সেই অক্ষমতার ওপরে প্রেমের স্নিগ্ধ আস্তরণ বিছিয়ে চলে। রক্তে রাঙ্গা হৃৎপদ্মের অর্ঘ্য উপহারে কবি চিত্তকে তৃপ্ত রাখার মরণ পণ ব্রত তার। হেনরিয়েটার নিরাসক্ত অনৈসর্গিক প্রেমের গভীরতা এই চরিত্রটিকে অনন্য সাধারণ মর্যাদা দান করেছে। মধুসূদন কবি, জগৎ সভায় তার জন্যে হয়ত আছে অজস্র উপহার কিন্তু কবির অন্তরচারী, দারিদ্র ভূষিত গৃহকোণে অবলুণ্ঠিতা সদা প্রসন্নময়ী এই নারীর অবস্থান বোধ হয় সমস্ত পুরস্কারের ঊর্ধে।

গৌরদাসের বন্ধুপ্রীতি নির্মল সখ্যতার এক চমৎকার নিদর্শন। আত্মীয় পরিজন, স্বজন বান্ধব বিবর্জিত ধর্মত্যাগী কবি বন্ধুর চরমতম দুর্দিনেও এই অখ্যাত মানুষটি পরম নির্ভরের, একান্ত নিরাপদের আশ্রয়। স্বার্থসন্ধানী আধুনিক জগতে এ হেন বন্ধুত্ব প্রায় বিরল। ছুৎমার্গের উপাসক ছিদ্রান্বেষী সমাজ ব্যবস্থায়, ছাত্র গর্বে গর্বিত সংস্কারমুক্ত পণ্ডিত মশাই নিঃসন্দেহে শ্রদ্ধার পাত্র। পাঠশালার চালাঘরে কিশোর মধুর জ্ঞাননেত্রে সবার অলক্ষে তিনিই কি সর্বপ্রথম সংস্কার মুক্তির অঞ্জন পড়িয়ে দিয়েছিলেন? তারই

চূড়ান্ত সাফল্যের গর্বেই তিনি যেন দিশাহারা। রমলা ও আর্ডেন মধু-কবির কল্পনায় রোমিও ও জুলিয়েট--তাদের প্রণয়, পরিণয় ও প্রতিষ্ঠার ইতিবৃত্তে মধুসূদনের প্রেমিক সত্বার নতুনভাবে পরিতৃপ্তি লাভের ব্যঞ্জনায় মূর্ত।

নাটকের প্রথম অঙ্কের প্রথম দুটি দৃশ্যে কৌশলে নাট্যকার পূর্ব ঘটনা দর্শকের সামনে তুলে ধরেছেন। তাতে স্থান-কালগত ঐক্যের বিধান অবশ্যই লঙ্ঘিত হয়েছে; কিন্তু 'জীবনী নাটকে' তার অনাবশ্যকতা আমরা পূর্বেই আলোচনা করেছি। অতএব বর্তমানে সে আলোচনার আর প্রয়োজন নেই। তবে দ্বিতীয় দৃশ্যে পরলোকগত পিতা-মাতার কাল্পনিক উপস্থিতিতে মধুসূদনের কথোপকথনের মধ্যে একটু অনুশোচনাবোধ যেন লক্ষ্য করা যায়। ধর্মত্যাগ এবং বিদেশিনী নারীর পাণিগ্রহণ, পিতা মাতার সঙ্গে তার চির বিচ্ছেদ রচনা করেছে এই অনুতাপ কবি চিত্তকে একটু যেন নাড়া দিয়েছে।

॥ মাইকেল মধুসূদন ॥

একদিকে অহীন্দ্র চৌধুরী এবং অন্যদিকে শিশির কুমার ভাদুড়ী এই দুই মহান প্রতিভাধর নাট্য ব্যক্তিত্বকে স্বল্প ব্যবধানে শহরের দুই রঙ্গমঞ্চে এক সময় মাইকেল মধুসূদনের ভূমিকায় পাশাপাশি অবতীর্ণ দেখবার বিরল সৌভাগ্য লাভ করেছিল কলকাতার নাট্যরসিক দর্শক সমাজ। 'রঙমহলে' মহেন্দ্র গুপ্তের 'মাইকেল' নাটকে নাম ভূমিকায় অবতীর্ণ হতেন নটসূর্য অহীন্দ্র চৌধুরী, অন্যদিকে 'শ্রীরঙ্গম' মঞ্চে নিতাই ভট্টাচার্যের 'মাইকেল মধুসূদন' নাটকে একই চরিত্রে দেখা যেত মহাত্মা শিশির কুমারকে। মহেন্দ্র গুপ্তের 'মাইকেল' রঙমহলে তার প্রথম অভিনয় শুরু করে ১৯৪২-র ৫ই জুন। আর 'শ্রীরঙ্গম' মঞ্চে নিতাই ভট্টাচার্যের 'মাইকেল মধুসূদন' মঞ্চস্থ হয় ১৯৪৩র মার্চ-এপ্রিলে।* দুই রঙ্গমঞ্চেই বেশ কিছুকাল ধরে অভিনীত মহাকবির জীবনকথা নির্ভর দুটি নাটক এবং ১৯৪৩ এর মাঝামাঝি সময়ে একই সঙ্গে দুটি নাটকের অভিনয় দর্শক সমাজে রীতিমত কৌতূহল সৃষ্টি করেছিল।

'শ্রীরঙ্গম' মঞ্চে মহাত্মা শিশির কুমারের নেতৃত্বে অভিনীত 'মাইকেল মধুসূদন' নাটকের পূর্ণাঙ্গ চরিত্রলিপি সংবাদপত্রে প্রকাশিত হয়নি। বিভিন্ন সূত্রে প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে নিম্নরূপ চরিত্রলিপি উদ্ধার করা সম্ভব হয়েছে : মধুসূদন—শিশির কুমার ভাদুড়ী; বিদ্যাসাগর -শৈলেন চৌধুরী; গৌরদাস--জীবেন বসু; রেভারেণ্ড—আদিত্য (এ্যাঃ) হেনরিয়েটা সুরুচি দেবী; দেবকী -রাজলক্ষ্মী; মেঘনাদ-- মাঃ মিনু। সম্ভবত এই নাটকের

---

* এই নাটকটির সঠিক প্রথম অভিনয় তারিখ সংবাদপত্রে পাওয়া যায়নি। পরস্পর বিরোধী বিভিন্ন সূত্র থেকে অনুমান ১৯৪৩-র মার্চ-এপ্রিল এ নাটকটি আত্মপ্রকাশ করেছে।

সংগীত ও নৃত্যের দায়ভার প্রাপ্ত হয়েছিলেন যথাক্রমে রঞ্জিৎ রায় এবং ললিত গোস্বামী। মহাত্মা শিশির কুমার স্বয়ং পরিচালনা ও নির্দেশনার দায়িত্ব গ্রহণ করেন।

রঙমহলে মহেন্দ্র গুপ্তের 'মাইকেল' নাটকের অভিনয় সাফল্যে অনুপ্রাণিত হয়ে শিশিরকুমার ভাদুড়ী মহাকবির জীবনী অবলম্বনে রচিত অনুরূপ একটি নাটক মঞ্চস্থ করতে মনস্থ করেন। ঠিক এই সময় তিনি নাট্যকার বনফুলের (বলাইচাঁদ মুখোপাধ্যায়) 'শ্রীমধুসূদন' নাটকটি রচনার সংবাদ পান।[৫] মহাত্মা শিশির কুমার অনতি বিলম্বে ভাগলপুরে বনফুলের সঙ্গে সাক্ষাৎ করে 'শ্রীমধুসূদন' মঞ্চস্থ করার ইচ্ছা প্রকাশ করেন। বনফুল প্রথমে সম্মত হলেও অভিনয়ের প্রয়োজনে শিশির কুমার নাটকটির কিছু সংশোধন করতে চাইলে তিনি তাতে সম্মত হতে পারেননি। ফলে 'শ্রীমধুসূদন' নাটকের অভিনয়ের সম্ভাবনা বাতিল হয়ে যায়। কিন্তু মহাত্মা শিশির কুমার সহজে হেরে যাবার পাত্র ছিলেন না। মাইকেল মধুসূদনের জীবনকথা নিয়ে রচিত নাটক 'শ্রীরঙ্গমে' তিনি মঞ্চস্থ করবেনই এমন সঙ্কল্প নিয়ে শিশির কুমার কলকাতায় প্রত্যাবর্তন করেন এবং তরুণ নাট্যকার নিতাই ভট্টাচার্যের কাছে তাঁর সঙ্কল্পের কথা ব্যক্ত করেন। তাঁরই অনুরোধে নিতাই ভট্টাচার্য অল্প সময়ের মধ্যে রচনা করেন 'মাইকেল মধুসূদন' নাটক 'শ্রীরঙ্গম' মঞ্চে[৬] যে নাটকে শিশির কুমার তাঁর প্রতিভার উজ্জ্বল সাক্ষ্য রেখেছেন। কিন্তু 'শ্রীরঙ্গমে' শিশির কুমারের সমতুল অভিনেতা অভিনেত্রী সে সময়ে বিশেষ কেউ ছিলেন না। অভাব ছিল সাজ সজ্জা, দৃশ্যপট প্রভৃতি অন্যান্য উপকরণেরও। ফলে একক অভিনয়ের জোরেই শিশির কুমারের মাইকেল স্বল্পকাল রঙ্গমঞ্চে আত্মপ্রকাশ করে।

---

৫ বনফুল পেশায় ডাক্তার হলেও ভাগলপুরে থাকাকালীন (১৯৪০ ৪১) সেখানকার একটি বেসরকারী কলেজে তাঁকে বাংলা সাহিত্য পড়াতে হত। মহাকবির জীবনী ও সাহিত্য পড়াতে গিয়ে তিনি মধুসূদনের প্রামাণ্য জীবনী রচনার তাগিদ অনুভব করেন। পরে এক অন্তরঙ্গ বন্ধুর অনুরোধে জীবনীর পরিবর্তে তিনি মহাকবির জীবন নিয়ে রচনা করেন 'শ্রীমধুসূদন' নাটক। 'শ্রীমধুসূদন' নাটক রচনার এই হল ইতিহাস। (১৭১৮৮ তারিখে বনফুলের জ্যেষ্ঠ পুত্র ডা অসীম কুমার মুখোপাধ্যায়ের সঙ্গে বর্তমান লেখকের একান্ত সাক্ষাৎকারে প্রাপ্ত তথ্য।)

৬ কেউ কেউ নিতাই ভট্টাচার্যের 'মাইকেল মধুসূদন' নাটকটিকে বনফুলের রচনা বলে উল্লেখ করেছেন ('বাংলা নাট্য সাহিত্যের ইতিহাস', আশুতোষ ভট্টাচার্য, ২য় খণ্ড, পৃঃ ৬৬৭)। বনফুলের নাটকটির নাম 'মাইকেল মধুসূদন' নয়, 'শ্রীমধুসূদন'। প্রসঙ্গত উল্লেখ করা যেতে পারে বনফুলের কোন নাটকই ঐ সময় সাধারণ রঙ্গমঞ্চে অভিনীত হয়নি। 'শ্রীমধুসূদন' অভিনয়ের জন্যে নাট্যকার সতু সেনের সঙ্গে যোগাযোগ করেও বিফল হন। সেটি পরে আকাশবাণী কলকাতা কেন্দ্র থেকে বেতার নাট্যরূপে প্রচারিত হয়। অনভিনীত বলে বনফুলের এই জীবনী নাটকটিকে আমরা আমাদের আলোচনার অন্তর্ভুক্ত করিনি। এই পর্বে কেবলমাত্র অভিনীত নাটকগুলিই আমাদের আলোচ্য বিষয়।

মহাকবির নাটকীয় জীবন কাহিনী অবলম্বনে সমসাময়িক কালে তিনটি 'জীবনী নাটকের' সন্ধান পাওয়া যায়। একটি মহেন্দ্র গুপ্তের 'মাইকেল', দ্বিতীয়টি নিতাই ভট্টাচার্যের 'মাইকেল মধুসূদন' এবং তৃতীয়টি বনফুলের 'শ্রীমধুসূদন'। মহেন্দ্র গুপ্তের নাটকটি নিয়ে আমরা পূর্বে আলোচনা করেছি। এখন 'শ্রীরঙ্গমে' অভিনীত নিতাই ভট্টাচার্যের এই 'জীবনী নাটকটির' রস বিচারে অগ্রসর হওয়া যেতে পারে।

বিশেষভাবে শিশিরকুমারের অভিনয় বৈশিষ্ট্যের দিকে লক্ষ্য রেখে নাট্যকার এই 'জীবনী নাটকটি' রচনা করেন। কেননা এটি ছিল শিশির কুমারের কাছে একটি বড় চ্যালেঞ্জ। মহাকবির চরিত্রটিকে নাট্যকার শিশিরকুমারের অভিনয় উপযোগী করে নির্মাণ করেছেন। মহেন্দ্র গুপ্তের নাটকে মধুসূদনের ব্যক্তি জীবনের সুখ দুঃখ, আবেগ অনুভূতি দর্শকের হৃদয়কে গভীরভাবে নাড়া দেয়। অন্যদিকে নিতাই ভট্টাচার্যের নাটকে কবি-প্রতিভার বিস্ময়কর দিকটিকে অধিক গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। এই নাটকে ব্যক্তি মধুসূদনের পরিবর্তে বিরল প্রতিভাধর কবির দুর্লভ সাফল্য ও ব্যর্থতাকে নাট্যকার তুলে ধরতে চেয়েছেন। মধুসূদন বিরাট সম্ভাবনাময় প্রতিভার অধিকারী অসামান্য তার মণীষা। কিন্তু তার চরিত্রের অন্তর্নিহিত ত্রুটির ছিদ্র পথে নেমে এসেছে মর্মান্তিক ট্র্যাজেডি। মধুসূদনের উত্থান পতন, সাফল্য ও ব্যর্থতার সঙ্গে অদ্ভুত সাযুজ্য খুঁজে পাওয়া যায় তারই স্রষ্টা নাট্যাচার্য শিশির কুমারের ব্যক্তি জীবনের। সৃষ্টি ও স্রষ্টার গভীর নৈকট্যই বোধ হয় শিশির কুমারের মাইকেলের সাফল্যের সব থেকে বড় কারণ।

মধুসূদন কবি সৃষ্টির প্রেরণায় সে অস্থির। বাক দেবীর অসীম করুণা তার ওপর। কিন্তু জীবন ধর্মে সে বে হিসেবী, উচ্ছৃঙ্খল। তার চরিত্রে শৃঙ্খলাবোধের অভাব অতিমাত্রায় প্রকট। আর এই সূত্রেই তার জীবনে নেমে এসেছে দুর্দিন। বোধহয়, প্রতিভাবান ব্যক্তি মাত্রই সংসারের সাধারণ বিচারে অবিবেচক। স্বার্থমগ্ন সংসারের লাভ-ক্ষতির নিখুঁত হিসাবের সঙ্গে তাদের হিসাব মেলে না। সেক্ষেত্রে সংসার বড়ই কৃপণ—তার স্বার্থে ঘা লাগলেই সে তৎপর হয়ে ওঠে। স্রষ্টার সৃষ্টি নিয়ে সংসার উল্লসিত হতে পারে—কিন্তু সৃষ্টির পশ্চাতে সৃজনশীল মানুষটির একান্ত ব্যক্তিগত জীবনের খবর সে রাখে না - রাখার প্রয়োজন মনে করে না। মহাকবি মধুসূদনকেও সংসারের এই নির্মম বিধানকে মেনে নিতে হয়েছে।

নাটক হিসাবে 'মাইকেল মধুসূদন' খুব একটা কৃতিত্বের দাবী করতে পারেনা। এখানে ঘটনাগত পরম্পরা, চরিত্রগুলির মনস্তাত্ত্বিক বিকাশ, নাটকীয় ঘাত প্রতিঘাত খুব উজ্জ্বল হয়ে ওঠেনি। কোনদিক থেকেই এই 'জীবনী নাটকটি' মহেন্দ্র গুপ্তের 'মাইকেলকে' অতিক্রম করতে পারেনি। বিদ্যাসাগর চরিত্রটি স্বকীয় বৈশিষ্ট্য উজ্জ্বল; বিদ্যাসাগর এই নাটকে দয়ার সাগর রূপে উপস্থিত। হেনরিয়েটা মহাকবির যোগ্য সহধর্মিনী। বন্ধু গৌরদাসের অকৃত্রিম সখ্যতা নিঃসন্দেহে প্রশংসার যোগ্য।

নবম অধ্যায়

অন্যতর নাট্য প্রয়াস

সমকালীন যন্ত্রণা-জর্জর জীবন প্রবাহকে নাটকের আঙ্গিকে রূপদানের কষ্টকল্প পন্থা থেকে বিচ্যুত হয়ে পুরাতনের অনুবর্তনে আত্ম তৃপ্তির অল্প বিস্তর প্রচেষ্টা এই পর্বের নাট্যধারায় লক্ষ্য করা যায়। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধকালীন বাংলা নাটকের আলোচনা প্রসঙ্গে এই লঘুতর প্রচেষ্টাগুলিও সমান গুরুত্ব সহকারে বিচার্য বিষয়; নচেৎ এই পর্বের সামগ্রিক চিত্রটি অনুধাবন করা যাবে না। হাল্কা চালের সঙ্গীত প্রধান এই শ্রেণীর নাট্যকর্মগুলিকে আমরা চিহ্নিত করতে পারি অপেরা বা গীতাভিনয় নামে।

বণিকের মানদণ্ড রাজদণ্ডে রূপান্তরের যুগ সন্ধিক্ষণে বাঙালীর ভাব জগতে তীব্র আলোড়নের প্রেক্ষাপট, অপেরা বা গীতাভিনয়ের উৎসভূমি। ব্যক্তি ও সমাজের আত্মমুক্তির -অন্তত মুক্তি প্রচেষ্টার মৌলিক প্রবৃত্তির ওপরেই অপেরা বা গীতাভিনয়ের উদ্ভব, বিকাশ এবং পরে বিনষ্টির ইতিবৃত্ত নির্মিত হয়েছে। আরও স্পষ্ট ভাষায় বলতে গেলে, বাংলার লোক-সমাজে প্রচলিত যাত্রা থেকে নাটকে উত্তরণের গতিপথে অপেরা বা গীতাভিনয়ের উৎপত্তি ও বিলুপ্তির ইতিবৃত্ত নির্মিত।

মুসলমান আমলে সংস্কৃত নাটকের অভিনয় পুরোপুরি লুপ্ত হয়ে পড়লে নাট্যরস-পিপাসু রসিক সমাজ রসোপভোগের বিকল্প খুঁজে পেয়েছে 'যাত্রা' শব্দটিকে কেন্দ্র করে। মুসলমান সমাজ নাটক ও অভিনয়কলার ঘোরতর বিরোধী ছিলেন। ফলে তাদের আমলে নাট্যচর্চার বিকাশের পথ রুদ্ধ হয়ে পড়েছিল। এই শূন্যস্থান পূরণে অগ্রণী ভূমিকা গ্রহণ করেছে 'যাত্রা'। সংস্কৃত অভিধানে উৎসব অর্থে 'যাত্রা' শব্দটির ব্যবহার আছে। কিন্তু মূল ইন্দো-ইউরোপীয় শব্দে 'যা' ধাতু থেকে নিষ্পন্ন বলে গমন অর্থে 'যাত্রা' শব্দের অধিক প্রচলন। কালক্রমে গমন উপলক্ষে অনুষ্ঠিত উৎসব, সমাজে 'যাত্রা' নামে প্রচলিত হয়ে পড়ে। এই গমন ব্যাপারটিকে নিয়েও পণ্ডিত সমাজে মতভেদের অন্ত নেই। কেউ কেউ মনে করেন, অতীতে কোন দেবতার লীলা প্রসঙ্গে ধর্মপ্রাণ মানুষ এক জায়গা থেকে

অন্য জায়গায় গমন করে নাচ গানের সঙ্গে সেই দেবতার মাহাত্ম্য প্রচার করতেন। এই অনুষ্ঠান 'যাত্রা' নামে অভিহিত হত।[১] পরে গমন ব্যাপারটি বর্জিত হয়ে শুধুমাত্র নৃত্যগীত সহকারে দেবলীলার অভিনয়ের ব্যাপারটি টিকে থাকে। দ্বিতীয় মতটি আরও যুক্তিসম্মত এবং অধিক গ্রহণযোগ্য। লক্ষ্য করলে দেখা যাবে পৃথিবীর আদি উৎসবগুলির অধিকাংশই গ্রহ নক্ষত্রের কক্ষ পরিবর্তনের সঙ্গে সম্পর্ক যুক্ত কিংবা কক্ষ পরিবর্তন উপলক্ষে অনুষ্ঠিত হত। গ্রহ নক্ষত্রের মধ্যে সূর্যই প্রধান এবং মানুষের জীবন ধারণের সঙ্গে প্রত্যক্ষ ভাবে সম্পর্ক যুক্ত। সেইকারণে সৌরৎসব সর্বাপেক্ষা আদি উৎসব এবং সৌরোৎসব থেকে ক্রমে অন্যান্য উৎসবের উৎপত্তি। সূর্যদেবতার উত্তরায়ণ বা দক্ষিণায়ন গমন উপলক্ষে নৃত্য গীতাভিনয় সহকারে অনুষ্ঠিত উৎসব প্রাচীনকালে 'যাত্রা' নামে অভিহিত ছিল। সূর্য দেবতা ক্রমে ক্রমে শিব ঠাকুরে রূপান্তর লাভ করেন। 'শিবপুরাণ', 'ধর্মসংহিতা', 'বায়বীয় সংহিতা' প্রভৃতিতে নৃত্যগীতাদি সহকারে শিবোৎসবের বর্ণনা আছে। এই সমস্ত উৎসব থেকে যাত্রা ও পরে নাটকের উৎপত্তি ঘটেছে বলে কেউ কেউ অনুমান করেন।[২]

কিন্তু এই অভিমত আংশিকতা দোষ দুষ্ট। পৌরাণিক যুগে অনুষ্ঠিত শিবোৎসবকে উপলক্ষ করে নয়, বৈদিক যুগের শেষ ভাগে ইন্দ্রোৎসবকে কেন্দ্র করেই নাট্যের উদ্ভব ঘটে। ধ্বজমহ বা মহেন্দ্র বিজয় উৎসবে প্রযোজিত 'দেবাসুর যুদ্ধ' অভিনয়ের বহু পরে মহাদেবের সম্মুখে অভিনীত হয়েছিল 'ত্রিপুরদাহ'। আচার্য ভরতকৃত নাট্য-শাস্ত্রের চতুর্থ অধ্যায়ে শিবের উক্তিতেও পাচ্ছি, ব্রহ্মা সৃষ্ট নাট্যকর্মে প্রীত হয়ে নৃত্যাদি সংযুক্ত করেছিলেন শিব স্বয়ং। কাজেই নাট্য উদ্ভবের সঙ্গে ব্রহ্মার সংযুক্তিই প্রমাণিত - এবং তা বৈদিক যুগে; শিবোপাসনার সঙ্গে নাট্যের সংযোগ তৎপরবর্তীকালে। এখানে আরও একটি কথা উল্লেখযোগ্য — সংস্কৃত নাট্যশৈলী বিভাজনে 'যাত্রা' শব্দের কোন উল্লেখ নেই। 'যাত্রা' বলতে সাধারণ অর্থে আমরা বুঝি—বাংলার লোক সমাজে বহুল প্রচলিত গীতিময় দেবলীলা প্রধান অভিনয়োপযোগী আখ্যান-বস্তু।

---

১ প্রসঙ্গত পারিবারিক জীবনে অনুষ্ঠিত একটি উৎসবের কথা এখানে উল্লেখ করি। আমাদের বাড়িতে দেখেছি বিজয়া দশমীর দিন দুর্গাপ্রতিমাকে যখন বিসর্জনের জন্যে নিয়ে যাওয়া হয়, তখন পরিবারের সকলকে প্রতিমার সঙ্গে কিছুদূর গমন করতে হয়। এই অনুষ্ঠান যাত্রা নামে পরিচিত। প্রায় চারশো বছর ধরে এই অনুষ্ঠান আজও নিয়মিত পালিত হয়ে আসছে। সম্ভবত এই অনুষ্ঠান আদরের কন্যাকে পিতৃগৃহে থেকে উৎসবান্তে অশ্রুসজল চোখে বিদায় দানের বেদনায় তাৎপর্যপূর্ণ।

২ "আমাদের দেশে যে শিবোৎসব উপলক্ষেই নাটকের সৃষ্টি হইয়াছিল তাহা শিবঠাকুরের নটরাজ, নটেশ, নটনাথ, মহানট, আদিনট প্রভৃতি নাম হইতেই বেশ বুঝা যায়।" 'বাংলা নাটকের উত্তপত্তি ও ক্রমবিকাশ, মন্মথমোহন বসু, পৃঃ ৯ দ্রষ্টব্য।

ইংরেজ আমলে রঙ্গমঞ্চের প্রতিষ্ঠা ও অনুবাদ নাটকের অভিনয় শুরু হবার পর থেকে শিক্ষিত ও অভিজাত সম্প্রদায়ের মধ্যে যাত্রার জনপ্রিয়তা বহুলাংশে হ্রাস পেতে শুরু করে। বিশেষ করে শেষের দিকে যাত্রার মধ্যে অশ্লীল অঙ্গভঙ্গী ও নিম্নমানের কাহিনীর অবতাড়না, যাত্রার প্রতি মানুষের মনোভাব দ্রুত পরিবর্তনে সহায়ক হয়ে ওঠে। এদিকে সকল সময় সকল স্থানে ব্যয়সাধ্য নাট্যশালা প্রতিষ্ঠাও সম্ভবপর ছিল না। এমতাবস্থায় বিকল্প অনুসন্ধানের প্রয়োজন হয়ে পড়েছিল স্বাভাবিক ভাবে। ফলে উন্মুক্ত প্রাঙ্গণে নাটকের মত অঙ্ক দৃশ্য বিভাগ সমন্বিত নাট্যকাহিনীর অভিনয় প্রসার লাভ করে। এই নতুন রীতির 'যাত্রা' সাধারণ পরিচিতি লাভ করে 'গীতাভিনয়' বা 'অপেরা' নামে। সাজ পোষাকের বৈচিত্র্য, ভক্তি ও করুণ রসের আধিক্য এবং অপেক্ষাকৃত মার্জিত রুচি ও ভাষার দ্বারা এগুলি সহজেই তৎকালীন নাট্যরসিক দর্শককে আকৃষ্ট করতে সক্ষম হয়েছিল। মনোমোহন বসু এবং তাঁরই উত্তরসূরী রাজকৃষ্ণ রায়ের নাটকগুলি বস্তুত এই শ্রেণীর অপেরা বা গীতাভিনয়।

অপেরা বা গীতাভিনয়ের সঙ্গে নাটকের মূল এবং মৌলিক পার্থক্য অনেকখানি। মনে রাখতে হবে -"The entire field of opera has no concern with drama"[৩]। অপেরা বলতে আমরা বুঝি "In an opera there is a variety of dress and costumes, elegant language and other imposing things"[৪]। অর্থাৎ বাইরের দিক দিয়ে মন ভোলানোর চেষ্টা আছে এগুলিতে। নাটকের লক্ষণ মেনে নাটকীয়তা সৃষ্টির আন্তরিক প্রযত্ন এগুলিতে প্রায় অনুপস্থিত। সমকালীন সমাজ পরিবেশ এই শ্রেণীর নাট্যকর্মের অনুকূল বাতাবরণ সৃষ্টি করেছিল।

কিন্তু দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধকালীন ক্রম পরিবর্তিত সমাজ প্রেক্ষাপট এই শ্রেণীর নাট্যকর্মের পক্ষে মোটেই সহায়ক ছিল না। কেননা ততদিনে আধুনিক বিশ্বনাট্য ধারার সঙ্গে বাংলা নাটকের সংযোগ স্থাপিত হয়েছে এবং কলকাতার পেশাদারী নাট্যশালাগুলি কিছুটা অবস্থার চাপে পড়ে এ ব্যাপারে সক্রিয় ভূমিকা গ্রহণ করতে শুরু করেছে। তবু এ কালের কোন কোন নাট্যকার পশ্চাদাপসরণ করে অপেরা বা গীতাভিনয় রচনায় আত্মনিয়োগ করেছেন— সমকালীন রঙ্গমঞ্চে সেগুলি মঞ্চায়নের প্রচেষ্টাও কম-বেশী দেখা গেছে। বলাবাহুল্য এই শ্রেণীর নাট্যকর্মগুলি যুগ চেতনার পরিচয়বাহী নয় সুলভে দর্শকের মনোরঞ্জনের উদ্দেশ্যে এগুলির উদ্ভব। কিন্তু এই ফাঁক রেখে ফাঁকি দেবার প্রচেষ্টা তৎকালীন দর্শকের সহানুভূতি

---

৩ 'The Theatre And Dramatic Theory' A Nicoll pp 12

৪ Indian Stage, Vol I, Hemendra Nath Dasgupta, pp 133

থেকে বঞ্চিতই হয়েছে। সংগীত-প্রধান অপেরাগুলিতে কোথাও কোথাও রবীন্দ্র গীতিনাট্যের কিঞ্চিৎ প্রভাব লক্ষ্য করা যাবে। তবে রবীন্দ্র গীতিনাট্যে ভাব, ভাষা এবং সংগীতের যে সুষ্ঠু সমন্বয় দেখতে পাওয়া যায়, কৃত্রিম অনুকরণের ফলে এগুলিতে তার অভাবটাই প্রত্যক্ষ হয়ে উঠে রস সম্ভোগের ক্ষেত্রে পীড়াদায়ক হয়ে উঠেছে। আরও একটি বিষয় বর্তমান ক্ষেত্রে উল্লেখ করা প্রয়োজন-- আমরা যাকে 'লঘুনাট্য' বলে গণ্য করি, এগুলিকে নাট্য বিভাজনের সেই পর্বেরও অন্তর্ভুক্ত করতে সমালোচনা রীতি অন্তরায় হয়ে দাঁড়ায়। লঘুনাট্যে জীবনের জটিল সমস্যার উপস্থাপনা ঘটে লঘু চালে; লঘুনাট্য নাট্যধর্ম থেকে যেমন বিচ্যুত নয়, তেমনি জীবনযন্ত্রণার প্রকাশও সেখানে অপরিহার্য। কিন্তু এ কালের গীতাভিনয় বা অপেরাগুলি উভয় দিক থেকেই সম্পূর্ণ ব্যর্থ। যুদ্ধকালীন বাংলা নাটকের ধারায় এই ধরনের পলায়নী প্রয়াস বিরল ব্যতিক্রম হিসাবেই গণ্য।

॥ মধুমালা ॥

কলেজ স্ট্রীট মার্কেটের সন্নিকটে 'আলফ্রেড মঞ্চে' রঘুনাথ মল্লিকের 'নাট্যভারতীর' উদ্বোধন ঘটে 'রঙমহলে' অভিনীত দুটি পুরোনো নাটকের অভিনয় দিয়ে। ১৯৩৯ র ৫ই আগস্ট বাংলা রঙ্গমঞ্চের ইতিহাসে 'নাট্যভারতী' প্রথম তার নামটি সংযুক্ত করে। কিন্তু রঙ্গমঞ্চে উপস্থাপনা করার মত কোন নতুন নাটক তখন তাদের হাতে ছিল না।[*] এই সময় কাজী নজরুল ইসলাম তাঁর রচিত সঙ্গীত বহুল অপেরা 'মধুমালা' বন্ধুবর বীরেন্দ্রকৃষ্ণ ভদ্রের হাতে তুলে দেন। 'নাট্যভারতীর' কর্তৃপক্ষ সর্বসম্মতিক্রমে নাটকটি অনুমোদন করেন এবং এই অপেরাটি 'নাট্যভারতীর' প্রথম মৌলিক প্রয়াস, মঞ্চস্থ হয় ১৯৩৯র ১৯শে অক্টোবর, মহাসপ্তমী তিথিতে।[*] আকাশবাণী কলকাতা কেন্দ্রের অন্যতম প্রাণপুরুষ বীরেন্দ্রকৃষ্ণ ভদ্রের পরিচালনায় প্রথম অভিনয় রজনীতে অংশগ্রহণ করেন : মদনকুমার -- জহর গাঙ্গুলী, অয়স্কান্ত-- রতীন বন্দ্যোপাধ্যায়, বিচিত্রকুমার-- সন্তোষ সিংহ, পাটেশ্বরী--

---

* 'মধুমালার গোড়ার কথায়' পরিচালক বীরেন্দ্রকৃষ্ণ ভদ্র লিখেছেন -- "গদাধর বাবু ও তাঁর পুত্র শ্রীমান বিদ্যাধর মল্লিক ও জামাতা শ্রীরঘুনাথ মল্লিক একত্রে যখন একটি খুব ভাল নাটক মঞ্চস্থ করবার সঙ্কল্প করলেন তখন আমাদের হাতে প্রযোজনা করার মত কোন নাটক ছিল না।

আব্দুল আজীজ আল আমান 'নজরুল রচনা সম্ভার' (২য় খণ্ড) তে নাটকটির 'নাট্যভারতীতে' অভিনয়কাল ১৯৪৫ বলে উল্লেখ করেছেন। পরিচালক বীরেন্দ্রকৃষ্ণ ভদ্রও সম্ভবত স্মৃতিভ্রষ্ট হয়ে উক্ত সময়কেই অভিনয়কাল নির্দেশ করেছেন। কিন্তু ১৯৪৪র জানুয়ারীর পর 'নাট্যভারতীর' অস্তিত্ব ছিল না। তাছাড়া 'অমৃত বাজার পত্রিকায়' প্রকাশিত 'মধুমালার' প্রথম অভিনয় সংক্রান্ত একাধিক বিজ্ঞাপন থেকে আমাদের প্রদত্ত তারিখটিই পাওয়া যাচ্ছে। কাজেই 'মধুমালা' প্রথম মঞ্চস্থ হয় ১৯৪৫এ নয়, নিশ্চিতভাবে ১৯৩৯র ১৯শে অক্টোবর তারিখে। এ ব্যাপারে পরিশিষ্ট দ্রষ্টব্য।

রাজলক্ষ্মী (বড়), কাঞ্চনমালা, নিরুপমা, মন্দিরা, সুহাসিনী, মধুমালা, সাবিত্রি দেবী এবং আরো অনেকে। নাটকটির প্রযোজক ছিলেন বিদ্যাধর মল্লিক, সঙ্গীত পরিচালক ধীরেন্দ্রনাথ দাস, নৃত্য পরিচালক সমর ঘোষ এবং দৃশ্যপট নির্মাণ করেছিলেন প্রখ্যাত মনীন্দ্রনাথ দাস (নানুবাবু)। সঙ্গীতে সুরারোপ করেন কবি স্বয়ং।

বহু অর্থ ব্যয় করে 'নাট্যভারতী' কর্তৃপক্ষ সঙ্গীতবহুল 'মধুমালা' মঞ্চস্থ করলেও, সমকালীন দর্শক সমাজকে ততটা আকৃষ্ট করতে পারেননি। তার প্রধান কারণ, নাট্য-নির্বাচনে বাস্তব দৃষ্টিভঙ্গীর অভাব। সমকালীন দর্শকের মন ও মেজাজ তখন দ্রুত পরিবর্তিত হতে শুরু করেছিল; তাদের হাতে তুলে দেবার সামগ্রী এ নয়। আবেগ জড়িত অতিলৌকিক ভাবরসে অবগাহনের মধ্যযুগীয় মানসিকতা থেকে যুদ্ধ বিধ্বস্ত বাংলার দর্শক সমাজ যে নতুন জীবন জিজ্ঞাসায় উত্তীর্ণ হয়েছেন, এই সহজ সত্যটি 'নাট্যভারতীর' কর্তৃপক্ষ মাথায় রাখতে পারেননি। তাই মাত্র চল্লিশ রাত্রি কোনক্রমে অভিনয়ের পর 'মধুমালা' সার্বিক ব্যর্থতার দায় মাথা পেতে নিয়ে রঙ্গমঞ্চ থেকে বিদায় গ্রহণ করে।[১]

বাংলার লোকসমাজে 'পূর্ববঙ্গ গীতিকা' বা 'মৈমনসিংহ গীতিকার' বিশিষ্ট প্রভাব আছে। সঙ্গীত বহুল 'মধুমালার' আখ্যানভাগ নির্মিত হয়েছে 'পূর্ববঙ্গ গীতিকার' তেমনি একটি লৌকিক কাহিনীর ওপরে ভিত্তি করে। কিন্তু যে উপাদান কাব্যিক উৎকর্ষ বিধানে সহায়ক হয়ে রস পিপাসু চিরন্তন মানবের রসতৃষ্ণা নিবারণ করতে পেরেছে, উৎকৃষ্ট নাট্যরস সৃষ্টিতে তা প্রধান অন্তরায় হয়ে দাঁড়িয়েছে উভয় শিল্পরীতির বৈপরীত্যের কারণে। তদুপরি কবির প্রতি যথোচিত শ্রদ্ধা রেখে অত্যন্ত বিনয়ের সঙ্গেই এ কথা বলছি, কাব্যের কাঁচামাল নাটকের মোড়কে পরিবেশন করতে তিনি ব্যর্থই হয়েছেন। 'মধুমালার' অঙ্গে অঙ্গে কাব্যের বৈচিত্র্যময় অলঙ্কার নাটকের গোত্র থেকে তাকে বহু দূরে সরিয়ে রেখেছে। কাহিনী বিন্যাসে রূপকথাধর্মী অতীতচারিতা, চরিত্র চিত্রণে প্রত্যাশিত নাট্যদ্বন্দ্বের অভাব, ঘটনা-সংস্থাপন কিম্বা পরিবেশ পরিস্থিতি পরিকল্পনায় অতিলৌকিক ভাবালুতা 'মধুমালার' শিল্প কৌশলগত ত্রুটি হিসাবেই বিবেচ্য। সর্বোপরি যুগ চেতনার প্রতিফলন এই অপেরাটিতে পুরোপুরি অনুপস্থিত; সমকালীন চৈতন্য প্রবাহকে স্পর্শ করবার বিন্দুমাত্র প্রচেষ্টাও আমরা এই অপেরাটিতে দেখতে পাইনা।

---

[১] 'মধুমালার গোড়ার কথায় পরিচালক স্বয়ং লিখেছেন 'ঐ সময় অপেরার বিপুল ব্যয়ভার গ্রহণ করার জন্য যে দর্শকের সমাগম হওয়া বাঞ্ছনীয় ছিল তা হল না। একক্ভাবে গীতিনাট্য দেখতে লোক উৎসাহ বোধ করলে না। তাই চল্লিশ রাত্রি অভিনয়ের পর আমাদের আবার অন্য নাটক প্রযোজনা করতে হয়।'

কাঞ্চননগরের যুবরাজ মদনকুমার এবং সাগর ঘেরা দ্বীপরাজ্য সন্দীপের রাজকন্যা মধুমালার অতিলৌকিক প্রণয়, এই অপেরার বিষয়বস্তু। ঘুমপরী ও স্বপনপরীর কারসাজিতে উভয়ের সাক্ষাৎ, রূপোন্মত্ততা এবং পরিশেষে একের প্রতি অন্যের তীব্র আকর্ষণ তাদের মিলন বিরহের গভীরতা মোহময় পরিবেশ এবং সাংগীতিক সুর মূর্চ্ছনায় এখানে অভিব্যক্ত হতে চেয়েছে। মুহূর্তের দর্শন মাত্রেই মদনকুমার মধুমালা পরস্পর পরস্পরকে আত্মনিবেদন করে ফেলেছে; বিরহ যন্ত্রণায় তারা উন্মাদপ্রায়। উৎকণ্ঠিত কাঞ্চননগরাধিপতি, আরাধ্য দেবতা মহাকালের নির্দেশে সপ্তডিঙা মধুকর সজ্জিত করে পুত্রকে প্রেরণ করেছেন মধুমালার দেশে। কিন্তু মহাকালের কোপে ডুবে গেছে সপ্তডিঙা মধুকর বিপন্ন মদনকুমারকে উদ্ধার করেছেন মগরাজ। তিনি বন্দী করেছেন মদনকুমারকে। মগরাজ্যের প্রতি বাঙালী জাতির অবজ্ঞার প্রতিশোধকল্পে বদ্ধপরিকর মগ রাজ তাঁর কুৎসিত কুব্জপৃষ্ঠ আকাট মূর্খ পুত্রের সঙ্গে বাংলার শ্রেষ্ঠ রাজকন্যার বিবাহ দিতে সঙ্কল্প করেছেন। সুদর্শন মদনকুমারকে পুত্র পরিচয় দিয়ে বঙ্গেশ্বরের কন্যা কাঞ্চনমালার সঙ্গে তার বিবাহ দিয়েছেন তিনি। বিবাহান্তে বন্দীদশা মুক্ত মদনকুমার মধুমালার অন্বেষণে যাত্রা করে। মগরাজের সঙ্গে যুদ্ধ বাধে বঙ্গেশ্বরের, কুৎসিত দর্শন বিচিত্রকুমার অশেষ লাঞ্ছনা ভোগ করে অবশেষে পরাজিত পিতার সঙ্গে পলায়ন করে প্রাণরক্ষা করে। বিপন্ন পুত্রের অন্বেষণে এক সময় সে রাজ্যে উপস্থিত হন কাঞ্চননগরের রাজা ও রাণী। কাঞ্চনমালাকে তাঁরা পুত্রবধূরূপে সানন্দে গ্রহণ করেন। কাঞ্চনমালা যোগিনীর বেশে মদনকুমারের খোঁজে বিবাগী হয়ে যায়।

এদিকে সন্দীপরাজ মদনকুমারের খোঁজে দেশে দেশে লোক পাঠিয়েছেন-- ঘোষণা করেছেন লক্ষ মুদ্রা পারিতোষিক। অবশেষে ঘুমপরী ও স্বপনপরীর কৌশলে মদনকুমার ও মধুমালার মিলন ঘটে। আনন্দে অভিভূত হয়ে ওঠে সমগ্র সন্দীপরাজ্য। কিন্তু এই মিলন মুহূর্তে দূর থেকে ভেসে আসে বিরহিনী কাঞ্চনমালার করুণ সংগীতের সুর। পরিশেষে কাঞ্চনমালাকে উদ্ধার করে তারই হাতে মদনকুমারকে সমর্পণ করে সমুদ্র-গর্ভে আত্মাহুতি দিয়ে প্রাণ বিসর্জন করে মধুমালা।

দৃশ্য বিভাগ বর্জিত, তিনটি অঙ্কে বিন্যস্ত এই আখ্যানে অজস্র ত্রুটি বর্তমান। মদনকুমার ও মধুমালার প্রণয়তৃষ্ণাকে নিছক রূপোন্মাদনার উর্দ্ধে গণ্য করা যায় না। কাঞ্চনমালার প্রসঙ্গটি একেবারেই অপ্রত্যাশিত এবং অনাবশ্যক। মধুমালার সমুদ্রগর্ভে আত্মবিসর্জন অতি-নাটকীয়তা দোষে দুষ্ট। মহাকালের নির্দেশেই মদনকুমারের সমুদ্রযাত্রা, অথচ বিপদকালে তাঁর অদ্ভুত নীরবতা বিসদৃস ঠেকেছে। অয়স্কান্ত, চন্দনা প্রমুখের রঙ্গরস স্থূল গ্রাম্যতা দোষে দুষ্ট। চরিত্রগুলিও অনেকাংশে অপরিণত। সংগীতের বাহুল্য রীতিমত ক্লান্তিকর।

॥ ব্ল্যাক আউট ॥

১৯৪০ এ গঠিত 'মিনার্ভা লিমিটেড কোম্পানী' আর্থিক প্রতিকূলতা কাটিয়ে উঠবার জন্যে বিশেষ কতকগুলি উদ্যোগ গ্রহণ করে। মোটামুটি ভাবে নতুন স্বাদের সামাজিক নাটক অভিনয়ের দিকেই কোম্পানীর প্রবণতা দেখতে পাই। তন্মধ্যে কলকাতা রেডিওর প্রাণপুরুষ বীরেন্দ্রকৃষ্ণ ভদ্রের রঙ্গনাট্য (Pantomime) 'ব্ল্যাক আউট' অন্যতম। ১৯৪১র ১৩ই সেপ্টেম্বর শ্রীযুক্ত কালীপ্রসাদ ঘোষের পরিচালনায় রঙ্গনাট্য 'ব্ল্যাক আউট' পাদ প্রদীপের আলোয় প্রথম আত্মপ্রকাশ করে। কিন্তু 'মিনার্ভার' তৎকালীন অর্থনৈতিক দূরবস্থা থেকে উত্তরণে এই রঙ্গনাট্যটি কোনভাবেই সাহায্য করেনি। এটিও 'মিনার্ভার' অন্যতম ব্যর্থ প্রয়াস। নিম্নে এই রঙ্গনাট্যের প্রথম অভিনয় রজনীর চরিত্রলিপি পেশ করা গেল ঃ শ্রীদুর্গা- উষারাণী: লক্ষ্মী রাধা (ছোট): সরস্বতী সরস্বতী: জয়া ও ঝি করুণাময়ী; বিজয়া - কমলাবালা: গিন্নী নীরদা সুন্দরী: মালতী অপর্ণা দাস: সবুজপক্ষ ও কনে উমা মুখার্জী: ভূতি রেণুকাদেবী: কর্তার কন্যাদ্বয় আশালতা ও প্রভা: গণেশ বিজয় নারায়ণ মুখোপাধ্যায়: কার্তিক ও পাগলা শান্তি মুখোপাধ্যায়: নন্দী ও মাখন অমল বন্দ্যোপাধ্যায়: ভৃঙ্গী ও বর মৃণাল ঘোষ: ভূতেশ্বর ও গোপীকান্ত রঞ্জিত রায়: ম্যাজিস্ট্রেট ভানু চট্টোপাধ্যায়: ন কড়ি শিবকালী চট্টোপাধ্যায়: কালাচাঁদ নারাণ দাস মিত্র: চিন্ময় - অনাদী গাঙ্গুলী: পটলা কেষ্ট দাস: গণশা প্রশান্ত কয়াল এবং আরও অনেকে।

এই রঙ্গনাট্যটি রচনার ও 'মিনার্ভা' থিয়েটারে অভিনয়ের একটি দীর্ঘ ইতিহাস আছে।* নকসার আকারে রচিত স্বল্প দৈর্ঘের 'ব্ল্যাক আউট' বেতার নাট্য রূপে একরাত্রি অভিনীত হয়। পক্ষকালের মধ্যে 'হিজ মাষ্টারস কোম্পানী' তা রেকর্ড করেন এবং দুখানি পত্রিকায় নকশাটি মুদ্রিত হয়। এরপরে বিশ্বনাথ চক্রবর্তী, কালীপ্রসাদ ঘোষ এবং রঞ্জিত রায় 'ব্ল্যাক আউট' অভিনয়ের ইচ্ছা প্রকাশ করলে নাট্যকার নকশাটিকে মঞ্চোপযোগী করে পুনর্নির্মাণে সচেষ্ট হন। প্রধানত কালীপ্রসাদ ঘোষ এবং রঞ্জিত রায়ের অত্যুৎসাহে দশ মিনিটের বেতার-নকসা 'ব্ল্যাক আউট' ঘণ্টা দুয়েকের নাট্য পরিসরে বিস্তৃতি লাভ করে। উৎসাহের আতিশয্যে কালীপ্রসাদবাবু প্রস্তাবনার ব্ল্যাক আউট গানটি এবং বরকনের দীর্ঘ গানটি নিজেই রচনা করে ফেলেন। ভূতেশ্বরের গান দুটি রচনা করে দেন বিদ্রোহী কবি কাজী নজরুল ইসলাম। এইভাবে মোটামুটি বহুজনের মিলিত চেষ্টায় 'ব্ল্যাক আউট' বর্তমান চেহারা নিয়ে 'মিনার্ভা' থিয়েটারে অবশেষে আত্মপ্রকাশ করে। প্রত্যাশা মতই

---

* নাট্যকার কৃত 'ভীষণ ভূমিকা' দ্রষ্টব্য।

সঙ্গীত পরিচালনার দায়িত্ব গ্রহণ করেন রঞ্জিত রায় এবং নৃত্য পরিচালকের দায়িত্ব প্রাপ্ত হন শ্রীযুক্ত রতন সেনগুপ্ত।

মর্ত্যলোকে পূজোর বাজনা বেজে উঠেছে; কৈলাসপুরীতে দেবী দুর্গা সপরিবারে পিত্রালয়ে আগমনের প্রস্তুতিতে অত্যন্ত ব্যস্ত। কিন্তু এই দুর্গা আমাদের চির পরিচিত দশভুজা দেবী দুর্গা নন -তিনি এই মর্ত্যালোকেরই সঙ্কটাপন্ন গৃহকর্ত্রীর প্রতিনিধি স্থানীয়া। লক্ষ্মী, সরস্বতী, কার্তিক, গণেশ এই চার সন্তানের নিত্য নতুন বায়নাক্কায় জননী দুর্গার নাজেহাল অবস্থা। অলকা, তিলকা, মেনকা, নন্দী, ভূতেশ্বর--এদেরও সকলকে নিয়ে চলতে হয় তাঁকে। তিনি সেকেলে মানুষ, হাল আমলের আদব কায়দা কিছুই বোঝেন না; বরং সে ব্যাপারে রীতিমত শঙ্কিত। নন্দীর কাছ থেকে দুর্গা মর্ত্যালোকের সংবাদ শোনেন। অন্তরে অন্তরে তিনি ব্যাকুল হয়ে ওঠেন বাংলাদেশের হাল হকিকৎ শুনে, অবশেষে দিব্যদৃষ্টিতে প্রত্যক্ষ করেন ব্ল্যাক আউটের পটভূমিতে বাংলাদেশের অন্ধকারাচ্ছন্ন প্রতিচ্ছবি। সে ছবিও খুব স্পষ্ট নয় অন্তত যুদ্ধকালীন জীবন সঙ্কটের দিনলিপি সেখানে অনুপস্থিত। ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত পরস্পর যোগসূত্রহীন কতকগুলি বিচ্ছিন্ন ঘটনার বিবরণ পেশ করেই নাট্যকার ক্ষান্ত হয়েছেন। জীবনের গূঢ়তম কোন সমস্যাকে তা স্পর্শ করেনি অথবা নির্মল হাস্যরস সিক্ত জীবন সমস্যার রূপায়ণও তা হয়ে উঠতে পারেনি। তাই মর্ত্যলোকবাসীর দুঃখ বেদনায় জননী দুর্গার উদ্বেগ আকুলতার সঠিক কারণ নির্ধারণ করাও রীতিমত দুরূহ। কেননা সমস্যাই যেখানে নেই, তার সমাধান-চিন্তাও সেখানে অর্থহীন। তদুপরি জননী দুর্গা নিজের পরিবারটিকে নিয়েই যথেষ্ট বিব্রত, জগৎ কল্যাণে তাঁর দুশ্চিন্তাও তাই বিশ্বাসযোগ্যতা হারিয়েছে।

নাট্যকার একে বলেছেন Pantomime রঙ্গ নাট্য। কিন্তু 'ব্ল্যাক-আউট' রঙ্গ হলেও নাট্য পদবাচ্য নয়। ব্ল্যাক আউটের ফলে উদ্ভূত পরিস্থিতির কতকগুলি টুকরো টুকরো ছবি বিভিন্ন দৃশ্যে ধরা পড়েছে। দৃশ্যগুলির মধ্যে সংযোগহীনতা হেতু নিটোল নাট্য কাহিনী গড়ে ওঠেনি। আধুনিক এ্যাবস্ট্রাক্ট ড্রামাও এ নয়। নিছক আনন্দ দানের উদ্দেশ্যে বিভিন্ন প্রসঙ্গের অবতাড়না করা হয়েছে। প্রসঙ্গগুলিও কোনদিক থেকেই জীবনকে গভীর ভাবে স্পর্শ করেনি। অর্থাৎ সমকালীন জীবন যন্ত্রণার উপলব্ধি ঘটেনি এই রঙ্গনাট্যে। সেদিক থেকে নাট্যকার তাঁর দায়িত্বকে সযত্নে এড়িয়ে গেছেন। তাই লঘুনাট্যের পর্যায়ে এই রঙ্গনাট্যটি উত্তীর্ণ হতে পারেনি।

রসের বিচারে 'ব্ল্যাক আউট' প্রধানত কৌতুক রসাশ্রিত। স্বর্গ ও মর্ত্য উভয়লোকের নানাবিধ ঘটনা ও চরিত্রগত অসঙ্গতিকে কেন্দ্র করে এই কৌতুকের উদ্ভব এবং অনেকাংশেই তা স্থূলরুচি ও গ্রাম্যতা দোষে দুষ্ট। অপেরা বা গীতাভিনয়ের প্রচলিত রীতি অনুসারে

ভক্তি অথবা করুণ রসকে নাট্যকার আশ্রয় হিসাবে গ্রহণ করেননি। সেদিক থেকে তিনি একটু অভিনবত্ব দেখাতে চেয়েছেন। যুদ্ধকালীন নগর জীবনের প্রাত্যহিক দিনলিপি থেকে উপাদান সংগ্রহ করে তার বিরুদ্ধে তিনি কৌতুকের অস্ত্র শানিয়েছেন। কিন্তু তার পশ্চাতে হৃদয়ের স্পর্শ নেই। ফলে নিছক রঙ্গ ব্যঙ্গের সীমানা ছাড়িয়ে তা সার্থক শিল্পের আঙ্গিনায় পদার্পণ করতে পারেনি।

মনোহর দৃশ্যপট এবং সংগীতের ব্যাপক প্রয়োগ অপেরার আখ্যানভাগের শিথিলতা দূরীকরণের সহজসিদ্ধ পন্থা। অপেরা বা গীতাভিনয়ে তাই সংগীত ও নৃত্যের একটা বাড়তি আকর্ষণ থাকে। ঘটনাগত পরম্পরাহীন, পরস্পর যোগসূত্ররহিত বিচ্ছিন্ন কতকগুলি দৃশ্যের সমন্বিত রূপ 'ব্ল্যাক আউট' সেদিক থেকেও সম্পূর্ণ ব্যর্থ। সংগীত ও নৃত্য এখানে দুর্বল কাহিনীর পরিপূরক তো হয়ে ওঠেইনি, এবং অনেকাংশেই ক্লান্তিকর এবং অপ্রাসঙ্গিক। সম্ভবত বহু জনের সম্মিলিত চেষ্টায় এর দেহ সৌষ্ঠব রচিত হয়েছে বলে এবং স্বল্প দৈর্ঘ্যের নকসাটিকে অকারণ বিস্তৃতি দানের তাগিদ অন্তরালে কাজ করেছে বলে 'ব্ল্যাক আউট' তার সাবলীলতা হারিয়েছে।

বহু চরিত্র এই নাটকে ভিড় করেছে। কিন্তু কোন চরিত্রই বিশেষ ভাবে আমাদের মনে রেখাপাত করেনা। চরিত্রগুলির বিকাশ সকল সময় স্বাভাবিক হয়নি। ব্ল্যাক আউটের আবছা অন্ধকারে তাদের অস্পষ্ট অঙ্গভঙ্গিই শুধু দেখা গেছে সুখ দুঃখ, আনন্দ বেদনায় মুখাবয়বের অভিব্যক্তি স্পষ্ট হয়ে ওঠেনি। নাটকের সংলাপ মোটামুটি উপভোগ্য। স্থান কাল ও ঘটনাগত নাটকীয় ত্রি ঐক্য লঙ্ঘিত হয়েছে। নাটকের শেষে দেবীর আগমনে জগতের অন্ধকার মোচনের অতি সুলভ তত্ত্ব প্রচারে নাট্যরস খণ্ডিত হয়েছে।

দশম অধ্যায়

উত্তরকালের নাট্য আন্দোলনের গতি-প্রকৃতি

জার্মান নাট্যকার ব্রেখট (বা ব্রেশট) চলতি থিয়েটারের বিরুদ্ধে সরাসরি জেহাদ ঘোষণা করেছিলেন; 'মেহর গুটেনশ্‌পোর্ট' প্রবন্ধে দ্বিধাহীন ভাষায় তিনি মত ব্যক্ত করেছিলেন এইভাবে :

'যে থিয়েটারের সঙ্গে জনগণের সম্পর্ক নেই সে থিয়েটার অর্থহীন। চলতি থিয়েটারও যে এই রকম অর্থহীন, তার প্রথম প্রমাণ এই থিয়েটার জানেই না জনগণ তার কাছ থেকে কি আশা করে, কি চায়। এবং যেহেতু সে তা জানে না সেহেতু এই থিয়েটার জনগণের ঐ চাহিদা সম্পর্কে কিছু করতে অপারগ; যদি সে এখন সে সম্বন্ধে জানতেও চায় জনগণ তাকে আর চায়না।'[১]

নাটকের কাছে আধুনিক জনগণের প্রত্যাশার এমন স্পষ্ট স্বীকারোক্তি প্রায় বিরল। ব্রেখট বুঝেছিলেন নান্দনিক শুচীবায়ু পরিত্যক্ত না হলে জনতার নাটক জনগণেশের অর্ঘ লাভে সমর্থ হবে না। যুদ্ধকালীন ক্রান্তিলগ্নের উপান্ত ভাগে পৌঁছে অনুরূপ ভাবনার আলোড়ন কম-বেশি আন্দোলিত করছিল বাংলা নাটকের উর্বর প্রাঙ্গণকেও। আর এ কাজে অগ্রণী ভূমিকা নিঃসন্দেহে আই.পি.টি.এ.-র অনুগামী নাট্যকারবৃন্দের 'অঞ্জনগড়', 'কেরাণী' এবং 'নবান্ন' থেকে যার সূত্রপাত। শুধু নাটক কেন, সামগ্রিক ভাবে শিল্প সংস্কৃতি কি? তার উদ্দেশ্যই বা কি? তার যথার্থ রসভোক্তাই বা কারা? এমন বহুবিধ দার্শনিক প্রশ্নের উত্তর খুঁজতে গিয়ে তাঁরা দেখলেন, বিপুল জনতা চলে দলে দলে। দ্বিধাহীন অকপটে তাই শিল্প সংস্কৃতিকে জনতার আম-দরবারে পৌঁছে দিয়েছেন তাঁরা। বাংলা নাটকেও জনতার এই অভ্যুত্থানকে বরণ করে নিতে হল আন্তরিক প্রযত্নে। জনতার অন্তর্ভুক্তি নয় – অন্তর্ভুক্তি ঘটেছিল কিছু পূর্বেই, এখন ঘটল অভ্যুত্থান; নাট্যচক্রের প্রধান কীলক রূপে আম-জনতাকে প্রতিষ্ঠিত হতে দেখলাম আমরা।

---

[১] ব্রেশট ও তাঁর থিয়েটার—সত্য বন্দ্যোপাধ্যায়, পৃষ্ঠা- ৯৯ দ্রষ্টব্য।

নিঃসন্দেহে এই প্রতিষ্ঠা এনে দিয়েছে সমকালীন রাজনৈতিক অস্থিরতা এবং আর্থ সামাজিক প্রেক্ষাপট। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের অন্তিম লগ্নে পৃথিবী ব্যাপী নাৎসী জার্মানীর পশ্চাদাপসরণ এবং পরিশেষে সোভিয়েত জনগণের গণতন্ত্র রক্ষায় অভাবনীয় সাফল্য বৃটিশ-ভারতের মানুষকে নতুন করে উদ্বুদ্ধ করেছিল। কিন্তু আন্তর্জাতিক রাজনীতির পট-পরিবর্তন সঞ্জাত বিপুল প্রত্যাশা, দেশ বিভাগের রক্তাক্ত ক্ষত বাহিত স্বাধীনতা প্রাপ্তির নিদারুণ বেদনায় পর্যবসিত হল মহাযুদ্ধান্তে উপনীত হয়ে! সাম্রাজ্যবাদ অন্তর্হিত হল বটে, তবে চরম মর্ম-যন্ত্রণায় তাকে নিত্য স্মরণের ব্যবস্থা করে দিয়ে গেল পাকাপাকি ভাবে। সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা, দুর্ভিক্ষ, মন্বন্তর, উদ্বাস্তু সমস্যা এবং সর্বোপরি নৈতিক মূল্যবোধ বিবর্জিত স্বাধীনতোত্তর রাষ্ট্রকাঠামোর যূপকাষ্ঠে বলি প্রদত্ত হল তরুণের স্বপ্ন! জাতীয় জীবনে মোহ ভঙ্গের এই মর্মবেদনা, গণনাট্য আন্দোলনে গণকণ্ঠকে আশ্রয় করে সোচ্চার হয়ে উঠেছে। গণনাট্য আন্দোলন শিল্পের পরিকাঠামোয় সমস্ত রকম বঞ্চনা থেকে মুক্তিকামী মানুষের আন্দোলন।

অথচ কলকাতার পেশাদারী নাট্যশালাগুলি এই আন্দোলনের শরিক হতে পারেনি; নাট্যাভিনয়ের গতানুগতিক ধারাতেই তারা আবদ্ধ থেকেছে কিম্বা থাকতে চেয়েছে। যুগানুবর্তিতার বিপরীতে নিরুপদ্রব ঘেরাটোপেই তাদের অবস্থান। ইতিহাস, পুরাণ, সমাজ দর্শনের তাত্ত্বিক বিচার বিশ্লেষণ জাত নব মূল্যায়ণের মধ্যেই তারা আধুনিকতাকে সীমাবদ্ধ রেখেছে। এর পশ্চাতে নিবদ্ধ কারণগুলি অনুসন্ধান সাপেক্ষ; ক্রম অনুসারে সেগুলিকে নিম্নোক্ত রূপে বিন্যস্ত করে নেওয়া যায় ঃ

ক) হল মালিকদের ব্যবসায়িক মনোভাব।
খ) মঞ্চাভিনয়ে ব্যক্তি বিশেষের প্রাধান্য—যা গণনাট্যের পরিপন্থি।
গ) বামপন্থী মতবাদে যথাযোগ্য অনুশীলনের অভাব।
ঘ) গণনাট্যের প্রতি নেতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গি।
ঙ) আলস্য-জনিত আত্মতৃপ্তি।

কালের নিয়মেই শিল্প তার বিবর্তনের পথ রেখা অনুসরণ করে অভিব্যক্ত হয়ে থাকে। এই বিবর্তনের কোন পূর্ব কল্পিত সিদ্ধান্ত গ্রহণ সম্ভব নয়; যুগাবয়বের চিত্রকল্প রচনায় অগ্রণী শিল্পকলা তার পথের দুপাশ থেকেই উপাদান সংগ্রহ করে নেয়। কলকাতার যুদ্ধোত্তর পেশাদারী নাট্যশালাগুলি এ ব্যাপারে সক্রিয় ভূমিকা গ্রহণ করতে ইতস্ততঃ বোধ করেছে। অর্থোপার্জনের নিমিত্ত-স্বরূপ ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠানে পরিণত হতে শুরু করেছিল এ কালের নাট্যশালাগুলি। হল মালিকদের নিতান্ত ব্যবসায়িক দৃষ্টিতে, গণ-জাগরণ অপেক্ষা নিরুপদ্রব অভিনয় ধারা, অব্যাহত রাখাটাই জরুরি হয়ে পড়েছিল। ঝঞ্ঝা-বিক্ষুব্ধ পটভূমির উপান্তে এসে এরা নতুন করে ঝুঁকি নিতে আর প্রস্তুত ছিলেন না। তাই যুদ্ধকালীন জীবন-বিপর্যয়ের আলেখ্য রচনায় অঙ্গীকারবদ্ধ নাট্যশালাগুলি তাদের কৌলীন্য থেকে কিছুটা ভ্রষ্ট হয়ে পড়েছিল। বামপন্থী আন্দোলন সম্পর্কে নাট্যশালার ভাগ্য নিয়ন্ত্রক মালিক পক্ষের অস্বাভাবিক ভীতি এই পদচ্যুতির অন্যতম কারণ। পূর্বেই

উল্লেখ করেছি, কমিউনিস্ট ভাবধারার প্রতি জনমানসে সেদিন যথেষ্ট বিভ্রান্তি সৃষ্টি হয়েছিল। অজ্ঞতা কিম্বা প্রত্যক্ষ সংযোগের অভাব হেতু মালিক পক্ষ বামপন্থী সংশ্রব থেকে দূরে সরে থাকাটাই শ্রেয় বোধ করেছিলেন এবং গণনাট্যের কর্মীরাও এদেরকে বামপন্থী আন্দোলনের শরিক করে তুলতে সচেষ্ট হননি কিম্বা হতে চাননি। এই বিমুখতা থেকেই উদ্ভব গণনাট্যের প্রতি নেতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গির। মঞ্চাভিনয়ে এক নায়কতন্ত্রের প্রাধান্যও পেশাদারী নাট্যশালায় গণনাট্যের সম্ভাবনা বানচাল করে দিয়েছে। বাংলা নাটকে একক অভিনয় নির্ভরতার যুগ শেষ হয়ে গিয়েছিল, সামগ্রিক উৎকর্ষতার ওপর নির্ভরশীল যুদ্ধোত্তর আধুনিক গণচেতনা সমৃদ্ধ বাংলা নাটক। পেশাদারী নাট্যশালা তাকে স্বীকার করতে কুণ্ঠা বোধ করেছে। সর্বোপরি আলস্যজনিত আত্মতৃপ্তির দুর্বার মোহ এদের গ্রাস করেছিল।

কর্মে ও কথায় সত্য আত্মীয়তা অর্জনের অকৃত্রিম উদ্যোগ নিয়ে এরই সমান্তরালে গণনাট্য সংঘের আত্মপ্রকাশ। ফ্যাসী বিরোধী লেখক ও শিল্পী সংঘের সাংস্কৃতিক শাখা হিসাবে গণনাট্য সংঘ তার কর্মপন্থা নির্ধারণ করেছে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের চোরাবালিতে আকণ্ঠ নিমজ্জিত বাংলার মানুষের চরম দুর্দশার চিত্রকে সর্বভারতীয় সুরে উপস্থাপিত করে তাকে জাতীয় সমস্যা হিসাবে তুলে ধরতে চেয়েছেন বাংলার গণনাট্য সংঘের কর্মীরা। এই ভাবে একটি প্রাদেশিক সমস্যা জাতীয় সমস্যায় রূপ লাভ করেছে এবং এই ব্যাপ্তি ভারতীয়ত্ব বোধের এই উদ্দীপনা এদের কর্মপন্থার প্রধানতম বৈশিষ্ট্য। কিন্তু গণনাট্য সংঘ নৈরাশ্যবাদের উপাসক নয়; কমিউনিস্ট ভাবধারায় লালিত ও পুষ্ট এই সংঘ আপোষহীন শ্রেণী সংগ্রামের বন্ধুর পথে সাম্যবাদী সমাজ গঠনের অঙ্গীকারকে নাটকে, শিল্পে, সংগীতে বলিষ্ঠ ভাষায় প্রকাশ করেছে। গণনাট্য সংঘের ঘোষণাপত্রে সেই অঙ্গীকার অত্যন্ত স্পষ্ট ঃ

"It is a movement which seeks to make of our arts the expression and the organizer of our people's struggle for freedom, economic justice and a democratic culture. It stands for the defence of culture against imperialism and fascism and for enlighting the masses about the causes and solution of the problems facing them."[২]

তাহলে বোঝা যাচ্ছে, দলিত মানুষকে সংঘবদ্ধ হবার প্রেরণা জুগিয়েছে এই আন্দোলন এবং তাদের বাঞ্ছিত শোষণমুক্ত সমাজ গঠনের প্রত্যাশা পূরণের পন্থাও নির্ধারণ করে দিয়েছে। লক্ষ্য যেহেতু 'গণ' অভিধাভুক্ত সাধারণ নর নারী অতএব সাধারণের সহজে বোধগম্য নাট্য প্রযোজনার গুরুত্ব সর্বাধিক স্বীকৃত গণনাট্যের ঘোষণাপত্রে।[*] কাজেই নাট্য বিচারের শাস্ত্রসিদ্ধ পরিধির সীমারেখার বহু বাইরে বিস্তৃত গণনাট্যের কর্মশালা।

---

২ Marxist Cultural Movement in India (Part I) pp. 127— Edited by Sudhi Pradhan

* গণনাট্যের খসড়া সংবিধানে স্পষ্ট বলা হয়েছে — "Our productions should be simple and direct."

'নবান্ন' র পর বিজন ভট্টাচার্যের 'কলঙ্ক', 'অবরোধ' 'মরাচাঁদ' 'জীয়নকন্যা' 'জননেতা' কিম্বা 'গোত্রান্তর' নতুন দিনের নাট্য ভাবনায় ভাবিত নাটক। দিগিন্দ্রচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'তরঙ্গ', 'বাস্তুভিটা' 'মোকাবিলা' 'মশাল' প্রভৃতি নাটকে যুদ্ধোত্তর সমাজ বিপর্যয়ের বস্তুবাদী জীবন দর্শন প্রতিফলিত। পূর্ণাঙ্গ নাটকের পাশাপাশি একাঙ্ক নাটকের সীমিত পরিসরেও দিগিন্দ্রচন্দ্র এই জীবন বেদকে চমৎকার স্পর্শ করেছেন: 'কাঁঠালের আমসত্ত্ব' কিম্বা 'গোলটেবিল' যার সার্থক দৃষ্টান্ত। 'দুঃখীর ইমান' তুলসী লাহিড়িকে প্রতিষ্ঠিত করেছিল ভবিষ্যৎ প্রজন্মের অন্যতম পথিকৃৎরূপে: 'পথিক' 'ছেঁড়া তার', 'বাংলার মাটি', 'লক্ষ্মীপ্রিয়ার সংসার' প্রভৃতি নাটকেও তাঁর অনন্য পথ নির্দেশিকা অবিসংবাদিত রূপে প্রমাণিত। সলিল সেনের 'নতুন ইহুদী', 'দপণ', 'মৌচোর' 'দিশারী', ছবি বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'কেরাণীর জীবন', 'চোর' 'স্ট্রীট বেগার', কিরণ মৈত্রের 'বারো ঘন্টা', 'সঙ্কেত'; মনোরঞ্জন বিশ্বাসের 'আমার মাটি', ঋত্বিক ঘটকের 'দলিল'; শশিভূষণ দাসগুপ্তের 'দিনান্তের আগুন'; সুনীল দত্তের 'জতুগৃহ'; 'অভিশপ্ত ক্ষুধা', মনোজ বসুর 'বিপর্যয়'; উৎপল দত্তের 'ছায়ানট', কিম্বা 'অঙ্গার' দ্রুত পরিবর্তনশীল সমাজের বিভিন্ন প্রান্তকে সজীব মমতায় স্পর্শ করেছে। রক্তে আর ঘামে ভেজা বাঙলার মাটির রস নিঙড়ে এই সমস্ত নাটকের শিকড়ে শিকড়ে সঞ্চারিত করে দিয়েছেন এঁরা!

গণনাট্য বিশেষ কোন দল বা গোষ্ঠী নয় সর্বভারতীয় স্তরে সাংস্কৃতিক আন্দোলনের রূপরেখা গণনাট্য অভিধায় অভিব্যক্ত হতে চেয়েছে।[৪] সংগীত, নৃত্য, ছায়ানাট্য, কবিগান, কিম্বা শুধুই কবিতা এ সমস্তই গণনাট্যের পতাকা তলে ভারতীয় সংস্কৃতির মেল বন্ধনের ক্ষেত্র প্রস্তুত করছিল চল্লিশের দশক থেকে। অর্থাৎ গণনাট্য নামের ছত্রছায়ায় বৈচিত্র্যময় শিল্প সংস্কৃতি, নয়া ভাব পরিমণ্ডলকে প্রতিধ্বনিত করতে চেয়েছে তার উন্মেষ লগ্ন থেকে! নাটক সেই নবোদ্ভূত ভাব প্রবাহ সঞ্চারকের গুরু দায়িত্ব পালনে সসম্মানে উত্তীর্ণ। 'নবান্ন' র প্রয়োজনায় চূড়ান্ত সাফল্য তার চরমতম সিদ্ধি।

গণনাট্য আন্দোলনের স্রোতোধারায় সাফল্যের এই প্রবল জোয়ার স্তিমিত হয়ে পড়লো অচিরে। সংগঠনের তাত্ত্বিক বিচার বোধের সংকীর্ণতা কিম্বা জীবন দর্শনের অনভিপ্রেত অগভীরতা সমস্যা সৃষ্টি করল তার সিদ্ধিভূমিতে। বিশ্বনাট্যধারার ভাবচৈতন্যে অবগাহিত হয়ে এরা জাতীয়তাবাদ থেকে আন্তর্জাতিকতাবাদের মরুতীর্থে পদার্পণ করলেন সগৌরবে। 'নবান্ন' র পর অভিনয়োপযোগী বাংলা নাটকের জোগানটাই কমে গেল- অনুবাদ নাট্যের দিকেই আবার হাত বাড়াতে হল ভিক্ষুকের মত। জাতীয়তাবাদের প্রবল উদ্দীপনা ধীর লয়ে হলেও হ্রাস পেতে শুরু করল। জাতীয় জীবনের হৃদয় নিঃসারিত দাবদাহের একেবারে মূলে গিয়ে আঘাত হানতে প্রায় ব্যর্থ হলেন এঁরা। অথচ গণনাট্যের সৃষ্টিলগ্নে এই তাগিদ ছিল স্বতঃপ্রণোদিত। সমস্যার গভীরে না গিয়ে তার বাহ্যিক প্রকাশ নিয়ে

---

[৪] শারদীয়া নতুন পরিবেশ, পৃঃ ৬০, দিগিন্দ্রচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের অভিমত দ্রষ্টব্য।

দুশ্চিন্তা, গণনাট্যের দায়িত্ব ও কর্তব্যের উৎকট কৃত্রিমতার লজ্জাকে আড়াল রাখতে পারল না। এই অন্তঃসারশূন্যতা থেকে চোখ ফেরানোর সহজসিদ্ধ পন্থা হয়ে দাঁড়ালো পার্টির মতবাদ প্রচারের অতি ব্যস্ততা। সমাজের বিরুদ্ধে এঁরা আক্রমণের তীক্ষ্ণ অস্ত্র শানিয়ে তুললেন কিন্তু সমাজশুদ্ধির উপায় অনুসন্ধানে আন্তরিক হয়ে উঠতে পারলেন না। গণনাট্যের গণ ব্যাপারটি অনেকটা উপেক্ষিতই হয়ে পড়ল।

একথা অস্বীকার করবার উপায় নেই যে, গণনাট্য কর্মীদের দায়িত্ব ও আন্তরিকতার অভাব গণনাট্যের ভাঙ্গনকে ত্বরান্বিত করেছে। পেশাদারী রঙ্গমঞ্চে টালমাটাল অবস্থার ফলে যারা গণনাট্যে এসে ভিড় করেছিলেন, তাদের অনেকের মধ্যেই ন্যূনতম আদর্শের বালাই ছিল না। পেশাদারী নাট্যশালার বিকল্প ক্ষেত্র হয়ে উঠেছিল তাদের কাছে গণনাট্যের প্রাঙ্গণ। যশস্বী অভিনেতার তকমা আঁটা খ্যাতির দুর্নিবার মোহ থেকে এঁরা মুক্ত হতে পারেননি। 'নবান্ন' র প্রযোজনায় আশাতীত সাফল্য, সেই দুর্লভ সম্ভাবনার পথকে তাঁদের সম্মুখে উন্মুক্ত করে দিল। জনচেতনার কিম্বা গণনাট্যের আদর্শকে অনায়াসে বিস্মৃত হয়ে তাঁরাই সর্বাগ্রে বোম্বাই চিত্রজগতে গিয়ে ভিড় করলেন; এবং সেখানে ব্যর্থ হয়ে কেউ কেউ আবার গণনাট্যের আশ্রয়ে ফিরেও এলেন। কিন্তু দীনতার এই লজ্জা গোপনের কোন কৌশলই বিশেষ কাজে লাগল না। অর্থাৎ খ্যাতির বিড়ম্বনা এবং ব্যক্তিগত উচ্চাশার দায় গণনাট্যের ভবিষ্যৎকে কিছুটা অনিশ্চিতই করেছে।

পূর্বেই উল্লেখ করেছি, বাংলাদেশে গণ জাগরণের লক্ষ্যকে সামনে রেখে গণনাট্যের পথ চলার শুরু। কেবলমাত্র কলকাতার বিদগ্ধ বুদ্ধিজীবী নাট্যরসিকের গুরুভার মস্তিষ্কের কাছে তার আবেদন কখনই সীমাবদ্ধ ছিল না। অথচ গণনাট্যের কর্মীরা নানান অজুহাতে গ্রামাঞ্চলে গিয়ে কাজ করতে নিরুৎসাহ বোধ করছিলেন। এমনকি এই কলকাতাতেও ঘূর্ণায়মান মঞ্চ ছাড়া 'নবান্ন' র অভিনয় করতে অনেকেই রাজী হচ্ছিলেন না। উল্টোদিকে পেশাদারী নাট্যশালার হল মালিকদের অসহযোগিতায় গণনাট্যের জন্যে হল ভাড়া পাওয়াও সমস্যা হয়ে দাঁড়িয়েছিল; অতিরিক্ত ভাড়া দিয়ে প্রযোজনা করাও ব্যয় বাহুল্যে সব সময় সম্ভব হচ্ছিল না।

সরকারী মদতে গণনাট্যের যাবতীয় প্রচেষ্টা বানচাল করে দেবার কৌশলী চক্রান্ত শুরু হলো এই সময়। গণনাট্য কর্মীদের আক্রমণ, গ্রেপ্তার, অনুষ্ঠান নিষিদ্ধ ঘোষণার পাশাপাশি গড়ে উঠল 'লোকরঞ্জন শাখা' ২১শে ফেব্রুয়ারী, ১৯৫৪। দল ভাঙ্গিয়ে, গণনাট্য কর্মীদের প্রলোভন দেখিয়ে শুদ্ধ সংস্কৃতির প্রচার কর্মীতে তাঁদের রূপান্তরের চেষ্টা শুরু হল। তৎকালীন পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী ডাঃ বিধানচন্দ্র রায়ের ঐকান্তিক উদ্যোগে গণনাট্যের কৃতিকর্মী লোকরঞ্জন শাখায়' যুক্ত হয়ে কংগ্রেসী সংস্কৃতি প্রচারের মহান কর্তব্য পালনে স্বয়ং সচেষ্ট হলেন। ব্যক্তি মর্যাদার লড়াইটাও এই সুযোগে প্রকাশ্যে এসে পড়ল। গণনাট্যের কৃতি পুরুষদের অনেকেই ভেতরে ভেতরে একে অপরের প্রতিদ্বন্দ্বী ছিলেন; এই সুযোগে তাঁরা অনেকেই মূল গণনাট্য সংঘ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে ব্যক্তি কেন্দ্রিক দল গঠনে উৎসাহিত বোধ করলেন এবং গণ সচেতন শিল্পী মনন সমৃদ্ধ একমাত্র দল হিসাবে প্রত্যেকেই

নিজেদের শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণে দারুণ ভাবে আত্মনিয়োগ করলেন। এইভাবে গণনাট্যের ভাঙ্গন অনিবার্য হয়ে উঠল, তাকে আর রোধ করা গেল না।

গণনাট্যের এই সঙ্কট জন্ম দিল নয়া আর এক নাট্য আন্দোলনের—'নবনাট্য আন্দোলন" যার পোষাকী পরিচয়। গণনাট্যের 'গণ' শব্দটি অপসারিত হয়ে সেখানে যুক্ত হ'ল 'নব' কথাটি। এই অপসারণ স্পষ্ট ভাবেই নির্দেশ করে নাট্য আন্দোলনের পটভূমি থেকে 'গণ' পংক্তিভুক্ত আপামর জনসাধারণের বাধ্যতামূলক নির্বাসন। নাটককে যথা সম্ভব উন্নততর শিল্প মর্যাদায় শুদ্ধিকরণের ব্যাপক আয়োজন শুরু হয়ে গেল। গণনাট্য আন্দোলনের ভাব প্রবাহ থেকে সরে এসে কিম্বা সযত্নে তার স্পর্শ বাঁচিয়ে নাটকের বিষয়বস্তু, আঙ্গিক এবং টেকনিকের নিত্য নতুন পরীক্ষা নিরীক্ষার মধ্যে দিয়ে নবযুগ সৃষ্টির বিপুল উন্মাদনা দেখা গেল। আংশিক দুরূহতা আশ্রয় করল বাংলা নাটককে। নগরবাসী বুদ্ধিজীবী নাট্যরসিক এবং সমালোচকের প্রশংসাধন্য এই 'নবনাট্য আন্দোলন' স্বতন্ত্র রীতিতে বাংলা নাটকের ধারায় অদ্যাবধি প্রবাহিত।

'গণনাট্য' এবং 'নবনাট্য' আন্দোলনের চাপে পড়ে কলকাতার পেশাদারী নাট্যশালাগুলি প্রধানত দুটি উপায়ে নিজেদের অস্তিত্ব রক্ষার পথ খুঁজে পেলেন। আপ্রাণ চেষ্টায় তাঁরা বিষয়বস্তু ও আঙ্গিকে যথা সম্ভব গণচেতনা আনতে সচেষ্ট হলেন: জীবনধর্মী নাটকাভিনয়ে তাদের ঔৎসুক্য কিছুটা বৃদ্ধি পেল। সেই সঙ্গে জনপ্রিয় চলচ্চিত্র শিল্পীদের মঞ্চাভিনয়ে নিয়ে এসে একটা বাড়তি আকর্ষণ তারা সৃষ্টি করতে চাইলেন। মঞ্চ আলো আবহ ইত্যাদি কারিগরী ক্ষেত্রে নাট্য আন্দোলনের অভিজ্ঞ কর্মীদের নিযুক্ত করে গতানুগতিকতা মুক্তির প্রচেষ্টাও কম বেশি দেখা গেল।

গণনাট্য আন্দোলনের ভবিষ্যৎ কি—এ সম্পর্কে শেষ কথা বলার সময় এখনো আসেনি। কেননা গণনাট্যের ধারা আজও প্রবহমান। শুধু কলকাতায় নয়—কলকাতার বাইরে গণনাট্যের বিভিন্ন শাখা সংগঠন, অসংখ্য গ্রুপ থিয়েটার, গণনাট্যের আদর্শকে সামনে রেখে তাদের সংগ্রামী চেতনালব্ধ নাট্যাভিনয়ের ধারা অব্যাহত রেখেছে। উত্তরকালের হাতে তার সামগ্রিক মূল্যায়নের ভার ছেড়ে দেওয়া ছাড়া গত্যন্তর নেই।

পরিশিষ্ট

কালানুক্রমিক নাট্যতালিকা

[From 1st September 1939 to 31st December 1945)

	নাটক	নাট্যকার	রঙ্গমঞ্চ	প্রথম অভিনয় তারিখ
১	অভিযান	মহেন্দ্র গুপ্ত	মিনার্ভা	1st September, 1939
২	জাহ্নবী	ভোলানাথ কাব্যশাস্ত্রী	স্টার	2nd September, 1939
৩.	মাটির ঘর	বিধায়ক ভট্টাচার্য	রঙমহল	9th September, 1939
৪	মধুমালা	কাজী নজরুল ইসলাম	নাট্যভারতী	19th October, 1939
৫	মহামায়ার চর	যোগেশচন্দ্র চৌধুরী	নাট্যনিকেতন	1st December, 1939
৬	বিশ বছর আগে	বিধায়ক ভট্টাচার্য	রঙমহল	27 December, 1939
৭	সতী তুলসী	মহেন্দ্র গুপ্ত	স্টার	16th March, 1940
৮	আগামীকাল	আশুতোষ ভট্টাচার্য	রঙমহল	15th May, 1940
৯	উত্তরা	মহেন্দ্র গুপ্ত	স্টার	18th May, 1940
১০	নার্সিং হোম	শচীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত	নাট্যভারতী	13th June, 1940
১১.	পাঞ্জাব কেশরী রঞ্জিত সিংহ	মহেন্দ্র গুপ্ত	স্টার	13th July, 1940
১২	মালা রায়	বিধায়ক ভট্টাচার্য	রঙমহল	14th August, 1940
১৩	সিঁথির সিঁদুর	জলধর চট্টোপাধ্যায়	নাট্যভারতী	24th August, 1940
১৪	রণদাপ্রসাদ	সুধীন্দ্রনাথ রাহা	স্টার	28thSeptember, 1940
১৫.	পি.ডাবলিউ.ডি.	জলধর চট্টোপাধ্যায়	নাট্যভারতী	1st October, 1940
১৬	ঘূর্ণী	গৌর শী	রঙমহল	14th December, 1940
১৭	উষাহরণ	মহেন্দ্র গুপ্ত	স্টার	21st December, 1940
১৮	পরিণীতা	যোগেশচন্দ্র চৌধুরী	নাট্যনিকেতন	24th December 1940
১৯	রত্নদীপ	বিধায়ক ভট্টাচার্য	রঙমহল	24th December, 1940
২০	কুহকিনী	বিধায়ক ভট্টাচার্য	মিনার্ভা	22nd February, 1941
২১	ভারতবর্ষ	শচীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত	নাট্যনিকেতন	9th April, 1941
২২	কালিন্দী	তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়	নাট্যনিকেতন	12th July, 1941

	নাটক	নাট্যকার	রঙ্গমঞ্চ	প্রথম অভিনয় তারিখ
২৩	রক্তের ডাক	বিধায়ক ভট্টাচার্য	রঙমহল	12th July 1941
২৪	কবি কালিদাস	জলধর চট্টোপাধ্যায়	মিনার্ভা	20th July 1941
২৫	প্লাবন	মনোজ বসু	নাট্যভারতী	24th July, 1941
২৬.	মায়ের দাবী	তুলসী লাহিড়ী	রঙমহল	14th August. 1941
২৭	ব্ল্যাক আউট	বীরেন্দ্র কৃষ্ণ ভদ্র	মিনার্ভা	13thSeptember 1941
২৮	কঙ্কাবতীর ঘাট	মহেন্দ্র গুপ্ত	নাট্যভারতী	25th September, 1941
২৯	তুমি আর আমি	বিধায়ক ভট্টাচার্য	রঙমহল	3rd December, 1941
৩০	হাউস ফুল	জলধর চট্টোপাধ্যায়	মিনার্ভা	13th December, 1941
৩১	রাণী ভবানী	মহেন্দ্র গুপ্ত	স্টার	24th January, 1942
৩২	জীবন পথে	বিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়	রঙমহল	12th February, 1942
৩৩	সুপ্রিয়ার কীর্তি	শচীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত	মিনার্ভা	26th February, 1942
৩৪	দুইপুরুষ	তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়	নাট্যভারতী	28th May, 1942
৩৫	মাইকেল	মহেন্দ্র গুপ্ত	রঙমহল	5th June, 1942
৩৬.	ডাক্তার	গৌতম সেন	মিনার্ভা	16th June, 1942
৩৭	চিরন্তনী	বিধায়ক ভট্টাচার্য	মিনার্ভা	15th July, 1942
৩৮	পুরীর মন্দির	অশ্বিনী ঘোষ	স্টার	18th July. 1942
৩৯	ভোলা মাস্টার	অয়স্কান্ত বক্সী	রঙমহল	17th December, 1942
৪০	পথের ডাক	তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়	নাট্যভারতী	24th December, 1942
৪১.	রাণী দুর্গাবতী	মহেন্দ্র গুপ্ত	স্টার	9th January, 1943
৪২	খুনী	অয়স্কান্ত বক্সী	রঙমহল	17th April, 1943
৪৩	মাইকেল মধুসূদন	নিতাই ভট্টাচার্য	শ্রীরঙ্গম	March-April 1943
৪৪	মহারাজা নন্দকুমার	মহেন্দ্র গুপ্ত	স্টার	March-April, 1943
৪৫.	আগুন	বিজন ভট্টাচার্য	নাট্যভারতী	23rd May, 1943
৪৬	ল্যাবরেটরি	বিনয় ঘোষ	নাট্যভারতী	23rd May, 1943

	নাটক	নাট্যকার	রঙ্গমঞ্চ	প্রথম অভিনয় তারিখ
৪৭	ধাত্রীপান্না	শচীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত	নাট্যভারতী	18th November, 1943
৪৮	সানিভিলা	প্রমথনাথ বিশী	রঙমহল	23rd December, 1943
৪৯.	জবানবন্দী	বিজন ভট্টাচার্য	স্টার	3rd January, 1944
৫০.	হোমিওপ্যাথি	মনোরঞ্জন ভট্টাচার্য	স্টার	3rd January, 1944
৫১	তাইতো	বিধায়ক ভট্টাচার্য	শ্রীরঙ্গম	3rd February, 1944
৫২	টিপু সুলতান	মহেন্দ্র গুপ্ত	স্টার	19th May 1944
৫৩	রামের সুমতি	দেবনারায়ণ গুপ্ত	রঙমহল	22nd June, 1944
৫৪	নবান্ন	বিজন ভট্টাচার্য	শ্রীরঙ্গম	24th October, 1944
৫৫.	বন্দনার বিয়ে	মনোরঞ্জন ভট্টাচার্য	শ্রীরঙ্গম	26th October, 1944
৫৬	বিন্দুর ছেলে	দেবনারায়ণ গুপ্ত	শ্রীরঙ্গম	20th December, 1944
৫৭	বিংশ শতাব্দী	তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়	রঙমহল	25th December, 1944
৫৮.	সন্তান	বাণীকুমার	রঙমহল	18th January, 1945
৫৯	অনুপমার প্রেম	দেবনারায়ণ গুপ্ত	রঙমহল	27thSeptember, 1945
৬০	পলাশী	হীরেন্দ্রনারায়ণ মুখোপাধ্যায়	স্টার	11th October, 1945
৬১	শতবর্ষ আগে	মহেন্দ্র গুপ্ত	স্টার	21st December, 1945